উপমহাদেশের সমাজ ও প্রধান দ্বন্দ্ব

উপমহাদেশের সমাজ ও প্রধান দ্বন্দ্ব

সুব্রত বল

সুবর্ণরেখা ॥ ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড কলকাতা-৯

Upamahadesher Samaj O Pradhan Dwandwa

A Socio-political Study in Bengali by *Subrata Ball*

প্রকাশক
ইন্দ্রনাথ মজুমদার
সুবর্ণরেখা
৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা ৯

মুদ্রাকর
মদনমোহন চৌধুরী
শ্রীদামোদর প্রেস
৫১ এ কৈলাস বসু স্ট্রীট, কলকাতা ৬

প্রচ্ছদপট
তরুণ মিত্র
Shape.

মূল্য
কুড়ি টাকা

উৎসর্গ

যাঁরা বেঁচে থাকলে হয়তো
আজ আমার এ বইটি পড়তেন

সূচীপত্র

দ্বিতীয় খণ্ড

ভূমিকা

১.

আর সবকিছুর মতোই এ বইটারও একটা ইতিহাস আছে। কিন্তু যেহেতু এটা ঠিক অ্যাকাডেমিক ধরনের রচনা নয়, তাই এর ইতিহাস ভারতের 'নকশালপন্থী' আন্দোলনের মহান অনুশীলনের ইতিহাস থেকে অবিচ্ছেদ্য। বইটা বস্তুত তারই প্রত্যক্ষ ফল।

পেশাদার বিপ্লবী হয়ে যখন আমি পশ্চিমবঙ্গ থেকে রওনা হলাম তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের দ্বারা প্রায় চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত, উত্তর-পূর্ব ভারতের সেই ক্ষুদ্র পার্বত্য প্রদেশ ত্রিপুরাতে, তখন আমি নিছকই এক শহুরে পেটি-বুর্জোয়া যুবক—বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সবে বেরোনো, সাধারণের থেকে হয়তো-বা একটু আলাদা। আমি ছিলাম সেই মুষ্টিমেয়েরই দলের অনেকের মতো, যাঁরা তখন আক্রান্ত এক আশ্চর্য স্বপ্নের তাড়নায়: আরো নকশালবাড়ি গ'ড়ে তুলতে হবে, ভারতীয় সর্বহারাশ্রেণীর এক সাচ্চা পার্টির ভিত্তি স্থাপন করতে হবে, সৃষ্টি করতে হবে এক নতুন ভারতবর্ষ। আমার পরিবারের উদ্ভব পূর্ববঙ্গের অতি প্রাচীন, দীর্ঘ-ক্ষয়িষ্ণু, টিপিক্যাল কৌলীন্যগর্বী, হিন্দু-সামন্ত বংশ থেকে; অন্যদিকে তা ছিল একেবারে গোড়া থেকেই ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং এই ধারাটির মূল খুঁজে পাওয়া যায় তথাকথিত সিপাহী বিদ্রোহ ও ব্রিটিশবিরোধী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার মধ্যে। ভারত-বিভাগের ফলে আমার পরিবার নিক্ষিপ্ত হল পশ্চিমবঙ্গে স্রোতের মতো ঢুকতে-থাকা উদ্বাস্তুদের দলে, আর তেলেঙ্গানা সংগ্রামের পরিসমাপ্তি সম্পূর্ণ ক'রে দিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে সংশোধনবাদকে নেতৃত্বদায়ী ধারারূপে সংহত করার কাজ। ফলে, আমার স্মৃতির দৌড় যে সময় পর্যন্ত তার আগেই আমার পারিবারিক উত্তরাধিকারের সামন্তবাদী ও সাম্যবাদী এই দুটি উপাদানই নিজ নিজ ব্যঙ্গস্বরূপে পর্যবসিত হয়েছিল এবং তাদের সম্মিলন আমার পূর্ববর্তী প্রজন্মের প্রতিনিধিদের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিল এক ঘৃণ্য বিকটত্বের চেহারা নিয়ে। তাঁদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন অসাধারণ রকম আলোকপ্রাপ্ত ও মুক্তবুদ্ধি, তাঁরাই আবার একই সঙ্গে ছিলেন নিকৃষ্টতম ও পূর্ণতম অর্থে 'দেক্লাসে' বা শ্রেণীগোত্রহীন। সুতরাং প্রথম থেকেই এটা নির্ধারিত ছিল যে আমরা কোনোভাবেই আমাদের পূর্ববর্তী প্রজন্মের মতো হওয়ার চেষ্টা করব না। অন্তত কমিউনিজমের প্রেমে পাগল হওয়ার তো কোনো কারণই আমার ছিল না। নেতিবাচক দিক দিয়ে ছাড়া আমার পারিবারিক ঐতিহ্য আমাকে কমিউনিস্ট হতে কোনো

সাহায্যই করেনি। তা শুধু এটুকুই সুনিশ্চিত করেছিল যে শেষ পর্যন্ত আমি যখন বুঝব আমার মনোভাব আসলে যার বিরুদ্ধে উদ্যত তা মোটেই কমিউনিজম নয়, বরং তার যমজ সংশোধনবাদ, এবং তা বুঝে আমি যখন কমিউনিজমের দিকে মোড় নেব, তখন আমাকে আর সি পি আই ও সি পি এম-এর নরক-কুণ্ডের মধ্য দিয়ে যেতে হবে না। এটাই শুরু হল ১৯৬৬তে। মহান খাদ্য আন্দোলন একটি ঝলকে দেখিয়ে দিল শ্রেণীসংগ্রাম ভারতীয় সমাজেও কি সুতীব্র এক বাস্তব সত্য এবং কি বিপুল শৌর্যে উদ্দীপ্ত হতে সক্ষম আমার দেশের সাধারণ মানুষ। সময়টা ছিল আন্তর্জাতিক কমিউনিজমেরও বসন্তঋতু। চীনের মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব তখন চারদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে আশ্চর্য প্রাণ, সতেজতা, সৃজনশীলতা, স্পর্ধা ও দুঃসাহসের বার্তা—যে বার্তা দুনিয়াকে ভেঙে-গড়ার এই জঙ্গী মতবাদেরই মর্মবাণী। মার্কসীয় দর্শনের এক সস্তা পাঠ্যবই প'ড়ে সঙ্গে সঙ্গেই আমি মার্কসবাদী হয়ে গেলাম, যোগাযোগ গ'ড়ে তুলতে শুরু করলাম সি পি এম-এর ভেতর ও বাইরের বিক্ষুব্ধদের সঙ্গে। ১৯৬৭তে এল নকশালবাড়ি অভ্যুত্থানের খবর, আর তার কিছু পর থেকেই ভারতীয় ইতিহাসের দিগন্তে জেগে উঠতে লাগল আমার সব নবলব্ধ আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের জীবন্ত প্রতি-মূর্তি চারু মজুমদারের ক্ষীণ দেহ। ভয়ংকর গতিতে বাড়তে লাগলাম আমি। তত্ত্বের সম্বল শূন্য হলেও নিজের বুদ্ধিজীবী উৎস নিয়ে অস্বস্তিটা ছিল পুরোমাত্রায়, তাই আমি তখন অধীর সত্যিকারের অনুশীলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে। ১৯৬৮র গোড়ার দিকে ত্রিপুরায় গিয়ে কাজ শুরু ক'রে দিলাম আদিবাসী কৃষকদের মধ্যে।

১৯৬৯এ সি পি আই (এম-এল) গঠিত হল। ত্রিপুরাসহ বহু জায়গায় দেখা দিল সশস্ত্র সংগ্রামের এলাকা। পরের এক বছরের মধ্যে সশস্ত্র সংগ্রামের ঝড় বইতে লাগল প্রায় সারা ভারত জুড়ে। সেই বছরের শেষ দিকেই এল বিপর্যয়, কিন্তু বিপর্যয়গুলো তখনও স্পষ্ট ছিল না—অন্তত ত্রিপুরায় আমাদের কাছে তো নয়ই। তাই ১৯৭১এর গোড়ায় আমি যখন গ্রেপ্তার হই তখনও আমি চারু মজুমদার-প্রণীত পার্টি লাইনের নিঃসংশয় অনুগামী, যদিও পশ্চাৎ-দৃষ্টিতে আমি এখন বুঝি যে তখনই আমরা তা থেকে অচেতনভাবে সরতেও শুরু করেছি—অবশ্য সরাসরি সমালোচনার মধ্য দিয়ে নয়, আরো "সৃজনশীল" ও "নমনীয়" প্রয়োগের নাম ক'রে। জেলে কাটল প্রায় এক বছর এবং তার ফলে হাতছাড়া হয়ে গেল সে সময়কার বৃহত্তম উপমহাদেশীয় আলোড়নের, অর্থাৎ বাংলাদেশের উদ্ভবপ্রক্রিয়ার, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। ১৯৭২এর প্রথমে যখন জেল ভাঙার আরো একটি মামলা মাথায় নিয়ে বেরোলাম, ততদিনে আমাদের আন্দোলনের বিপর্যয় সম্পূর্ণ হয়ে গেছে কিন্তু পার্টি লাইনের পরিপ্রেক্ষিতে আমার নিজস্ব অবস্থানে তখনও কোনো তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন আসেনি। এই পশ্চাদ-র্তিতার জন্য অন্তত অংশত দায়ী বাকী ভারত থেকে ত্রিপুরার এক অদ্ভুত

বিচ্ছিন্নতা এবং আমার নিজের বিচ্ছিন্ন কারাজীবন। তবে অদম্যবর্ধিত সমস্যার চাপে প'ড়ে প্রাদেশিক পার্টি সিদ্ধান্ত নিল যে সরাসরি কথাবার্তার জন্য চারু মজুমদারের কাছে আমাকে পাঠানো হবে। আন্তর্জাতিক সীমান্ত তখনও শিথিল থাকায় আমরা বুঝলাম যে ত্রিপুরা থেকে পশ্চিমবঙ্গে যাওয়াটা সবচেয়ে নিরাপদ হবে বাংলাদেশের মধ্য দিয়েই। এই যাওয়ার সময়েই আমি দেখলাম যে জাতীয় দ্বন্দ্বকে প্রধান ধরার লাইন বাংলাদেশের মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের মধ্যে দ্রুত জোরদার হচ্ছে। তাঁরা দাবী করছিলেন যে এই বিষয়ে নাকি সি পি আই (এম-এল) ও স্বয়ং চারু মজুমদারের অনুমোদন রয়েছে তাঁদের পেছনে। অথচ মরীয়া চেষ্টা সত্বেও আমি নিজেকে এই লাইনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারলাম না। যত ভাবি ততই আমার এটাকে মনে হয় মারাত্মক শ্রেণীসমঝোতার অছিলা ব'লে—**চারু মজুমদার তাকে অনুমোদন ক'রে থাকুন বা না-ই থাকুন।** চারু মজুমদারের 'কর্তৃত্বে'র গোঁড়া দাসত্ব থেকে আমার মনের মুক্তিসাধন ও স্বাধীন তাত্ত্বিক চিন্তার অভিমুখে প্রথম পদক্ষেপ হওয়ার দরুণ এটা ছিল আমার বিকাশের পক্ষে সমধিক গুরুত্বপূর্ণ।

পশ্চিমবঙ্গে পৌছে প্রথম আমি টের পেলাম আমাদের পরাজয়ের প্রকৃত ব্যাপকতা। তখন পর্যন্ত অন্য অধিকাংশ মার্কসবাদী-লেনিনবাদীর মতোই আমিও সংগ্রামের যে কোনো সমস্যাকে 'ব্যাখ্যা' করতাম এক নির্ভুল শাস্ত্র-বাক্যের ত্রুটিপূর্ণ প্রয়োগের ফল হিসাবে। কিন্তু এবার আমি ভাবতে লাগলাম, এতগুলো অসঙ্গতির মূল যদি পার্টি লাইনেই না থেকে থাকে তবে তো তা বড় আজব ব্যাপার হবে! চারু মজুমদারের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলাপ আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারল না, বরং তা আমার সন্দেহগুলিকেই জোরদার ক'রে তুলল। আমি ঠিক করলাম, পার্টি লাইনকে কঠোর বস্তুনিষ্ঠ ও নির্মম সমালোচনামূলক বিশ্লেষণের সামনে ফেলতে হবে। ততদিনে সর্বভারতীয় পার্টি কাঠামো চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে, বিশাল দেশের বিভিন্ন প্রান্তের কমরেডদের মতামতের আদানপ্রদান ও কেন্দ্রীকরণ হয়ে উঠেছে অসম্ভব। আমরা বুঝলাম যে আপাতত ত্রিপুরা পার্টিকে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েই নিজের পুনর্ভাবনাটুকু চালাতে হবে। বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরায় ফেরার সময় ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩ তারিখে ঢাকায় আমি গ্রেপ্তার হয়ে গেলাম*।

* প্রসঙ্গত, কারামুক্তির পর ভারতে ফিরে আমি জানতে পারলাম যে আমার মুক্তি ও স্বদেশ-প্রত্যাবর্তনের জন্য আন্দোলনের সময় আমার দেশান্তরে কারাবাসের যে প্রকাশ্য ব্যাখ্যা রাখা হয়েছিল তা হল, আমি বাংলাদেশে গিয়েছিলাম ইন্দিরা সরকারের ফাসিবাদী অত্যাচার এড়াতে। মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের মধ্যে বহুলপ্রচলিত সংস্কারের বিপরীতে আমার জোরালো অভিমত হচ্ছে এই যে বিদেশে আশ্রয় খোঁজার মধ্যে প্রাবস্থিকভাবে অবিপ্লবী কিছুই নেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার এও মনে হয় যে তথ্যগুলো আমার সঠিকভাবেই রাখা উচিত: উপরোক্ত ব্যাখ্যাটির আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল সম্ভবত আন্দোলনগত সুবিধার কারণে।

তখন কি আমি কল্পনা করতে পেরেছিলাম ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে যে সময়টা আমাকে কাটাতে হবে তা হয়ে দাঁড়াবে আমার রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে নির্ধারক ও ফলপ্রসূ পর্যায়গুলির অন্যতম? এখানেই একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করলাম যে আমি আসলে এমন এক তাত্ত্বিক কাজের অর্ধেক পথ অতিক্রম ক'রে এসেছি, যা আমাদের বিপ্লবের সবগুলি মৌলিক সমস্যার সরাসরি মোকাবেলা করতে চাইছে এবং যার অনুসন্ধানপরিধি তাই মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো। আমার বিস্ময়ে কোনো খাদ ছিল না, কারণ আমি স্বপ্নেও নিজেকে কখনো এমন কাজে হাত দেওয়ার যোগ্য ব'লে ভাবিনি বা তার জন্য নিজেকে কখনো তৈরী করিনি সচেতনভাবে। আমার সম্বলের দৈন্য ছিল সত্যই লজ্জাজনক। আজও যখন আমি বলি যে আমার তাত্ত্বিক পাথেয় বলতে তখন ছিল কেবল মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্তালিন ও মাওয়ের গুরুত্বপূর্ণ রচনা-সমূহের মাত্র কয়েকটির অধ্যয়ন, এবং আমার ব্যবহারিক বিপ্লবী কার্যকলাপ থেকে আহৃত অভিজ্ঞতাগুলিকে সুসংবদ্ধ করার জন্য ও পার্টির তাত্ত্বিক ভিত্তি-রূপে গৃহীত মার্কসবাদের মৌলিক নীতিমালার সঙ্গে সেগুলিকে সম্পর্কিত করার জন্য এক নাছোড়বান্দা তাগিদ, অধিকাংশ কমরেডই তখন তাকিয়ে থাকেন অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে।

যা হোক, এবার বিদেশে কারারুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও আমি ছিলাম অত্যন্ত ভাগ্য-বান। কারণ ত্রিপুরা প্রাদেশিক কমিটির অমানুষিক প্রচেষ্টা ও আমার জন্য বিরল উৎকণ্ঠার ফলে এবং কিছু বাংলাদেশী কমরেড ও ঢাকা জেলের কিছু ওয়ার্ডারের অবিস্মরণীয় সাহায্যের দরুণ আমি স্বদেশের বিপ্লবীদের একটা অংশের সঙ্গে প্রাণবন্ত ও বেশ নিয়মিত পত্রবিনিময় চালাতে পেরেছিলাম। ত্রিপুরার কমরেডরা তখন অবিশ্বাস্যরকম দুরূহ অবস্থার মধ্যে একটি পরাজিত সংগ্রামের ধ্বংসাবশেষের উপর পুনর্নির্মাণের কাজে ব্যস্ত এবং সেই সূত্রে পার্টি লাইন পুনঃ-পরীক্ষা ও তাকে অতীত বিচ্যুতিসমূহ থেকে মুক্ত করারও দায়িত্বে নিয়োজিত। তাঁরা আমাকে তাঁদের সমস্যা ও অভিজ্ঞতা পাঠাতে লাগলেন আর আমি উত্তর দিতে থাকলাম তাৎক্ষণিক প্রবন্ধ, খুচরো নোট, মন্তব্য ও পরামর্শের আকারে। বাইরে সেগুলো দুটো পর্যায়ে সংকলিত হল: প্রথমে ত্রিপুরা পার্টি সেগুলোকে 'তরুণ নন্দী'র 'ভারতে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন টিঁকে থাকতে পারে?—১, ২, ৩ ও ৪' এই শিরোনামায় ধারাবাহিকভাবে প্রচার করল, তারপরে সেগুলোকে একটি দলিলের আকার দেওয়া হল এবং তা সি পি আই (এম-এল)এর ঐক্য কমিটির রাজনৈতিক-সাংগঠনিক রিপোর্টরূপে গৃহীত হল (২২ আগস্ট ১৯৭৫) ও নভেম্বর ১৯৭৫এর 'কমিউনিস্ট রিভিউ'তে প্রকাশিত হল। আমার তাত্ত্বিক কাজের এই প্রথম পর্যায়টি ক্রমান্বয়ে খণ্ডে খণ্ডে গ'ড়ে উঠেছিল তিন বছর ধ'রে। এই পর্যায়টি যখন শেষ হল, আমি জানতাম যে আমার

তাত্ত্বিক কাঠামোর লজিকই এবার দাবী করছে যাতে এবার আমি আমার মৌলিক আদিপ্রতিজ্ঞাটি—যে ভারতবর্ষ একটি আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্তবাদী দেশ—পরীক্ষা করতে অগ্রসর হই। বাইরের সংগ্রাম থেকে উঠে-আসা অধিকতর সমসাময়িক সমস্যার চাপে এই আদিপ্রতিজ্ঞাটিকে রেখে দিতে হয়েছিল এক অনুমিতির স্তরে—যে অনুমিতির সত্যতা আমার কাছে যতই সম্ভাব্য মনে হোক কখনো প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। তবে তা যে আমাকে আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্তবাদী ও পুঁজিবাদী সমাজের সংজ্ঞা ও নিরিখ নির্ধারণের ভীতিপ্রদ কাজের দিকে ঠেলে দেবে এটুকু আমার কাছে খুবই পরিষ্কার ছিল, কেননা অনেক আগে থেকেই আমি জানতাম যে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সাহিত্যে এই বর্গগুলিঃ কোনো সংজ্ঞা নেই। কেবলমাত্র লেনিনের 'দি ডেভেলপমেন্ট অব ক্যাপিটালিজম ইন রাশিয়া' বইটাই খুব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে না প'ড়েও আমি বহু পূর্বেই অনুভব করতে পেরেছিলাম যে 'পুঁজিবাদ **কতখানি** বিকশিত **হয়েছে**?' এই প্রশ্নের জবাবের মধ্যে সমাধানের মূল থাকতেই পারে না, বস্তুত সমস্যাটিকে উত্থাপন করার এই বন্ধ্যা ও ভুল ধরনটিই এই বিষয়ের উপর লেখা যাবতীয় সাহিত্যকে আমার কাছে মূল্যহীন ক'রে দিয়েছিল। তখনই আমি আন্দাজ করতে পারছিলাম যে সমাধানটা কোনো-না-কোনো-ভাবে আসবে 'অধোনত (underdeveloped) দেশে সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের বিশেষ অবস্থায় **কিভাবে** পুঁজিবাদী রূপান্তর **এগোচ্ছে**?' এই প্রশ্ন থেকে। এই অস্পষ্ট ধারণার উপর নির্ভর ক'রে আমি জেল থেকে একটা ছোটো প্রবন্ধও (পৃঃ ৯৫, পাদটীকা ৭) লিখে ফেললাম বাংলাদেশে সরাসরি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রবক্তা জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের বিরুদ্ধে। এইখানে এসে আমার চিন্তা আটকে রইল কিছুদিন। ইতিমধ্যে জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্যের তত্ত্ব বাংলাদেশী মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের মনের উপর প্রায় একচেটিয়া দখল কায়েম ক'রে ফেলেছে, তার ধাক্কা আমাদের সেলের নির্জনতাতেও মালুম হচ্ছিল। আমার কাছে যা এতদিন ছিল বহুলাংশে একটা তাত্ত্বিক কৌতূহলের বিষয় তা এবার সেলসঙ্গীদের কয়েকজনের একটানা চাপ ও উৎসাহে রূপান্তরিত হল এক জরুরী ব্যবহারিক সমস্যায়। এইরকম একটা সময়ে যখন প্রথম খণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ের মূল চিন্তাটি মোটামুটি সম্পূর্ণ আকারে আমার মনের মধ্যে ঝিলিক দিয়ে উঠল তখন আমি লিখতে বসলাম একটি প্রবন্ধ, যা তার স্বভাবগত অবাধ্যতায় হয়ে উঠল এই বইয়ের প্রথম খণ্ড। আদতে বর্তমান বইটির নামে যা ভারতে পাঠানো হয়েছিল তা হল এই প্রথম খণ্ডটাই। সেখানে এটা এবং তার ইংরাজি অনুবাদ হাতে-লেখা ও টাইপ-করা অবস্থায় সঙ্গে সঙ্গেই গোপনে বেশ ব্যাপক প্রচার লাভ করল। এখন দ্বিতীয় খণ্ড হিসাবে যা ঢোকানো হচ্ছে তা পরে গ'ড়ে উঠেছিল প্রথম খণ্ডের স্বাভাবিক ধারাবাহিকতায়, তার উপর ত্রিপুরার কমরেড-

দের পাঠানো নানা প্রশ্নের জবাব ও সংযোজনী হিসাবে; এগুলোও আলাদা আলাদা প্রবন্ধ ও "জেলের চিঠি" হিসাবে প্রচারিত হয়। **অতএব কড়াকড়িভাবে বলতে গেলে এটাই এই বইয়ের বিষয়বস্তুগুলির প্রথম প্রকাশ নয়**—একটা সম্ভাব্য সাংগঠনিক ভুল বোঝাবুঝি এড়ানোর জন্য এই কথাটি মনে রাখা প্রয়োজন।

কেননা আমি বিদেশে কারারুদ্ধ থাকার সময়েই একটা আগ্রহজনক প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং আমি ভারতে ফেরার আগেই তা শেষ হয়ে যায়। খণ্ডবিখণ্ড সি পি আই (এম-এল)কে পুনর্গঠিত করা ও ভারতের কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে ত্রিপুরা প্রাদেশিক কমিটি ও আসাম প্রাদেশিক কমিটি সংযুক্ত হয়ে 'আসাম-ত্রিপুরা জোনাল কমিটি' গঠন করে; অতঃপর তা পশ্চিমবঙ্গের কিছু গ্রুপের সঙ্গে একত্রিত হয়ে 'পূর্ব ভারত আঞ্চলিক সংহতি' গ'ড়ে তোলে এবং তা আবার আরো কয়েকটি প্রদেশের গ্রুপের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে 'সি পি আই (এম-এল)এর ঐক্য কমিটি'তে সম্প্রসারিত হয়; আর আমার মুক্তির ঠিক আগে এই 'ঐক্য কমিটি' ও কমরেড সত্যনারায়ণ সিংয়ের নেতৃত্বাধীন গ্রুপটি একত্রিত হয় 'সি পি আই (এম-এল)-এর অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কমিটি'র অধীনে। ফলে ৪ এপ্রিল ১৯৭৮ তারিখে ভারতে পা দিয়ে আমি দেখলাম যে আমি এই শেষোক্ত সংগঠনের সদস্য হয়ে গেছি এক ধরনের স্বয়ংক্রিয় অন্তর্ভুক্তি-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে—স্বয়ংক্রিয় এই অর্থে যে আমি তার অংশ হয়েছি কোনো স্বাধীন ব্যক্তিগত পছন্দের ভিত্তিতে নয় বরং নিছক এইজন্য যে যে-সংগঠনের আমি অংশ ছিলাম তা এখন এর অংশ, এবং তদুপরি এই অর্থে যে যে-সংগঠনে আমি যোগ দিতে যাচ্ছি তার সঙ্গে আমার দৃঢ়পোষিত ও **প্রকাশ্যে অভিব্যক্ত** একটা মতও ফয়সালা ক'রে নেওয়ার স্বাভাবিক সুযোগটুকু আমি পাইনি। এই অদ্ভুত অবস্থায় আমি বইটাকে প্রকাশ করতে পারি কেবল সুস্পষ্টভাবে এই ঘোষণাটি ক'রেই যে এটা আমার যেসব মতামতের পুনঃপ্রকাশ সেগুলো গঠিত ও **প্রকাশিত** হয় এমন সময় যখন বর্তমানের এই সংগঠনটির কোনো অস্তিত্বই ছিল না; তাই এ মতামতগুলোকে দেখতে হবে পুরোপুরিই আমার ব্যক্তিগত দায়িত্ব হিসাবে, যার সঙ্গে বিদ্যমান কোনো সংগঠন ও তার শৃঙ্খলার কোনো সম্পর্কই নেই।

সুতরাং জেলে আমার তাত্ত্বিক প্রচেষ্টাগুলির মধ্য থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ের (১৯৭৫এর শুরু থেকে ১৯৭৬এর শুরু পর্যন্ত) ফসলগুলিই ছিল সুসমাপ্ত পাণ্ডুলিপির অধিকতর কাছাকাছি আর তাই এগুলোই প্রথমে প্রকাশিত হচ্ছে; প্রথম পর্যায়ে (১৯৭৩এর মাঝামাঝি থেকে ১৯৭৫এর শুরু পর্যন্ত) জেল থেকে যে বিপুলসংখ্যক চিঠি, নোট ও প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলাম এবং যেগুলোর একটি অংশ রক্ষা পেয়েছে সেগুলো থেকে ভবিষ্যতে একটা বই দাঁড় করানোর পরিকল্পনা

আমার আছে। এর ফলে অবশ্য ঐতিহাসিক পারম্পর্য লঙ্ঘিত হল, কিন্তু আমার বিশ্বাস তার জন্য আমার পাকা অজুহাত রয়েছে: যৌক্তিক পারম্পর্যটি এতে পুনঃস্থাপিত হল। যেসব পাঠক এ বইয়ের বিষয়বস্তুগুলির পূর্বতন রূপটির সঙ্গে পরিচিত তাঁরা খেয়াল করলে দেখবেন যে অন্য সব দিক থেকেই আমি সর্বাধিক-সম্ভব ঐতিহাসিক বিশ্বস্ততা রক্ষার চেষ্টা করেছি। বেশীর ভাগ পরিবর্তনই হয়েছে নিছক লিখনশৈলীগত। বাকী সামান্য কটির ব্যাপারে যখনই তিলমাত্র সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে যে সেগুলি হয়তো আমার পরবর্তী চিন্তা থেকে অচেতনভাবে আহৃত বিষয়বস্তুগত সংযোজনী হয়ে যেতেও পারে তখনই আমি হয় সেগুলোকে সযত্নে চৌকো বন্ধনীর মধ্যে সন্নিবেশিত করেছি কিংবা অন্যভাবে তা জানিয়ে দিয়েছি। এমন কি শেষোক্ত পর্যায়েরও অধিকাংশই আসলে পরবর্তী ধারণা নয়, বরং সেগুলোর উদ্ভব জেলেই—এমন কি দ্বিতীয় খণ্ডের প্রবন্ধগুলি লেখার সময়েই। মূল বইয়ের সঙ্গে দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয়গুলিও যোগ ক'রে দিলাম কারণ সেগুলোতে রয়েছে মূর্ত সমস্যাবলীর উপর প্রথম খণ্ডে নিষ্কাশিত সাধারণ নিয়মাবলীর প্রয়োগের দৃষ্টান্ত এবং তাই সেগুলো হয়ে দাঁড়িয়েছে আমার তাত্ত্বিক মীমাংসাগুলির সৎ যাচাই ও অধিকতর বিকাশ।

২

আমি জানি যে প্রায়-উন্মত্ত 'উপাত্ত পূজা'র এই দিনে আমার বই অন্তত প্রথমে অনেক পাঠককেই নিরাশ করতে পারে। কারাজীবনের সীমাবদ্ধতার মধ্যে অবশ্য সম্মানজনক পরিমাণের পরিসংখ্যান বিপুল আয়াসে নানাভাবে বার বার সাজিয়ে, বিশ্লেষণ ও পুনর্বিশ্লেষণ ক'রে তার মধ্যে ঠেসে দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভবই ছিল না। তবে সেটা কোনো অজুহাত নয়—এই ধরনের পরিশ্রমকে যদি আমি আমার বইয়ের উদ্দেশ্যের পক্ষে অপরিহার্য ব'লে ভাবতাম তাহলে হয় জেল থেকে না বেরোনো পর্যন্ত বইটা আমি লিখতামই না, নতুবা লেখার পরেও বর্তমান আকারে আজ তা প্রকাশ করতাম না।

মার্কসবাদী হিসাবে অবশ্য আমি সাধারণভাবে তথ্য থেকে, এবং বিশেষভাবে পরিমাণীকৃত তথ্য থেকে, সত্য খোঁজার গুরুত্ব অস্বীকার করার কথা ভাবতেই পারি না। বস্তুত আমার সারা বই জুড়ে আমি বেশ ভালো পরিমাণ তথ্য নিয়ে কারবার করেছিও বটে। এমন কি পরিমাণীকৃত তথ্যও অবহেলিত হয়নি। বরং এই বইয়ে বিশ্লেষিত সমস্যাগুলি আলোচনার জন্য যেসব উপাত্ত পাওয়া যায় এবং সাধারণত ব্যবহৃত হয়, ১০৭ পৃষ্ঠার একটি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদে তাদের অভিন্ন বৈশিষ্ট্যটি আঁকড়ে ধ'রে আমি আসলে একধাক্কায় তাদের **গোটা একটা শ্রেণীর** সঙ্গেই কারবার সেরে দিয়েছি: অর্থনীতিবিদ ও সমাজতত্ত্ববিদেরা (এমন কি তাঁদের মধ্যে যাঁরা মার্কসবাদী তাঁরাও) সকলেই ব্যতিক্রমহীনভাবে যে

পদ্ধতিতে তাদের ব্যবহার করার চেষ্টা ক'রে থাকেন তার অর্থহীনতা ও নিষ্ফলতা আমি উদ্ঘাটন করেছি এবং যে একটিমাত্র পদ্ধতিতে তাদের অর্থপূর্ণভাবে কাজে লাগানো সম্ভব তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি। তবু এটা সত্য যে প্রথম খণ্ডে ধারণাসমূহের বিশ্লেষণ এবং তাদের সঠিক সংজ্ঞা ও নিরিখ কড়াকড়িভাবে প্রতিষ্ঠা করার উপর যতটা জোর রয়েছে ততটা জোর তথ্য বিশ্লেষণ ও তা থেকে ইতিমধ্যে-সংজ্ঞায়িত বর্গের ভাষায় সিদ্ধান্ত নিষ্কাশনের উপর দেওয়া হয়নি। আর তার কারণ খুবই পরিষ্কার—প্রয়োজনীয় বর্গগুলির একটারও সংজ্ঞা কখনো যুক্তি-গতভাবে প্রতিষ্ঠিতই হয়নি। আজকালকার ফ্যাশানদুরস্ত 'উপাত্ত পূজা'র মূল বৈশিষ্ট্যটাই তো নিহিত রয়েছে এই নিতান্ত প্রাথমিক সত্যটি ভুলে যাওয়ার মধ্যে যে সংকলনের হাজার সৌষ্ঠব সত্ত্বেও উপাত্ত নিজে নিজে কোনো অর্থই বহন করে না; যতখানি মাত্রায় তারা সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত প্রসব করতে পারে—অর্থাৎ কতগুলি প্রতিজ্ঞাকে সমর্থন ও কতগুলিকে খণ্ডন করতে পারে—কেবল-মাত্র ততটুকুই তাদের তাৎপর্য। কিন্তু এই কাজে আপনি তাদের লাগাবেন কেমন ক'রে যদি না আপনার সিদ্ধান্ত গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় ধারণাগুলির সুস্পষ্ট বাচ্যার্থ আপনি আগে থাকতেই প্রতিষ্ঠা ক'রে থাকেন? আমাদের ধরনের সমাজবিষয়ক ভয়ংকর পরিমাণ লেখাপত্রের দিকে একবার তাকান। পণ্ডিতেরা ন্যক্কারজনকভাবে পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অধিক থেকে অধিকতর পরিমাণ উপাত্ত জমিয়ে তোলেন আর তারপর একে অন্যের বিরুদ্ধে এবং প্রত্যেকেই উপযুক্ত মাত্রার গাম্ভীর্য সহকারে দাবী করেন যে "অতএব" অমুক সমাজটা 'অধোনত' বা 'পুঁজিবাদী' বা 'আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্তবাদী,' বা 'নির্ভরশীল পুঁজিবাদী' বা 'একটা ঔপনিবেশিক উৎপাদনব্যবস্থা' ইত্যাদি। এই বিরক্তিকর নিস্ফল বিতর্ক যে কখনও শেষ হয় না তার কারণ এঁদের কেউই এই সহজ প্রশ্নটার জবাব দেওয়ার তোয়াক্কা করেননি: কোনো এক বিশেষ বর্গকে সনাক্ত করার এবং **অন্যগুলিকে বর্জন ক'রে** সেটার ব্যবহারকেই আবশ্যিক ক'রে তোলার নিরিখগুলি ঠিক কি?

আমার অনুমান, এইখানে যে পাল্টা জবাবটি আসবে তা এই: "বর্গ ও তার সংজ্ঞার ক্ষেত্রে সঠিক-বেঠিক কিছু থাকতে পারে না। বিজ্ঞানের একমাত্র দাবী হল, আপনার ব্যবহৃত নামগুলির আপনি যা-খুশী সংজ্ঞা দিন অথবা—যা একই কথা—আপনার প্রয়োজনীয় ধারণাগুলির আপনি যা-খুশী নাম দিন, আপনাকে তার সঙ্গে আগাগোড়া সঙ্গতি বজায় রেখে যেতে হবে। আপনি যেভাবে কতগুলি বর্গের 'সঠিক' সংজ্ঞা **যুক্তি খাটিয়ে** বের করার চেষ্টা করেছেন তা কি অসার ভাষাতত্ত্ব ও essentialist তর্ক নিয়ে বন্ধ্যা স্কলাস্টিক কসরৎ নয়?" আমরা কমিউনিস্টরা প্রায়ই যে অন্তহীন বাচনিক (verbal) বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়ি তার বিরুদ্ধে গোলাপগন্ধের নাম-নিরপেক্ষতাবিষয়ক এই প্রাচীন হিতোপদেশটি

একটি মূল্যবান হুঁশিয়ারি বটে, কিন্তু বিমূর্তভাবে গ্রহণ করলে তা সংজ্ঞার সমস্যা সম্বন্ধে এমন এক নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্ম দেয় যাকে নানা কারণে আমি স্বীকার করতে পারি না। বইয়ের ১২ পৃষ্ঠায় ১নং পাদটীকায় আমি উল্লেখ করেছি যে একদিকে আপনি যদি আপনার মতামতগুলিকে বিবৃত করেন কোনো অগ্রিম-বিদ্যমান জ্ঞান-ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে (আর, মূর্তভাবে বলতে গেলে, তা কি কখনও পুরোপুরি এড়ানো সম্ভব ?), যেমন ধরুন মার্কসবাদের কাঠামোর মধ্যে, অথচ অন্যদিকে কোন কোন সংজ্ঞা সেই জ্ঞান-ব্যবস্থার সঙ্গে সবচেয়ে ভালোভাবে খাপ খায় তা নির্ণয় করার দায়িত্ব নিয়ে একেবারেই মাথা না ঘামানোর নিরঙ্কুশ স্বাধীনতাটি নিজের জন্য সংরক্ষিত রাখেন, তাহলে তাতে অসঙ্গতির উদ্ভব প্রায় অবধারিত হয়ে ওঠে। তবে এহ বাহ্য। সংজ্ঞার সমস্যা সম্বন্ধে এইরকম বিমূর্ত ও স্বেচ্ছাচারী দৃষ্টিভঙ্গী টিপিকাল অ্যাকাডেমিজীবীর নিধিরামমার্কা ঔদ্ধত্য নিয়ে একদিকে বিজ্ঞান ও অন্যদিকে লোকায়ত অনুশীলন, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের দীর্ঘ সামাজিক-ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া—এই দুইয়ের মধ্যে এক অলীক চীনা প্রাচীর খাড়া করতে চায়। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে বিজ্ঞানী হল এক নির্জন হাঁস, যে তার 'বিজ্ঞানে'র আস্ত বিরাট ডিমটা পাড়ে এক চরম শূন্যতার মধ্যে। অথচ বিজ্ঞানের পুরো ইতিহাস দেখিয়ে দেয় যে প্রত্যেক বিজ্ঞান—বিশেষত প্রত্যেকটি তরুণ বিজ্ঞান, আর মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিকাশের দিক থেকে এখনও তরুণই বটে—তার অন্তত মূল বর্গগুলিকে পূর্বতন ব্যবহারধারা থেকেই গ্রহণ করে এবং সেগুলিকে সংজ্ঞায়িত করার সময় তাদের ঐতিহাসিকভাবে অর্জিত অর্থকে স্বেচ্ছাচারিতার সঙ্গে উড়িয়ে দেয় না বরং সেই অর্থকেই আরো স্পষ্ট, যথাযথ ও তাত্ত্বিক কর্মোপযোগী ক'রে তোলে। স্মরণাতীত কাল থেকেই লোকে 'ধাতু' শব্দটি ব্যবহার ক'রে আসছে এবং তার আওতায় কি কি জিনিস পড়ে আর কি কি পড়ে না সে সম্বন্ধে কাজ চালানোর মতো একটা জ্ঞানও পোষণ ক'রে আসছে। রসায়নবিদ্যা যখন ধাতুকে সংজ্ঞায়িত করল এমন এক মৌলিক পদার্থ ব'লে যা অ্যাসিড থেকে হাইড্রোজেন পরমাণুকে হটিয়ে দেয়, তখন নামটাকে সে তার তদবধি-অর্জিত অর্থ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কোনো অর্থ বোঝাতে বাধ্য করেনি, বরং সেই অর্থটাকেই সে এমনভাবে তীক্ষ্ণ করল যা ছিল দীর্ঘ-সঞ্চিত সামাজিক-ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার দৃষ্টিকোণ থেকে 'সঠিক'। ঔপনিবেশিক' ও 'স্বাধীন'এর থেকে পৃথক একটি বর্গ 'আধা-ঔপনিবেশিক', এবং 'সামন্তবাদী' ও 'পুঁজিবাদী'র থেকে পৃথক একটি বর্গ 'আধা-সামন্তবাদী' সম্বন্ধেও আমার দায়িত্বটা আমি একইভাবে গ্রহণ করেছিলাম। এই বর্গগুলি বিপ্লবী অনুশীলন ও তত্ত্বে দীর্ঘদিন যাবৎ ব্যবহৃত হয়ে আসছে, এবার অনুশীলনেরই বিকাশ দাবী করছে যেন সেই ব্যবহারবিধির যুক্তিগ্রাহ্য অন্তর্বস্তুকে সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ দ্বারা নির্ধারণ করা হয় ও সেই অন্তর্বস্তুর

ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রেখেই বর্গগুলির সংজ্ঞাকে দেওয়া হয় আরো কালোপযোগী যাথার্থ্য।

'নকশালপন্থী' আন্দোলন যে হারে ধ্বংসে গিয়েছে ঠিক সেই হারেই তা অর্থনীতিবিদ, সমাজবিজ্ঞানী ও সংস্কৃতি-উৎসাহী প্রমুখ বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে একটা সম্মানজনক বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে ; নানাভাবে তা বিদগ্ধ পরিভোগের জন্য এক নিরাপদ ধরনের পণ্যও হয়ে উঠেছে। বিশেষত অর্থনীতিবিদেরা যেন দ্রুত বাঁয়ে মোড় নিচ্ছেন : আমাদের সমাজের চরিত্রনির্ধারণের সাধারণ সমস্যা এবং আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্তবাদী হিসাবে তাদের চরিত্রায়ণের বিশেষ সমস্যা নিয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনায় লিপ্ত হচ্ছেন তাঁরা। অবশ্য এর সবটাই খারাপ নয়। তাঁদের কেউ কেউ এমন কি আমাদের মতো 'অনুশীলনরত বিপ্লবী' ও তাঁদের মতো 'তত্ত্ববিদ'দের মধ্যে ভাববিনিময়ের গুরুত্বের উপরেও জোর দিয়ে থাকেন। কিন্তু এই ধরনের ভাববিনিময় যদি কার্যকরী হতে হয় তাহলে তা যেমন 'অনুশীলনরত বিপ্লবী'দের কাছ থেকে তত্ত্ব সম্বন্ধে এক নতুন মনোভাব দাবী করবে, ঠিক তেমনি বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকেও তা দাবী করবে অনুশীলনের প্রতি, বিপ্লবী কর্মী ও জনগণের পথ-হাতড়ানো কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতির মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির প্রতি, এক নতুন মনোভাব। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে বুদ্ধিজীবীদের নিঃসংশয় হতে হবে 'কঠোর' বিজ্ঞানের সঙ্গে অনুশীলনলব্ধ 'লোকায়ত' জ্ঞানের অঙ্গাঙ্গী-সম্পর্ক সম্বন্ধে, দ্বিতীয়টির উপর প্রথমটির নির্ভরশীলতা ও দ্বিতীয়টিকে প্রথমটির সেবা করার দায়িত্ব সম্বন্ধে। এক কথায়, জীবন্ত অনুশীলন থেকে বিপ্লবীদের আহৃত অভিজ্ঞতার প্রতি জ্যেষ্ঠ ও মাস্টারসুলভ মনোভাব থেকে তাঁদের মুক্ত হতে হবে এবং অনুশীলনের অভিজ্ঞতার কাছে 'পাঠ নেওয়া'র জন্য তৈরী হতে হবে। আমার বই যদি আর কোনো কাজ না ক'রে তাঁদের মনে অন্তত এই মৃদু খটকাটুকুও জাগিয়ে দিতে পারে যে, আমাদের সমাজরূপ সম্বন্ধে তাঁদের যাবতীয় লেখাপত্র অনেক মূল্যবান মালমশলা ও খুচরো অন্তর্দৃষ্টির সমাবেশ সত্ত্বেও হয়তো বা বহুলাংশে বিফল হয়ে গেছে, এবং হয়তো এমন কি সমস্যাটার সঠিক উত্থাপনকেও আসতে হবে 'অনুশীলনে'রই দিক থেকে, তাহলেই আমি নিজেকে অপরিসীম আপ্যায়িত মনে করব।

এসবই অবশ্য আসলে তত্ত্ব ও অনুশীলনের ঐক্যের সেই বহুপুরাতন বিষয়টিরই পুনরাবৃত্তি। তবে আমি ঠিক প্রচলিত ধরনে বিষয়টার উপর জোর দিচ্ছি না। মার্কসবাদীরা অসংকোচেই মেনে নেন যে আমাদের আন্দোলনের সব বিচ্যুতিই শেষ পর্যন্ত তত্ত্ব ও অনুশীলনের বিচ্ছেদ থেকে উদ্ভূত এবং আমাদের দায়িত্ব তাদের ঐক্যবদ্ধ করা। কিন্তু তাঁরা প্রায় সকলেই এই দায়িত্বটাকে দেখেন ও পালন করার চেষ্টা করেন এক ভ্রান্ত, সংকীর্ণ পদ্ধতিতে। তাঁরা যেন কল্পনা করেন : একদিকে রয়েছে তত্ত্ব, আরেকদিকে অনুশীলন ;

যেহেতু দুর্ভাগ্যক্রমে তারা পরস্পরের থেকে আলাদা হয়ে বাস করছে তাই যা দরকার তা হল দুটোকে তাদের **নিজ নিজ বর্তমান স্তরে রেখেই** কোনো-রকমে একসঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া; এবং কেবলমাত্র এই বিবাহের পরিণতিতেই তাদের স্তরের উন্নতি ঘটতে পারে। আমার অবস্থান কিন্তু এর ঠিক উল্টো: অবিরাম প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আমরা যে তাদের মেলাতে ব্যর্থ হয়েছি এই ঘটনাটাই তো প্রমাণ করে যে বর্তমান স্তরে রেখে তাদের ঐক্যবদ্ধ করা যাবে না। বরং তাদের স্তরের উন্নতিসাধনই (কোনো একটি বিশেষ মুহূর্তে যা শুরু করতে হবে প্রধানত তাদের **একটির** স্তরের উন্নতি দিয়ে) হল তাদের ঐক্যসাধনের **পূর্ব-শর্ত**। আমি আশা করি, আমার বইয়ের পুরো ধাঁচটাই পরিষ্কার ক'রে দিয়েছে যে আমার মতে তত্ত্ব ও অনুশীলনের ঐক্যসাধনের জন্য আমাদের এখন প্রয়াস কেন্দ্রীভূত করতে হবে প্রধানত আমাদের **তত্ত্বের** বর্তমান স্তরের উন্নতিসাধনের উপর। তত্ত্বের ক্ষেত্রে বাঁধ-ভাঙাকেই যে বর্তমানে আমাদের সকল প্রয়াসের প্রধান দিক হিসাবে গ্রহণ করা উচিত সেটা তো আমাদের অসাধারণ সমৃদ্ধ ও বীরত্বপূর্ণ অনুশীলনের এতাবৎ অমীমাংসিত সমস্যার সংখ্যাবহুলতা থেকেই পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার কথা। এমন কি ভারতের কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের ঐক্যসাধনের প্রচেষ্টায় আমরা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তাতেও তা-ই প্রতিপন্ন হয়। এখন পর্যন্ত আমাদের এই প্রচেষ্টা প্রায় পুরোপুরি সীমাবদ্ধ রয়েছে এই বিষয়ের উপর জোর দেওয়াতে যে বিভিন্ন গ্রুপের চেষ্টা করা উচিত যাতে তারা, এখন ঠিক যেভাবে রয়েছে সে অবস্থাতেই ও নিজ নিজ রাজনৈতিক লাইন অক্ষুণ্ণ রেখেই, নিজেদের মধ্যেকার মতপার্থক্যগুলিকে একটি অভিন্ন গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার কাঠামোর মধ্যে ধরিয়ে নিতে পারে। কিন্তু এই বিষয়ের উপর জোর-দেওয়া অব্যাহত রেখেই আমাদের আজ এটা বোঝার সময় এসেছে যে এটাকে আমাদের প্রচেষ্টার **প্রধান** উপাদান করার মধ্য দিয়ে যদি ঐক্যসাধন সম্ভব হত তবে তা অনেক আগেই হাসিল হয়ে যেত। আমাদের অভিজ্ঞতার শিক্ষা কিন্তু দ্ব্যর্থহীন। ঐক্য আসতে পারে শুধু তখনই যখন তীব্র তাত্ত্বিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যেকার বর্তমান মতৈক্য ও মতানৈক্যের পুরো সমাহার-টাই বিপ্লবায়িত হয়ে সম্পূর্ণ নতুন ও উচ্চতর এক স্তরে উঠে যাবে। ভারতীয় সর্বহারাশ্রেণীর পার্টি পুনর্নির্মাণের ব্যাপারে সিরিয়স প্রতিটি ব্যক্তি ও গ্রুপকে এই তত্ত্বের ক্ষেত্রে বাঁধ-ভাঙার কাজকেই ঐক্যপ্রচেষ্টার প্রধান দিক হিসাবে ধরতে হবে। কিন্তু মোহ দুর্ভাগ্যক্রমে অত সহজে মরে না। যে সামান্য কজন এই মূল্যায়নের সঙ্গে মুখে একমত হন তাঁরাও অনুশীলনে তা লঙ্ঘন করেন। তাঁরা তাঁদের তাত্ত্বিক সংগ্রাম শুরু করার আগে সর্বদাই 'আরেকটু ব্যাপক' সংগঠনিক ভিত্তি খুঁজে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু সে ভিত্তি যে কখনোই বাস্তবায়িত হয় না তার সহজ কারণ হল, সাংগঠনিক সংহতিসাধন কখনো মতাদর্শগত সংহতি-

সাধনের আগে আসতে পারে না। এই মুহূর্তে যে সাংগঠনিক ভিত্তিটুকু আছে তা যতই অকিঞ্চিৎকর হোক তার উপর দাঁড়িয়েই—এমন কি দরকার হলে ব্যক্তিগত উদ্যোগেই—তাত্ত্বিক সংগ্রাম শুরু ক'রে দিতে হবে। হ্যাঁ, আর আমাকে তত্ত্বের উপর একপেশে বুদ্ধিজীবীসুলভ জোর দেওয়ার অভিযোগ তুলেও বসিয়ে দেওয়া যাবে না, কারণ আমি এ কথা বলছি ভারতের সেই অতি অল্প সংখ্যক প্রদেশেরই একটির অভিজ্ঞতার দৃঢ় জমিতে দাঁড়িয়ে যেখানে মার্কস-বাদী-লেনিনবাদীরা এখন নিয়োজিত রয়েছেন সতেজে-প্রসারমান খাঁটি গণ-বিপ্লবী অনুশীলনে।

আমার বই এ উপলব্ধিতেও অনুপ্রাণিত যে, তত্ত্ব ও অনুশীলনের মধ্যেকার বিরাট ফাটলের কথা যে বিশেষ অর্থে উপরে উল্লেখ করেছি তা শুধু জাতীয় ক্ষেত্রে নয় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও অত্যন্ত প্রকট। একদিকে আমরা উত্তরোত্তর যা পাচ্ছি তা হল : তত্ত্ব=অভিজ্ঞতার সারসংকলন=পরস্পরের সঙ্গে ও মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সাধারণ তত্ত্বব্যবস্থার সঙ্গে যৌক্তিক সম্পর্কবিহীন প্রচুরসংখ্যক ব্যবহারিক বিধির সমষ্টি ; অন্যদিকে আমাদের মধ্যে যৌক্তিক চিন্তার যেটুকু আজও অবশিষ্ট আছে তা-ও খরচ হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন কর্তৃত্বশালী লেখার মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের স্কলাষ্টিক কসরতে। লেনিনের মৃত্যুর পর থেকে ক্রমান্বয়ে অবনতিশীল এই মারাত্মক অবস্থাকে যে একটি বাক্যে বিবৃত করা যায় তা হল : অনুশীলনলব্ধ অভিজ্ঞতার উপর জটিল তাত্ত্বিক যুক্তিধারাকে প্রয়োগ করা হচ্ছে না। আমার মনে হয়, চীন বিপ্লবের বিজয়ের পরে বিশ্বব্যাপী সংশোধনবাদবিরোধী সংগ্রাম কেন অক্টোবর বিপ্লবের পরবর্তী পর্যায়ের সঙ্গে তুলনীয় একটা গতিবেগ ও সংহতি অর্জন করতে পারল না, তার ব্যাখ্যা অংশত নিহিত রয়েছে এরই মধ্যে। আমার বই মোটেই এই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির সংশোধক নয় কিন্তু তা মার্কসবাদের এই সহজীকৃত, লোকবিজ্ঞান-মার্কা পর্যায়ের বিরুদ্ধে এক খোলাখুলি প্রতিবাদ তো বটেই। উপরন্তু তা এই বিষয়েরও স্বীকৃতি যে ইতিহাস সৌভাগ্যক্রমে ভারতীয় বিপ্লবকে এমনই এক কোণঠাসা অবস্থার মধ্যে নিক্ষেপ করেছে যে বিশ্ব-মার্কসবাদের এই ক্রমাগত তাত্ত্বিক অবমূল্যায়ন রোধ করার জন্য তাৎপর্যপূর্ণ অবদান না রেখে তার পক্ষে এক পা-ও অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়।

অতএব আমার অবলম্বিত পদ্ধতিটির দুটি চরিত্রবৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রথমত আমি যে শুধু বিপ্লবী কর্মী ও জনগণের জীবন্ত অনুশীলন থেকে আহরিত 'লোকায়ত' অভিজ্ঞতার ইতিহাসপ্রদত্ত ভিত্তির উপর শ্রমসাধ্য, বিশদ ও জটিল যুক্তিধারাকে এনে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছি তা-ই নয়, উপরন্তু দীর্ঘ যুক্তি-শৃঙ্খলের মধ্য দিয়ে কোনো একটা সিদ্ধান্তে পৌছানোর পর আমি সর্বদাই ব্যবহারিক সংগ্রামের সবচেয়ে মেঠো সমস্যাবলীর উপর তার তাৎপর্য পরীক্ষা

করতেও ফিরে গিয়েছি। দ্বিতীয়ত আমি পাঠককে শুধু আমার রান্না-করা খাবারের থালা ধরিয়ে দিয়েই বিদায় করিনি, তাঁকে আমার রান্নাঘরের মধ্য দিয়েও নিয়ে যেতে চেয়েছি। মার্কস অবশ্য বলেছিলেন যে "অনুসন্ধানের পদ্ধতি থেকে উপস্থাপনার পদ্ধতির রূপের পার্থক্য থাকবেই" ('পুঁজি', ১ম খণ্ডের ভূমিকা, ১৮৭৩)। কিন্তু আমাদের বিপ্লবী কর্মীদের মধ্যে তাত্ত্বিক চিন্তার সাধারণ দারিদ্র্যের কথা মনে রেখে আমি ক্লান্তিকর হওয়ার ঝুঁকি নিয়েও আমার বইয়ে অনুসন্ধানের নেপথ্য প্রক্রিয়াটিরও কিছুটা পরিচয় রেখে দিয়েছি।

আমার মনে হয়, এতক্ষণ আমার যে সাধারণ মনোভাবগুলির রূপরেখা আঁকলাম সেগুলোকে রূপায়িত করার সবচেয়ে স্পর্ধিত প্রচেষ্টা নিয়েছি যেখানে সেই চতুর্থ অধ্যায় (প্রথম খণ্ড) সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য ক'রে রাখার এটাই সবচেয়ে ভালো জায়গা। এই অধ্যায়ে আমি 'আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্তবাদী' বর্গটির যথাযথ সংজ্ঞা ও নিরিখ—এবং 'উপনিবেশ', 'স্বাধীন', 'সামন্তবাদী' ও 'পুঁজিবাদী' বর্গকটি থেকে ঐ বর্গটির পার্থক্যনির্দেশের মাধ্যমে এই শেষোক্ত বর্গকটিরও যথাযথ সংজ্ঞা ও নিরিখ—প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছি। আমি বেশ ভালোরকম নিঃসংশয় যে আমার সিদ্ধান্তলাভের প্রক্রিয়ায় কোনো গুরুতর যৌক্তিক ত্রুটি নেই। সুতরাং মার্কসবাদীদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধ'রে প্রচলিত এই বর্গগুলি যদি নিছক কল্পনার ফসল না হয়ে বাস্তব গুণের নাম হয়ে থাকে তাহলে আমার পাওয়া নিরিখগুলির খুব কাছাকাছি কিছু বাস্তব জগতেও পরিলক্ষিত হওয়ার কথা। কাজেই, নির্দিষ্টভাবে 'আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্তবাদী' বর্গটির সম্বন্ধে বলা যায় যে, একবার যখন তার বিশ্লেষণ সম্পন্ন হয়ে তার নিরিখগুলি যুক্তিগতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন যা বাকী রইল তা হল শুধু অভিজ্ঞতাভিত্তিক যাচাই। এবং তা থেকে চারটি সম্ভাব্য ফলাফল বেরোতে পারে:

(১) এখন পর্যন্ত আধা ঔপনিবেশিক আধা-সামন্তবাদী সমাজের প্রতিভূ ব'লে ধরা হয়েছে এমন কোনো দেশ, অর্থাৎ প্রাক-বিপ্লব চীন, এবং এখানে আমার আলোচিত দেশসমূহ এরা উভয়েই দেখা যাবে এইসব নিরিখ পূরণ করছে। আমার পক্ষে এটাই হবে সর্বোত্তম পরিণতি, কারণ তাতে এই সবগুলি দেশই আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্তবাদী ব'লে **প্রমাণিত** হয়ে যাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ আত্মীয়তা প্রতিপন্ন হয়ে যাবে এইসব দেশের বিপ্লব ও চীনের বিপ্লবী অভিজ্ঞতার মধ্যে।

(২) দেখা যাবে যে চীন এইসব নিরিখ পূরণ করলেও আমাদের বর্তমান বিতর্কের কেন্দ্রস্থিত দেশগুলি তা পূরণ করছে না। তাতে প্রমাণিত হবে যে চীন আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্তবাদী দেশ ছিল ঠিকই, কিন্তু বাকী দেশগুলির একটাও তা নয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণিত হবে যে চীন ও এইসব

দেশের বিপ্লবের মধ্যেকার আত্মীয়তাকে আমরা অনেকেই যতটা ঘনিষ্ঠ ব'লে আশা ক'রে এসেছি, তা ততটা ঘনিষ্ঠ হতেই পারে না।

(৩) এইসব নিরিখ কেউই পূরণ করবে না—না চীন, না এই বাকী দেশগুলি। তাতে কার্যত এটাই দাঁড়াবে যে 'আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্তবাদী' বর্গটির অস্তিত্বের ব্যাপারে সব মার্কসবাদীই এতদিন যে সায় দিয়ে এসেছেন তা-ই ছিল পুরোপুরি ভুল এবং এই অশরীরী বর্গটির আশ্রয় না নিয়েই সফল চীন বিপ্লবের অভিজ্ঞতাকে আমাদের পুনর্বিচার ও গ্রহণ করতে হবে।

(৪) এইসব নিরিখকে চীন লঙ্ঘন করবে কিন্তু পূরণ করবে এই বাকী দেশগুলি এবং তাতে প্রমাণিত হবে যে, প্রাক-বিপ্লব চীন নয় বরং এই দেশগুলিই আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্তবাদী দেশ! এই অপ্রত্যাশিত ও বিস্ময়কর পরিণতি নিয়ে এখনই জল্পনা করতে যাওয়াটা কিন্তু বড় বেশী দূরান্বেষণ হয়ে যাবে।

কিন্তু একটা বিষয় নিশ্চিত: এই চারটে ফলাফলের যেটাই বাস্তবায়িত হোক না কেন তা নিঃসন্দেহে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের বিকাশে একটা নতুন দিক খুলে দেবে।

তত্ত্বের প্রতি এবং তত্ত্ব ও অনুশীলনের সম্পর্কের প্রতি আমার মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে আমার বই প্রবল তর্কমূলক ছাড়া আর কিছু হতে পারিত এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। তর্কের উত্তাপ বৈজ্ঞানিক বস্তুনিষ্ঠার অন্তরায় ব'লে যে কুণ্ঠাটির বেশ ভালোরকম ছোঁয়াচ আজকাল মার্কসবাদীদেরও আক্রমণ করেছে, আমি সে কুণ্ঠার অংশীদার নই। বরং আমি মনে করি যে মার্কসীয় তত্ত্বের সর্বোত্তম অগ্রগতিগুলি সর্বদাই সাধিত হয়েছে তীব্রতম তর্কের মাধ্যমে এবং মার্কসবাদের তাত্ত্বিক সমৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় বর্তমানে যে নিম্নগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে তা মার্কসবাদীদের মধ্য থেকে খাঁটি তর্কের উত্তরোত্তর অবলুপ্তির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। পরিবর্তে যার প্রাধান্য চলছে তা হল তিনটি অতি অস্বাস্থ্যকর ধারার ন্যক্কারজনক সম্মিলন। প্রথমটা হল স্থূল 'অনুশীলনবাদ': দু-পক্ষের প্রত্যেকেই প্রাচ্য ঋষির চরম আত্মসংবৃত স্থৈর্যসহকারে এবং অশোভন লেনিনীয় কলহপরায়ণতার লেশমাত্র প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে অম্লানবদনে ঘোষণা করেন যে তাঁর "অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দেয়" তাঁরই বক্তব্য সত্য ও অন্যের বক্তব্য মিথ্যা; কেউই সবগুলি প্রতিদ্বন্দ্বী মতামতের শ্রমসাধ্য **তাত্ত্বিক** বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হন না; বড়জোর উভয় পক্ষ সম্মত হন কার অবস্থানকে অনুশীলন সমর্থন করবে তা দেখার জন্য অপেক্ষা করতে এবং এইভাবে উভয় পক্ষই ভুলে যান যে কতগুলি প্রতিদ্বন্দ্বী মতামত প্রয়োগের **আগেই** তাদের সত্যতা-অসত্যতা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করাটা যদি বিজ্ঞানের লক্ষ্য না হত তাহলে

বিজ্ঞানের অস্তিত্বেরই কোনো যুক্তিযুক্ততা থাকত না; তাঁরা এটাও ভুলে যান যে বিপ্লবী নৈতিকতাও দাবী করে যাতে ব্যবহারিক একসপেরিমেন্টের খরচ যথাসম্ভব কমানোর জন্য তত্ত্বকে কাজে লাগানো হয়। দ্বিতীয় ধারাটিও প্রায় একই রকম ব্যাপক এবং তার সার কথা হল প্রতিপক্ষের মতামতকে তত্ত্বগত-ভাবে খণ্ডন করার পরিবর্তে স্থূলতম-সম্ভব ব্যক্তিগত আক্রমণের আশ্রয় নেওয়া। আর তৃতীয় ধারাটির পুরো মর্মবস্তু হল কর্তৃত্বাধিষ্ঠিত পুঁথিপত্র থেকে নিছক স্বমত-পোষণের জন্য বাছাই-করা অংশ উদ্ধৃত করা; তা আরো অসহনীয় এই কারণে যে তাতে এইসব পুঁথির কোনো এক বিশেষ ব্যাখ্যাকে **যুক্তিগতভাবে প্রতিষ্ঠিত** করার এবং কিভাবে তা কোনো এক বিশেষ মতকে সমর্থন ও অন্যগুলোকে খণ্ডন করছে তা **প্রমাণ** করার স্কলাস্টিকসুলভ তাগিদটুকুও অনুপস্থিত। অব্যবস্থার এই প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে স্পষ্টতই বিদ্রোহ করতে চেয়েছে আমার বই।

কিন্তু আমার তর্কটা যাতে ছায়ার সঙ্গে কুস্তিতে পর্যবসিত না হয় তার জন্য আমাকে বাস্তব কিছু প্রতিপক্ষের প্রকৃত লেখাপত্রের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। তবে জেলের মধ্যে স্বভাবতই তার জোগান ছিল খুবই কম। উপরন্তু যা-ও ছিল তারও অধিকাংশই বাংলাদেশী। অনেক চিন্তার পরে আমি সেসব বর্তমান সংস্করণে রেখে দেওয়াই স্থির করলাম, কারণ আমার মনে হয়েছে যে সেগুলো বাদ দিলে আমার বইয়ের আদি ও মূল স্বাদটাই মাটি হয়ে যেত। কিন্তু একজন ভারতীয় মার্কসবাদীর পক্ষে এটা হয়েছে এক বিপজ্জনক স্বেচ্ছাচার। এর ফলে মানব-ইতিহাসের সবচেয়ে আন্তর্জাতিক মতবাদের অনুসারীদের মধ্যে নিঃসন্দেহে ছি-ছি প'ড়ে যাবে 'হস্তক্ষেপে'র অপরাধ নিয়ে অর্থাৎ অন্য দেশের কমিউনিস্ট পার্টির (বা এমন কি স্রেফ কমিউনিস্ট "আন্দোলনে"র) আভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলানোর অপরাধ নিয়ে। আমার মনে হয়, এই ধরনের আক্রমণকে এখনই যতটা পারা যায় খণ্ডিয়ে রাখা উচিত।

অবাক লাগলেও এটাই সত্য যে প্রচলিত হস্তক্ষেপবিরোধী মনোভাবের প্রায় সবটাই আসলে একটা কুসংস্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত, আর প্রায় সার্বজনীনভাবে এই কুসংস্কারের অংশীদার ঠিক তাঁরাই যাঁরা প্রতিনিয়ত গম্ভীরভাবে নিজেদের আশ্বস্ত করছেন এই ব'লে যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ "একটি বিজ্ঞান"। এটা ধ'রেই নেওয়া হয় যে: বিপ্লবের "কিছু সমস্যা" (যা অনিবার্যভাবে "সব সমস্যা"রই নামান্তর হয়ে দাঁড়ায় যখন একজন বিদেশীর কর্তব্য হয় একটা দেশের সবগুলি মার্কসবাদী গ্রুপকেই সমান সম্মান দেওয়া) একটা বিশেষ দেশের পক্ষে এতই "আভ্যন্তরীণ" যে যেসব মার্কসবাদী তার নাগরিক কেবল তাঁরাই সেগুলোকে স্পর্শ করার অধিকারী, এই নিরাপদ আচারবিধি থেকে তিলমাত্র বিচ্যুতি সাংঘাতিক ভুলের জন্ম দিতে বাধ্য এবং বিদেশীটি যদি কোনোক্রমে

এমন কি সঠিক সমাধান পেয়েও যায় তবু তাতে ঐ দেশের বিপ্লবের উপকারের চেয়ে অপকারই হবে বেশী! আমি ভালোই বুঝি যে জাতিস্বাতন্ত্র্যের এই যে শিশুসুলভ ঝোঁকটি আজকাল বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে এত জোরদার প্রভাব বিস্তার করেছে, তার উদ্ভব "পিতৃ পার্টির" সোভিয়েত-সংশোধনবাদী ধারণারই প্রতিক্রিয়া হিসাবে এবং প্রত্যেক দেশের বিপ্লবী শক্তি সেই দেশের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিপ্লবের জটিল সমস্যাবলী সমাধানের পর্যায়ে বিকশিত হোক এই আকাঙ্ক্ষারই এক বিকৃত প্রকাশরূপে। কিন্তু তার জন্য আমি এই কুসংস্কারের অংশীদার হতে যাব কেন? ব্যাপকতম বৈজ্ঞানিক বিতর্কের যে ঝড়ই কেবল আজ মার্কসীয় অনুশীলনের ক্রমান্বয়ী তাত্ত্বিক অবক্ষয়কে রোধ করতে পারে, সেই ঝড়ের কবল থেকে জাতীয় সীমান্তের আড়ালে নিজের পেটোয়া মতামত ও আরামদায়ক বিপ্লবী প্রতিষ্ঠাকে বাঁচিয়ে রাখার অহংবাদী বুদ্ধিজীবীর লিপ্সা ছাড়া এই কুসংস্কারের মধ্যে আর আছেটা কি? আমি বরং বিজ্ঞানের সমগ্র ইতিহাস দ্বারা সমর্থিত এই মামুলি সত্যটাই অনুসরণ করেছি যে কোনো বিশেষ সমস্যার সমাধানের উৎস একটি দেশের নাগরিকত্ব নয় বরং প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সম্বন্ধে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির নির্ভুল প্রয়োগ, এবং সঠিক সমাধান—সমাধানদাতার জাতি যা-ই হোক না কেন—কখনও একটা দেশের বিপ্লবের ক্ষতিসাধন করতে পারে না। বাস্তবিক, এ ছাড়া অন্য কোনো অবস্থান তো আন্তর্জাতিক পরিসরে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার অনুপস্থিতির অবস্থায় ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির মধ্যেকার সম্পর্ক পরিচালনার জন্য বিশ্বের কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির দ্বারা স্বীকৃত আচরণবিধির সঙ্গেও খাপ খায় না। মনে রাখতে হবে, ঐ আচরণবিধি ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির মধ্যে **প্রকাশ্য** বিতর্ক নিষিদ্ধ করেছিল কিন্তু তা পুষিয়ে নেওয়ার জন্য অবকাশ রেখেছিল যাতে তাদের মধ্যে **যে কোনো** প্রশ্নেই বিতর্ক ও আলোচনা অন্যান্য উপায়ে তীব্রভাবে চলতে পারে। আর এর অন্যথা হবেই বা কি ক'রে, হলে তো তা ভ্রাতৃপ্রতিম সম্পর্ক পরিচালনার বিধি না হয়ে সে সম্পর্ক ছেদেরই বিধি হয়ে উঠত।

তবে আমার বিরুদ্ধে এ অভিযোগও তোলা যাবে না যে এই বইয়ে আমি উক্ত বিধিভঙ্গের পথ দেখিয়েছি। কারণ, দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমাদের নেতা চারু মজুমদারকে প্রকাশ্যে সমালোচনা ক'রে বাংলাদেশী কমরেডরাই প্রথম গুলিটি ছুঁড়েছেন এবং তার দ্বারা উক্ত বিধির সকল নিষেধাজ্ঞা থেকে তাঁরা মুক্তি দিয়েছেন আমাকেও। অবশ্য এটা আমি পরিষ্কারভাবেই বুঝি যে বাংলাদেশের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আন্দোলনের ইতিহাস ও তার উপর চারু মজুমদারের খোলাখুলি-স্বীকৃত প্রভাবের কথা ধরলে তাঁরা তা না ক'রেও পারতেন না। কিন্তু তাহলে তো তা হয়ে দাঁড়ায় সেই অসংখ্য দৃষ্টান্তেরই অন্যতম দৃষ্টান্ত যা দাবী করে গত দুই দশকব্যাপী আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের

অভিজ্ঞতার আলোকে উক্ত আচরণবিধির নিষেধগুলির পুনর্বিচার। আমাদের নির্ভীকতার সঙ্গে স্বীকার করতে হবে যে কার্যকরী ও স্থিতিশীল আন্তর্জাতিক ভাববিনিময়ের কোনো বিকল্প উপায় গ'ড়ে তোলা সম্ভব হয়নি, আর তাই আচরণবিধিটি যে উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছিল ফলাফল দাঁড়িয়েছে ঠিক তার বিপরীত। পার্টিগুলির মধ্যে আলোচনায় স্পষ্টতই ভাঁটা পড়েছে এবং তার পরিণতিতে সৃষ্টি হয়েছে বিশ্ব মার্কসবাদের তাত্ত্বিক বিকাশে প্রায়-অচলাবস্থা। জীবনের এই অস্বীকৃতির চরম কৃত্রিমতা অজস্র তথ্যে সুপ্রকট। মতামতের পার্থক্য বা সেগুলোকে ফয়সালা করার প্রয়োজন, কোনোটাই অন্তর্হিত হয়নি। কিন্তু তাদের স্বাভাবিক বিকাশচক্র অবদমিত হওয়ার ফলে তারা অনিবার্যভাবেই খুঁজে নিয়েছে ধ্বংসাত্মক ও বিস্ফোরক অভিব্যক্তি। এমনিতেও প্রকাশ্য বিতর্ক থেকে আমরা মুক্তি পাইনি ; কয়েক বছরের বাহ্যিক ভ্রাতৃত্ব ও অতি-সামান্য পার্থক্য নিরসনের পর প্রকাশ্য বিতর্ক ফেটে পড়ছেই দীর্ঘসঞ্চিত বিদ্বেষ ও হলাহল নিয়ে। সুতরাং সব বাধা সরিয়ে সাহসের সঙ্গে মুক্ত ও স্বাস্থ্যকর আন্তর্জাতিক আলোচনা শুরু ক'রে দিলেই তো হয় ? ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনগুলিকে প্রকাশ্যে তর্করত অবস্থায় দেখতে কেউই বিশেষভাবে আগ্রহী নয়। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতিই যদি এমন হয়ে থাকে যে কোনো বিকল্প আলোচনাব্যবস্থা রূপায়ণযোগ্য না হওয়ার দরুণ আমাদেরকে প্রকাশ্য বিতর্ক ও বিতর্কহীনতার মধ্যে এবং স্বাস্থ্যকর তর্ক ও অস্বাস্থ্যকর শত্রুতার বিস্ফোরণের মধ্যেই যে কোনো একটিকে বেছে নিতে হচ্ছে তাহলে প্রতিটি মার্কসবাদীকেই নিজ অবস্থান চূড়ান্তভাবে স্পষ্ট ক'রে তুলতে হবে। অন্তত আমি আমারটাতে কোনো দ্ব্যর্থ রাখিনি : বাংলাদেশী কমরেডরা যখন খোলাখুলি ভারতীয় বিষয়াদি সম্বন্ধে মন্তব্য করলেন তখন আমি তাঁদের "হস্তক্ষেপ" নিয়ে ঘ্যান ঘ্যান না ক'রে বরং সমান অবাধে ও প্রকাশ্যে নিজের মতামত প্রকাশ করেছি।

আমার বইয়ে আমাকে দু ধরনের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে। একটি দলকে আমি সংক্ষেপে উল্লেখ করেছি 'জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য ঘোষক' ব'লে আর অন্য দলটিকে '"সমাজতান্ত্রিক" বিপ্লবের প্রবক্তা' ব'লে। অর্থাৎ যেন বিপরীতক্রমে আমরা 'সামন্ত দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষক' ও 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রবক্তা'। এটা যে পুরো মিথ্যা তা নয়, কিন্তু সরলীকৃতভাবে ব্যাখ্যা করলে এতে কিছুটা ভুল বোঝাবুঝি ঘটতে পারে। কেননা জাতীয় দ্বন্দ্ব কখনোই প্রধান হতে পারে না ব'লে আমরা মনে করি কিংবা আমরা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য সংগ্রামে বিশ্বাস করি না—এটা তো ঠিক নয়। আমার মনে হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রসঙ্গ থেকেই আমার এ বক্তব্য পরিষ্কার যে :

(১) প্রথম ধরনের প্রতিপক্ষীয়রা জাতীয় দ্বন্দ্ব কোন অবস্থায় প্রধান হতে পারে তা নির্ধারণের মার্কসীয় নিরিখ থেকে বিচ্যুত, তাই তাঁরা ভুলভাবে

বর্তমান পর্যায়ে তার প্রাধান্য দাবী করেন এবং এমন কি আমাদের মতো দেশে তাকে **স্থায়ীভাবে** প্রধান করার দিকেও ঝোঁকেন। তাঁদের বিরুদ্ধে সঠিক নিরিখ তুলে ধ'রে আমরা অনিবার্যভাবেই বর্তমান পর্যায়ে সামন্ত দ্বন্দ্বের প্রাধান্যে পৌছাতে পারি এবং আমাদের মতো দেশে কি অবস্থায় জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান হওয়া সম্ভব তা-ও নিখুঁতভাবে নির্ধারণ করতে পারি।

(২) অন্য ধরনের প্রতিপক্ষীয়রা এইসব সমাজের চরিত্র ও বিপ্লবের বর্তমান স্তর নির্ধারণের জন্য দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদী পদ্ধতি শেষসীমা পর্যন্ত অনুসরণ করেন না আর তাই **সরাসরি** সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য সংগ্রাম শুরু করার জেদ ধরেন। তাঁদের বিরুদ্ধে আমাদের বক্তব্য হল, আমাদের দেশগুলিতে সমাজতন্ত্র অর্জন করার ব্যাপারে আমরা যদি আদৌ সিরিয়স হই তাহলে আমাদের তৈরী থাকতে হবে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের একটি পূর্ববর্তী স্তর অতিক্রম করার জন্য ও তাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে বিকশিত ক'রে তোলার জন্য।

আমি আশা করি এই ব্যাখ্যাটুকু প্রতিপক্ষীয়দের নামকরণ-বিষয়ক সর্বপ্রকার দ্ব্যর্থ কাটাতে সাহায্য করবে।

৩

বইটা যখন লেখা হয়েছিল এবং যখন তা ছাপা হচ্ছে এই দুইয়ের মধ্যে দীর্ঘ ব্যবধানের দরুণ ইতিমধ্যে যে বিষয়টা সর্বাধিক সমসাময়িক আগ্রহের সঞ্চার করেছে তার কোনো পূর্ণাঙ্গ আলোচনা তাতে নেই। বিষয়টা হল তিন বিশ্বের তত্ত্ব নিয়ে চীন-আলবেনিয়া বিতর্ক এবং বিশেষত আমার বইয়ের নির্দিষ্ট আলোচ্যবস্তুর সঙ্গে তার সম্পর্ক। এটা নিশ্চয়ই খুব দুঃখের কথা, কিন্তু এই ভূমিকায় খুব সংক্ষিপ্ত কিছু মন্তব্যের বাইরে যাওয়া স্বভাবতই সম্ভব নয়।

আমার মতে তিন বিশ্বের তত্ত্ব মূলত সঠিক এবং তার বিরুদ্ধে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের আলবেনীয় অভিযোগ অবশ্যই ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন। তার কারণ খুবই সহজ : আমি সুনিশ্চিত যে আলবেনিয়া যে শ্রেণীসমঝোতামূলক সিদ্ধান্তগুলি এই তত্ত্বের উপর আরোপ করেছে সেগুলোকে কোনোমতেই তার আবশ্যিক যৌক্তিক পরিণতিরূপে দেখানো যায় না। যেসব মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সঠিক বা বেঠিকভাবে ক্রমেই বিশেষ বিশেষ চীনা পলিসির সমালোচক হয়ে উঠছেন তাঁদের সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় তর্ক এড়ানোর জন্য এটা পুরোপুরি পরিষ্কার ক'রে দেওয়া দরকার যে আমার মতে তত্ত্বটির সঠিকতা চীন কর্তৃক তার ব্যাখ্যাদান ও বাস্তবায়নের থেকে **একেবারেই স্বাধীন**—ঠিক যেমন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের তত্ত্বের সঠিকতা রুশ পার্টি কর্তৃক তার ব্যাখ্যাদান ও বাস্তবায়নের দ্বারা আদৌ প্রভাবিত হয় না। (তবে আমি অতি দ্রুত যোগ ক'রে চাই যে

এই তুলনার মাধ্যমে আমি চীন পার্টি ও রুশ পার্টির মধ্যে মোটেও কোনো সমীকরণের আভাস দিতে চাইছি না।) অবশ্যই তার মানে এই নয় যে তত্ত্বটি দক্ষিণ-সুবিধাবাদী ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে কোনো অভেদ্য কবচের অধিকারী। কোনো তত্ত্বই তা নয়। বরং যেহেতু মূলত তা আন্তর্জাতিক মাপের একটি যুক্তফ্রন্ট পলিসি তাই অন্য যে কোনো যুক্তফ্রন্ট পলিসির মতোই তা বিভিন্ন ধরনের সুবিধাবাদী বিকৃতির নিকট সহজভেদ্য হয়ে থাকবে—যদি না যুক্তফ্রন্ট ও শ্রেণীসংগ্রামের সম্পর্কের মোক্ষম সমস্যাটিকে চূড়ান্ত সঠিকতা ও স্পষ্টতার সঙ্গে সমাধান করা হয়। একটা বিশেষ পর্যায় বা পরিস্থিতিতে শ্রেণীসংগ্রামের প্রতিটি সাধারণ স্তর একটা নির্দিষ্ট পরিধির যুক্তফ্রন্টের সুযোগ খোলা রাখে এবং সে সুযোগকে পুরোপুরি কাজে না লাগানোটা বাম সংকীর্ণতাবাদ; অপর পক্ষে শ্রেণীসংগ্রাম অবজেকটিভভাবে তীব্রতর হওয়া সত্ত্বেও যুক্তফ্রন্টের পরিধি (যে পরিধিকে হয়তো শ্রেণীসংগ্রামের বিকাশ ইতিমধ্যেই সেকেলে ক'রে দিয়েছে) কমিয়ে ফেলার ভয়ে সেই শ্রেণীসংগ্রামে সাহায্য বা নেতৃত্ব না দেওয়াটা দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ। **শ্রেণীসংগ্রামের ভিত্তিতে** যুক্তফ্রন্টের সমস্যা সমাধানের এই যে সঠিক পদ্ধতি, তা প্রথম খণ্ডের ১৭-৮ পৃষ্ঠায় চীন বিপ্লবের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে মূর্তভাবে বের ক'রে দেখানো হয়েছে। শ্রেণীসংগ্রামই যে সর্বোচ্চ বিবেচনার বিষয় একবার তা বোঝা গেলে আর এটা যোগ ক'রে দেওয়ার দরকার হয় না যে কোনো এক নির্দিষ্ট অবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টির হাতে বিভিন্ন শ্রেণীর আপেক্ষিক গুরুত্বের যে স্কেল থাকে তার সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট পলিসির কোনো মৌলিক সংঘাত থাকা উচিত নয়, থাকতে পারেও না। সমাজের কোনো এক অংশের (যেমন বিভিন্ন শ্রেণীসমবায়ে গঠিত কৃষক সম্প্রদায়ের) সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সময় সর্বহারাশ্রেণী যদি ঐক্যের পূর্বশর্ত হিসাবে একটা বিশেষ শ্রেণীর (ধরুন দরিদ্র কৃষকের) একটা নির্দিষ্ট মাত্রার প্রাধান্যের জন্য জেদ ধরে তবে তা বাম সুবিধাবাদ; আবার যুক্তফ্রন্টের মধ্যে ক্লেশ সৃষ্টির ভয়ে সেই বাঞ্ছিত শ্রেণীর প্রাধান্যলাভের সংগ্রামকে স্বাগত না জানানো বা সাহায্য না করাটা দক্ষিণ সুবিধাবাদ। অতএব, নিপীড়িত জাতি-সমূহের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্বই আজকের প্রধান বিশ্বদ্বন্দ্ব, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আপেক্ষিক আসন্নতা, তৃতীয় ও দ্বিতীয় বিশ্বের দেশ-গুলি সহ সারা বিশ্বে শ্রেণীসংগ্রামের সাধারণ স্তর ও ধরন, দুই অতিশক্তি, বিশেষত সোভিয়েতের বিরুদ্ধে এইসব দেশের জনগণ ও শাসকশ্রেণী উভয়ের **অভিন্ন** (যদিও বিভিন্ন মাত্রায়) বৈরিতা, ইত্যাদি আদিপ্রতিজ্ঞা মেনে নিলে তিন বিশ্বের তত্ত্বের প্রস্তাবিত সাধারণ যুক্তফ্রন্ট-পরিকল্পনাটি নিঃসন্দেহে সঠিক ও যুক্তিযুক্ত। সঙ্গে সঙ্গে ভুল হবে যদি আমরা যুক্তফ্রন্টের অভ্যন্তরে সংগ্রামের অনিবার্যতার প্রতি চোখ বুঁজে থাকি, শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রতাবৃদ্ধি ঐক্যের

একটা বিশেষ ধরনকে খারিজ ক'রে দেওয়ার পরেও যদি আমরা গোঁড়ামি ক'রে তা-ই আঁকড়ে প'ড়ে থাকি, যদি আমরা ভুলে যাই যে যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত তৃতীয় বা দ্বিতীয় বিশ্বের কোনো দেশে জনগণ শাসকশ্রেণীকে উৎখাত ক'রে ক্ষমতাদখল করতে পারলে তাতে এই আন্তর্জাতিক যুক্তফ্রন্ট দুর্বল না হয়ে বরং সবলই হবে, এবং আমরা যদি অস্বীকার করি যে এই তত্ত্ব তাই আমাদের কাছে দাবী করে এই শেষোক্ত পরিণতি থেকে পিছিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে বরং অবজেকটিভ অবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে তা বাস্তবায়নের জন্যই বিরামহীন প্রচেষ্টা। কিন্তু এই শেষোক্ত দায়িত্ব বিসর্জন দেওয়ার জন্যই কেউ কেউ আজ তিন বিশ্বের তত্ত্ব-প্রস্তাবিত সোভিয়েত-বিরোধী **আন্তর্জাতিক** যুক্তফ্রন্টকে প্রতিটি বিশেষ দেশের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও যান্ত্রিকভাবে প্রসারিত করছেন এবং ফলত সেই দেশের মার্কিনপন্থী শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে ঐক্যের ওকালতি করছেন ; আর বহিঃশক্তি সোভিয়েতকে এইভাবে **আভ্যন্তরীণ** সংগ্রামেরও প্রধান লক্ষ্যবস্তুরূপে পাওয়ার জন্যই তাঁদের ফেরী করতে হচ্ছে আধা-উপনিবেশে সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় শাসকশ্রেণীদ্বয়ের জোটের মিলিত রাষ্ট্রক্ষমতার তত্ত্ব এবং সেই জোটের সঙ্গে জনগণের দ্বন্দ্বকে প্রধান করার ছদ্মবেশে আসলে সোভিয়েতের সঙ্গে জাতির দ্বন্দ্বকেই প্রধান করার বিষাক্ত লাইন। তিন বিশ্বের তত্ত্বের উপর দক্ষিণ-সুবিধাবাদী ব্যাখ্যা সেঁটে দেওয়ার বিপদ খুবই বাস্তব এবং **যে মহল থেকেই সে প্রচেষ্টা হোক না কেন** আমাদের তা রুখতে হবে। বিশেষত আমাদের নিঃসংশয় হতে হবে যে এই বইয়ে আমরা যাদের 'জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষক' ব'লে অভিহিত করেছি তাদের শ্রেণীসমঝোতামূলক সিদ্ধান্ত-সমূহ এই তত্ত্বের আদিপ্রতিজ্ঞাগুলি থেকে বৈধভাবে কিছুতেই টানা যায় না।

৪.

যে কঠোর ব্যক্তিগত ও অবস্থাগত সীমাবদ্ধতার মধ্যে আমাকে বইটি লিখতে হয়েছে তার কথা আমি সারা ভূমিকা জুড়ে বারবারই উল্লেখ করেছি। যে তর্ক-মূলক রচনায় আমি কাউকে রেয়াত করিনি ও কারো কাছ থেকে রেয়াত চাইনি, তাতে এর উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই পাঠকের সদয়তার নিকট আবেদন করা নয় — বরং লেখক হিসাবে আমি তাত্ত্বিক শৃঙ্খলার কঠোরতম মান অনুযায়ী পরীক্ষিত হওয়ারই সম্মান দাবী করি। আমি এই উল্লেখগুলি করেছি প্রধানত তিনটি কারণে।

প্রথমত, আমি আমার এই নবার্জিত অভিজ্ঞতা জানাতে চেয়েছি যে তাত্ত্বিক কাজ অনুশীলনরত বিপ্লবীর নাগালের চিরবহির্ভূত কোনো রহস্যবস্তু নয়। বলা বাহুল্য, এর দ্বারা আমি এই দাবী করছি না যে আমি এখানে তাত্ত্বিক কাজের একটা আদর্শই স্থাপন ক'রে ফেলেছি কিংবা তত্ত্ব হল যে কারো অশিক্ষিত

প্রলাপের জায়গা ; আমি শুধু দাবী করি যে, যে কোনো ব্যবহারিক বিপ্লবী—যে অবস্থাতেই তিনি থাকুন না কেন—এ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা, ধাপে ধাপে ও বিভিন্ন মাত্রায় অর্জন ক'রে নিতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, বইটায় যে বহু লেখকের নাম করা হয়েছে তারাই যে উদ্ধৃত মতামতগুলির সর্বশ্রেষ্ঠ বা টিপিক্যাল প্রতিনিধি তা মোটেও নয়। জেলে যা মালমশলা হাতে এসেছিল তা দিয়েই কাজ চালাতে হয়েছে। তবে আমার প্রতিপক্ষীয়দের সাধারণ অবস্থানটির একটি প্রতিনিধিস্থানীয় পরিচয় যে আমি মোটের উপর ন্যায্যভাবেই তুলে ধরতে পেরেছি তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

তৃতীয়ত, যে বিষয়টার উপর আমি জোর দিতে চেয়েছি তা হল, একজন পেশাদার বিপ্লবী যখন এমন একটি বই লেখেন—বিশেষত উপরিবর্ণিত অবস্থায়—তখন তাঁর ঋণ আবশ্যিকভাবেই এত বিপুল হয় যে বইটা সত্য সত্যই অসংখ্য মানুষের যৌথ কাজ হয়ে দাঁড়ায়। সহজবোধ্য কারণেই তাঁদের প্রায় কারুরই নাম করা সম্ভব নয়। কিন্তু বইটাকে তার স্বাধীন জীবনপথে ঠেলে দেওয়ার প্রাক্‌মুহূর্তে এই শেষ কটি লাইন যখন লিখছি তখন স্মৃতি বারবার ফিরে আসছে ঢেউয়ের পর ঢেউয়ে। মনে পড়ছে তাঁদের কথা, যাঁদের স্বেদ, রক্ত, যৌবন ও জীবনের মূল্যে অর্জিত অভিজ্ঞতা আমি গ্রহণ করেছি ও তত্ত্বে রূপ দিতে চেয়েছি, আমার সেইসব সহবন্দীদের কথা যারা অক্লান্তভাবে আমার সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন এবং এই বই লিখতে উৎসাহিত ও আক্ষরিক অর্থেই বাধ্য করেছিলেন, লাইনে-লাইনে চোরের মতো এদিক-ওদিক তাকিয়ে আমি যখন বইটা লিখতাম তখন যারা পাহারা দিতেন, আমাদের সেলে আকস্মিক তল্লাসীর পৌনঃপুনিকতার মধ্য দিয়ে পাণ্ডুলিপিকে লুকিয়ে রক্ষা করতে যারা সাহায্য করেছিলেন, সেই কারারক্ষীদের, যাঁরা তাঁদের ডিউটির সময় আমার বেআইনী লেখা চালানোর অনুমতি দিয়েছিলেন, যাঁরা জেলের বাইরে একজন ভারতীয়ের লেখাগুলি বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিজেদের জীবিকা (এবং বাংলাদেশের কোনো কোনো উন্মাদ মুহূর্তে এমন কি নিজেদের জীবন) বিপন্ন করেছিলেন ; মনে পড়ছে ত্রিপুরা পার্টিকে, যে পার্টি আমি বাংলাদেশের মতো একটা দেশে কারারুদ্ধ থাকা সত্ত্বেও পাঁচটি কঠিনতম বৎসর জুড়ে আমার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার প্রায়-অতিমানবিক দায়িত্বটি পালন করেছে, অনবরত আমাকে তার অভিজ্ঞতা ও প্রশ্ন জুগিয়ে গেছে, পাণ্ডুলিপি সীমান্ত পার করার ব্যবস্থা করেছে, তার কপির পর কপি করেছে, তর্জমা ও প্রচার করেছে ; ভারত ও বাংলাদেশের সেই কমরেড ও বন্ধুদের যাঁরা আমার মুক্তি ও স্বদেশপ্রত্যাবর্তনের জন্য লড়েছেন, তাঁদের মধ্যে যাঁরা আমাকে প্রকাশক জোগাড় করতে সাহায্য করেছেন, ছাপাখানার জন্য পাণ্ডুলিপিটির চূড়ান্ত প্রস্তুতির কাজ আমি যাতে সম্পন্ন করতে পারি তার জন্য যাঁরা আমাকে অর্থ ও আশ্রয় দিয়েছেন ও এই সময় জুড়ে নিয়ত

জুগিয়ে গেছেন উৎসাহ, সমালোচনা ও পরামর্শ ; ত্রিপুরার কমরেডদের, যাঁরা প্রদেশের প্রায় পুরো ব্যবহারিক কাজের বোঝা নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন যাতে আমি বই ছাপানোর এই পুরো ব্যাপারটার উপর প্রয়াস কেন্দ্রীভূত করতে পারি ; এবং সবশেষে প্রকাশক, প্রচ্ছদশিল্পীবৃন্দ, মুদ্রক ও ছাপাখানার সকল কর্মীকে, যাঁরা বইটির দ্রুত প্রকাশ সম্ভব করার জন্য দিয়েছেন অকুণ্ঠ সহযোগিতা। আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সেই প্রতি-পক্ষীয়দেরও স্মরণ করছি যাঁরা আমার সঙ্গে দীর্ঘ তর্কে লিপ্ত হয়ে ও তাঁদের দলিলপত্র দিয়ে আমাকে তাঁদের অবস্থান জানতে সাহায্য করেছিলেন। এই বইয়ের প্রকাশ ও আমার অব্যাহত বিপ্লবী সক্রিয়তাই তাঁদের সকলের নিকট আমার একমাত্র প্রতিদান।

সু. ব.

প্রথম খণ্ড

লেখকের কৈফিয়ৎ

লিখতে চেয়েছিলাম একটা প্রবন্ধ, হয়ে দাঁড়াল একটা বই। প্রধান দ্বন্দ্ব নির্ধারণের সংকীর্ণ পরিসর ছেড়ে প্রবেশ করতে হল দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশের সমাজবিচার ও প্রধান দ্বন্দ্ব নির্ধারণের বৃহত্তর ও জটিলতর ক্ষেত্রে।

এক অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে বইটা আমাকে লিখতে হয়েছে। বই-পুস্তক (বিশেষত মাও সেতুঙের লেখা), পরিসংখ্যান ও দলিলপত্রের নিদারুণ অভাবের দরুণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রামাণ্যতম সূত্রটি উদ্ধৃত করতে পারিনি, বহু সময় হাত-ফেরতা উদ্ধৃতি দিয়ে কাজ চালাতে হয়েছে, অনেক জায়গায় নির্ভর করতে হয়েছে স্রেফ আমার অতীত পাঠের স্মৃতির উপর। তবে আমার বিচারবুদ্ধির কষ্টিপাথরে যা নিঃসংশয়ে গ্রহণীয় মনে হয়েছে কেবলমাত্র তেমন মালমশলাই আমি ব্যবহার করেছি ও পাঠকদের নিকট পেশ করেছি—এ আশ্বাস আমি দিতে পারি।

জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকদের মধ্যে যাঁদের আমি উল্লেখ করেছি, তাঁরা ছাড়াও তাঁদের মধ্যে আরো কয়েকটি উপধারা বিদ্যমান। যেমন, বাংলাদেশের কেউ কেউ মনে করেন যে পূর্ববাংলা অতীতে পাকিস্তানের উপনিবেশ ছিল এবং আজ তা ভারতের উপনিবেশ, কেউ কেউ আবার এখনও অখণ্ড পাকিস্তান-ভিত্তিক চিন্তা করেন এবং মনে করেন যে "তার পূর্বাংশ" (অর্থাৎ বাংলাদেশ) আজ দখলীকৃত উপনিবেশ, "তার পশ্চিমাংশ" আধা-উপনিবেশ এবং কমিউনিস্টদের কর্তব্য আজ সমগ্র পাকিস্তান-ভিত্তিক "জাতীয় প্রতিরোধযুদ্ধ"। এঁদের দলিলপত্র হাতের কাছে পাইনি। তবে সম্ভবত তার খুব একটা প্রয়োজনও আর নেই। কেননা আমি আশা করি যে আলাদাভাবে এঁদের উল্লেখ না করলেও এঁদের ভ্রান্ত চিন্তার মূল দিকগুলি আমার রচনায় আমি তুলে ধরতে ও খণ্ডন করতে পেরেছি। পাঠকের পক্ষে সেগুলি খুঁজে নিতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

বাস্তব পরিস্থিতির এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও যে আমি এই ঝুঁকিপূর্ণ কাজে হাত দেওয়ার দুঃসাহস করলাম, তার কারণ একটাই। এই বইয়ে যেসব বিষয় নিয়ে কারবার করতে হয়েছে সেগুলি সবই মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের মধ্যে নিয়ত-উত্থাপিত জরুরী ও বাস্তব সমস্যা। এগুলোর আশু সমাধান ছাড়া এ অঞ্চলের কমিউনিস্ট আন্দোলন এক পা-ও অগ্রসর হতে পারবে না। কিন্তু যাঁরা আমার চেয়ে বেশী যোগ্যতাসম্পন্ন এবং আমার চেয়ে অধিকতর সুবিধাজনক পরিবেশে অবস্থিত, তাঁরা কেউই এইসব সমস্যার সরাসরি মোকাবেলা করছেন

না। দেবদূতরা যেখানে পা ফেলতে ভয় পান সেখানে বোকাদেরই এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর উপায় কি থাকে ?

আমার কিছু স্বকীয় চিন্তা যদি কোথাও থেকে থাকে তবে তা আছে প্রধানত চতুর্থ অধ্যায়ে। দুর্ভাগ্যক্রমে এই অধ্যায়টাই সম্ভবত কিঞ্চিৎ দুরূহতার দোষে দুষ্ট। এ জন্য আমার সাহিত্যিক অক্ষমতা নিঃসন্দেহে কিছুটা দায়ী, কিন্তু বিষয়-বস্তুরও অনেক সময় একটা অন্তর্নিহিত জটিলতা থাকে যাকে ভাষার কোনো প্রাঞ্জলতা দিয়েই পুরোপুরি অতিক্রম করা যায় না। তাই এই অধ্যায়টি পড়ার সময় একটু ধৈর্যশীল ও অধ্যবসায়ী হওয়ার জন্য আমি পাঠককে পূর্বাহ্নেই অনুরোধ ক'রে রাখছি।

পরিবেশের অসুবিধার জন্য আরেকটা ত্রুটিও ঘটেছে। লেখাটা মোটামুটি শেষ হয়ে যাওয়ার পরে কিছু কিছু নতুন মালমশলা হাতে এসেছিল। সেগুলোকে মূল লেখার মধ্যে ফাঁকে ফাঁকে ঢুকিয়ে দিতে হয়েছে এবং সেইজন্য পুনরাবৃত্তি ও লিখনশৈলীর অন্যান্য স্খলনকে বহু ক্ষেত্রেই পুরোপুরি এড়ানো যায়নি।

বইটা প্রধানত বাংলাদেশের একজন লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা। কিন্তু আমার ধারণা, আলোচিত বিষয়গুলির প্রকৃতিই এমন যে একজন ভারতীয় বা পাকিস্তানী পাঠকের কাছেও সেগুলোর আবেদন অক্ষুণ্ণ থাকাই স্বাভাবিক।

বইটিকে পাঠকদের নিকট উপস্থিত করতে গিয়ে মার্কসের এই মহান বাণী থেকে আমি সাহস ও শক্তি সঞ্চয় করেছি : "বিজ্ঞানসম্মত সমালোচনা-ভিত্তিক প্রতিটি অভিমতকে আমি স্বাগত জানাই। কিন্তু তথাকথিত জনমতের সংস্কারের কথা ধরলে—যার সঙ্গে আমি কখনও আপোষ করিনি—আগের মতো এখনও সেই ফ্লোরেন্সবাসী মহাপুরুষের নীতিকথাটাই আমার নীতি :

'নিজের পথ অনুসরণ ক'রে চল, লোকে যা বলে বলুক'।"

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার

কথারম্ভ

আমাদের সমাজের প্রধান দ্বন্দ্ব কোন কোন নিরিখের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে, তা নির্ধারণের মার্কসীয় পদ্ধতি কি, বর্তমান পর্যায়ে কোনটা প্রধান দ্বন্দ্ব, বর্তমান পরিস্থিতি পরিবর্তিত হলে কিভাবে প্রধান দ্বন্দ্ব পরিবর্তিত হতে পারে—এ সবই আমাদের বিপ্লবের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। তাই সংগ্রামের প্রতিটি পর্যায়ে স্বাভাবিকভাবেই এ প্রশ্নগুলো বারে বারে উঠছে এবং বিতর্কের অবতারণা হচ্ছে।

এই ধরনের বিতর্ক খারাপ নয়, বরং খুবই স্বাস্থ্যকর। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রধান দ্বন্দ্ব নিয়ে বিতর্করত পক্ষদ্বয়ের কেউই যথার্থ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সমস্যা-টির পর্যালোচনা করছেন না, মার্কসীয় বিশ্লেষণ সহকারে প্রতিষ্ঠিত করছেন না নিজের বক্তব্য। ফলে দলিলে, পত্রিকায় ও আলোচনায় যা ক্রমাগত উৎসারিত হচ্ছে তা হল কতগুলি ভাসাভাসা আন্দাজী মন্তব্য এবং অস্পষ্ট ও অস্বচ্ছ ধারণার ধূম্রজাল। সত্যিকারের মতাদর্শগত সংগ্রাম যত না হচ্ছে, তার চেয়ে ধুলো উড়ছে অনেক বেশী এবং আমাদের দৃষ্টি স্বচ্ছ হওয়ার পরিবর্তে সবকিছু কেবলই যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

যাঁরা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের রণনীতিতে বিশ্বাসী, তাঁদের মধ্যে এখন পর্যন্ত এটা নিয়ে দ্বিমত হয়নি যে এই উপমহাদেশের সমাজবিকাশ দুটো মৌলিক দ্বন্দ্ব দ্বারা শাসিত :

(১) সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে জাতির দ্বন্দ্ব ; এই দ্বন্দ্বটি বাহ্যিক চরিত্রের এবং একে আমরা সংক্ষেপে "জাতীয় দ্বন্দ্ব" নামে উল্লেখ করব।

(২) সামন্তবাদের সঙ্গে ব্যাপক জনগণের দ্বন্দ্ব ; এই দ্বন্দ্বটি আভ্যন্তরীণ চরিত্রের এবং একে আমরা সংক্ষেপে "সামন্ত দ্বন্দ্ব" নামে উল্লেখ করব।

নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে এই মৌলিক দ্বন্দ্বদুটিরই যে কোনো একটি প্রধান দ্বন্দ্বে পরিণত হয়[১] এবং সমগ্র অবস্থাটিকে নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণ করতে থাকে। অন্যটি

১ [বইটির প্রথম খণ্ড লেখা হয়ে যাওয়ার পর অবশ্য জানতে পেরেছিলাম যে কেউ কেউ এ সত্যকেও অস্বীকার করতে চাইছেন এবং তা-ও আবার মাওয়েরই দোহাই পেড়ে। এঁরা, প্রথমত, সাধারণভাবে দাবী করেন যে মাও চিন্তা অনুযায়ী মৌলিক দ্বন্দ্বদুটির বহির্ভূত তৃতীয় কোনো দ্বন্দ্বও কখনও কখনও প্রধান হতে পারে এবং, দ্বিতীয়ত, বিশেষভাবে দাবী করেন যে ভারতবর্ষে বর্তমানে এই ধরনের তৃতীয় একটি দ্বন্দ্বই প্রাধান্যে রয়েছে আর সে দ্বন্দ্বটি হল সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক-সাম্রাজ্য-বাদ ও দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণীদ্বয়ের জোটের সঙ্গে ভারতীয় জনগণের দ্বন্দ্ব। এঁরা যে আসলে জাতীয় দ্বন্দ্বেরই ছদ্মবেশী প্রাধান্য-ঘোষক তা আমি বইটির দ্বিতীয় খণ্ডে 'সম্পাদকের চিঠির জবাবে' লেখাটিতে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি।]

অপ্রধান স্থান গ্রহণ করলেও সক্রিয় থাকে এবং কোনোমতেই বিলুপ্ত হয় না।

কিন্তু এই দুটি দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে একটা বিষয় এখানেই লক্ষ্য ক'রে রাখা প্রয়োজন, কারণ এটা নিয়ে ব্যাপক বিভ্রান্তি এখনও বিরাজমান। সামন্তবাদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব হয় জনগণের (জাতির নয়), আর সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব হয় সমগ্র জাতি বা দেশের (শুধু জনগণের নয়)। 'জাতি' ও 'জনগণ' ধারণাদুটি সমার্থক নয়। 'জাতি'র ধারণাটি ব্যাপকতর , 'জনগণ' তার অংশমাত্র। "বিভিন্ন দেশে, এবং একই দেশে বিভিন্ন ঐতিহাসিক পর্যায়ে, 'জনগণ' ধারণাটির অন্তর্বস্তুতে প্রভেদ ঘটে" ('জনগণের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসা সম্পর্কে' : মাও), তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে আমাদের মতো দেশগুলিতে বিপ্লবের বর্তমান স্তরে শ্রমিক, কৃষক, শহুরে পেটি বুর্জোয়া ও দোদুল্যমান জাতীয় বুর্জোয়া নিয়েই 'জনগণ' মূলত গঠিত। কিন্তু 'জাতি' বোঝাতে গেলে এদেরও অতিরিক্ত কিছু যোগ করতে হয় অর্থাৎ অন্তর্ভুক্ত করতে হয় মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণী[২] ও জমিদার-শ্রেণীকেও। বস্তুত, ব্যক্তি হিসাবে, বা বড় জোর ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠী হিসাবে, স্বল্পসংখ্যক জাতিদ্রোহী বাদ যেতে পারে কিন্তু মোটামুটিভাবে সবকটি শ্রেণী ও গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত না হলে 'সমগ্র জাতি' বা 'সমগ্র দেশ'এর ধারণাটাই অর্থহীন হয়ে যায়। অতএব প্রধান দ্বন্দ্ব যা-ই হোক না কেন, এই মৌলিক দ্বন্দ্বদুটি সর্বদাই সক্রিয় থাকে, কিন্তু তারা কাজ করে পৃথক পৃথক তলে বা স্তরে। সামন্ত দ্বন্দ্ব যখন প্রধান থাকে, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তখনও, জনগণ তো বটেই, মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও জমিদারশ্রেণীও কমবেশী দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকে, কিন্তু সেই দ্বন্দ্বকে বহুগুণে ছাপিয়ে ওঠে তাদের সঙ্গে জনগণের দ্বন্দ্ব—তাই তারা জনগণের সংগ্রামী ফ্রন্টের অংশীদার হতে পারে না (সাম্রাজ্যবাদের পায়ে আত্মসমর্পণকারী এই দুটি শ্রেণীকে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে একেবারেই "দ্বন্দ্বহীন" ব'লে কল্পনা করাটা এক ধরনের সরলীকরণ মাত্র, যা আমাদের মধ্যে খুবই প্রবল ও ব্যাপক)। পক্ষান্তরে জাতীয় দ্বন্দ্ব যখন প্রধান হয়, তখনও মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও জমিদারশ্রেণীর সঙ্গে জনগণের দ্বন্দ্ব সক্রিয় থাকে, কিন্তু তাকে বহুগুণে ছাপিয়ে ওঠে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে এই উভয় পক্ষের অভিন্ন দ্বন্দ্বটি, তাই তারা সাময়িকভাবে জনগণের সংগ্রামী ফ্রন্টের অংশীদার হতে পারে, 'জনগণ' ধারণাটির অন্তর্বস্তু সম্প্রসারিত হয় এবং 'জাতি' ও 'জনগণ' সাময়িকভাবে সমার্থক হয়ে যায়।

সামন্ত দ্বন্দ্ব প্রধান না জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান? —সংগ্রামী শক্তির উপাদানগত

২ মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ারা অবশ্য বুর্জোয়াশ্রেণীরই একটা অংশ। কিন্তু বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্য থেকে কেবলমাত্র এই অংশটাই আধা-উপনিবেশে রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদার হওয়ার দরুণ এবং অর্থ-নৈতিক দিক থেকেও তা পশ্চাৎপদ দেশগুলিতে সবচেয়ে শক্তিশালী হওয়ার দরুণ তা একটি আলাদা শ্রেণীর গুরুত্বই অর্জন করে। [মাও নিজেও তাদেরকে প্রায়ই সেই গুরুত্বই দিয়েছেন।]

গঠনের দৃষ্টিকোণ থেকে এই প্রশ্নের তাৎপর্য হল : মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও জমিদার-শ্রেণী জনগণের সংগ্রামী ফ্রন্টের অংশীদার হতে পারে কিনা[৩], 'জনগণ' ধারণাটির পরিধি সম্প্রসারিত হয়েছে কিনা, 'জাতি' ও 'জনগণ' সমার্থক হয়ে গেছে কিনা।

প্রধান দ্বন্দ্ব নিয়ে বিতর্ক বরাবরই ছিল, কিন্তু তা বিশেষভাবে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে আজকের একটা নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে। এই উপমহাদেশের মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা বিগত কয়েক বৎসর সামন্ত দ্বন্দ্বকে প্রধান ধ'রে কাজ করেছেন এবং কতগুলি কারণে তাঁদের সংগ্রামে নিদারুণ বিপর্যয় এসেছে। এই আবহাওয়ায় খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, তাঁদের প্রধান দ্বন্দ্ব নির্ধারণটাই সঠিক ছিল কিনা। আমরা মনে করি ছিল, অন্যরা মনে করেন ছিল না। তাঁদের মতে, জাতীয় দ্বন্দ্ব বা বাহ্যিক দ্বন্দ্বটাই প্রকৃতপক্ষে প্রধান ছিল এবং সেটা অস্বীকার কবার মধ্যেই বিপর্যয়ের মূল কারণ নিহিত।

বলা বাহুল্য, সমাজের চরিত্র-বিচারের সঙ্গে সমস্যাটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আমাদের সমাজগুলির আভ্যন্তরীণ অর্থনীতি যে আধা-সামন্তবাদী, এ বিষয়ে মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা সকলেই একমত [যদিও একটু পরেই আমরা দেখব যে এই ঐক্যমতের তলায় কোনো সচেতন বৈজ্ঞানিক চিন্তার ভিত্তি থাকে না বললেই চলে]। আমাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে অন্য জায়গায় : সাম্রাজ্যবাদের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সমাজগুলির অবস্থান কোন স্তরে ? আমরা মনে করি আমাদের দেশগুলি রয়েছে আধা-ঔপনিবেশিক অর্থাৎ আধা-স্বাধীন অবস্থায়। জাতীয় দ্বন্দ্বকে যাঁরা প্রধান ধরেন তাঁদের অধিকাংশই মনে করেন যে আমাদের দেশগুলি আসলে "নয়া-উপনিবেশ"—অর্থাৎ অন্তর্বস্তুতে উপনিবেশই, তবে রূপটা "নয়া"। এঁদেরই অন্য এক দল অবশ্য এখনও আমাদের দেশগুলিকে আধা-উপনিবেশ মনে করেন, যদিও আধা-উপনিবেশেরই অন্তর্বস্তু বোঝাতে "নয়া-উপনিবেশ" বর্গটাকেও এঁরা একই সঙ্গে ব্যবহার ক'রে থাকেন, কিন্তু এঁদের সমগ্র চিন্তাধারা এত স্ববিরোধী যে নিজেদের প্রধান দ্বন্দ্ব-মূল্যায়নে অটল থাকতে গেলে আধা-উপনিবেশের প্রতি আকর্ষণ ত্যাগ ক'রে অনিবার্যভাবে এঁদের অতি শীঘ্রই নয়া-উপনিবেশওয়ালাদের দলেই পুরোপুরি ভিড়ে যেতে হবে[৪]।

এই উপমহাদেশের দেশগুলির সমাজ-চরিত্র বিচার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সমস্যা, কেননা সেটাই হবে আমাদের প্রধান দ্বন্দ্ব নির্ধারণের ভিত্তি। যে কোনো দেশের সমাজ-চরিত্র নির্ধারণ সাধারণত সেই দেশেরই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-

৩ [শুধু 'হতে পারে কিনা' নয়, বাস্তবে তা ইতিমধ্যেই হয়েছে কিনা—পাঠক দেখতে পাবেন, এ বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে আমি এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছি।]

৪ [বাংলাদেশের আলাউদ্দীন সাহেব সাম্যবাদী দলে যোগ দিয়ে এই ভবিষ্যদ্বাণীকে অক্ষরে অক্ষরে সফল করেছেন।]

দের দায়িত্ব। কিন্তু এই উপমহাদেশের মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের মধ্যে যাঁরা বর্তমান পর্যায়ের জন্য বা স্থায়ীভাবে জাতীয় দ্বন্দ্বকে প্রধান করতে চান, তাঁরা নির্দ্বিধায় একে অন্যের দেশ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন ও করছেন। এতে আমাদের সুবিধাই হয়েছে। তাঁদের বক্তব্য খণ্ডন করার জন্য আমরাও ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সম্বন্ধে আমাদের মতামত উপস্থিত করার পাল্টা অবাধ স্বাধীনতা লাভ করেছি।

এবার মূল আলোচনা শুরু করা যাক।

১

ইতিহাসের পাতা থেকে

১৯৪৭এর পূর্বে অবিভক্ত ভারত ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শাসনাধীন একটি ঔপনিবেশিক আধা-সামন্তবাদী দেশ। আমাদের সমাজে তখন সামন্ত ও জাতীয় এই মৌলিক দ্বন্দ্বদুটি সক্রিয় ছিল, কিন্তু প্রধান স্থানে ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে জাতির দ্বন্দ্ব। ১৯৪৭ সালে এই উপমহাদেশে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি পৃথক রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। এই দুটো দেশের সমাজ-চরিত্র সম্বন্ধে মার্কসবাদীদের মূল্যায়ন কি ছিল?[১]

৩ জুন ১৯৪৭ তারিখে মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদ ঘোষিত হবার পর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে এই প্রশ্নে তীব্র মতাদর্শগত সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় এবং তার মধ্য দিয়ে প্রধানত তিনটি লাইন বেরিয়ে আসে।

১. যোশী ও রজনী পাম দত্তের লাইন

জুনের শেষে ভারতীয় পার্টির নেতা যোশী ও জুলাই মাসে বৃটিশ পার্টির তত্ত্ববিদ রজনী পাম দত্ত যে বক্তব্য রাখেন তার মর্মার্থ হল এই যে মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদ আসলে সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব টিঁকিয়ে রাখারই একটি চক্রান্ত হলেও সব মিলিয়ে তা একটি অগ্রসর পদক্ষেপও বটে। সর্বোপরি, ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্তবাদ-বিরোধী জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে, সামন্তশ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদার নয় এবং দুর্বল নবীন রাষ্ট্র দেশী-বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীলদের হুমকি ও চাপের সম্মুখীন। অতএব কমিউনিস্ট পার্টির কর্তব্য হল জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রগতিশীল ভূমিকায় মদত জোগানো। প্রথম দিকে এই লাইনই পার্টির নেতৃত্বে প্রাধান্য লাভ করেছিল। বুঝতে কষ্ট হয় না যে আধা-ঔপনিবেশিক সমাজের ধারণা এই বক্তব্যের ভিত্তি নয়। এই বক্তব্যের ভিত্তিমূলে যা কাজ করেছে তা আসলে স্বাধীন বুর্জোয়া রাষ্ট্রের কল্পনা।

১ [এই অধ্যায়ে ব্যবহৃত তথ্যগুলি আমাকে সংগ্রহ করতে হয়েছিল প্রধানত বদরুদ্দীন উমরের 'পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি' গ্রন্থ থেকে; তিনি আবার এই তথ্যগুলি প্রধানত সংগ্রহ করেছেন ওভারস্ট্রীট ও মার্শাল-এর 'কমিউনিজম ইন ইণ্ডিয়া' গ্রন্থটি থেকে। তথ্যগুলির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের দায়িত্ব বলা বাহুল্য আমারই।]

ক্ষমতাসীন বুর্জোয়াশ্রেণীকে মদত দেওয়ার কথা ব'লে এই লাইন বিপ্লবের কেন্দ্রীয় কর্তব্য অর্থাৎ রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রশ্নকে একেবারেই বাতিল ক'রে দিয়েছে। আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গে যেটা সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় তা হল এই যে জাতীয় প্রশ্নের উপর অর্থাৎ ক্ষমতাসীন বুর্জোয়াশ্রেণীর "সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী" ভূমিকার পেছনে মদত দেওয়ার উপর প্রধান জোর দেওয়ার ফলে এই লাইনের পরিণতি এটা ছাড়া আর কিছু হতেও পারত না। এই মূল সংশোধনবাদী বক্তব্যটিই আজ ডাঙ্গে ও মণি সিংদের লাইনে পরিণত হয়েছে।

২. রুশ পার্টি ও কমিনফর্মের লাইন

অথচ জুন মাসেই দিয়াকভ রুশ পার্টির বক্তব্য রেখে বলেন যে "মাউন্ট-ব্যাটেনের প্রস্তাবটি আসলে ভারতীয় উপমহাদেশে সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণ কায়েম রাখারই একটি সুপরিকল্পিত চক্রান্ত। সেই চক্রান্তের কাছে নতিস্বীকার ক'রে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ বস্তুতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদের সাথে একটা আপোষরফায় উপনীত হয়েছেন···। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ এবং উপমহাদেশের বৃহৎ ব্যবসা দেশী বাজারকে নিজেদের মধ্যে **ভাগাভাগি** ক'রে বিপ্লবকে বানচাল করতে উদ্যোগী হয়েছে" ('পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি': বদরুদ্দীন উমর, বড় হরফ আমাদের)। জুলাই মাসে রুশ পার্টির এশীয় বিশেষজ্ঞ জুকভ বললেন যে কংগ্রেস আসলে বৃহৎ বুর্জোয়ার প্রতিনিধি এবং মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদকে স্বীকার করার মধ্য দিয়ে তা আজ প্রতিক্রিয়াশীলদের শিবিরভুক্ত হয়েছে, "বৃহৎ বুর্জোয়ারা······পূর্ণ স্বাধীনতার পরিবর্তে পারস্পরিক সুবিধার ভিত্তিতে একটি **মাঝামাঝি ব্যবস্থা** অবলম্বন করেছে" (ঐ, বড় হরফ আমাদের)। "পূর্ণ স্বাধীনতার পরিবর্তে···মাঝামাঝি ব্যবস্থা"র অর্থ আধা-ঔপনিবেশিক অবস্থা। কিন্তু কোনো সমাজকে আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্তবাদী বলার অর্থ সে সমাজের বিপ্লবে চীনা পথের প্রযোজ্যতাকে মেনে নেওয়া। ঘটলও তাই। ১৯৪৯এর জুনে জুকভের সভাপতিত্বে সোভিয়েত আকাদেমিশিয়ানদের এক সভা সর্বসম্মতিক্রমে চীনের নয়া-গণতন্ত্রকে এশিয়ার জন্য একটা নীতি হিসাবে ঘোষণা করল। জুকভ চীনের জনগণতন্ত্রের সঙ্গে পূর্ব ইউরোপের জনগণতন্ত্রের সাদৃশ্য তুলে ধরলেন এবং তেলেঙ্গানার কৃষকযুদ্ধকে অভিনন্দন জানালেন। ভারত-সম্পর্কিত রিপোর্টে বালাবুশেভিচ ভারতে চীনা পথের প্রয়োগপদ্ধতি আলোচনা করলেন, তেলেঙ্গানার সংগ্রামকে আখ্যায়িত করলেন "ভারতে জনগণতন্ত্র কায়েমের প্রথম প্রচেষ্টা", "কৃষি-বিপ্লবের অগ্রদূত" ও মুক্তি আন্দোলনের "সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্বস্তু" হিসাবে। ১৯৪৯এর নভেম্বরে পিকিঙে এশীয়-অস্ট্রেলীয় ট্রেড ইউনিয়ন কনফারেন্সে চীন পার্টির পক্ষ থেকে বলা হল যে ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলির জন্য চীনের

পথ একটি সাধারণ পথ এবং সশস্ত্র সংগ্রামই "সংগ্রামের মূল রূপ"। এর পরেই কমিনফর্ম 'ঔপনিবেশিক ও নির্ভরশীল দেশসমূহে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের শক্তিশালী অগ্রগতি' শীর্ষক প্রবন্ধে বলল যে চীনের পথ ঔপনিবেশিক ও নির্ভরশীল দেশগুলির ক্ষেত্রে সাধারণভাবে প্রযোজ্য এবং "ভারতের কামউনিস্ট পার্টিকে চীন এবং অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষালাভ ক'রে তাদের কর্মসূচী নির্ধারণ করতে হবে" (ঐ)।

ভারত পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করেছে এই তত্ত্বকে যেমন কমিনফর্মের বিশ্লেষণ খারিজ ক'রে দেয়, ঠিক তেমনি খারিজ ক'রে দেয় এই তত্ত্বকেও যে ভারত অন্তর্বস্তুর দিক থেকে উপনিবেশই রয়ে গেছে, শুধু অধীনতার রূপের রকমফের হয়েছে মাত্র। কমিনফর্ম স্পষ্টভাবেই বলে যে ভারতে দেশীয় একটি শ্রেণীই রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জন করেছে কিন্তু তার আত্মসমর্পণকারী চরিত্রের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতার পরিবর্তে উদ্ভব হয়েছে একটি আধা-স্বাধীন অবস্থার। পরবর্তী আলোচনা থেকে দেখতে পাব যে এটা আসলে আধা-উপনিবেশেরই অন্তর্বস্তুর বর্ণনা।

৩ যুগোস্লাভ পার্টি ও রণদিভের লাইন

তৃতীয় বক্তব্যটি ছিল যুগোস্লোভ পার্টির। ১৯৪৭ সাল থেকেই তাঁরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় ধরনের জনগণতন্ত্রেরই বিরোধিতা করতে থাকেন,"···তাঁরা বলেন যে জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে একটি মধ্যবর্তী অবস্থা হিসাবে না দেখে আরও জঙ্গী কর্মসূচীর মাধ্যমে বুর্জোয়া ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে একই সূত্রে গ্রথিত ক'রে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করতে হবে।···উপনিবেশগুলিতে 'জাতীয় বুর্জোয়া' সব ক্ষেত্রেই প্রতিক্রিয়াশীল, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের মুৎসুদ্দি, কাজেই উপনিবেশগুলিতে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামকে সফল করতে হলে অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির সাথে বুর্জোয়াশ্রেণীকেও সম্পূর্ণভাবে পরাজিত না ক'রে তা সম্ভব নয়। এবং এক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন শুধুমাত্র সশস্ত্র বিপ্লবের পক্ষেই সম্ভব" (ঐ)। যোশীর আনুষ্ঠানিক নেতৃত্ব সত্ত্বেও আগস্ট মাস থেকেই ভারতীয় পার্টির মুখপত্রে এই বক্তব্য প্রকাশিত হতে থাকে। যোশীর সংশোধনবাদী লাইন পার্টির কর্মীসাধারণের মধ্যে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি করেছিল, কারণ শ্রমিক-কৃষকের সমস্ত জঙ্গী বিপ্লবী সংগ্রাম প্রত্যাহার ক'রে নিচ্ছিল তখনকার নেতৃত্ব। এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে রণদিভে এই বাম-হঠকারী যুগোস্লাভ লাইনকে পার্টির মধ্যে চালু করতে অগ্রসর হলেন। অবশ্য ভারতীয় সমাজ সম্বন্ধে কমিনফর্মের মূল্যায়ন ও জনগণতন্ত্রের রণনীতিকে তিনি সরাসরি আঘাত করতে সাহস পেলেন না। আনুষ্ঠানিকভাবে ওগুলো বহাল রইল, আঘাতটি তিনি হানলেন একটু ঘুরিয়ে। ভারতের সমগ্র বুর্জোয়াশ্রেণীকে প্রতিক্রিয়াশীল

আখ্যা দিয়ে তিনি বললেন : "কাজেই জনগণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের রণনীতিকে একই সঙ্গে গ্রথিত ক'রে পার্টিকে নিরবচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম ক'রে যেতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন হবে সামগ্রিক-ভাবে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপুল জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত ও পরিচালনা করা" (ঐ)। তাঁর প্রস্তাব ছিল : শ্রমিক, কৃষক, পেটি বুর্জোয়া এবং প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের সমন্বয়ে এক 'জনগণতান্ত্রিক মোর্চা' গঠন করতে হবে, ভারতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্ভব, "ছয়মাসের মধ্যে ভারতে বিপ্লব আসন্ন" এবং "'জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে'র অর্থ সর্বহারার একনায়কত্ব ব্যতীত আর কিছুই নয়" (ঐ)। ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষেত্রে তাঁর রণকৌশল ছিল বাম-সঙ্কীর্ণতাবাদী। সবচেয়ে বড় কথা, ভারতীয় বিপ্লবে চীনা পথের প্রযোজ্যতাকে তিনি সরাসরি নাকচ ক'রে দেন। এ সবই হল ভারতীয় সমাজের আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্তবাদী চরিত্রকে চোরাপথে অস্বীকার করার এক নির্লজ্জ দৃষ্টান্ত।

যা হোক, রণদিভের লাইনে অনিবার্য বিপর্যয়টি শীঘ্রই নেমে এল। ইতিমধ্যে কমিনফর্মের বক্তব্য পৌঁছাল পার্টির ব্যাপক কর্মীদের কাছে। ১৯৫০এর মে মাসে এ লাইন বাতিল হল, রণদিভে অপসারিত হলেন নেতৃত্ব থেকে। অন্তর্বর্তী-কালীন নেতৃত্ব এল অন্ধ্র-লাইনের প্রবক্তা রাজেশ্বর রাওয়ের হাতে। ১৯৪৮ সাল থেকেই অন্ধ্রের কমরেডরা ভারতের ক্ষেত্রে চীনা পথের প্রযোজ্যতাকে সমর্থন ও রণদিভে-লাইনের বিরোধিতা ক'রে আসছিলেন। এ বিষয়ে প্রথম কৃতিত্ব তাঁদেরই। কিন্তু নেতৃত্বে এসে রাজেশ্বর রাও যে ঠিক কোন লাইন অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন তার সঠিক তথ্য আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি। এস ইউ সি নেতা শিবদাস ঘোষের মতে তিনি চীনা পথের হুবহু অনুকরণ করতে গিয়ে 'বাম' বিচ্যুতির কবলিত হয়েছিলেন[২]। ১৯৫১ সালে মাদুরাই কংগ্রেসে অজয় ঘোষের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। আনুষ্ঠানিকভাবে তিনিও কমিনফর্মের বক্তব্য বহাল রাখলেন, তবে "ভারতবর্ষের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে পুরোপুরি সাম্রাজ্যবাদের

২ [বইটা লেখা হয়ে যাবার পর 'অনীক' পত্রিকার কোনো একটি সংখ্যা শত ছিন্ন অবস্থায় জেলখানাতেই আমার হাতে আসে। তাতে সুন্দরাইয়ার 'তেলেঙ্গানা পীপলস স্ট্রাগল অ্যাণ্ড ইটস লেসনস' গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে প্রকাশ কর তাঁর 'সংশোধনবাদী বিশ্বাসঘাতকতা' প্রবন্ধে জানাচ্ছেন : "রণদিভে লাইন পর্যুদস্ত হবার পর রাজেশ্বর রাওকে সাধারণ সম্পাদক ক'রে যে নতুন পলিটবুরো নেতৃত্বে এল, তারা (১) রণদিভের নেতৃত্বে দ্বিতীয় পার্টি-কংগ্রেসে গৃহীত 'বামপন্থী' হঠকারী লাইনকে প্রত্যাখ্যান করল : (২) গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দুই স্তরকে একসঙ্গে মিশিয়ে দেবার টিটোপন্থী লাইনকে প্রত্যাখ্যান করল ; (৩) চীনের পথ অনুসরণ ক'রে বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তীব্র সশস্ত্র কৃষিবিপ্লবের বিকাশ ঘটাবার লাইনকে সঠিক ব'লে ঘোষণা করল। কিন্তু বাস্তবে এ লাইন কার্যকরী হল না।"]

তাঁবেদার রাষ্ট্র হিসাবে ব্যাখ্যা ক'রেও পার্লামেন্টারী নির্বাচনে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ করলেন" ('কেন ভারতের মাটিতে এস ইউ সি একমাত্র সাম্যবাদী দল': শিবদাস ঘোষ)। বলা বাহুল্য, "পুরো-পুরি সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার রাষ্ট্র" বলার অর্থও ভারতের আধা-ঔপনিবেশিক চরিত্রকেই অস্বীকার করা। **আজকের জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষক-দের যুক্তির সঙ্গে এই যুক্তির সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়।** তাছাড়া, পার্লামেন্টারী সুযোগ বিদ্যমান থাকলে তার সদ্ব্যবহার করার চেষ্টাও নিশ্চয় সাধারণভাবে সঠিক; কিন্তু এই "সদ্ব্যবহার" যদি চীনা পথের মূল অন্তর্বস্তুর নাকচনে (negation-এ) পর্যবসিত হয় তবে তাতে ভারতীয় সমাজের মৌলিক আধা-ঔপনিবে-শিক আধা-সামন্তবাদী চরিত্রটাই কার্যত আবার অস্বীকৃত হয়ে যায়।

সে যা-ই হোক, জাতীয় দ্বন্দ্বের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে অজয় ঘোষের লাইনের পরবর্তী বিকাশটাই অত্যন্ত আগ্রহজনক। পঞ্চাশের দশকে ভারত সরকার কিছু পরিমাণে স্বাধীন বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করেছিল। ফলে "পুরোপুরি···তাঁবেদার রাষ্ট্রে"র তত্ত্বের সঙ্গে বাস্তবের ফাটল দেখা দিল। তখন পার্টি-কংগ্রেসের লাইন রইল শিকেয় তোলা, কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বিতীয় বৈঠকে হঠাৎ সিদ্ধান্ত গৃহীত হল যে ভারতীয় রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে জাতীয় বুর্জোয়ার প্রভাব ও শক্তি বাড়ছে, বাড়ছে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তার বিরোধ। "ফলে দিল্লীতে কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকের পর থেকেই···স্বাধীন সার্বভৌম জাতীয় রাষ্ট্রের কথা পরিষ্কারভাবে মুখে বা লিখিতভাবে না হলেও বাস্তবে তাঁরা মেনে নিলেন" (ঐ)। তৈরী হল অজয় ঘোষের সংশোধনবাদী-সংস্কারবাদী অনুশীলনের একটা জোড়াতালি-দেওয়া তত্ত্বগত সাফাই—"অর্থাৎ ভারতবর্ষের রাষ্ট্রের চরিত্র হচ্ছে, বৃহৎ পুঁজিপতিশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত বুর্জোয়া-জমিদার রাষ্ট্র" (ঐ), যা আজকের সি পি এম-এর কর্মসূচীর তাত্ত্বিক ভিত্তি। বাস্তবের সঙ্গে সংঘাতের ফলে "পুরোপুরি·· তাঁবেদার রাষ্ট্রে"র একপেশে তত্ত্ব অনিবার্য নিয়মে রূপান্তরিত হল তার বিপরীত ভ্রান্তিতে, অর্থাৎ পুরোপুরি স্বাধীন রাষ্ট্রের তত্ত্বে। প্রথম দিককার যোশী লাইন থেকে এর দূরত্ব খুব বেশী নয়, কারণ যদি সমগ্র বুর্জোয়া-শ্রেণীকে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন ব'লে কল্পনা করা হয়, তবে হয় সমগ্র বুর্জোয়া-শ্রেণীকে উৎখাত ক'রে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব করার বাম-হঠকারী লাইন নিতে হবে, আর না হয় তার "জাতীয়-গণতান্ত্রিক" "প্রগতিশীল" অংশের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হওয়ার জন্য ছুটে মরতে হবে। সি পি আই ছুটে মরে ক্ষমতাসীন **সমগ্র** বুর্জোয়া-শ্রেণীর পেছনে, আর সি পি এম ছুটে মরে ক্ষমতাসীন বুর্জোয়াশ্রেণীর একটা **অংশের** পেছনে—এইটুকুই যা "তফাৎ"। মূলত একই সংশোধনবাদী লাইনের ধারাবাহিকতা চলছে সি পি আই ও সি পি এম-এর মধ্যে, আর অন্য কতগুলি দল করছে এক জাল "সমাজতান্ত্রিক" বিপ্লবের ওকালতি। এই দুই বিপরীত ধারার

তাত্ত্বিক ভিত্তিটি কিন্তু অভিন্ন—ভারতের (তথা বাংলাদেশের তথা পাকিস্তানের) আধা-ঔপনিবেশিক চরিত্র অস্বীকার ক'রে এক অলীক স্বাধীন রাষ্ট্রের কল্পনা। একটু পরেই আমরা দেখব যে জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকরাও এই দেশগুলির আধা-ঔপনিবেশিক চরিত্র অস্বীকার করেন, কিন্তু তা করেন উল্টো দিক থেকে অর্থাৎ ঐগুলোকে পুরোপুরি পরাধীন বা "পুরোপুরি·· তাঁবেদার" ব'লে কল্পনা ক'রে। কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে সংঘাতের ফলে "পুরোপুরি···তাঁবেদার"এর তত্ত্ব কেমন ক'রে "পুরোপুরি স্বাধীন"এর সংশোধনবাদী তত্ত্বে অপ্রতিরোধ্যভাবে রূপান্তরিত হয় তা আমরা এইমাত্র দেখেছি; জাতীয়তাবাদী বন্ধুরা কি তা থেকে শিক্ষা নিতে পারবেন?

৪. ইতিহাসের কয়েকটি শিক্ষা

আমাদের উপমহাদেশকে কেন্দ্র ক'রে কমিউনিস্ট আন্দোলনের আভ্যন্তরীণ মতাদর্শগত সংগ্রামের এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস থেকে আমরা কি দেখতে পাই?

চীনের সঙ্গে বহু পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় সমাজ যে মূলগতভাবে একটি আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্তবাদী সমাজ এবং ভারতীয় বিপ্লব যে মূলগত-ভাবে চীনের পথই অনুসরণ করবে—এই বক্তব্যটি প্রতিষ্ঠা করার দিকেই রয়েছে ১৯৪৭এর পর থেকে এ যাবৎকালের মতাদর্শগত সংগ্রামের অবজেকটিভ গতিমুখ। কমিউনিস্টরা যখন যতটুকু মাত্রায় এই গতিধারা থেকে বিচলিত হয়েছেন—তা খোলাখুলিই হোক আর কার্যতই হোক—তখনই, ঠিক ততটুকু মাত্রাতেই, ডান বা 'বাম' বিচ্যুতি প্রাধান্য লাভ করেছে।

একটা উপমা দেওয়া যাক। পণ্য প্রায় কখনোই তার প্রকৃত মূল্যে ক্রীত বা বিক্রীত হয় না, তার বাস্তব দাম প্রায় সর্বদাই তার মূল্যের উপরে বা নিচে আন্দোলিত হতে থাকে, কিন্তু মূল্যই হচ্ছে সেই কেন্দ্রীয় অন্তর্লীন বাস্তবতা যা এইসব আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং অনিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদী সমাজে মূল্যের এই নিয়ম কেবল বিভিন্ন আকস্মিক বিচ্যুতিগুলির গড় হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়। ঠিক তেমনি ১৯৪৭এর পর থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ধারাবাহিক ডান ও 'বাম' বিচ্যুতিগুলি, এবং তার বিরুদ্ধে সংগ্রামগুলি, আগাগোড়াই 'আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্তবাদী', এই কেন্দ্রীয় চরিত্রায়ণটিরই দুপাশে আন্দোলিত হয়েছে—এটাই হচ্ছে সেই অন্তর্লীন বিষয় যা আড়ালে বা প্রকাশ্যে থেকে সমগ্র আন্তঃপার্টি সংগ্রামকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। এটাই হচ্ছে সেই লক্ষ্যস্থল, কর্মী-সাধারণের অক্লান্ত মতাদর্শগত সংগ্রাম যাকে সুনির্দিষ্টভাবে অর্জন করার জন্য বিরামহীনভাবে অগ্রসর হয়েছে। কর্মীসাধারণের সংগ্রামের এই অবজেকটিভ চরিত্রের জন্যই নেতাদের শত ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও, পার্টির হাজার ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও,

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লবী সত্তাটি দীর্ঘকাল বজায় থাকতে পেরেছিল।[৩] কর্মীসাধারণ তাঁদের নিজেদের সংগ্রামের কেন্দ্রীয় বিষয় সম্বন্ধে কতখানি সচেতন ছিলেন তার দ্বারা এ সত্য নির্ধারিত হয় না, ঠিক যেমন মূল্যের নিয়মের সত্যতা নির্ধারিত হয় না সে সম্বন্ধে মানুষের সচেতনতার স্তর দ্বারা। পণ্য-উৎপাদকেরা সুদীর্ঘকাল মূল্যের নিয়ম মেনে চলার পর যেমন মার্কসই প্রথম সে নিয়মকে সচেতনতার আওতায় আনলেন, এই উপমহাদেশে ঠিক তেমনি চারু মজুমদার পূর্ণ সচেতনতার সঙ্গে সামনে এনেছিলেন সমগ্র আন্তঃপার্টি সংগ্রামের কেন্দ্রীয় ও নির্ধারক বিষয়টিকে।

ব্যাপারটি আরো বিশদভাবে বোঝা প্রয়োজন।

ভারতীয় সমাজের 'আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্তবাদী' অন্তর্বস্তুটির উপর সুবিধাবাদ দুভাবে আক্রমণ চালিয়েছে। কখনও তা এই মৌলিক উপলব্ধিটিকে প্রকাশ্যেই নাকচ করেছে যেমন, যাঁরা সরাসরি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব করতে চান, তাঁরা খোলাখুলিই বলেন যে ভারত বা পাকিস্তান বা বাংলাদেশ মোটেই একটি আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্তবাদী দেশ নয়, তা আসলে একটি স্বাধীন পুঁজিবাদী দেশ। কখনও আবার সুবিধাবাদ এই দেশগুলির আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্তবাদী অন্তর্বস্তু আনুষ্ঠানিকভাবে মেনে নিয়েছে, কিংবা অন্তত সে সম্বন্ধে তাদের বিরোধিতাকে অস্পষ্ট রেখেছে, কিন্তু কার্যত তাকে নস্যাৎ ক'রে দিয়েছে। এই জাতের সুবিধাবাদের ইতিহাস চমৎকারভাবে পাওয়া যায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির আভ্যন্তরীণ সংগ্রামে। পার্টির কর্মীসাধারণের সংগ্রাম আগাগোড়া সমাজ-বিচারের এই মর্মবস্তুকে যথাসম্ভব রক্ষা করেছে— অন্তত নেতৃত্বকে প্রকাশ্যে তা থেকে খুব বেশী দূরে যেতে দেয়নি। ফলে নেতৃত্বকে নিতে হয়েছে চোরা আক্রমণের পথ। মুখে তারা এই মৌলিক তত্ত্বটির প্রতি যখন যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকু সায় দিয়েছে, কিন্তু চীনা পথের সাধারণ প্রযোজ্যতা ও সার্বজনীন তাৎপর্যটুকু অস্বীকার ক'রে কার্যত আবার তাকে পুরোপুরিই নাকচ ক'রে দিতে চেয়েছে। প্রথমে অন্ধ্রের কমরেডরাই এই প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরাও আশানুরূপ সাফল্য লাভ করতে পারেননি। সংশোধনবাদের এই নাগপাশকে দীর্ঘ দুই দশক পরে প্রথম সফলভাবে ছিন্ন করলেন চারু মজুমদার। সুবিধাবাদী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে

৩ [অবশ্য কর্মীসাধারণের মতাদর্শগত সংগ্রামের এই অবজেকটিভ লক্ষ্যস্থলটিকে যদি ভারতীয় সমাজের জন্য সত্য ব'লে প্রমাণ করা না যায় তাহলে এই দাবীটা স্পষ্টতই প্রতিষ্ঠিত হয় না। পাঠক দেখতে পাবেন যে 'আধা-ঔপনিবেশিক' ও 'আধা-সামন্তবাদী' বর্গদুটির বাস্তবে যাচাইযোগ্য তাৎপর্য (যা, কোনো সমাজ 'আধা-ঔপনিবেশিক' 'আধা-সামন্তবাদী' কিনা, তা নির্ণয়ের তাত্ত্বিক নিরিখ হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে) নিষ্কাশনই এই বইয়ের (বিশেষত চতুর্থ অধ্যায়ের) একটি মূল লক্ষ্য।]

কর্মীসাধারণের দীর্ঘ আঁকাবাঁকা সংগ্রামে এল প্রথম নির্ধারক বিজয়। সমগ্র উপমহাদেশ প্রকম্পিত হয়ে উঠল ঐতিহাসিক ঘোষণায়ঃ "ভারত একটি আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্তবাদী দেশ!" "চীনের পথ আমাদের পথ!" নিছক আনুষ্ঠানিকভাবে এই তত্ত্বগত ভিত্তি গৃহীত হয়নি, তাকে নেওয়া হয়েছিল পূর্ণ সচেতনতার সঙ্গে, তার সমস্ত বাস্তব তাৎপর্যসহ[৪]। তাই সব প্রতিকূলতা ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল একটি নতুন পার্টি, যার মধ্যে বিপুলতর মহিমায় পুনর্জন্ম নিল সহস্র শহীদের রক্তস্নাত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি; সমাজের বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রামের ভাষায় অনূদিত হয়ে এমন একটি বাস্তব শক্তিতে পরিণত হল যে তার ধাক্কায় থর থর ক'রে কেঁপে উঠল শাসকশ্রেণীর সৌধমূল। এখানেই চারু মজুমদারের ঐতিহাসিক অবদান, আবার এখানেই তাঁর বেদনাদায়ক ব্যর্থতাও। চীনা পথকে তিনি যান্ত্রিকভাবে হুবহু অনুকরণ করতে চেয়েছিলেন এবং তার সঙ্গে তিনি যোগ করেছিলেন নিজের বহু ভ্রান্তিকেও। ফলে কর্মীসাধারণের এই প্রথম আত্মসচেতন মহান প্রয়াস সন্ত্রাস-বাদ ও বাম-হঠকারিতার চোরাগলিতে পথ হারাল। কিন্তু তাঁর ভুলগুলিকে বড় ক'রে দেখে আজ যাঁরা তাঁর সমস্ত অবদানকে অস্বীকার করতে চাইছেন, তাঁরা যে কেবল এক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের প্রতি অবিচার করছেন তাই নয়, কর্মীসাধারণের কষ্টার্জিত একটি অগ্রসর পদক্ষেপকে নাকচ ক'রে তাঁরা ফিরে যেতে চাইছেন সংশোধনবাদের নাগপাশে আবদ্ধ এক পশ্চাৎপদ স্তরে, ভারতীয় সমাজের চরিত্রায়ণ ও আমাদের আন্তঃপার্টি সংগ্রামের কেন্দ্রীয় বিষয়টিকে তাঁরা ডুবিয়ে দিতে চাইছেন পুরোনো দিনের আচ্ছন্ন চেতনার মধ্যে। এইখানেই জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকদের চিন্তার অন্তর্নিহিত প্রতিক্রিয়াশীলতা।

এই অবস্থায় আমাদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব কি? চারু মজুমদারের ভুলভ্রান্তি-গুলিকে বিশ্লেষণ ক'রে তাঁর সঠিকতা ও বেঠিকতাকে আলাদা করতে হবে, তিনি যতদূর পর্যন্ত এগিয়েছিলেন সেখান থেকেই আমাদের শুরু করতে হবে। পরাজয়বাদের মায়ায় ভুলে তাঁর ভ্রান্তিগুলির অজুহাতে তাঁর পূর্ববর্তী পর্যায়ে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করলে চলবে না। দৃঢ়তার সঙ্গে আমাদের ঘোষণা করতে হবে যে ভারত একটি আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্তবাদী দেশ, তাই চীনের পথই আমাদের পথ। সেই সঙ্গে বিশ্লেষণের মাধ্যমে চীনের পথের সার্বজনীন সারবস্তুকে তার স্থানীয় বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে আলাদা করতে হবে এবং সৃজন-শীলভাবে তাকে আমাদের সমাজের নির্দিষ্ট অবস্থার সঙ্গে সমন্বিত করতে হবে।

ইতিপূর্বের আলোচনা থেকে আমরা আরো একটা শিক্ষা পাই। সব ধরনের

৪ [অন্তত নেওয়ার সবচেয়ে সৎ, বলিষ্ঠ ও সচেতন প্রচেষ্টা টা যে তিনিই প্রথম করেছিলেন সে সম্বন্ধে সম্ভবত খুব কম মার্কসবাদী-লেনিনবাদীই দ্বিমত পোষণ করবেন।]

সুবিধাবাদীরাই এই উপমহাদেশের রাষ্ট্র ও সমাজগুলিকে হয় একপেশেভাবে স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক, আর না হয় একপেশেভাবে পরাধীন ও সামন্তবাদী মনে করেছে। অনুরূপভাবে ক্ষমতাসীন শ্রেণীগুলিকেও তারা একপেশেভাবে "পুতুল" কিংবা "এজেন্ট," আর না হয় সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন কল্পনা করেছে। অথচ তাদের এই অধিবিদ্যক গোঁয়ার্তুমির সঙ্গে বাস্তব মেলে না। বাস্তব অনবরত এদের প্রত্যেকের একপেশে চিন্তার বিপরীত দিকটাকে সামনে এনে হাজির করেছে, ফলে সঙ্গে সঙ্গেই এরা ইচ্ছানিরপেক্ষভাবে এক মেরু থেকে অন্য মেরুতে ঝুঁকতে বাধ্য হয়েছে। অধিবিদ্যার এটাই অনিবার্য পরিণতি। স্বাধীনতা ও পরাধীনতা, পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদ, গণতন্ত্র ও গণতন্ত্রবিরোধী উপাদানগুলি যে একই সমাজদেহে সমন্বিত হতে পারে এবং সেই ধরনের সমাজকেই যে আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্তবাদী সমাজ বলা হয়, এই দ্বন্দ্বমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর নিদারুণ অভাব ছিল। বিশেষ ক'রে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণীটি সম্বন্ধে এই বিভ্রান্তি সবচেয়ে প্রবল। তার যেন আত্মসমর্পণের দিক ছাড়া অন্য কোনো দিক নেই, তার যেন পৃথক কোনো শ্রেণীসত্তাই নেই, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তার যেন কখনও কোনো দ্বন্দ্বই থাকতে পারে না, দুনিয়ার আর সবই দ্বন্দ্বমূলক দৃষ্টিতে বিচার্য হলেও কেবলমাত্র একেই যেন তার আওতার বাইরে রাখতে হবে। দুনিয়ার অন্য সব কিছুর মতোই মুৎসুদ্দি-বুর্জোয়ারও দ্বৈত চরিত্র আছে, তবে তার আত্ম-সমর্পণের দিকটাই স্থায়ীভাবে প্রধান থাকে। বিষয়টিকে এভাবেই আমাদের দেখতে হবে। তা না হলে "একেবারে স্বাধীন" থেকে "একেবারে পরাধীন"এর বিপরীত মেরুদ্বয়ের মধ্যে জীবনভোর ছুটে মরার নিয়তি আমরা কিছুতেই এড়াতে পারব না।

জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকদের চিন্তাও যে উপরে বর্ণিত সুবিধাবাদের সবগুলি চরিত্রলক্ষণেই আক্রান্ত, তা নিশ্চয়ই যেকোনো পাঠক এতক্ষণে লক্ষ্য করেছেন। পরবর্তী আলোচনা থেকে তা আরো পরিষ্কার হবে।

জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকরাও সুস্পষ্টভাবে দুটি দলে বিভক্ত। এক দল আমাদের সমাজের আধা-ঔপনিবেশিক চরিত্রকে খোলাখুলি অস্বীকার ক'রে বলেন যে এই দেশগুলি নয়া-উপনিবেশ, অর্থাৎ অন্তর্বস্তুতে উপনিবেশই তবে চেহারা ও রূপটা "নয়া"। অপর দল অবশ্য আনুষ্ঠানিকভাবে এখনও এ দেশ-গুলির আধা-ঔপনিবেশিক চরিত্র মেনে নেন, কিন্তু তারপর যে বক্তব্য ও কর্মসূচী রাখেন তাতে তা কার্যত নাকচই হয়ে যায়। আসলে প্রথম দলের যে নগণ্য সাহস ও যুক্তিনিষ্ঠতা আছে, এঁদের তা-ও নেই। তাই এঁদের আক্রমণটা চোরাপথে। যেমন—

(ক) তাঁদের মতে, "নির্ভরশীলতা যদিও **ঔপনিবেশিক** চরিত্র" (?—বড় হরফ আমাদের), তবু তাঁরা বাংলাদেশকে নির্ভরশীল ব'লেও সন্তুষ্ট নন, তাঁরা

একে "তার চাইতেও বেশী," পুরোপুরি "তাঁবেদার রাষ্ট্র" ব'লে আখ্যায়িত করতে চান ('আমার কথা': আলাউদ্দীন আহম্মদ, ১. ৯. ৭৪), এই সরকারকে বলতে চান "পুতুল সরকার"। অর্থাৎ তাঁরা উপনিবেশ বা নয়া-উপনিবেশের ধারণাকেই গোপনে আমদানী করতে চাইছেন।

(খ) আধা-উপনিবেশে এক-এক পরিস্থিতিতে এক-এক দ্বন্দ্ব প্রাধান্যে আসে। উপনিবেশ ছাড়া কোথাও জাতীয় দ্বন্দ্বকে স্থায়ীভাবে প্রধান ব'লে বেঁধে দেওয়া যায় না। তাই যখন জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান হওয়ার অর্থেই বলা হয় "এই উপমহাদেশে **বরাবরই** জাতীয় মুক্তির প্রশ্নই প্রধান হয়ে রয়েছে" ('আত্রাই', নভেম্বর '৭৪, বাংলাদেশ, বড় হরফ আমাদের), তখন তার দ্বারাও আসলে এই উপমহাদেশের আধা-ঔপনিবেশিক চরিত্রায়ণের স্থলে ঔপনিবেশিক চরিত্রায়ণটিকেই চোরাচালান করা হয়।

কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকদের দুটি দলই আসলে প্রকাশ্যে বা গোপনে এই দেশগুলির আধা-ঔপনিবেশিক চরিত্রকেই অস্বীকার করতে চান।

২

প্রতিপক্ষীয়দের প্রশ্ন উত্থাপনের ধারা

উপমহাদেশের সমাজগুলির আধা-ঔপনিবেশিক অন্তর্বস্তু এতদিনকার একটা স্বীকৃত মত ব'লেই যে তাকে শাস্ত্রবাক্যের মতো মেনে চলতে হবে, এমন ভাবাটা অবশ্য একটা মার্কসবাদ-বিরোধী চিন্তা। কিন্তু বাস্তব তথ্য ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সে মতকে উল্লেখ ও খণ্ডন না ক'রে নীরবে সেটাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া এবং স্বতঃপ্রমাণিত সত্যের মতো নিজের বক্তব্যকে প্রায় বিনা যুক্তিতর্কে উত্থাপন করা—এগুলো কি গোঁজামিলের সচেতন অপচেষ্টা নয়? জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকদের লেখায় কোথাও কমিনফর্মের লাইনের (ও তার উপর সুবিধাবাদের দীর্ঘ ধারাবাহিক আক্রমণের) উল্লেখমাত্র পাবেন না, খণ্ডন তো নয়ই। যতদূর দেখেছি, তাঁদের বক্তব্যের কোথাও এই সততা ও বিজ্ঞাননিষ্ঠতার লেশমাত্র আমরা খুঁজে পাইনি। এরই অনিবার্য শাস্তিস্বরূপ তাঁদের প্রত্যেকটি বক্তব্য লক্ষ লক্ষ স্ববিরোধে কণ্টকিত। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলেই আমাদের অভিযোগ প্রমাণিত হবে।

১. বাংলাদেশকে যাঁরা নয়া-উপনিবেশ মনে করেন

বাংলাদেশকে যাঁরা নয়া-উপনিবেশ মনে করেন (এই অর্থে যে তার অন্তর্বস্তু আসলে উপনিবেশই, রূপটা শুধু নয়া), সেই বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)র একটি পুস্তিকা নেওয়া যাক। পুস্তিকাটির নাম 'পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল)এর রাজনীতির আসল রূপ'। পুস্তিকাটিতে উক্ত পার্টির, বিশেষ ক'রে জনৈক আলাউদ্দীন সাহেবের, বক্তব্যকে খণ্ডন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

বর্তমানে আলাউদ্দীন সাহেব জাতীয় দ্বন্দ্বকে প্রধান মনে করলেও উপরোক্ত পুস্তিকাটি লেখার সময় তাঁর বক্তব্য ছিল: সাবেক পাকিস্তান এবং আজকের পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সবই নয়া-উপনিবেশ; নয়া-উপনিবেশে সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়; বর্তমানে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বই প্রাধান্যে রয়েছে।

স্পষ্টতই আলাউদ্দীন সাহেবরা নয়া-উপনিবেশ বলতে প্রধানত আধা-উপনিবেশের অন্তর্বস্তুই বোঝাতেন (এখনও তাই বোঝান)। ঠিক হোক বা ভুল হোক, নয়া-উপনিবেশের এই ব্যাখ্যা যে আমাদের মার্কসবাদী সাহিত্যে নিতান্ত বিরল নয়, তা ওয়াকিবহাল ব্যক্তি মাত্রই বুঝবেন।

অতএব এক্ষেত্রে যাঁরা ভিন্ন মত পোষণ করেন তাঁদের কিভাবে এগোনো উচিত ছিল? মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নয়া-উপনিবেশের অর্থ কি, তাকে আধা-উপনিবেশের সমার্থক ধরা ঠিক না ভুল, পাকিস্তান বা বাংলাদেশকে আধা-উপনিবেশের অর্থে নয়া-উপনিবেশ বলা সঠিক কিনা—এইসব প্রশ্নের জবাব দিয়ে আলোচনা শুরু করাই যুক্তিনিষ্ঠতার পরিচায়ক হত[১]। কিন্তু এই ধরনের কোনো আলোচনায় "সাম্যবাদী"রা মোটে গেলেনই না। তাঁরা প্রথমে নয়া-উপনিবেশের একটি বিশেষ অর্থ (তা মার্কসীয় দৃষ্টিতে সঠিক বা বেঠিক যা-ই হোক না কেন) **ধ'রে নিলেন**, তারপর **সেই অর্থে** তাঁরা পাকিস্তান ও বাংলাদেশকে নয়া-উপনিবেশ **ধ'রে নিলেন** এবং তারপর তাঁরা "প্রমাণ" করলেন যে নয়া-উপনিবেশে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া অর্থাৎ এজেন্টদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয় না! এই ধরনের বিতর্ককে কি মার্কসবাদী বিতর্ক বলা যায়? নয়া-উপনিবেশের সাম্যবাদী দল-প্রদত্ত অর্থ একবার মেনে নিলে পরে সেখানে যে দেশীয় কোনো শ্রেণীর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয় না তা আর প্রমাণ করার দরকার পড়ে না, কারণ যা প্রমাণ করতে চাইছি তাকেই আমরা মেনে নিচ্ছি আগে থাকতে। এখানে আসলে যা প্রমাণ করা দরকার ছিল তা হল, নয়া-উপনিবেশের সাম্যবাদী দল-প্রদত্ত অর্থটা মার্কসবাদ অনুযায়ী সঠিক এবং তা ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

আলাউদ্দীন সাহেবরা বলতেন, নয়া-উপনিবেশে (=আধা-উপনিবেশের অর্থে) মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া অর্থাৎ এজেন্টদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়। "সাম্যবাদী"রা বলছেন, নয়া-উপনিবেশে (=উপনিবেশের অর্থে) মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া অর্থাৎ এজেন্টদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয় না। দু-দলই কিন্তু একই উদ্ভট উপলব্ধির শিকার। সেটা হল, "বাছাই করা ও শিক্ষা দেওয়া" কিছু এজেন্ট অর্থাৎ **ব্যক্তির** সঙ্গে একটা গোটা শ্রেণীকে, মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণীকে, গুলিয়ে ফেলা—দুটোকে হাস্যকরভাবে সমার্থক মনে করা। আমরা পরে দেখাব যে

১ [কেননা কাউকে যদি মার্কসীয় বা অ-মার্কসীয় যেকোনো প্রকার সংজ্ঞা ইচ্ছামতো ব্যবহারের স্বাধীনতা দেওয়াও যায়, তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে একটি ক্ষেত্রে অ-মার্কসীয় একটি সংজ্ঞা ব্যবহার ক'রে তারপর আবার তাকে মার্কসীয় সিদ্ধান্ত ও সংজ্ঞার সঙ্গে সম্পর্কিত করতে গেলে খুব সহজেই অসঙ্গতি ও স্ববিরোধের উদ্ভব ঘটতে পারে। তাই মার্কসবাদীদের মধ্যেকার আলোচনায় বিভিন্ন বর্গের সঠিক মার্কসীয় সংজ্ঞা নির্ধারণ একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে বাধ্য।]

মার্কসবাদের মতে সাম্রাজ্যবাদের এজেন্টরা যে দেশে সরকার গঠন করে সেই দেশটা হয় পুতুল সরকার-শাসিত একটি উপনিবেশ। এজেন্টরা সরকার গঠন করে ঠিকই, কিন্তু সেই এজেন্টরা তখন দেশীয় কোনো শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে না, এমন কি মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণীরও না। পক্ষান্তরে আধা-উপনিবেশে যারা সরকারে থাকে তারা এক বা একাধিক দেশীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে—সেই শ্রেণীগুলি যত আত্মসমর্পণকারীই হোক না কেন। দু-দলের কেউই এই মূল তফাৎটা দেখেননি এবং মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণীকে পূর্ববর্ণিত অধিবিদ্যক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করেছেন।

"সাম্যবাদী"রা তিন ধরনের নয়া-ঔপনিবেশিক সরকারের কথা বলেছেন: (১) পুতুল সরকার (ভিয়েতনাম, কাম্বোডিয়া); (২) নির্ভরশীল সরকার (ভারত, পাকিস্তান); (৩) নিয়ন্ত্রিত সরকার (দৃষ্টান্ত দেননি)। কিন্তু এই তিনটি ধরনের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য সত্ত্বেও কোন অন্তর্নিহিত সাদৃশ্যের দরুণ এই সবগুলিই নয়া-উপনিবেশ? পার্থক্য বলতে তাঁরা অস্পষ্টভাবে "তারতম্যে"র উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই তারতম্য কি নির্ভরশীলতা ও অধীনতার স্তর ও পরিমাণেরই তারতম্য নয়? তা যদি হয় তবে তো কেবলমাত্র প্রথমটিকেই উপনিবেশ বা নয়া উপনিবেশ বলা যায়—বাকীগুলি যেহেতু পুরো অধীন নয়, আবার পুরো স্বাধীনও নয়, বরং এ দুটোর মাঝামাঝি, তাই সেগুলিকে আধা-উপনিবেশই বলতে হবে।

উপরোক্ত ধরন তিনটির সাদৃশ্য নির্দেশ ক'রে তাঁরা বলেছেন: "নয়া-উপনিবেশে ক্ষমতার মূল চাবিকাঠি থাকে সাম্রাজ্যবাদ বা সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের হাতে।" নয়া-উপনিবেশে (=উপনিবেশের অর্থে) তো তাই থাকে, কিন্তু ২নং ও ৩নং ধরনে রাষ্ট্রক্ষমতা কার হাতে থাকে সেটাই তো প্রশ্ন। রাষ্ট্রক্ষমতা যদি সে দেশগুলির মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও জমিদারশ্রেণীর হাতে থাকে, তবে তাদের উপর **যত সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণই থাক** তাদেরকে উপনিবেশ বা নয়া-উপনিবেশ বলা যাবে না, আধা-উপনিবেশই বলতে হবে—যেমন চীন, তুরস্ক ও পারস্যকে "শতকরা নব্বইভাগ উপনিবেশ" বলা সত্ত্বেও লেনিন সেগুলিকে আবার আধা-উপনিবেশই বলছেন ('ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্রের স্লোগান সম্পর্কে,' ১৯১৫, দ্রষ্টব্য)। "সাম্যবাদী"রা এই সবকিছু এত চমৎকারভাবে গুলিয়ে ফেলেছেন ব'লেই পরক্ষণে আবার বলতে পারলেন: "পাকিস্তান সরকার ছিল সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল সরকার এবং এই সরকার আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ছিল সামন্ত-মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী। ক্রমে ক্রমে এই সরকারের ভিতরে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণী অধিকতর প্রভাবশালী হয়ে ওঠে এবং এই শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদের ছত্রছায়ায় থেকেও সামন্তবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে অপেক্ষাকৃত পরিণত ও সুসংগঠিত শ্রেণী হিসাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠে,

আর **নিজস্ব শ্রেণীস্বার্থেই** পাকিস্তান সরকার ১৯৬৩-৬৪ সন থেকে পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে ক্রমশ স্বাধীন ভূমিকা নিতে থাকে··" (বড় হরফ আমাদের)। এর পরেও তাঁরা বলেন যে পাকিস্তানে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও সামন্তশ্রেণীর হাতে (যারা একটা পর্যায়ে আপেক্ষিকভাবে "স্বাধীন ভূমিকা"ও নিতে থাকল) রাষ্ট্রক্ষমতা ছিল না এবং পাকিস্তান ছিল একটা নয়া-উপনিবেশ !

পাকিস্তানের মতো একটা দেশে ক্ষমতাসীন শ্রেণী যখন "স্বাধীন ভূমিকা" নিতে থাকে, তখন **জাতীয় দ্বন্দ্বকে প্রধান মনে করলে** কর্তব্য হয় সেই শ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করা নয়, বরং তার প্রগতিশীল ভূমিকার পেছনে মদত জোগানো। সেটা বলতে এত লজ্জা কেন ? খোলসা ক'রে বললেই তো ল্যাঠা চুকে যায়, যোশী-ডাঙ্গের উত্তরাধিকারটাকে সঠিকভাবেই চিনে নিতে পারি আমরা। আধা-ঔপনিবেশিক দেশে জাতীয় দ্বন্দ্বকে অনড ও স্থায়ীভাবে প্রধান ক'রে নেওয়ার অনিবার্য উপসংহার যে এটাই, সে কথা আমাদের কখনও ভোলা উচিত নয়। পক্ষান্তরে আমরা যেহেতু আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে প্রধান মনে করি, তাই শাসকশ্রেণী যত "স্বাধীন ভূমিকা"ই নিক না কেন, একটা বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া (যা আমরা পরে আলোচনা করব) তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার লক্ষ্য সাময়িকভাবেও আমাদের ত্যাগ করার প্রয়োজন হয় না।

তাঁরা বাংলাদেশকে নয়া-উপনিবেশ মনে করেন এবং বলেন যে নয়া-উপনিবেশে দেশীয় কোনো শ্রেণীর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয় না। অথচ 'গণশক্তি'তে (জুন-জুলাই, '৭৪) তাঁরা বলেছেন যে আওয়ামী লীগ সরকারের রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারিত হচ্ছে যে শ্রেণী ক্ষমতায় আছে তার (অর্থাৎ মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণীর) শ্রেণীস্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে ! স্ববিরোধের আর কত দৃষ্টান্ত দেব ? আমরা আগেই দেখিয়েছি যে এগুলো নিছক অসতর্ক ভাষা-ব্যবহার নয়, বরং তাঁদের মৌলিক ভ্রান্ত রাজনীতির অনিবার্য ফল।

অতঃপর তাঁদের প্রধান দ্বন্দ্ব নির্ধারণ : "আমাদের ন্যায় নয়া-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশে মুক্তি ও বিকাশের পথে মূল বাধা হচ্ছে দুটো শক্তি সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ···।" "বলা বাহুল্য উপরোক্ত দুই শক্তির মধ্যে বর্তমানে যে শক্তিটি সবচেয়ে বড় বাধা হবে তার সাথেই হবে বর্তমানে সর্বপ্রধান (প্রিন্সিপাল) দ্বন্দ্ব এবং সে শক্তিকে উৎখাত করাই হবে প্রাথমিক ও সবচেয়ে জরুরী কাজ।" "এসব নয়া-উপনিবেশে সাম্রাজ্যবাদই হচ্ছে নিয়ামক শক্তি। সামন্তবাদী ব্যবস্থার ও তার ধারক সামন্তশ্রেণীরও প্রধান রক্ষক হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী শক্তি।" অর্থাৎ বাংলাদেশে এখন প্রধান দ্বন্দ্ব সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে। কেন ? যেহেতু বাংলাদেশ একটি নয়া-উপনিবেশ। কিন্তু বাংলাদেশ নয়া-উপনিবেশ কেন ? যেহেতু তার সরকার "গঠিত হয় ভারতের বুকে" এবং তাকে চাপানো হয় "রুশ-ভারত শাসকচক্রের বন্দুকের জোরে"। কিন্তু বন্ধুগণ,

এই দুটো যুক্তির একটাও প্রমাণ করে না যে আওয়ামী সরকার দেশীয় কোনো শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করছে না। ফলে বাংলাদেশকে আপনারা নয়া-উপনিবেশ বলেছেন মাত্র, প্রমাণ করতে পারেননি। বস্তুত আপনাদের নয়া-উপনিবেশ চেনার কোনো বৈজ্ঞানিক নিরিখ নেই, নেই প্রধান দ্বন্দ্ব নির্ধারণের কোনো মার্কসবাদী পদ্ধতি।

২. বাংলাদেশকে যারা আধা-উপনিবেশ মনে করেন

বাংলাদেশে জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকদের মধ্যে যারা এই উপমহাদেশের দেশগুলিকে এখনও আধা-উপনিবেশ মনে করেন এবার তাঁদের বক্তব্য নেওয়া যাক।

'ভূমিবিপ্লবের স্তর নয় কেন' (১.৬.৭৪ : 'পূর্ববাংলা') প্রবন্ধে জহির হোসেন যা বলেছেন তা থেকে এঁদের চিন্তাটা বেশ পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে। তাঁর মতে ভূমিবিপ্লব দুটো পরিস্থিতিতে হতে পারে—(১) বুর্জোয়ারা[২] যখন রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকে এবং কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিবিপ্লবী কর্মকাণ্ডে **সহায়তা** করে, যেমন ১৯২৪-২৭ ও ১৯৩৭-৪৫এর চীনে; (২) বুর্জোয়ারা যখন রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকে কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিবিপ্লবী কর্মকাণ্ডের **বিরোধিতা** করে; বিরাট দেশ, অনুকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও পার্টির নেতৃত্বে মুক্ত এলাকা—এই তিনটি শর্ত পূরণ হলে তখন "আংশিক" ভূমিবিপ্লব সম্পন্ন করা যায়, যেমন গিয়েছিল ১৯২৭-৩৭এর চীনে। বাংলাদেশে বর্তমানে ১নং পথে ভূমিবিপ্লব সম্ভব নয়, কেননা ক্ষমতাসীন বুর্জোয়ারা সহযোগিতা করছে না; আবার ২নং পথেও ভূমিবিপ্লব সম্ভব নয়, কারণ "বর্তমান পরিস্থিতিতে দু'একটা ক্ষুদ্র ঘাঁটি এলাকা প্রতিষ্ঠা ক'রে লাল পতাকা উড্ডীন রাখা যাবে না"। বর্তমানের সে "পরিস্থিতিটা" কি? তা হল বিপ্লব দমনে ভারত ও বাংলাদেশ সরকারের ঐক্যবদ্ধতা: "বিপ্লব দমনে ভারত ও সাম্রাজ্যবাদীরা এখানে আসবেই এবং প্রধানত এই কারণেই এখানে তাদের লেজুড় সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে," ইত্যাদি। অতএব?… অতএব জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান, কৃষিবিপ্লব "জাতীয় মুক্তি বিপ্লবেরই করণীয় কাজ"। এই হল তাঁর সম্পূর্ণ যুক্তি। মার্কসবাদী সাহিত্যে এই রকম মণিমুক্তো সচরাচর পাওয়া যায় না, তাই এটাকে একটু খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

তাঁর মতে, ভূমিবিপ্লব সম্ভব কিনা তা নির্ধারিত হয় বুর্জোয়ারা কি করছে তাই দিয়ে। হয় তারা সহযোগিতা করবে নতুবা অন্তত ভারতের সঙ্গে মিলে বিপ্লব দমন করবে না, তবেই না আমাদের বিপ্লবী নায়ক ভূমিবিপ্লব করতে নামবেন!

২ প্রকৃতপক্ষে সমগ্র বুর্জোয়াশ্রেণী চীনে কখনোই ক্ষমতায় ছিল না; কিন্তু সে কথা আপাতত থাক।

বুর্জোয়াদের লেজুড়বৃত্তি কাকে বলে, জহির সাহেব ?

উপরন্তু তাঁর বক্তব্য ইতিহাসের বিকৃতিসাধনে কলঙ্কিত। ক্ষমতাসীন বুর্জোয়ার সহযোগিতার উপর নির্ভর ক'রে ভূমিবিপ্লব করতে চাওয়ার সাফাই হিসাবে তিনি চীনের প্রথম বিপ্লবী গৃহযুদ্ধ (১৯২৪-২৭) ও জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-যুদ্ধের (১৯৩৭-৪৫) দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। আর "আংশিক" ভূমিবিপ্লবের পর্যায়-রূপে নির্দেশ করেছেন ১৯২৭-৩৭ সময়কালটিকে। অথচ আসলে ১৯২৭-৩৭ সময়কালটাই ছিল পূর্ণ ভূমিবিপ্লবের পর্যায়, তখনকার গৃহযুদ্ধের নামটাই ছিল 'কৃষিবিপ্লবী গৃহযুদ্ধ'। তখন অবশ্য সারা দেশে কৃষিবিপ্লব করা যায়নি, দেশের অংশবিশেষেই তা সম্ভব হয়েছিল ; কিন্তু যেখানেই এ কাজে হাত দেওয়া হয়েছে সেখানেই তা ছিল পূর্ণ কৃষিবিপ্লব, কেননা পার্টির কর্মসূচী ছিল **সমগ্র** জমিদার-শ্রেণীর উচ্ছেদ ও পূর্ণ ভূমিসংস্কার। পক্ষান্তরে ১৯২৪-২৭ ও ১৯৩৭-৪৫ কোনো-টাই কৃষিবিপ্লবের পর্যায় ছিল না, কারণ কোনোটাতেই **সমগ্র** জমিদারশ্রেণীর উপর চূড়ান্ত আঘাত হানা হয়নি। ১৯২৪-২৭এর পর্যায়টা ছিল গৃহযুদ্ধের পর্যায়, প্রধান দ্বন্দ্ব ছিল সামন্তবাদের সঙ্গে, তবু সে দ্বন্দ্ব ঐ মুহূর্তে তীব্রতম ছিল সামন্তবাদের বৃহত্তম ও হিংস্রতম প্রতিভূ যুদ্ধবাজদের সঙ্গে অর্থাৎ সামন্তশ্রেণীর একটা নির্দিষ্ট **অংশের** সঙ্গে ; তাই ব্যাপক ঐক্যের খাতিরে প্রধান আঘাতকে তাদেরই বিরুদ্ধে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব হয়েছিল। আর ১৯৩৭-৪৫এর পর্যায়টা ছিল জাতীয় যুদ্ধের পর্যায়, প্রধান দ্বন্দ্ব ছিল সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষত জাপ সাম্রাজ্য-বাদের সঙ্গে ; তাই ব্যাপক ঐক্যের খাতিরে তখন কৃষিবিপ্লবের আওয়াজ প্রত্যাহার করা গিয়েছিল, জমিদারশ্রেণীকে বলপূর্বক উচ্ছেদের কর্মসূচী স্থগিত রাখা গিয়েছিল এবং প্রধান আঘাতকে কেন্দ্রীভূত করা গিয়েছিল বিদেশী শত্রু ও দেশী বেইমানদের উপর। এই পর্যায়দুটো কৃষিবিপ্লবের পর্যায় ছিল না ব'লে সামন্তবাদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব (ও সংগ্রাম) ছিল না, এমন ভাবা ভুল হবে। সে দ্বন্দ্ব অবশ্যই ছিল ; ১৯২৪-২৭এ তা এমন কি প্রধান স্থানেই ছিল এবং ১৯৩৭-৪৫এ তা ছিল অপ্রধান স্থানে। কিন্তু সে দ্বন্দ্বের তাৎক্ষণিক তীব্রতার বাস্তব মাত্রা অনুযায়ী ব্যাপকতম ঐক্যের খাতিরে সংগ্রামে কিছু সাময়িক রদবদল ক'রে নেওয়া হয়েছিল মাত্র। পরিস্থিতি অনুযায়ী এই ধরনের রদবদল নিশ্চয়ই করতে হবে এবং তা না করাটা ভুল।

বিগত কয়েক বৎসর উপমহাদেশের মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা সামন্ত দ্বন্দ্ব প্রধান ধ'রে লড়াই করেছেন, কিন্তু তা করতে গিয়ে পরিস্থিতির বিচার-বিবেচনা না ক'রে হঠকারীর মতো যুদ্ধে নেমে পড়েছেন এবং সংগ্রামের নির্দিষ্ট পর্যায়ের ভিত্তিতে যথাসম্ভব ব্যাপক ঐক্য গড়ার নীতি পরিত্যাগ ক'রে রুদ্ধদ্বারবাদ অনুশীলন করেছেন। ফলে বিপর্যয় নেমেছে। তাই আজ এমন একটা দক্ষিণপন্থী পরাজয়বাদী ধারণা গ'ড়ে ওঠা স্বাভাবিক যে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব প্রধান ধরার

অর্থই যেন তাৎক্ষণিক গৃহযুদ্ধ, আর গৃহযুদ্ধ মানেই যেন সংকীর্ণতম ঐক্য, হঠকারিতা, রুদ্ধদ্বারবাদ ও বিপর্যয়। জহির সাহেব এই অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছেন। সংগ্রামের পর্যায় আলাদাভাবে বৈজ্ঞানিক পন্থায় নির্ধারণ ক'রে **তারই ভিত্তিতে** কার কার সঙ্গে ঐক্য সম্ভব তা অনুসন্ধান করা—এটাই মার্কসবাদী পদ্ধতি। কিন্তু ঐক্যের একটা আত্মগত ইচ্ছার ভিত্তিতে যদি সংগ্রামের পর্যায় নির্ধারণ করা হয়, সংগ্রামের পর্যায় নির্ধারণের সঙ্গে ঐক্যের প্রয়াসকে খাপ খাওয়ানোর পরিবর্তে যদি ঐক্যের প্রয়াসের সঙ্গে সংগ্রামের পর্যায় নির্ধারণকে খাপ খাওয়ানো হয়, তবে তা দক্ষিণপন্থী লেজুড়বৃত্তিতে পর্যবসিত হতে বাধ্য। জহির সাহেবের চিন্তার অন্তর্নিহিত যুক্তিটি হল, বুর্জোয়াদের সহযোগিতা ছাড়া ভূমিবিপ্লব সম্ভব নয়, এবং বাংলাদেশে বর্তমানে ভূমিবিপ্লবের এই শর্তটি অনুপস্থিত; কাজেই বুর্জোয়াদের দলে পেতে হলে জাতীয় যুদ্ধেরই পর্যায় নির্ধারণ করতে হবে। এই কি মার্কসবাদী পদ্ধতি? উপরন্তু প্রশ্ন থাকে: ব্যাপক ঐক্য কি কেবল জাতীয় যুদ্ধেই সম্ভব, গৃহযুদ্ধে আদৌ সম্ভব নয়? ১৯২৪-২৭এর চীনে কিন্তু গৃহযুদ্ধের কাঠামোর মধ্যেই ব্যাপক ঐক্য সম্ভব হয়েছিল। জহির হোসেন তা না জানতে বাধ্য হয়েছেন, কারণ ব্যাপক ঐক্যের লোভ দেখিয়ে আমাদের যে ক'রেই হোক জাতীয় যুদ্ধের মধ্যে নিয়ে ফেলাটাই তাঁর লক্ষ্য।

তাছাড়া জহির হোসেনের সমগ্র চিন্তার যুক্তিগত উদ্ভটত্বটা দেখুন। বলছেন: বুর্জোয়ারা যখন সহযোগিতা করেছিল তখন ভূমিবিপ্লব সম্ভব হয়েছিল (যদিও তা আসলে ঠিক নয়), আবার যখন তারা বিরোধিতা করেছিল তখনও তা সম্ভব হয়েছিল। তাহলে ভূমিবিপ্লবের পর্যায় নির্ধারণের ক্ষেত্রে বুর্জোয়াদের মনোভাব কি তাঁরই কথামতো একটা অবান্তর বিষয় হয়ে দাঁড়ায় না? অথচ তিনি নিজেই ভূমিবিপ্লবের পর্যায় নির্ধারণকে বুর্জোয়াদের মনোভাবের উপর নির্ভরশীল ক'রে রেখেছেন। বুর্জোয়াদের মনোভাব বাস্তবিকই এক্ষেত্রে একটা অবান্তর বিষয়, কেননা বুর্জোয়াদের মনোভাব সংগ্রামের পর্যায় নির্ধারণ করে না বরং সংগ্রামের পর্যায়ই বুর্জোয়াদের মনোভাব নির্ধারণ করে এবং সেই পর্যায় নিজে নির্ধারিত হয় তৃতীয় কোনো বিষয় দ্বারা। সেটা কি? সেটা হল **বিদ্যমান শ্রেণী-সংগ্রামের বাস্তব প্রকৃতি, স্তর ও তীব্রতার মাত্রা**। জহির সাহেব নিজেই অবশ্য এক জায়গায় বলেছেন যে ভূমিবিপ্লবের জন্য প্রয়োজন "ভূমিহীন গরীব কৃষকের রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা" এবং "এরজন্য প্রয়োজন উঁচু মানের রাজনৈতিক চেতনা ও সংগঠন," কিন্তু ইচ্ছানিরপেক্ষভাবে বিদ্যমান ও চলমান শ্রেণীসংগ্রামের **নির্ধারক** গুরুত্বের কথা স্পষ্টই তিনি বোঝেননি। ১৯২৪-২৭এর শেষ দিক থেকেই চীনে **সমগ্র** জমিদারশ্রেণীর সঙ্গে কৃষক জনতার শ্রেণী-সংগ্রাম তীব্র হতে থাকে এবং বুর্জোয়ারা প্রতিক্রিয়াশীল শিবিরে চ'লে যেতে

থাকে[৩]। ১৯২৭এ বুর্জোয়ারা বিপ্লবী শিবির পরিত্যাগ করেছিল ব'লেই যে চীনের কমিউনিস্টরা 'অগত্যা' কৃষিবিপ্লবের পর্যায় শুরু করতে 'বাধ্য' হয়েছিলেন তা নয়, বরং শ্রেণীসংগ্রাম ইতিমধ্যে কৃষিবিপ্লবের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল ব'লেই বুর্জোয়াদের শিবিরত্যাগের পরেও কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে কৃষিবিপ্লবী গৃহযুদ্ধের উদ্বোধন ঘটানো সম্ভব হয়েছিল। উপনিবেশে, কিংবা সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা আক্রান্ত আধা-উপনিবেশে, নিছক ব্যাপক ঐক্যের খাতিরেই যে কৃষিবিপ্লবের কর্মসূচী পরিত্যাগ করা হয় তা ঠিক নয়; তা করা হয় এইজন্য যে জাতীয় দ্বন্দ্ব তীব্র হওয়ার ফলে সামন্ত দ্বন্দ্ব তখন বাস্তবেই তার তুলনায় অপ্রধান ও মৃদুতর হয়ে যায় এবং তার উপর সামগ্রিক কৃষিবিপ্লবের কর্মসূচী দাঁড় করাতে চাওয়াটা হয়ে পড়ে অবাস্তব বাম-হঠকারিতা ও সংকীর্ণতাবাদ। কিন্তু জাতীয় যুদ্ধ দীর্ঘকাল চলতে চলতে, **জাতীয় দ্বন্দ্বের চেয়ে** সামন্ত দ্বন্দ্ব প্রধান না হলেও, তা **আগের চেয়ে** এতটা তীব্র হতে পারে যে তার সম্পূর্ণ সমাধান ছাড়া আর এক পা-ও অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয় এবং তখন, জাতীয় যুদ্ধের প্রয়োজনেই ও জাতীয় যুদ্ধের মধ্যেই, কৃষিবিপ্লব সমাধা করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে—যেমন হয়েছিল ভিয়েতনামে। বাস্তবে শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও শ্রেণীসংগ্রাম ঠিক যে তীব্রতায় বিরাজ করছে তারই উপর ভিত্তি ক'রে নির্ধারণ করতে হবে আ... সচেতন প্রয়াসের প্রকৃতি ও ঐক্যের পরিধি।

...র বক্তব্য যে বুর্জোয়াদের লেজুড়বৃত্তির কোন পর্যায়ে নেমে গেছে তার আরো একটি দৃষ্টান্ত দিই। 'আমার কথা'য় আলাউদ্দীন সাহেব বলেছেন: "জনগণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা"র "লক্ষ্যে পৌছার আগেও পূর্ববাংলার বিশেষ অবস্থায়" (সেই বিশেষ অবস্থাটা কি, জনাব?) "একটি প্রাথমিক ধাপের সরকার গঠনের সম্ভাবনার কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না" এবং তার জন্য কমিউনিস্টদের "আওয়াজ"ও রাখতে হবে। যেহেতু এই "প্রাথমিক ধাপের" মধ্যে সর্বহারা নেতৃত্বের কথা বা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে তার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা তিনি বলছেন না, অতএব ধ'রে নিতে হয় যে তিনি একটি জাতীয়-বুর্জোয়া সরকারের কথাই ভাবছেন। অথচ এই সরকারের করণীয়ের মধ্যে তিনি জাতীয় স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করার সঙ্গে ভূমিসংস্কারকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তার মানে আমাদের মতো দেশে জাতীয় বুর্জোয়ারা যে শুধু ক্ষমতায় যাবে তাই নয়, তারা একটি জাতীয়-গণতান্ত্রিক বিপ্লবও সম্পন্ন করবে! এত সবের পরেও তাঁরা যখন সর্বহারা নেতৃত্বে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা বলেন, তখন তা কি একটা নির্ভেজাল ভণ্ডামি হয়ে দাঁড়ায় না? অথচ তিনিই আবার

৩ অবশ্য জাতীয় বুর্জোয়ারা সাময়িকভাবে প্রতিক্রিয়াশীল পথে পা বাড়ালেও রাষ্ট্রক্ষমতার অংশ তারা কোনোদিনই পায়নি।

অভিযোগ করেছেন যে 'বুর্জোয়ারা ভূমি-সংস্কার ক'রে ফেলতে পারে' এই ভ্রান্ত চিন্তার বশবর্তী হয়ে চারু মজুমদার সাত-তাড়াতাড়ি বিপ্লব সমাধা করতে চেয়েছিলেন এবং তার ফলে 'বাম' বিচ্যুতির কবলিত হয়েছিলেন: "আমলা মুৎসুদ্দি সামন্ত বুর্জোয়ারা" (এটা আবার কোন জন্তু রে বাবা!) "যদি ভূমিসংস্কার করে তা হলে তো সর্বহারা নেতৃত্বে···গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রয়োজন নেই বলতে হয় এবং 'শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব' তত্ত্ব সঠিক হয়ে দেখা দেয়।" না, জনাব! চারু মজুমদারের এই চিন্তা শান্তিপূর্ণ উত্তরণের তত্ত্বের জন্ম দেয়নি, বরং বাম-হঠকারী প্রয়াসের জন্ম দিয়েছিল। ওই একই চিন্তা আপনার লেখাতেই বরং জঘন্য সংশোধনবাদী লাইন প্রসব করেছে। কেননা জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্যের জন্য আপনার ওকালতির অর্থ শেষ পর্যন্ত যা দাঁড়াল তা হল একটি জাতীয়-বুর্জোয়া সরকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, তাকেই চাপ ও মদত দিয়ে জাতীয়-গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করার মহান সংগ্রাম এবং দৃঢ়তার সঙ্গে বুর্জোয়াদের পেছন পেছন হাঁটা—বিশেষ ক'রে আপনারা যখন ব'লেই দিয়েছেন, বুর্জোয়ারা ক্ষমতায় না থাকলে বাংলাদেশে ভূমিবিপ্লব সম্ভব নয়।

কোনো রকম বুর্জোয়া সরকারের জন্যই কমিউনিস্টরা "আওয়াজ" তুলতে পারে না। তবে আমরা ক্ষমতা দখল করার আগেই যদি বর্তমান সরকারের তুলনায় আমাদের পক্ষে অধিকতর সুবিধাজনক কোনো সরকার আসার অবস্থা বাস্তবে উদ্ভূত হয়, তখন আমরা দ্বিমুখী পলিসি অবলম্বন করব। একদিকে যেমন তার গদীদখলকে আমরা সমর্থন করব, অন্যদিকে **সেই সরকারের কাছে** এমন কোনো দাবী আমরা তুলব না যার ফলে এ মোহের সৃষ্টি হয় যে এই সরকারকে দিয়ে সত্যি বুঝি জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের মৌলিক সমস্যাবলীর সমাধান সম্ভব। **সীমাবদ্ধ** কয়েকটি দাবী (যেমন ধরুন রাজবন্দীদের মুক্তি) আমরা তার কাছ থেকে আদায় ক'রে নেওয়ার চেষ্টা করব এবং আমাদের মৌলিক সামাজিক দাবীগুলি নিয়ে আমরা এগিয়ে যাব সেই সরকারকে সময়মতো উৎখাত ক'রে **জনগণতান্ত্রিক একনায়কত্ব** অর্জন করার পথে[৪]।

জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্যের সপক্ষে জহির হোসেনের আরেকটি যুক্তি হল: "···সামন্তশ্রেণীর বিরুদ্ধে যে কোনো ধরনের বিপ্লবী সংগ্রামই দমনের জন্য রাষ্ট্রযন্ত্র ঝাঁপিয়ে পড়ে।" তা, সব জায়গাতেই তো শোষিতের সংগ্রাম দমনের জন্য রাষ্ট্রযন্ত্র ঝাঁপিয়ে পড়ে, কিন্তু তার সঙ্গে জাতীয় দ্বন্দ্বের কি সম্পর্ক? দীর্ঘ সময়

৪ [প্রচলিত সমাজব্যবস্থার মধ্যে ক্ষমতাসীন শাসকশ্রেণীর দ্বারা যেসব সামাজিক কর্তব্য সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়, কমিউনিস্টরা যে সেগুলিকে দাবী হিসাবে উত্থাপন করে না তা নয়—বরং উল্টো। কিন্তু এই রকম ক্ষেত্রে তারা সর্বদাই সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ ক'রে দেয় যে এই জরুরী দাবীগুলি পূরণের জন্যই প্রচলিত সমাজব্যবস্থা তথা ক্ষমতাসীন শাসকশ্রেণীর বিপ্লবী উচ্ছেদ অপরিহার্য।]

মাথা খাটিয়েও আমি এই অদ্ভুত যুক্তিটার মাথামুণ্ডু কিছু উদ্ধার করতে পারিনি। অবশেষে মনে হল, কিছুটা যেন হদিশ পেলাম আলাউদ্দীন সাহেবের 'আমার কথা'য়: "আধা-ঔপনিবেশিক দেশে কৃষকের এই যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদের পুতুল সরকারের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হয়।" অর্থাৎ যে রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে সংঘাত লাগে তা যেহেতু সাম্রাজ্যবাদের "পুতুল", তাই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধটাও জাতীয় যুদ্ধ। চমৎকার! কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে আধা-উপনিবেশের সরকার কখনও পুতুল সরকার হয় না, আর যে দেশে পুতুল সরকার ক্ষমতাসীন সে দেশ কখনও আধা-উপনিবেশ হতে পারে না, তা উপনিবেশই। এই প্রাথমিক জ্ঞানটুকু তাঁদের মাথায় জায়গা পায়নি ব'লেই বাংলাদেশের বিপ্লবী সংগ্রামের চরিত্র নির্ধারণ করতে গিয়ে তাঁরা জাতীয় যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ, জাতীয় দ্বন্দ্ব, সামন্ত দ্বন্দ্ব ইত্যাদি সব তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। আলাউদ্দীন সাহেব একবার বলছেন যে "কৃষকদের এই বিপ্লবী লড়াইয়ের প্রধান লক্ষ্য বিদেশী শক্তি ও তার তাঁবেদার সরকার", আবার বলছেন যে "এটা গৃহ-যুদ্ধ এই অর্থে যে এখন পর্যন্ত আভ্যন্তরীণ শক্তিকেই (মুৎসুদ্দি-বুর্জোয়া ও সামন্ত-শ্রেণীকে) এই লড়াই আঘাত হানছে।" তাহলে প্রধান লক্ষ্য কোনটা? "বিদেশী শক্তি ও তার তাঁবেদার সরকার"? —সেক্ষেত্রে যা হয় তা হল জাতীয় যুদ্ধ। নাকি আভ্যন্তরীণ কোনো শ্রেণী?—সেক্ষেত্রে তা গৃহযুদ্ধ ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। নাকি উপনিবেশের কমিউনিস্টরা যেভাবে সংস্কারবাদী জাতীয়তা-বাদের বিরোধিতা ক'রে শ্রেণীসংগ্রামের ভিত্তিতেই জাতীয় যুদ্ধ গ'ড়ে তোলার লক্ষ্যে এগিয়ে যায়, তার কথাই তিনি বলছেন?—কিন্তু তাহলে আর "আধা-উপনিবেশ" বলার এই ছলনা কেন?

আধা-ঔপনিবেশিক দেশে তাঁরা কেন জাতীয় দ্বন্দ্বকে প্রধান মনে করছেন, সে প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গেলে হয় পাওয়া যাবে "পুতুল সরকারে"র যুক্তি, আর না হয় পাওয়া যাবে রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে ভয়ানক জাতিগত নিপীড়নের ফিরিস্তি। পুতুল সরকারের যুক্তির অসারতা ও স্ববিরোধ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আমরা কিছুটা আলোচনা করেছি, পরে আরো আসবে। আর জাতিগত নিপীড়ন সম্বন্ধে এটাই বলতে হয় যে আধা-উপনিবেশে জাতিগত নিপীড়ন সব সময়েই থাকে, তা গৃহযুদ্ধের পর্যায়েই হোক আর জাতীয় যুদ্ধের পর্যায়েই হোক। কিন্তু সেই জাতিগত নিপীড়ন ঠিক কতখানি 'ভয়ানক' হলে পরে জাতীয় যুদ্ধের পর্যায় শুরু হবে তার নিশ্চয়ই একটা সুস্পষ্ট মাপকাঠি ও নিরিখ প্রয়োজন। সে নিরিখ কি মার্কসীয় তত্ত্বে এখনও যথাযথভাবে নিরূপিত হয়নি? মাও কি তার ব্যাখ্যা দেননি? জা[illegible] ঘোষকরা কি সে ব্যাখ্যাকে আজকের পরিস্থিতিতে অচল বা অপ্রতুল ব'লে [illegible]ন? যদি তাই হয় তবে তাঁরা মাওয়ের সিদ্ধান্তকে [illegible]ভাবে তুলে ধ'রে [illegible]গুন বা

সংশোধন বা পরিবর্ধন করছেন না কেন? মার্কসবাদের একটি প্রতিষ্ঠিত বক্তব্যকে এইভাবে কূটনৈতিক কায়দায় পাশ কাটিয়ে যাবার হীন প্রবৃত্তিটাকে কি নাম দেওয়া যায় মার্কসবাদীদের তা ভালো ক'রে ভেবে দেখতে হবে।

৩. বাংলাদেশ সম্বন্ধে এক বিদেশী বন্ধুর প্রেসক্রিপশন

'বাংলাদেশ রিভিউ' (লণ্ডন, নভেম্বর ১৯৭২)-তে জর্জ টমসন 'বাংলাদেশের সমাজের প্রধান দ্বন্দ্ব' সম্বন্ধে একটি আলোচনা করেছেন। তাঁর মতামত যদি এ অঞ্চলের মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের গভীরভাবে প্রভাবিত ক'রে থাকে তবে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। তাই তাঁর সম্পূর্ণ বক্তব্যটি নিচে তর্জমা ক'রে দিলাম।

"বাংলাদেশের প্রধান দ্বন্দ্বরত শ্রেণীগুলি হল, একদিকে সর্বহারাশ্রেণী ও কৃষক এবং অন্যদিকে সামন্ত ভূস্বামী ও মুৎসুদ্দি পুঁজিপতিরা। এখানেই তাহলে প্রধান দ্বন্দ্বটি রয়েছে। কিন্তু সামন্ত ভূস্বামী ও মুৎসুদ্দি পুঁজিপতিরা তাদের অস্তিত্বের জন্য ভারত সরকারের সমর্থনের উপর নির্ভর করে, সে সরকার সে দেশের সামন্ত ভূস্বামী ও মুৎসুদ্দিদের প্রতিনিধিত্বকারী, এবং তারা আবার নিভরশীল সাম্রাজ্যবাদের উপর—বৃটিশ, মার্কিন এবং ইদানীং সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের উপর। আমার তাই মনে হয় যে বাংলাদেশে প্রধান দ্বন্দ্বটি রয়েছে, একদিকে সর্বহারা শ্রেণী ও কৃষক এবং অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদ, এই দুইয়ের মধ্যে।"

তারপর তিনি মাওয়ের একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন:

"অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ ও আধা-ঔপনিবেশিক চীনে জমিদারশ্রেণী ও মুৎসুদ্দিশ্রেণী হল পুরোপুরিভাবে আন্তর্জাতিক বুর্জোয়াশ্রেণীর লেজুড় এবং বেঁচে থাকা ও বিকশিত হওয়ার জন্য তার উপর নির্ভরশীল।"

এ থেকে তিনি সিদ্ধান্ত টানলেন:

"এটা যদি গ্রহণ করা হয় তবে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রধান শত্রু সামন্ত ভূস্বামী ও মুৎসুদ্দি পুঁজিপতি উভয়ের দ্বারাই গঠিত—এটা কিংবা ওটা নয়, দুটোই। কৃষকদের মধ্যে কাজ করার সময় কমরেডরা স্বভাবতই তাদের সঙ্গে জমিদারদের দ্বন্দ্বের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেবেন আর শহুরে সর্বহারাদের মধ্যে কাজ করার সময় মনোযোগ দেবেন তাদের সঙ্গে মুৎসুদ্দিদের দ্বন্দ্বের প্রতি, কিন্তু এদের কোনোটাই প্রধান দ্বন্দ্ব নয়।"

হ্যাঁ, এ রকমই একটা ভ্রান্ত, অসাধু ও ছেঁদো যুক্তি এল জর্জ টমসনের কাছ থেকে!

এত যত্নের সঙ্গে মাও থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি প্রধান দ্বন্দ্ব নির্ধারণ করলেন, কিন্তু মাও যেভাবে তাঁর 'দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে' লেখায় আধা-ঔপনিবেশিক আধা-

সামন্তবাদী সমাজে প্রধান দ্বন্দ্ব নির্ধারণ করতে বলেছেন সেই আসল বস্তুটি সম্বন্ধে তিনি এত রহস্যজনকভাবে নীরব কেন ? বাংলাদেশকে তিনিও আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্তবাদী মনে করেন, কারণ তা না হলে চীনের উদাহরণ তিনি দিতেন না। কিন্তু প্রধান দ্বন্দ্বের এ কেমন সূত্রায়ণ তিনি করলেন ? আমরা আগেই দেখেছি, উপনিবেশ বা আধা-উপনিবেশে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে মৌলিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকে সমগ্র জাতি বা দেশ—কেবল জনগণ নয়, কেবল শ্রমিক-কৃষক তো নয়ই। টমসন সাহেব একদিকে জাতীয় দ্বন্দ্বকে প্রধান করার দক্ষিণ-সুবিধাবাদী ভুল করেছেন, অন্যদিকে করেছেন সংগ্রামী শক্তির পরিধিকে সর্বনিম্ন মাত্রায় সংকুচিত ক'রে আনার বাম-সংকীর্ণতাবাদী ভুল। তাছাড়া আধা উপনিবেশের শাসকশ্রেণী সর্বদাই নিজেদের অস্তিত্ব ও বিকাশের জন্য সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল। কাজেই এটা যদি জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান হওয়ার কারণ হয় তাহলে তো মানতে হয় যে আধা-উপনিবেশে সর্বদাই জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান। কিন্তু তাহলে আধা-ঔপনিবেশিক চীনে কখনও সামন্ত দ্বন্দ্ব, কখনও জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান হত কেমন ক'রে ? আসলে, প্রধান দ্বন্দ্ব নির্ধারণের জন্য মাওয়ের দেওয়া নিরিখগুলি চেপে গিয়ে নিজের উদ্ভাবিত একটি উদ্ভট নিরিখ তিনি এখানে চালিয়ে দিতে চেয়েছেন। সবচেয়ে মজার কথা এই যে, মাওয়ের যে উক্তির উপর নির্ভর ক'রে তিনি বাংলাদেশে জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য "প্রমাণ" করলেন, সেই উক্তিটি কবেকার ? ১৯২৬ সালের। তখন চীনে কোন দ্বন্দ্বটি প্রধান ছিল ? সামন্ত দ্বন্দ্ব (মাওয়ের 'দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে' দ্রষ্টব্য)! অতএব মাওয়ের যে উদ্ধৃতি তিনি দিয়েছেন তার সম্বন্ধে একটা কথাই বলা যায়: "এটা যদি গ্রহণ করা হয়", তবে তা তাঁর বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করে না, বরং খণ্ডনই করে—টমসন সাহেব নিজেই নিজেকে সমূলে উচ্ছেদ ক'রে ছেড়েছেন। জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকরা, আরো একটা বিষয় খেয়াল করুন! যারা "পুরোপুরিভাবে আন্তর্জাতিক বুর্জোয়াশ্রেণীর লেজুড়", তাদের শাসিত একটি দেশ হয়েও চীন উপনিবেশ ছিল না, তা ছিল আধা-উপনিবেশ—যেখানে বিশেষ কারণ না থাকলে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বই প্রধান হয়। এ সম্বন্ধে মাওয়ের অতি প্রাঞ্জল ও স্পষ্ট বক্তব্য হয় আপনারা বোঝেন না, আর না হয় তা উদ্দেশ্যমূলকভাবে চেপে যান। তবে 'মার্কস থেকে মাও' পর্যন্ত সবগুলি উদ্ধৃতি যাঁর কণ্ঠস্থ, সেই টমসন সাহেবকে অবশ্য আমরা কোনোমতেই না জানা বা না বোঝার অপবাদ দিতে পারি না।

৪. ভারতের মার্কসীয় সাহিত্য থেকে

ভারতের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সাহিত্য থেকে জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য

ঘোষণার নমুনা খুব বেশী সংগ্রহ করতে আমরা পারিনি[৫]। তবে ভারতকে নয়া-উপনিবেশ (=উপনিবেশের অর্থে) মনে করা এবং সেখানে জাতীয় দ্বন্দ্বকে প্রধান মনে করার ঝোঁকটা সেই দেশে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ব'লেই মনে হয়। অবশ্য ভারতীয় মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের মধ্যে যাঁরা বাংলাদেশকে নয়া-উপনিবেশ মনে করেন ও বাংলাদেশে জাতীয় দ্বন্দ্বকে বর্তমানে প্রধান ধরেন তাঁদের সংখ্যা খুব কম নয়।

১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে চারু মজুমদার বাংলাদেশকে সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের দখলীকৃত একটি নয়া-উপনিবেশ ব'লে মূল্যায়ন করেছিলেন এবং রুশ-ভারত জোটের সঙ্গে জাতীয় দ্বন্দ্বকেই বাংলাদেশের প্রধান দ্বন্দ্ব ব'লে নির্দেশ করেছিলেন। সি পি আই (এম-এল)এর "কেন্দ্রীয় সংগঠনী কমিটি" নামের দাবীদার একটি গোষ্ঠী ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে বাংলাদেশকে বর্ণনা করেছেন এমন এক দেশ ব'লে "যাকে সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের সেবাদাস ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের সহায়তায় এক নূতন ধরনের উপনিবেশে পরিণত করেছে···।" কিন্তু এই সমস্ত বক্তব্যের যুক্তি বা যুক্তিহীনতার সঙ্গে পূর্বে-আলোচিত বাংলাদেশী ও বিলেতী বক্তব্যগুলির যুক্তি বা যুক্তিহীনতার বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। কেননা বাংলাদেশ সৃষ্টির পেছনে রাশিয়া ও ভারত যে ভূমিকা পালন করেছিল তাতে বাংলাদেশের ঔপনিবেশিক বা নয়া-ঔপনিবেশিক অবস্থা **কোনো রকমেই** প্রমাণিত হয় না—অর্থাৎ এ কথা প্রমাণিত হয় না যে বাংলাদেশে বর্তমানে **দেশীয় কোনো শ্রেণী** (তা যত আত্মসমর্পণকারীই হোক) রাষ্ট্রক্ষমতায় নেই।

ভারতকে যাঁরা নয়া-উপনিবেশ মনে করেন তাঁদের হালটাও তাঁদের বাংলাদেশী ভায়রাদের থেকে খুব একটা ভালো ব'লে মনে হয় না। যেমন 'পূর্বতরঙ্গ' (১০ আগস্ট ১৯৪৭) পত্রিকায় জনৈক পাঠক একদিকে স্বীকার করেছেন যে ১৯৪৭ সালে সাম্রাজ্যবাদের সেবাদাসদের হাতে **ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছিল,** অন্যদিকে তিনিই আবার দাবী করেছেন যে "ভারত বর্তমানে সম্পূর্ণতই বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত" একটি "নয়া-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র"। ভ্রান্ত তত্ত্বের স্ববিরোধিতা কি সব দেশে একই রকম হয়ে থাকে?

'ফ্রন্টিয়ার' পত্রিকায় প্রকাশিত অজিতা নারায়ণনের 'বাম ঐক্য স্থাপন সম্বন্ধে' নামক একটি প্রবন্ধ আমরা 'হলিডে' (ঢাকা, ২৪ নভেম্বর ১৯৭৪)-তে

[৫] এই বইটি লেখা হয়ে যাবার পর আমরা দেখলাম যে ভারতীয় পত্রিকা 'পূর্বতরঙ্গে' (নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৭৪) কিশলয় মিত্রের একটি প্রবন্ধে জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকদের প্রায় সবকটি কুযুক্তিই কেন্দ্রীভূত আকারে সমাবিষ্ট হয়েছে।

পুনর্মুদ্রিত আকারে পড়লাম। সেটাও মাওয়ের প্রাসঙ্গিক তত্ত্ব সম্বন্ধে অসাধু নীরবতা, নানা খোঁড়া যুক্তি ও শোচনীয় স্ববিরোধ দ্বারা চিহ্নিত।

অবশ্য অজিতা দেবী কোথাও পরিষ্কারভাবে জাতীয় দ্বন্দ্বকে বর্তমান ভারতের ক্ষেত্রে প্রধান করার কথা বলেননি। বরং তিনি ভারতীয় সমাজের প্রধান দ্বন্দ্বকে যেভাবে সূত্রায়িত করেছেন তাতে, মাওয়ের তত্ত্ব অনুযায়ী, আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব তথা সামন্ত দ্বন্দ্বই প্রধান হয়ে যায়। কিন্তু তিনি সামন্ত দ্বন্দ্বের প্রাধান্য যেভাবে নাকচ ক'রে দিয়েছেন এবং সাম্রাজ্যবাদকে যেভাবে নিরঙ্কুশ গুরুত্ব দিয়েছেন, তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে নিজের সূত্রায়ণের প্রকৃত তাৎপর্য তিনি নিজেই বোঝেননি এবং জাতীয় দ্বন্দ্বকেই তিনি প্রধান করতে চান[৬]।

সি পি আই (এম-এল)এর রাজনৈতিক প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে সামন্ত দ্বন্দ্বই বর্তমানে ভারতে প্রধান। অজিতা দেবীর মতে চীন পার্টি নাকি সেই রাজনৈতিক প্রস্তাব প্রচার করার সময় সামন্ত দ্বন্দ্ব-সংক্রান্ত অংশটিকে বাদ দিয়ে আসলে সেটিকে খারিজ করারই ইঙ্গিত দিয়েছিল। অথচ অজিতা দেবী নিশ্চয়ই জানেন, সেই চীন পার্টিই 'পিকিং রিভিউ'তে শ্রীকাকুলামের একটি রিপোর্ট ছেপেছিল, যাতে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছিল যে জমিদার-কৃষক দ্বন্দ্বই প্রধান। অজিতা দেবীর কাছে সেটা বোধহয় তেমন উপাদেয় লাগেনি, তাই বুঝি তিনি সেটাকে সুযোগমতো ভুলে যেতে চেয়েছেন? রাজনৈতিক প্রস্তাব থেকে প্রধান দ্বন্দ্ব-সংক্রান্ত অংশ বাদ দেওয়ার মধ্য দিয়ে চীন পার্টির বিরোধিতা প্রমাণ হয় না, বড় জোর এটুকু প্রমাণ হতে পারে যে এ প্রশ্নে তাঁরা নিরপেক্ষ থাকতে চেয়েছেন। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, চীন পার্টির প্রতিটি হাঁচি-কাশির উপর এই নাবালিকা-সুলভ নির্ভরতা কেন? আমরা তো আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে প্রধান প্রমাণ করার জন্য 'পিকিং রিভিউ'তে মুদ্রিত শ্রীকাকুলামের রিপোর্ট উল্লেখ করিনি, কেননা তার দ্বারা বিজ্ঞানের জগতে কিছুই প্রমাণিত হয় না। আমরা আমাদের বক্তব্যের সপক্ষে নিজস্ব যুক্তি রাখছি, তাঁরা অনর্থক চীন পার্টির পেছনে ছুটে মরছেন কেন? আসলে চীন পার্টি নিজেই যে "আন্তর্জাতিক নেতৃত্বে"র ঘোর বিরোধী, তাঁরা তলে তলে তাতেই বিশ্বাসী।

অজিতা দেবীর মতে ভারতের মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা সামন্ত দ্বন্দ্বকে প্রধান করেছিলেন ব'লেই যত 'বাম' বিচ্যুতির শিকার হয়েছিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, এত বড় কথাটা তিনি বললেন, কিন্তু আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে প্রধান ধরার সঙ্গে তাঁদের 'বাম' বিচ্যুতির **কার্যকারণ-সম্পর্ক** উদ্‌ঘাটন ক'রে দেখানোর

৬ [অবশ্য পরে বুঝতে পারলাম যে অজিতা দেবী আসলে মৌলিক দ্বন্দ্বদুটির বহির্ভূত তৃতীয় একটি দ্বন্দ্ব—সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় শাসকশ্রেণীগুলির জোটের সঙ্গে জনগণের দ্বন্দ্ব—প্রধান করার পক্ষপাতী। কিন্তু উপরোক্ত অনুচ্ছেদে উপস্থাপিত প্রত্যেকটি বক্তব্য যে তা সত্ত্বেও অটুট থাকে তা পাঠক পরে দেখতে পাবেন।]

তোয়াক্কা তিনি করলেন না। যেন তাঁর বলাটাই একটা প্রমাণ! তাঁর বাংলাদেশী জ্ঞাতিরাও যে একই পন্থায় বিশ্বাসী, এটা কি একটা কাকতালীয় ব্যাপার? যাহোক, সে কার্যকারণ-সম্পর্ক তাঁরা উদ্‌ঘাটন না করলেও আমরা কিন্তু আমাদের অতীত 'বাম' বিচ্যুতিগুলির সঙ্গে তাঁদের বর্তমান "জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান" ঘোষণার এবং তার সঙ্গে আবার তাঁদের সংশোধনবাদী চিন্তার কার্যকারণ-সম্পর্ক ইতিমধ্যেই সাধ্যমতো বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছি।

অজিতা দেবীর মতে ভারতবর্ষে সামন্ত দ্বন্দ্ব প্রধান ছিল একমাত্র বৃটিশ রাজত্বের আগে। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত তা নাকি আগাগোড়া অপ্রধান হয়ে থেকেছে। কিন্তু কেন? আবারও, তাঁর বলাটাই তো একটা প্রমাণ! ব্যাখ্যা দেওয়ার একটা আবছা চেষ্টা অবশ্য তিনি করেছেন—এই সমগ্র সময়কালটা ধ'রে নাকি "সাম্রাজ্যবাদই সক্রিয় উপাদান ছিল", আর সামন্তবাদ "রণক্ষেত্রে তার পরাজয়ের পর" একটা নিছক "অক্রিয়" ভূমিকা, "সাম্রাজ্যবাদের প্রতি একটা নিছক অধস্তন ও দাসত্বমূলক ভূমিকা" পালন করেছে। তা সত্য কিনা সে কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু এগুলো কি প্রধান দ্বন্দ্ব নির্ধারণের মাও-নির্দেশিত নিরিখ? পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখব যে নিরিখ হিসাবে এগুলো ভ্রান্তও বটে।

অজিতা দেবী বলছেন: বর্তমান ভারতে প্রধান দ্বন্দ্বের একদিকে রয়েছে দুই অতিশক্তি (যাদের মধ্যে প্রাধান্যে রয়েছে সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ) ও তাদের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ ভারতীয় শাসকচক্র (যাদের মধ্যে সি পি আই ও সি পি এম নেতৃত্বও অন্তর্ভুক্ত) এবং অন্যদিকে রয়েছে ভারতীয় জনগণ অর্থাৎ শ্রমিক, কৃষক, শহুরে পেটি বুর্জোয়া, জাতীয় বুর্জোয়া ও এমন কি দ্বিতীয় দুনিয়ার পুঁজিবাদী দেশগুলোর প্রতিনিধিত্বকারী মুৎসুদ্দিরা। এই সূত্রায়ণের নানা বিদঘুটে দিক আপাতত বাদ দিলে তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম যা দাঁড়ায় তা হল, বর্তমান ভারতে সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের[৭] আঁতাতের সঙ্গে ভারতীয় জনগণের দ্বন্দ্বই প্রধান। কিন্তু শ্রেণীশক্তির মেরু-বিন্যাস ঠিক এই রকমই দাঁড়িয়েছিল চীনে ১৯২৭ সালের কু দে'তার পরে (মাওয়ের 'দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে' দ্রষ্টব্য), তবু সেখানে তখন জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান হয়নি, প্রধান ছিল আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব তথা সামন্ত দ্বন্দ্বই।

৫. কয়েকটি সিদ্ধান্ত

নানা দেশের জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকদের বক্তব্যের এই ক্লান্তিকর পরীক্ষাকর্ম থেকে আমরা এবার সমস্যাটিকে উত্থাপন ও আলোচনা করার ক্ষেত্রে

৭ যাদের মধ্যে তিনি আমলা-মুৎসুদ্দি বৃহৎ বুর্জোয়া ও বৃহৎ জমিদারশ্রেণীকে ফেলেছেন।

তাঁদের অবলম্বিত পদ্ধতি ও তার দুষ্ট পরিণতি সম্বন্ধে কয়েকটি সাধারণ সিদ্ধান্ত টানতে পারি :

(ক) এঁরা কেউই ১৯৪৭এর পরবর্তী পর্যায়ের ভারত ও পাকিস্তানের সমাজ-সম্বন্ধে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠিত বক্তব্য খণ্ডন করেননি, সংশোধন করেননি, উল্লেখ পর্যন্ত করেননি। তার পরিবর্তে তাঁরা তাকে সযত্নে পাশ কাটিয়ে গেছেন এবং বিনা যুক্তিতর্কে যে যার মনগড়া সমাজ-চরিত্রের ধারণা বিপ্লবীদের চিন্তায় চোরাপথে ঢুকিয়ে দিতে চেয়েছেন। এটা আর যা-ই হোক সত্যসন্ধানের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নয় – নিজেদের পছন্দসই বক্তব্য গছিয়ে দেওয়ার অপকৌশল মাত্র।

(খ) এঁরা কেউই 'উপনিবেশ', 'আধা-উপনিবেশ' ইত্যাদি বর্গগুলির মার্কসীয় সংজ্ঞা খণ্ডন করেননি, সংশোধন করেননি, উল্লেখ পর্যন্ত করেননি। তার পরিবর্তে তাঁরা সেগুলিকে সযত্নে পাশ কাটিয়ে গেছেন এবং বিনা যুক্তিতর্কে যে যার মনগড়া সংজ্ঞা বিপ্লবীদের চিন্তায় চোরাপথে ঢুকিয়ে দিতে চেয়েছেন [এবং সেগুলিকে নানা মার্কসীয় সিদ্ধান্ত ও সংজ্ঞার সঙ্গে সম্পর্কিত ক'রে নিজেদের ঈপ্সিত সিদ্ধান্ত উপপাদন করেছেন]। এটাও আর যা-ই হোক, সত্যসন্ধানের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নয় – নিজেদের পছন্দসই বক্তব্য গছিয়ে দেওয়ার অপকৌশল মাত্র।

(গ) এঁরা কেউই শেষ পর্যন্ত অস্বীকার করতে পারেননি যে উপমহাদেশের দেশগুলিতে আমলা-মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও জমিদারশ্রেণীর প্রতিনিধিরাই শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। কিন্তু তার দ্বারা যে আসলে এসব দেশের আধা-ঔপনিবেশিক চরিত্রই মার্কসবাদ অনুযায়ী প্রমাণ হয়ে যায়, "নতুন ধরনের উপনিবেশ", "পুতুল সরকার" ইত্যাদি সব তত্ত্বই নাকচ হয়ে যায় এবং বিশেষ কারণ ছাড়া সাধারণভাবে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বই প্রধান থাকে – এই সমস্যার তাঁরা উল্লেখ করেননি, ফয়সালা তো নয়ই। তার পরিবর্তে তাঁরা তাকে সযত্নে পাশ কাটিয়ে গেছেন এবং বিনা যুক্তিতর্কে যে যার নিজের মনগড়া মূল্যায়ন বিপ্লবীদের চিন্তায় চোরাপথে ঢুকিয়ে দিতে চেয়েছেন। এটাও আর যা-ই হোক, সত্যসন্ধানের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নয় – নিজেদের পছন্দসই বক্তব্য গছিয়ে দেওয়ার অপকৌশল মাত্র।

(ঘ) দ্বন্দ্বতত্ত্বের ক্ষেত্রে প্রধান দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে এমন স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ ধারণা মাওয়েরই অবদান, বিশেষত আমাদের মতো পশ্চাৎপদ সমাজগুলিতে প্রধান দ্বন্দ্ব নিরূপণের পদ্ধতিটি তিনিই প্রথম নির্ধারণ করেন। জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকরা প্রধান দ্বন্দ্ব বের করতে বসেছেন, কিন্তু এঁরা কেউই সেই প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব খণ্ডন করেননি, সংশোধন করেননি, উল্লেখ পর্যন্ত করেননি। তার পরিবর্তে তাঁরা তাকে সযত্নে পাশ কাটিয়ে গেছেন এবং বিনা যুক্তিতর্কে যে যার নিজের মনগড়া প্রধান দ্বন্দ্ব বিপ্লবীদের চিন্তায় চোরাপথে ঢুকিয়ে দিতে চেয়েছেন। এটাও আর যা-ই হোক

সত্যসন্ধানের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নয় – নিজেদের পছন্দসই বক্তব্য গছিয়ে দেওয়ার অপকৌশল মাত্র।

(ঙ) আমাদের সমাজে কখনোই জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান হতে পারবে না এ কথা ঠিক নয়। কিন্তু বর্তমানে যেভাবে জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য দাবী করা হচ্ছে, এমন কি যে পদ্ধতিতে সমস্যাটিকে উত্থাপন করা হচ্ছে, তাতে সন্দেহ থাকে না যে এই বক্তব্য একটি দক্ষিণ-সুবিধাবাদী প্রতিকূল স্রোত, যার অন্তর্বস্তুতে অজ্ঞতা ও প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নেই। সবচেয়ে বড কথা, তা আজ একটি শক্তিশালী আন্তর্জাতিক ঝোঁকে পরিণত হতে চলেছে।

৩

কতগুলি বর্গের সংজ্ঞা ও অন্তঃসম্পর্ক

জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকরা 'উপনিবেশ', 'আধা-উপনিবেশ', 'নয়া-উপনিবেশ' ইত্যাদি কতগুলি বুনিয়াদী বর্গের (categ r y র) অর্থে যে পরিপূর্ণ নৈরাজ্যের সৃষ্টি করেছেন এবং তার ফলে যে অনপনেয় আত্মখণ্ডন ও পরস্পরবিরোধিতায় জড়িয়ে পড়েছেন তার কিছু নমুনা আমরা আগের অধ্যায়ে তুলে ধরেছি। আলোচনাসূত্রে নিজেদের কিছু কিছু প্রাসঙ্গিক মতও খণ্ডে খণ্ডে তখন আমরা ব্যক্ত করেছি। এবার সেই মৌলিক বর্গগুলির সংজ্ঞা ও অন্তঃসম্পর্ককে মার্কসবাদের আলোকে সুসংবদ্ধ আকারে প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। কিঞ্চিৎ পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা থাকলেও এটার প্রয়োজন আছে ব'লেই আমাদের মনে হয়।

১ উপনিবেশবাদ ও উপনিবেশ

প্রথমেই বলা দরকার যে 'উপনিবেশ' বর্গটি পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর 'সাম্রাজ্যবাদ' বর্গটির সঙ্গে আবশ্যিকভাবে যুক্ত নয়, কেননা:

(ক) কোনো একটি দেশ সাম্রাজ্যবাদী না হলেও তার উপনিবেশ থাকতে পারে, যদি সে অন্য দেশ বা জাতিকে (বা তার অংশবিশেষকে) বলপূর্বক প্রত্যক্ষভাবে নিজের পদানত করে। পুঁজিবাদের উদ্ভবের পূর্বেও উপনিবেশ ছিল, যেমন রোমের। পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হওয়ার পূর্বেও উপনিবেশ ছিল, যেমন উনবিংশ শতাব্দীতে বৃটেনের উপনিবেশ ছিল ভারত। আবার একটি আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্তবাদী দেশেরও উপনিবেশ থাকতে পারে, যেমন চীনের উপনিবেশ ছিল কোরিয়া (এডগার স্নো-র প্রতি মাওয়ের উক্তি দ্রষ্টব্য: 'চীনের আকাশে লাল তারা'), কিংবা ধরুন এই খবর: "চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র পীপলস ডেইলী এক নিবন্ধে ৩রা জুলাই (১৯৭৪) অভিযোগ করেছে যে…ভারতের উদ্দেশ্য হল সিকিমকে তার স্বাধীনতার অধিকার থেকে বঞ্চিত ক'রে ভারতের একটি উপনিবেশে পরিণত করা" ('লালতারা', কলকাতা, ৭ জুলাই ১৯৭৪)।

খ) কোনো সাম্রাজ্যবাদী শক্তি অন্য দেশে শোষণ ও নিপীড়ন চালালেও

সে দেশটি তার উপনিবেশ না হতে পারে : যখন সে অন্য দেশ ও জাতিকে বলপূর্বক প্রত্যক্ষভাবে পদানত করে একমাত্র তখনই সেটা তার উপনিবেশ হয়। আজকের বৃটেন এবং অতীতের চীন ও ভারত এই তিনটিতেই আমরা বৈদেশিক শোষণ ও নিপীড়ন দেখি ; তবু বৃটেন এখনও স্বাধীন দেশ, চীন ছিল আধা-উপনিবেশ আর ভারত ছিল বৃটিশ উপনিবেশ।

এইসব প্রাথমিক সত্য না জানার ফলেই বিভিন্ন বিচ্যুতির উদ্ভব ঘটে। 'পূর্ববাংলা পাকিস্তানের উপনিবেশ ছিল', 'বাংলাদেশ আজ ভারতের উপনিবেশ' —এইসব ভ্রান্ত বক্তব্যকে ভ্রান্ত যুক্তি দ্বারাই খণ্ডন করার চেষ্টা করা হয়, বলা হয় : ভারত ও পাকিস্তান নিজেরাই আধা-উপনিবেশ, তাদের আবার উপনিবেশ থাকে কেমন ক'রে ? আসলে পূর্ববাংলা পাকিস্তানের উপনিবেশ ছিল না এই কারণে যে পূর্ব-পাকিস্তানকে পশ্চিম-পাকিস্তান কখনও জোর ক'রে দখল ক'রে নেয়নি (অবশ্য তার মানে এই নয় যে পূর্ববাংলার উপর জাতিগত নিপীড়ন ছিল না)। আর বাংলাদেশও ভারতের উপনিবেশ নয় একই কারণে, অর্থাৎ যেহেতু ভারত তাকে প্রত্যক্ষভাবে পদানত ক'রে রাখেনি। ভারত ও পাকিস্তানের নিজস্ব সমাজ-চরিত্রের প্রশ্ন এক্ষেত্রে একেবারেই অবান্তর।

একই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে উল্টো দিক থেকে আবার আরেক ধরনের ভ্রান্ত বক্তব্যও উত্থাপন করা হয়। সেটা এই রকম। যেহেতু অন্য দেশ দখল করার প্রবণতা ভারতের রয়েছে (সে প্রবণতা কোথায় কতদূর সাফল্যলাভ করতে পেরেছে তা ভিন্ন কথা) এবং যেহেতু তা সাম্রাজ্যবাদী দেশেরই বৈশিষ্ট্য সেহেতু ভারত একটি সাম্রাজ্যবাদী দেশ। জাল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের এই ফেরীওয়ালারা ভুলে যান যে পুঁজিবাদের যুগে 'সাম্রাজ্যবাদী' বর্গটির একটি নির্দিষ্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক অর্থ আছে। ভারতে সমগ্র সামাজিক সম্পর্কের পরিপূর্ণ পুঁজিবাদী রূপান্তর ঘটেনি ; একটা সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে সেখানে বৃহৎ শিল্প স্থাপিত হয়েছে (যা বহুলাংশে উপর থেকে চাপানো) এবং এই ধরনের সংকীর্ণ সীমায় সে পুঁজি দ্রুত একচেটিয়া চরিত্র অর্জন করতে বাধ্য। এই একচেটিয়া পুঁজি সমগ্র সমাজব্যবস্থার পুঁজিবাদী রূপান্তরের ফল নয়, তার তলায় পরিপূর্ণ ও ব্যাপক পুঁজিবাদের ভিত্তি নেই। তাই সব বৃহৎ পুঁজির নিয়মানুযায়ী ভারতের আমলা-মুৎসুদ্দি পুঁজিও সম্প্রসারণকামী হলেও স্বাধীনভাবে তার 'সাম্রাজ্যবাদী' হওয়ার শক্তি নেই ; সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যোগসাজশ ক'রে এবং নিজে তার পায়ে আরও আত্মসমর্পণ ক'রে সে 'সম্প্রসারণবাদী' হতে পারে মাত্র।

অবশ্য বর্তমানে আমাদের আলোচ্য বিষয় সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপনিবেশই। অতএব এবার থেকে 'উপনিবেশবাদ' ও 'উপনিবেশ' বর্গদুটিকে আমরা সেই অর্থেই ব্যবহার করব।

'সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর' পুস্তকে লেনিন বলেছেন :"…পৃথিবীর অর্থনৈতিক ভাগাভাগিকে **ভিত্তি** ক'রে পুঁজিবাদী সমিতিগুলির মধ্যে বিশেষ বিশেষ সম্পর্ক গ'ড়ে ওঠে, আর তার সঙ্গে সমান্তরালভাবে ও তার সঙ্গে সংযোগ রেখে, পৃথিবীর ভূখণ্ডগত ভাগাভাগি, উপনিবেশের জন্য লড়াই, প্রভাব-বলয়ের জন্য লড়াইকে ভিত্তি ক'রে রাজনৈতিক মৈত্রীগুলির মধ্যে, রাষ্ট্রগুলির মধ্যে, বিশেষ বিশেষ সম্পর্ক গ'ড়ে ওঠে।" অর্থাৎ ফিনান্স পুঁজির প্রয়োজনে বিভিন্ন রাষ্ট্র তথা রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে ভূখণ্ডগুলির **রাজনৈতিক** ভাগাভাগি তথা দখলই হল উপনিবেশবাদের অন্তর্বস্তু, কেননা "ফিনান্স পুঁজি অবশ্যই অধীনতার এমন একটি **রূপকেই** সবচেয়ে 'সুবিধাজনক' হিসাবে দেখে ও তা থেকে সবচেয়ে বেশী মুনাফা লাভ করে, যাতে অধীন দেশ ও জাতিগুলির রাজনৈতিক স্বাধীনতাহানি জড়িত" (ঐ)।

অতএব সাম্রাজ্যবাদের পরিপ্রেক্ষিতেও 'উপনিবেশ' বর্গটির মূল সংজ্ঞা একই থাকে। তা হল অন্য দেশ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে দখলীকৃত একটি দেশ। 'চীনে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন টিঁকে থাকতে পারে?' প্রবন্ধে মাও উপনিবেশের সংজ্ঞা দিয়েছেন "সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন" দেশ ব'লে। এখানে দুটি বিষয় লক্ষ্যণীয় : সাম্রাজ্যবাদী শাসন এবং প্রত্যক্ষ শাসন। শাসন মানে কি? কোনো শ্রেণীর একনায়কত্ব[1]। অতএব উপনিবেশের অন্তর্বস্তু হল বিদেশী বুর্জোয়ার একনায়কত্ব, আর তার রূপটা হল প্রত্যক্ষ। এবং তার অর্থ : **দেশীয় কোনো শ্রেণীর হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা নেই**। অবশ্য যেকোনো একনায়কত্বই সশস্ত্র আধিপত্য হলেও তাকে টিঁকিয়ে রাখার জন্য একটা সামাজিক ভিত্তি দরকার। তাই বিদেশী বুর্জোয়ারা তাদের ঔপনিবেশিক শাসন টিঁকিয়ে রাখার জন্য নির্ভর করে উপনিবেশের ভিতরেরই কোনো আপোষপরায়ণ শ্রেণীর উপর। এদের তারা নানা রকম কনসেশন দেয় বা এমন কি দিতে বাধ্য হয়, কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতা ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা থেকে যায় সাম্রাজ্যবাদীদেরই হাতে।

ঐতিহাসিকভাবে উপনিবেশের শেষ যে বৈশিষ্ট্যটি এ পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয়েছে তা হল দেশটির উপর কোনো একটিমাত্র সাম্রাজ্যবাদী শক্তির একচেটিয়া অধিকার।

তাহলে, সংক্ষেপে বলতে গেলে, অন্তর্বস্তুর দিক থেকে উপনিবেশের বৈশিষ্ট্য তিনটি : (ক) বিদেশী বুর্জোয়ার হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা, এবং দেশীয় কোনো শ্রেণী বা

১ [বইটা লেখার এই পর্যায় পর্যন্ত 'প্রত্যক্ষ শাসন', 'পরোক্ষ শাসন', 'রাষ্ট্রক্ষমতা' ইত্যাদি ধারণা সম্বন্ধে এবং উপনিবেশ, নয়া-উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশের প্রসঙ্গে সেগুলোর তাৎপর্য সম্বন্ধে আমার চিন্তা যথেষ্ট পরিষ্কার ছিল না। এসব সম্বন্ধে আমার চিন্তা শেষ পর্যন্ত যে স্তরে উপনীত হয় তার পরিচয় পাঠক পাবেন এই বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে 'সম্পাদকের চিঠির জবাবে' লেখাটির মধ্যে।]

গোষ্ঠী যত কনসেশনই লাভ করুক, তাদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা নেই ; (খ) একটি-মাত্র সাম্রাজ্যবাদী শক্তির একচেটিয়া অধিকার, (গ) দেশের মাটিতে বিদেশী পুঁজিবাদের প্রায় একতরফা বিকাশ। রূপের দিক থেকে উপনিবেশের বৈশিষ্ট্য হল প্রত্যক্ষ বিদেশী শাসন।

২. উপনিবেশবাদ ও আধা-উপনিবেশ

অধীন বা নির্ভরশীল দেশগুলির রাজনৈতিক স্বাধীনতা হরণের জন্য ফিনান্স পুঁজির যে অপ্রতিরোধ্য তাগিদ তাকে নগ্ন বলপ্রয়োগের দ্বারা চরিতার্থ ক'রে নেওয়াটাই উপনিবেশবাদের (অর্থাৎ সনাতন উপনিবেশবাদের) কৌশলগত বৈশিষ্ট্য। যেখানে এই লক্ষ্য পুরোপুরিভাবে সিদ্ধ হয়ে যেত সেটা হত উপনিবেশ, যেমন ভারত ছিল বৃটেনের উপনিবেশ। অতএব যেখানে এই লক্ষ্য পুরোপুরি সিদ্ধ হত না সেটাই নিশ্চয় হত আধা-উপনিবেশ, যেমন ছিল চীন। কিন্তু লক্ষ্য করা দরকার যে উভয় ক্ষেত্রেই সাম্রাজ্যবাদের পদ্ধতিটা ছিল একই—নগ্ন বলপ্রয়োগ। অর্থাৎ সনাতন উপনিবেশবাদই কোথাও উপনিবেশের জন্ম দিত, কোথাও আধা-উপনিবেশের—যদিও সাম্রাজ্যবাদের প্রবণতাটা সর্বত্রই পূর্ণ উপনিবেশ অর্জনের দিকে। সনাতন ঔপনিবেশিক কায়দাতেই সাম্রাজ্য-বাদীরা বারংবার প্রত্যক্ষভাবে বলপ্রয়োগ করেছিল চীনের উপর, চীনের দুর্বল ও কাপুরুষ শাসকশ্রেণীকে বাধ্য করেছিল আত্মসমর্পণে, এইভাবে চীনের উপর চাপিয়ে দিয়েছিল নিজেদের পরোক্ষ শাসন ও অর্থনৈতিক প্রভুত্ব এবং চীনকে পরিণত করেছিল আধা-উপনিবেশে। অর্থাৎ আধা-উপনিবেশে বিদেশী শাসনের রূপটা পরোক্ষ হলেও সেই পরোক্ষ শাসনটাকে চাপানো হত, টেঁকানো হত ও জোরদার করা হত প্রত্যক্ষ বলপ্রয়োগ দ্বারা। এইজন্যই মাও একদিকে যেমন চীনে বিভিন্ন বিদেশী হামলা ও আগ্রাসনের তালিকা দিয়েছেন অন্যদিকে তেমনি 'চীনে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন টিঁকে থাকতে পারে?' প্রবন্ধে আধা-ঔপনিবেশিক চীনকে বর্ণনা করেছেন "সাম্রাজ্যবাদের পরোক্ষ শাসনাধীন" দেশ ব'লে।

কিন্তু প্রত্যক্ষ বলপ্রয়োগ দ্বারা শাসন চাপানো হচ্ছে, তবু সে শাসন পরোক্ষ হচ্ছে কেমন ক'রে? সেটা একটিমাত্র উপায়েই সম্ভব। তা হল: দেশীয় কোনো শ্রেণীই নিশ্চয় রাষ্ট্রক্ষমতায় রয়েছে, তা শাসনক্ষমতা থেকে উৎখাত হচ্ছে না, কিন্তু নিজের দুর্বলতা, কাপুরুষতা ও আত্মসমর্পণকারী চরিত্রের জন্য নিজেই সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের বাহক হতে বাধ্য হচ্ছে। আসল ঘটনাও তাই, কারণ মাও বলেছেন: "কুওমিনতাঙ্-এর নতুন যুদ্ধবাজদের বর্তমান শাসনটা শহরে মুৎসুদ্দি শ্রেণীর আর গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় উৎপীড়ক ও অসৎ বড়লোক শ্রেণীর শাসন যা বৈদেশিক ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদের পায়ে আত্মসমর্পণ

করেছে…” (‘চীনে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন টিঁকে থাকতে পারে?’)। অর্থাৎ আধা-উপনিবেশে রাষ্ট্রক্ষমতা দেশীয় শ্রেণীগুলির হাতেই থাকে, যদিও সেই শ্রেণীগুলির চরিত্রই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের পায়ে আত্মসমর্পণ করার চরিত্র—সাম্রাজ্যবাদের নিপীড়ন যতক্ষণ অসামরিক চরিত্রের থাকে, ততক্ষণ তারা তাকে প্রতিরোধ যত না করে তার চেয়ে বরং সেই শোষণ ও নিপীড়নকে নিজেদের জাতির ঘাড়েই চালান ক'রে দেয় এবং সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হয়ে জনগণকে নিপীড়ন করতে থাকে (মাওয়ের ‘দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে’ দ্রষ্টব্য)।

এখানেই রয়েছে উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশের গুণগত পার্থক্য, যাকে গুলিয়ে দিয়ে জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকরা বিশেষ আরাম বোধ করছেন।

সাম্রাজ্যবাদের শোষণ, নিয়ন্ত্রণ ও উৎপীড়ন যত গভীরই হোক, মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও সামন্তশ্রেণী যত আত্মসমর্পণই করুক, রাষ্ট্রক্ষমতা যতক্ষণ দেশীয় কোনো শ্রেণীর হাতে থাকছে ততক্ষণ দেশটিকে আমরা কোনোমতেই উপনিবেশের (বা নয়া-উপনিবেশের) পর্যায়ে ফেলতে পারি না। এইজন্যই লেনিন “শতকরা নব্বইভাগ উপনিবেশ”কেও আধা-উপনিবেশই বলেছেন। এবং এইজন্যই মাও যদিও বলেছেন যে “বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার” (অর্থাৎ চীনের) “জাতীয় স্বাধীনতা নেই” (‘যুদ্ধ ও রণনীতির সমস্যা’), তবু চীনকে তিনি আধা-উপনিবেশ ব'লেই আখ্যায়িত করেছেন (অবশ্য তিনি জাতীয় স্বাধীনতা পুরোপুরি অনুপস্থিত বলতে চাননি, কেননা তিনিই আবার অন্যত্র চীনকে “আধা-স্বাধীন” ব'লে উল্লেখ করেছেন)। অতএব জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকরা যেভাবে নিছক বৈদেশিক নিপীড়নের তীব্রতা ও ব্যাপকতা বর্ণনা ক'রেই উপনিবেশ (বা নয়া-উপনিবেশ) প্রমাণ করার চেষ্টা করেন সেটা ভ্রান্ত ও অবৈজ্ঞানিক।

আধা-উপনিবেশে আভ্যন্তরীণ অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্রগুলি থাকে প্রধানত সাম্রাজ্যবাদীদের দখলে। চীনেও তাই ছিল। শাসকশ্রেণী দেশীয় বাজারে সাম্রাজ্যবাদীদের আধিপত্য মেনে নেয় এবং ছোট শরিক হিসাবে তা তাদের সঙ্গে ভাগাভাগি ক'রে নেয় ও যৌথভাবে জনগণকে লুণ্ঠন করতে থাকে। অবশ্য এরই মধ্যে দেশীয় পুঁজিবাদেরও মন্থর বিকাশ ঘটতে থাকে। অতএব জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকরা যেভাবে নিছক বিদেশী অর্থনৈতিক প্রাধান্য দিয়েই উপনিবেশ (বা নয়া-উপনিবেশ) প্রমাণ করার চেষ্টা করেন সেটাও ভ্রান্ত ও অবৈজ্ঞানিক।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, আধা-উপনিবেশ হল পূর্ণ স্বাধীন ও পূর্ণ পরাধীন (অর্থাৎ ঔপনিবেশিক) অবস্থাদ্বয়ের মধ্যে একটি “মাঝামাঝি পর্যায়”, একটা “উত্তরণশীল রূপ” (লেনিন)।

আধা-উপনিবেশের আরেকটি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে মাও বলেছেন: “চীন একটি

আধা-ঔপনিবেশিক দেশ যা কুক্ষিগত করার জন্য বহু সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে…" ('একটি স্ফুলিঙ্গ একটি বিরাট আকারের অগ্নিকাণ্ড ঘটাতে পারে')।

সুতরাং অন্তর্বস্তুর দিক থেকে আধা-উপনিবেশের বৈশিষ্ট্য হল: (ক) দেশীয় কোনো আত্মসমর্পণকারী শ্রেণীর হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা; সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে নিয়ন্ত্রণক্ষমতা আছে কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতা নেই; (খ) সাধারণত একাধিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির যৌথ আধিপত্য এবং তাদের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা; (গ) দেশের মাটিতে বিদেশী পুঁজিবাদের প্রাধান্য, কিন্তু দেশীয় পুঁজিবাদেরও বিকাশ। রূপের দিক থেকে আধা-উপনিবেশের বৈশিষ্ট্য হল পরোক্ষ সাম্রাজ্যবাদী শাসন, সনাতন উপনিবেশবাদের আমলে যাকে প্রধানত প্রত্যক্ষ বলপ্রয়োগের দ্বারাই চাপিয়ে দেওয়া, টিকিয়ে রাখা ও জোরদার করা হত।

ফিনান্স পুঁজি কিন্তু তার চরিত্র অনুযায়ীই এই আধা-ঔপনিবেশিক অবস্থা স্থায়ীভাবে মেনে নিতে পারে না; প্রত্যেকটি আধা-উপনিবেশকে পুরো উপনিবেশে পরিণত করার অভিমুখে অর্থাৎ আধা-উপনিবেশের আত্মসমর্পণকারী শাসকশ্রেণীকে শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রক্ষমতাচ্যুত করার অভিমুখে তার প্রবণতা অব্যাহত রাখতে সে বাধ্য—সে প্রবণতা কখন এবং কোথায় কতখানি সফল হয় তা অবশ্য ভিন্ন প্রশ্ন।

[আরেকটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। সতর্ক পাঠক নিশ্চয় লক্ষ্য ক'রে থাকবেন যে আমরা এখন পর্যন্ত উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশকে পৃথক করার অর্থনৈতিক নিরিখটিকে যথেষ্ট যথাযথ করতে পারিনি। তা করা সম্ভব কিনা এবং সম্ভব হলেও তা কিভাবে সেটা এখনও আমি জানি না। তবে এই প্রসঙ্গে একটি আগ্রহজনক প্রচেষ্টার আমি উল্লেখ করতে পারি, যার গুণাগুণ বিচার করতে আমি আজও সক্ষম হইনি। হেলিও জাগুয়ারিবে তাঁর 'ইকনমিক অ্যাণ্ড পলিটিকাল ডেভেলপমেণ্ট: এ থিওরেটিকাল অ্যাপ্রোচ অ্যাণ্ড এ ব্রাজিলিয়ান কেস স্টাডি' (১৯৬৮) গ্রন্থে বলছেন: "একটি অর্থনৈতিক কাঠামো 'ঔপনিবেশিক' ব'লে গণ্য হবে তখনই যখন তার চরিত্রবৈশিষ্ট্য হবে তার রপ্তানী-দ্রব্যের জন্য বাহ্যিক চাহিদা ও সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীলতা (heteronomy বা পরতন্ত্র) এবং যখন তা সম্পদের কোনো আভ্যন্তরীণ সঙ্কলন সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয় ও তার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উদ্ভূত হয় বিদেশাগত সংযোজন ও রপ্তানী আয় থেকে (exogeny বা বহির্জনন)। আধা-ঔপনিবেশিক কাঠামো হচ্ছে তাই যা এখনও পরতান্ত্রিক হলেও অন্তর্জনিত প্রবৃদ্ধির একটা মোটামুটি হার অর্জন করতে শুরু করেছে এবং স্বয়ংসৃষ্ট প্রবৃদ্ধির ক্ষমতা রক্ষা বা বৃদ্ধি করার একটা দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা প্রদর্শন করছে।" অবশ্য তিনি নিজেই পরে বলছেন যে এই স্বয়ংসৃষ্ট প্রবৃদ্ধির দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতাটা স্থায়ী হয় না, আধা-সামন্তবাদ পুরোপুরি

অপসারিত না হলে তা শীঘ্রই অবলুপ্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ যে ধরনের স্থায়ী দীর্ঘ-মেয়াদী প্রবৃদ্ধির হার একটি আধা-সামন্তবাদী সমাজকে পুঁজিবাদী সমাজে পরিণত করতে পারে (চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) তার কথা তিনি এখানে বোঝাচ্ছেন না, সুতরাং তাঁর সংজ্ঞানুযায়ী কোনো সমাজ ঔপনিবেশিক কাঠামো থেকে আধা-ঔপনিবেশিক কাঠামোয় উত্তীর্ণ হয়েও আধা-সামন্তবাদী থেকে যেতে পারে এবং থাকেও। কিন্তু ভারত যেহেতু ১৯৪৭এর বহু পূর্বেই অন্তর্জনিত প্রবৃদ্ধির একটা মোটামুটি হার অর্জন ক'রে ফেলেছিল সেহেতু তখনই কি তা তাঁর সংজ্ঞানুযায়ী আধা-উপনিবেশে পরিণত হয়নি? হ্যাঁ, তাঁর সংজ্ঞানুযায়ী তাই হয়েছিল, কিন্তু কেবল অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে—রাজনৈতিক উপরি-কাঠামো বা শ্রেণীশাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে তা তখনও ঔপনিবেশিকই থেকে গিয়েছিল। সুতরাং আলোচ্য লেখকের সংজ্ঞা গ্রহণ করলে বলতে হবে যে ভারতের ক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা হতে পারত দুভাবে : হয় তার ঔপনিবেশিক অবস্থার পরিবর্তে স্বাধীন অবস্থার এবং একই সঙ্গে আধা-সামন্তবাদী অর্থনীতির পরিবর্তে নয়া-গণতান্ত্রিক অর্থনীতির বিপ্লবী প্রতিস্থাপন দ্বারা, নতুবা অর্থনৈতিক ভিত্তির সঙ্গে রাজনৈতিক উপরিকাঠামোর সংস্কারবাদী খাপ-খাওয়ানো দ্বারা, দ্বিতীয় বিকল্পটিই বাস্তবায়িত হয়েছিল এবং ঔপনিবেশিক ভারতের জায়গায় এসেছিল আধা ঔপনিবেশিক ভারত।]

৩. উপনিবেশবাদ ও নয়া উপনিবেশবাদ

প্রত্যক্ষ বলপ্রয়োগের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশকে উপনিবেশ বা আধা-উপনিবেশে পরিণত করাটাই ছিল সনাতন উপনিবেশবাদের রূপগত বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ফিনান্স পুঁজি ও সাম্রাজ্যবাদ জীবিত রয়েছে, অতএব বৈদেশিক শোষণ ও শাসন চালাবার জন্য তার যে চাহিদা ও লক্ষ্য তা বিলুপ্ত বা পরিবর্তিত হয়নি, হতে পারে না। কিন্তু বর্তমানে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আগের চেয়ে অনেক বেশী প্রতিকূল হয়েছে, দুর্বল হয়েছে সাম্রাজ্যবাদ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো সাম্রাজ্যবাদের হাতছাড়া হয়েছিল, অভ্যুদয় ঘটেছিল বিশাল গণচীনের, এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকায় দুর্বার হয়ে উঠেছিল জাতীয় মুক্তি আন্দোলন। ফলে সাম্রাজ্যবাদ তার সনাতন কায়দায় আর উপনিবেশগুলোর উপর কব্জা টিঁকিয়ে রাখতে পারল না। প্রতিকূলতর পরিস্থিতির দরুণ সেই উপনিবেশবাদী চাহিদাকে হাসিল করার কায়দায় পরিবর্তন ঘটল, ঘটতে বাধ্য হল। প্রত্যক্ষ বলপ্রয়োগের কায়দা যে একেবারে অন্তর্হিত হয়নি তার প্রমাণ ভিয়েতনাম। কিন্তু প্রতিকূলতর বিশ্ব-পরিস্থিতির জন্য সাম্রাজ্যবাদকে প্রত্যক্ষ পদ্ধতির পরিবর্তে আজ প্রধানত নির্ভর করতে হচ্ছে পরোক্ষ পদ্ধতির উপর। কিন্তু তার মানে ফিনান্স পুঁজির নিশ্চয়

এমন একটা শক্তি আছে যার জোরে সে প্রত্যক্ষ বলপ্রয়োগ ছাড়াও তার বৈদেশিক শাসন-শোষণ চালাতে পারে। নইলে সে আজও টিঁকছে কি ক'রে? শুধু তাই নয়, সনাতন উপনিবেশবাদ তথা প্রত্যক্ষ বলপ্রয়োগের আমলেও নিশ্চয় তার এই শক্তি ছিল। নইলে আজ হঠাৎ সে তা পেল কোত্থেকে?

সত্যিই তাই। যদিও "ফিনান্স পুঁজি ...অধীনতার এমন একটি রূপকেই সবচেয়ে 'সুবিধাজনক' হিসাবে দেখে ও তা থেকে সবচেয়ে বেশী মুনাফা লাভ করে যাতে অধীন দেশ ও জাতিগুলির স্বাধীনতাহানি জড়িত" – তবুও "সমস্ত অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কাবলীর ক্ষেত্রে ফিনান্স পুঁজি এমন একটা বিরাট, বলতে পারেন, এমন একটা নির্ধারক শক্তি যে যেসব রাষ্ট্র এমন কি পূর্ণতম রাজনৈতিক স্বাধীনতাও উপভোগ করে সেগুলিকেও তা নিজের অধীন ক'রে নিতে সক্ষম এবং বাস্তবে করেও তাই..." ('সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর' : লেনিন)।

প্রত্যক্ষ বলপ্রয়োগ তথা সনাতন উপনিবেশবাদের যুগেও যে সাম্রাজ্যবাদের এই পরোক্ষ কৌশল সক্রিয় ছিল তার দৃষ্টান্ত আমরা পাই লেনিনের উপরোক্ত পুস্তকেই :

"ফরাসী পুঁজি রপ্তানীগুলি প্রধানত ইউরোপ ও প্রথমত রাশিয়ায় লগ্নীকৃত (অন্তত এক হাজার কোটি ফ্রাঁ)। এটা মূলত কর্জ পুঁজি, সরকারী ঋণ— শিল্পোদ্যোগে লগ্নীকৃত পুঁজি নয়। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ বৃটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের মতো নয়, তাকে মহাজনী সাম্রাজ্যবাদ নাম দেওয়া যায়।" "পুঁজি রপ্তানীকারী দেশগুলি প্রায় সর্বদাই কিছু 'সুবিধা' লাভ করতে পারে...।" "সবচেয়ে সাধারণ বিষয়টি হল এটা বেঁধে দেওয়া যে মঞ্জুরীকৃত ঋণের একটি অংশ উত্তমর্ণ দেশে ক্রয়কাজে ব্যয় করা হবে, বিশেষত যুদ্ধ-সরঞ্জাম বা জাহাজ ইত্যাদি কেনার অর্ডারে। বিগত দুই দশকে (১৮৯০–১৯১০) ফ্রান্স প্রায়ই এই পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছে। পুঁজি রপ্তানী এইভাবে পণ্য রপ্তানীকে উৎসাহ দেওয়ার একটি পথ হয়ে ওঠে।" রাশিয়া, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল ও চীন ছিল এই ধরনের শোষণের অধীন।

আজকের নয়া-উপনিবেশবাদকে বোঝার জন্য লেনিনের উপরোক্ত পর্যবেক্ষণগুলিকে বোঝার গুরুত্ব অপরিসীম। নয়া-ঔপনিবেশিক কৌশলগুলি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে হঠাৎ গজিয়ে ওঠেনি, সেগুলোর মধ্যে প্রায় কিছুই 'নয়া' নেই। প্রত্যক্ষ জবরদস্তির পাশাপাশি সেগুলো বরাবরই ফিনান্স পুঁজির সহচর হয়ে ছিল। কিন্তু তাহলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ের নতুনত্বটা কোথায়? নতুনত্বটা এইখানে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ জবরদস্তির পক্ষে অধিকতর প্রতিকূল হয়ে ওঠার ফলে সাম্রাজ্যবাদের সমগ্র পদ্ধতিমালার মধ্যে আগে যেটা ছিল গৌণ আজ সেটাই প্রধান পদ্ধতি হয়ে

উঠেছে। এই পদ্ধতিটা হল, কোনো দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা সরাসরি হরণ না ক'রে অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক ও সামরিক নির্ভরতার জালে তাকে জড়িয়ে ফেলা।

জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকরা সবকটি ভূতপূর্ব উপনিবেশকে ঢালাওভাবে নয়া-উপনিবেশ ব'লে অভিহিত করেন এবং দাবী করেন যে যে-প্রক্রিয়ায় তারা স্বাধীন হয়েছে তাতে তারা নয়া-উপনিবেশ ছাড়া আর কিছু হতেও পারত না। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের পদ্ধতিতে যে এত বড় একটা ওলটপালট হল, তা সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদকে কোনো ক্ষতিই স্বীকার করতে হয়নি, বরং তার লাভই হয়েছে। উল্টো দিকে ভূতপূর্ব উপনিবেশগুলির অবস্থানেও কোনো উন্নতিই হয়নি, বরং অবনতিই হয়েছে। যেমন 'পূর্বতরঙ্গ' (২০ আগস্ট ১৯৭৪) পত্রিকায় জনৈক লেখক বলছেন: "উপনিবেশিক ভারতবর্ষে ১৯৪৭ সালের পরে কি কোনো গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে?...১৯৪৭ সালে ভারতে দেশীয় সেবাদাসদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর এই নতুন কৌশলেরই ফলশ্রুতি। এই ব্যবস্থা দ্বারা সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ভিত **আরো পাকা ও নিরাপদ হল**। উল্টে শাসন করবার প্রত্যক্ষ ঝুঁকিটা নিজের ঘাড়ে থাকল না। অর্থাৎ **শোষণের সুবিধা হল আরো বেশী**। নয়া কায়দায় শোষণটা বজায় থাকে বলেই রাষ্ট্রগুলিকে নয়া-উপনিবেশিক রাষ্ট্র বলা হয়" (বড় হরফ আমাদের)।

জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকদের উপরোক্ত বক্তব্য মানতে গেলে এটাও মেনে নিতে হয় যে প্রত্যক্ষ দখলদারীর চেয়ে পরোক্ষ শোষণটাই ফিনান্স পুঁজির পক্ষে বেশী লাভজনক! পরোক্ষ শোষণের কায়দাটা যেহেতু আজ হঠাৎ আকাশ থেকে পড়েনি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেও তা ছিল—সুতরাং তখনও নিশ্চয় তা প্রত্যক্ষ দখলদারীর চেয়ে বেশী লাভজনকই ছিল। কিন্তু তাহলে তখন সাম্রাজ্যবাদীরা, লেনিনের মতে, প্রত্যক্ষ দখলদারীটাই বেশী লাভজনক মনে করত কেন?...আমরা পড়েছি উভয়সংকটে। জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকদের বুদ্ধিমান ব'লে স্বীকার করতে গেলে হয় বলতে হবে লেনিন বুদ্ধু ছিলেন, আর না হয় বলতে হবে সাম্রাজ্যবাদীরা বুদ্ধু ছিল কারণ পরোক্ষ শোষণের অধিকতর মহিমা তারা সেদিন বুঝতেই পারেনি। ভদ্রতার খাতিরে এই উভয়-সংকটের সমাধান আমরা করব না—ওটার ভার পাঠকের উপরেই ছেড়ে দিলাম।

তবে জাতীয়তাবাদী বন্ধুদের কয়েকটা সহজ প্রশ্ন করতে চাই।

আমাদের মতো পশ্চাৎপদ দেশগুলি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি বিনিয়োগের পক্ষে নানা কারণে অধিকতর লাভজনক। তবু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে প্রধান প্রধান সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির পুঁজি রপ্তানী এইসব দেশে যত বেড়েছে তার চেয়ে বেশী বেড়েছে শিল্পোন্নত দেশগুলিতে। আপনারা কি তা জানেন না?

তাহলে আপনারা কেমন ক'রে বলেন যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রত্যর্পণের ফলে সাম্রাজ্যবাদীদের কোনো অসুবিধা ও ক্ষতিই স্বীকার করতে হয়নি? নয়া-ঔপনিবেশিক কৌশল গ্রহণ যে সাম্রাজ্যবাদের একটা **পিছু-হঠা**, তা আপনারা অস্বীকার করেন কেমন ক'রে?

আপনারা প্রায়ই আপনাদের বক্তব্যের সমর্থনে (?) চীন পার্টির এই বক্তব্য উদ্ধৃত করেন: "নয়া-উপনিবেশবাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদীরা কতগুলি অঞ্চলে তাদের প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক শাসনের পদ্ধতি বদলাতে এবং তাদের বাছাই-করা ও শিক্ষা-দেওয়া এজেন্টদের উপর নির্ভর ক'রে নতুন ধরনের ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের পদ্ধতি নিতে **বাধ্য হয়**" (বড় হরফ আমাদের)। অথচ সাম্রাজ্যবাদকে যে "বাধ্য" হয়েই একটা অপেক্ষাকৃত অসুবিধাজনক পদ্ধতি নিতে হচ্ছে, এই দিকটা আপনাদের চোখ এড়িয়ে যায় কেমন ক'রে?

৪. নয়া-উপনিবেশবাদ ও আধা-উপনিবেশ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ভূতপূর্ব উপনিবেশগুলি প্রধানত পরোক্ষ সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের সম্মুখীন হয়েছে। জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকদের অধিকাংশের মতে এই পরিবর্তনটা মোটেও গুরুত্বপূর্ণ নয় কেননা অধীনতার মাত্রা ও অন্তর্বস্তুতে কোনো তফাৎ ঘটেনি, রূপের তফাৎ ঘটেছে মাত্র। আগে যা ছিল উপনিবেশ, আজ তা-ই হয়েছে নয়া-উপনিবেশ। আগের অংশে আমরা সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ ও লাভ-ক্ষতির দিক থেকে দেখিয়েছি যে তা ঠিক নয়, ঠিক হতে পারে না। এবার আমরা প্রশ্নটিকে প্রাক্তন উপনিবেশগুলোর দিক থেকে বিচার ক'রে দেখতে চাই।

আলোচনাটি আমরা শুরু করব ১৯০৯-১৬ সালের (অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বহু পূর্বের) আর্জেন্টিনাকে দিয়ে, কারণ সেই দেশটি তখন যে পদ্ধতিতে সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা শোষিত হত তা সম্পূর্ণভাবেই আজকের নয়া-ঔপনিবেশিক পদ্ধতির সঙ্গে তুলনাযোগ্য।

আর্জেন্টিনা ছিল "রাজনৈতিকভাবে আনুষ্ঠানিক অর্থে স্বাধীন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ফিনান্সীয় ও কূটনৈতিক নির্ভরতার জালে আবদ্ধ।" 'আর্জেন্টিনা ফিনান্সগতভাবে লণ্ডনের উপর এত নির্ভরশীল যে তাকে প্রায় একটা বৃটিশ বাণিজ্যিক উপনিবেশ ব'লেই বর্ণনা করা উচিত।' ১৯০৯ সালে সেখানে বৃটিশ বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৮'৫ কোটি ফ্রাঁ: "এর দ্বারা বৃটিশ ফিনান্স পুঁজি (ও তার বিশ্বস্ত 'বন্ধু' কূটনীতি) আর্জেন্টিনার বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে—যে চক্রটি সে দেশের সমগ্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে তার সঙ্গে—যে কি শক্তিশালী যোগাযোগ অর্জন করে তা অনুমান করা কঠিন নয়" (ঐ: লেনিন)।

এখানে লক্ষ্যণীয় হচ্ছে এই যে 'প্রায় একটা বৃটিশ বাণিজ্যিক উপনিবেশ'কেও লেনিন উপনিবেশ বলছেন না, তাকে গণ্য করছেন স্বাধীন দেশ ও উপনিবেশের মধ্যেকার একটা "উত্তরণশীল রূপ," একটা "মাঝামাঝি পর্যায়," একটা "নির্ভরশীল'' দেশ ব'লে (দ্রষ্টব্য, ঐ : লেনিন) এবং তার সর্বপ্রধান কারণ হল এই যে আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রক্ষমতা ছিল সেই দেশেরই একটি শ্রেণীর হাতে। আর্জেন্টিনার সেই শাসকশ্রেণীরই মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের শাসন ও নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী করত। তার মানে অন্তর্বস্তুর দিক থেকে আধা-ঔপনিবেশিক চীনের সঙ্গে তার কোনো পার্থক্য ছিল না ; রূপের দিক থেকেও নয়। কারণ উভয় ক্ষেত্রেই সাম্রাজ্যবাদী শাসনের রূপটা ছিল পরোক্ষ। তফাৎ ছিল কেবল একটি জায়গাতে। সেই পরোক্ষ শাসন চীনের উপর চাপানো হয়েছিল বহুলাংশে প্রত্যক্ষ বলপ্রয়োগের উপর নির্ভর ক'রে, আর আর্জেন্টিনার ক্ষেত্রে উক্ত উপাদানটি ছিল না (এবং সেদিক থেকে আর্জেন্টিনা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলির আরো কাছাকাছি)। কিন্তু ফলাফলটা যেহেতু উভয় ক্ষেত্রে একই দাঁড়িয়েছিল, অতএব স্বীকার করতেই হবে যে তদানীন্তন আর্জেন্টিনায় আমরা যা দেখি তা উপনিবেশের অন্তর্বস্তু ও রূপ নয়, বরং আধা-উপনিবেশের অন্তর্বস্তু ও রূপ।

অবশ্য আর্জেন্টিনাকে 'আধা-উপনিবেশ' বলার বিরুদ্ধে একটা আপত্তি এখানে উঠতে পারে। লেনিন বলেছিলেন : "ফিনান্স পুঁজি অবশ্যই অধীনতার এমন একটি রূপকেই সবচেয়ে 'সুবিধাজনক' হিসাবে দেখে ও তা থেকে সবচেয়ে বেশী মুনাফা লাভ করে যাতে অধীন দেশ ও জাতিগুলির রাজনৈতিক স্বাধীনতাহানি জড়িত। এই দিক থেকে'' (অর্থাৎ রাজনৈতিক স্বাধীনতাহানির দিক থেকে) "আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলি 'মাঝামাঝি অবস্থা'র একটা টিপিকাল দৃষ্টান্ত।'' "আমরা ইতিমধ্যে নির্ভশীলতার একটি রূপের উল্লেখ করেছি — তা আধা উপনিবেশ। আরেকটার দৃষ্টান্ত জোগায় আর্জেন্টিনা'' (ঐ)। তার মানে, স্বাধীন ও ঔপনিবেশিক এই দুটি চরম অবস্থার মাঝামাঝি উত্তরণশীল পর্যায়টির সাধারণ নাম তিনি দিয়েছিলেন 'নির্ভরশীল অবস্থা', যার একাধিক রূপের মধ্যে একটি প্রকারভেদ ছিল আধা-উপনিবেশ। তাঁর সূত্রায়ণ অনুযায়ী সব নির্ভরশীল দেশই আধা-উপনিবেশ নয়, নির্ভরশীল দেশগুলির মধ্যে যেগুলির রাজনৈতিক স্বাধীনতাও খণ্ডিত, শুধু সেগুলিই আধা-উপনিবেশ — বাকীগুলির জন্য তিনি 'নির্ভরশীল'এর অতিরিক্ত আর কোনো বিশেষ বর্গ ব্যবহার করেননি। সেক্ষেত্রে রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন নির্ভরশীল দেশগুলিকে আধা-উপনিবেশ বলা কতদূর সঙ্গত ?

প্রথমত আমরা উপরেই দেখিয়েছি যে 'আধা-ঔপনিবেশিক' চীন ও 'নির্ভরশীল' আর্জেন্টিনার মধ্যে অন্তর্বস্তু ও রূপের খুব বেশী ফারাক নেই, অতএব

আর্জেন্টিনার ক্ষেত্রেও 'আধা-উপনিবেশ' কথাটি ব্যবহার করলে অন্তত কোনো গুরুতর অযথার্থতা ঘটে না। তা ছাড়া এমন করার ঐতিহাসিক নজীরও রয়েছে। আর্জেন্টিনার মতো একই ধরনের নির্ভরশীলতার জন্য স্তালিন রাশিয়ার ক্ষেত্রে 'আধা-উপনিবেশ' কথাটি ব্যবহার করেছিলেন ('সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক) এর ইতিহাস' দ্রষ্টব্য)। উপরন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ চীনের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের নগ্ন লঙ্ঘন পরিত্যাগ করেছিল, ফিরিয়ে দিয়েছিল অধিকৃত বন্দরগুলি ('চায়না শেকস্ দি ওয়ার্ল্ড' : জ্যাক বেলডেন)। চীনের অবস্থা ও 'নির্ভরশীল' আর্জেন্টিনার অবস্থার মধ্যে স্পষ্টতই তখন আর বিশেষ তফাৎ রইল না, কিন্তু তবুও ১৯৪৫-৪৯এর সময়কালের জন্য চীনের সমাজ-চরিত্রায়ণে 'আধা-ঔপনিবেশিক' বর্গটির জায়গায় 'নির্ভরশীল' বসানোর দরকার পড়েনি। অর্থাৎ মার্কসীয় বিজ্ঞানে 'আধা-উপনিবেশ' বর্গটির অর্থের সম্প্রসারণ ঘটেছে, 'আধা-ঔপনিবেশিক' দেশ আর 'নির্ভরশীল' দেশ সমার্থক হয়ে গেছে। [অতএব নির্ভরশীল দেশকে বাংলাদেশের "সাম্যবাদী"দের মতো নয়া-উপনিবেশের (অর্থাৎ অন্তর্বস্তুর দিক থেকে উপনিবেশের) প্রকারভেদ মনে করা যে কত বড় মূর্খতা তা এবার পাঠকরা চিন্তা করুন।]

অবশ্য 'নির্ভরশীল'কে 'আধা-উপনিবেশ' বলায় আর যারাই ক্ষুব্ধ হন, জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকদের তো অভিযোগ করার কোনো কারণই থাকতে পারে না। তাঁদের বরং খুশীই হওয়ার কথা, কারণ 'নির্ভরশীল' না ব'লে যদি 'আধা-উপনিবেশ' বলা হয় তাহলে 'আধা-উপনিবেশ' বর্গটির পূর্বের সংকীর্ণ অর্থের তুলনায় অধীনতার মাত্রাকে তো বাড়িয়েই দেখানো হল – আর বাড়িয়ে দেখানোটাই তো তাঁরা চান। তবে বাড়িয়ে দেখানোর অভিযোগও আসলে অচল, কেননা আমরা আগেই দেখিয়েছি যে 'আধা-উপনিবেশ' বর্গটির অর্থে সর্বসম্মত সম্প্রসারণ ঘটেছে,একটা বিশেষ প্রকারভেদের পরিবর্তে তা সর্বপ্রকার উত্তরণশীল অবস্থারই একটা সাধারণ নামে পরিণত হয়েছে এবং চীন ও আর্জেন্টিনা উভয় প্রকারের দেশই তার আওতাভুক্ত হয়ে গেছে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে স্বাধীনতা-প্রাপ্ত দেশগুলির অবস্থা বিশ্লেষণ করা যাক।

এদের সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত আমরা যা যা দাবী করেছি সেগুলো যে আদৌ দারুণ অভিনব কিছু নয় বরং সাধারণভাবে স্বীকৃত কতগুলি মামুলী বিষয় মাত্র সেটা বোঝানোর জন্য এ প্রসঙ্গে প্রথম যে বইটি হাতের কাছে পাচ্ছি তা থেকেই একটি বাক্য তুলে দেওয়া যাক। বাংলাদেশের নুরুল হুদা মির্জা তাঁর 'সাম্রাজ্যবাদের নয়া-ঔপনিবেশিক কৌশল' পুস্তকে বলছেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী প্রতিকূলতর পরিবেশে সাম্রাজ্যবাদকে প্রাক্তন উপনিবেশসমূহের "সহযোগী শ্রেণী-

গুলির সাথে আপোষ ক'রে তাদের একটু নড়াচড়ার জায়গা দিতে হয়েছে, তাদের হাতে "স্থানীয় শাসনভার" (স্পষ্টতই এর দ্বারা রাষ্ট্রক্ষমতা বোঝানো হচ্ছে) "তুলে দিতে হয়েছে।" আমরা আগেই দেখিয়েছি, প্রাক্তন উপনিবেশ-গুলিতে যে আজ দেশীয় শ্রেণীগুলিই রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন সে কথা জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকরাও নানা জায়গায় স্বীকার ক'রে ফেলতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু তারপরেও কেমন ক'রে বলা যায় যে অন্তর্বস্তুর দিক থেকে সেগুলি আজও উপনিবেশই, রূপটা কেবল নয়া? আবার এটাও ঠিক যে এগুলো পূর্ণ স্বাধীন নয়, কেননা সাম্রাজ্যবাদের শোষণ ও নিয়ন্ত্রণ আজও বিলুপ্ত হয়নি, যদিও তা চলছে পরোক্ষ রূপে অর্থাৎ রাষ্ট্রক্ষমতাসীন কিন্তু আত্মসমর্পণকারী দেশীয় শ্রেণী-গুলির মাধ্যমে। অধীনতার মাত্রার দিক থেকে এটাকে যদি 'মাঝামাঝি পর্যায়' বলা না যায় তবে তা আর কাকে বলা সম্ভব? অন্তর্বস্তু ও রূপ দুদিক থেকেই এর সঙ্গে চীনের, বিশেষত ১৯৪৫-৪৯এর চীনের, এবং ১৯০৯-১৬র আর্জেন্টিনার কি তফাৎ? ১৯৪৫-৪৯এর চীন যদি নয়া-উপনিবেশ না হয়ে থাকে (যদিও সে সময়টা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের সময়, যদিও চীনের বুকে তখন একটি মার্কিন নৌঘাটি ছিল, যদিও চিয়াং কাইশেকের বাহিনীর ঊনত্রিশটা ডিভিশন ছিল মার্কিনীদের দ্বারা অস্ত্রসজ্জিত ও প্রশিক্ষিত—সূত্রঃ 'চায়না শেক্স্ দি ওয়ার্লড,' জ্যাক বেলডেন) তবে এগুলিকে নয়া-উপনিবেশ বলা যাবে কোন যুক্তিতে?

নাকি এইসব প্রাক্তন উপনিবেশগুলির রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের কথাটা পুরোপুরি আমাদেরই বানানো? জাতিসংঘে চীনা প্রতিনিধির যে বক্তৃতা (১০ এপ্রিল ১৯৭৪) থেকে "সাম্যবাদী"রা উদ্ধৃতি দিতে এত পছন্দ করেন (পৃঃ ১১ দ্রষ্টব্য), তাতেই বলা হয়েছে: "বহু উন্নয়নশীল দেশ দীর্ঘদিন ধ'রে ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী পীড়ন ও শোষণ সহ্য করছে। তারা রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করেছে বটে কিন্তু এখনও এদের সকলের সামনেই রয়েছে উপনিবেশবাদের অবশেষকে নির্মূল ক'রে জাতীয় অর্থনীতির বিকাশ ও জাতীয় স্বাধীনতাকে সুদৃঢ় করার ঐতিহাসিক দায়িত্ব।...এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বহু দেশ রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করেছে, তা সত্ত্বেও এখনও তাদের অর্থনৈতিক জীবন কম-বেশী মাত্রায় উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত..." ('লালতারা,' কলকাতা, ৭ জুন ১৯৭৪)। প্রধান দ্বন্দ্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই বক্তৃতাটির তাৎপর্য আমরা পরে আলোচনা করব। আপাতত আমরা যেদিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তা হল, উপরের পংক্তিকটিতে রয়েছে "মাঝামাঝি পর্যায়"এর, আধা-ঔপনিবেশিক অবস্থার, একটি নিখুঁত বর্ণনা। "সাম্যবাদী"রা যেহেতু প্রাক্তন উপনিবেশগুলিকে নয়া-উপনিবেশ সাজাতে চান তাই বোধগম্য কারণেই চেপে যান যে এই বক্তৃতায় "রাজনৈতিক

স্বাধীনতালাভ"এর কথা স্বীকার করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে এ দেশ-গুলিতে পূর্ণ ঔপনিবেশিক দখলদারী আর নেই, আছে উপনিবেশবাদের "অবশেষ"। চীন পার্টির দোহাই দিয়ে এগুলোকে নয়া-উপনিবেশ (যা অন্তর্বস্তুতে উপনিবেশ) সাজানো কোনো রকমেই সম্ভব নয়।

এইসব প্রাক্তন উপনিবেশের বেশীর ভাগই যে আধা-ঔপনিবেশিক অবস্থার অর্থনৈতিক শর্তও পূরণ করে তা আমরা বর্তমান অধ্যায়ের সর্বশেষ অংশটিতে দেখাব। জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকরা মনে করেন যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা যদি এই দেশগুলি অর্জন ক'রেও থাকে, তবু তাদের মূল অর্থনৈতিক অবস্থায় কোনো পরিবর্তনই ঘটেনি। এখানে কেবল এইটুকু মন্তব্য আমরা ক'রে রাখতে চাই: তাঁদের বক্তব্য মানতে গেলে এটাও মানতে হবে যে এক শ্রেণীর কাছ থেকে আরেক শ্রেণীর কাছে রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তরের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবর্তনের মধ্যে কোনো অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সারবস্তু নিহিত থাকে না। কিন্তু তা যিনি বলবেন তিনি কি আর নিজেকে মার্কসবাদী ব'লে দাবী করতে পারেন?

এইসব দেশ যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতার রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে তা সর্বজনস্বীকৃত। তাই এ সম্বন্ধে অধিক মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

অতএব সব দিক থেকেই এবার আমরা এদের সম্বন্ধে একটি সুনির্দিষ্ট সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। সনাতন উপনিবেশবাদের আমলে, সাম্রাজ্যবাদের সেই জয়জয়কারের দিনে, উপনিবেশটাই ছিল নিয়ম আর "মাঝামাঝি পর্যায়" তথা আধা-ঔপনিবেশিক বা নির্ভরশীল অবস্থা ছিল অনেকাংশে ব্যতিক্রম। নয়া-উপনিবেশবাদের আমল শুরু হল সনাতন উপনিবেশবাদের ভাঙন, সাম্রাজ্যবাদের ব্যাপক পশ্চাদপসরণ এবং প্রাক্তন উপনিবেশগুলির মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও জমিদারশ্রেণীর হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা অর্পণের মধ্য দিয়ে। কাজেই এই আমলে "মাঝামাঝি পর্যায়" তথা আধা-ঔপনিবেশিক বা নির্ভরশীল অবস্থাটাই নিয়ম হয়ে উঠল আর উপনিবেশ বা নয়া-উপনিবেশ (অন্তর্বস্তুতে যা উপনিবেশই) হয়ে উঠল অনেকাংশে ব্যতিক্রম। এই দেশগুলির অধিকাংশে যেহেতু দেশীয় শ্রেণীগুলির হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা এসেছে, তাই অন্তর্বস্তুর দিক থেকে তারা উপনিবেশ নয়, আবার যেহেতু দেশীয় এই শাসকশ্রেণীগুলি চরিত্রগতভাবে সাম্রাজ্যবাদের পায়ে আত্মসমর্পণকারী, তাই অন্তর্বস্তুর দিক থেকে তারা পুরো স্বাধীনও নয়, তাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতাও আবশ্যিকভাবেই ভঙ্গুর। "শেষ বিচারে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অবিচ্ছেদ্য। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অসম্পূর্ণ ও অরক্ষিত" (জাতিসংঘে চীনা প্রতিনিধির বক্তৃতা, ১০ এপ্রিল ১৯৭৪: 'লালতারা,' ৭ জুন ১৯৭৪)।

৫. নয়া-উপনিবেশবাদ ও নয়া-উপনিবেশ

'নয়া-উপনিবেশ' বর্গটিকে দেখলে প্রথম দৃষ্টিতেই বোঝা যায় যে তাকে "অন্তর্বস্তুর দিক থেকে উপনিবেশ কিন্তু রূপের দিক থেকে কিছু 'নয়া' বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত"—এই অর্থে নেওয়াটাই অন্তত ভাষাগতভাবে সবচেয়ে স্বাভাবিক।

যা হোক, বর্গটিকে ভালো ক'রে বোঝার জন্য আবারও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের আমল থেকেই শুরু করা যাক।

উপনিবেশগুলিতে রাষ্ট্রক্ষমতা যদিও থাকত বিদেশী বুর্জোয়াদের হাতে, তথাপি রাষ্ট্রের বিভিন্ন যন্ত্রগুলি গ'ড়ে তুলতে তারা অবশ্যই দেশীয় লোকবলও ব্যবহার করত। বৃটিশ ভারতে ঔপনিবেশিক সেনাবাহিনীর বৃহত্তম অংশই গ'ড়ে তোলা হয়েছিল ভারতীয় সেপাই দিয়ে। অবশ্য তা সত্ত্বেও ক্ষমতার গুরুত্বপূর্ণ উচ্চতর অবস্থানগুলিতে প্রত্যক্ষভাবে থাকত বৃটিশরাই।

কিন্তু সেই আমলেই সাম্রাজ্যবাদীরা আরেক ধাপও এগিয়েছিল। তারা কখনও কখনও দেশীয় বিশ্বাসঘাতকদের নিয়ে একটা "পুতুল সরকার" ও "পুতুল বাহিনী"ও গ'ড়ে তুলত—যেমন জাপানীরা করেছিল চীনের কয়েকটি অধিকৃত অঞ্চলে। অবশ্য তখনও প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণক্ষমতায় থাকত বিদেশীরাই। দখলদারী সেনাবাহিনীও তখন প্রত্যক্ষভাবেই দেশের মাটিতেই অবস্থান করত।

এগুলো লক্ষ্য করা এই কারণে প্রয়োজন যে সনাতন উপনিবেশবাদের আমলেও সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রযন্ত্র গ'ড়ে তোলার জন্য দেশী লোক ব্যবহার করত, এমন কি পুরোপুরি দেশী লোক দিয়ে পুতুল সরকারের প্রশাসনযন্ত্রও গ'ড়ে তুলত—অর্থাৎ এগুলো কেবল নয়া-উপনিবেশবাদের আমলেরই অনন্য বৈশিষ্ট্য নয়। এই হেরফেরগুলোর জন্য কোনো গুণগত পরিবর্তন হত না, রাষ্ট্রক্ষমতা আসত না দেশীয় কোনো শ্রেণীর হাতে।

এবার মনে করুন সাম্রাজ্যবাদ আর সামান্য একটু আড়ালে গেল। পুতুল সরকার ও পুতুল বাহিনী রয়েছে, কিন্তু বিদেশী আমলারা বেশ পাল্টে হয়ে গেছে "উপদেষ্টা"। তখন কি হবে? স্পষ্টতই তখনও গুণগত কোনো পরিবর্তন হবে না, কিন্তু রূপের এই সামান্য হেরফেরটুকুর জন্য ইচ্ছা করলে আমরা দেশটিকে 'উপনিবেশ' না ব'লে 'নয়া-উপনিবেশ' বলতে পারি। অথচ এই 'নয়া-উপনিবেশ' নিয়ে এ অঞ্চলের মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের মধ্যে বিভ্রান্তি এখনও কি সর্বব্যাপী!

এবার আমরা আসব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলির অধিকাংশই যে নয়া-উপনিবেশ (যার অন্তর্বস্তু উপনিবেশই) নয় তা আমরা ইতিপূর্বে প্রমাণ করেছি। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে সাম্রাজ্যবাদ নেহাৎ বাধ্য হয়েই এই অসুবিধাজনক "মাঝামাঝি পর্যায়" তথা আধা-ঔপনিবেশিক অবস্থা মেনে নিয়েছিল। ফিনান্স

পুঁজি তার চরিত্র অনুযায়ীই এই নতুন আধা-উপনিবেশসমূহের শাসকশ্রেণী-গুলিকে রাষ্ট্রক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টা ক্রমাগত চালিয়ে যেতে বাধ্য। অথচ নগ্ন আক্রমণ ও প্রত্যক্ষ বলপ্রয়োগকে পুরোনো আমলের মতো আর তত সহজলভ্য পথ হিসাবে গ্রহণ করা যাচ্ছে না। তাই দেশীয় শাসকশ্রেণীগুলির ক্ষমতা ক্রমশ ক্ষুণ্ণ করার জন্য নিতে হয় নিজেদের "বাছাই-করা ও শিক্ষা-দেওয়া এজেন্টদের" নিয়োগ করার পথ। এই "বাছাই-করা ও শিক্ষা-দেওয়া" এজেন্টরা এমন কিছু ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যারা সম্পূর্ণতই বিদেশী বুর্জোয়ার শ্রেণীস্বার্থ ও ক্ষমতার প্রতি-নিধি। যদিও আত্মসমর্পণকারী শ্রেণীর শাসনই এই ধরনের এজেন্ট নিয়োগের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে, তবু এই এজেন্টরা কোনো শ্রেণী নয় বা দেশীয় কোনো শ্রেণীর স্বার্থ ও ক্ষমতার প্রতিনিধি নয়, এমন কি মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও জমিদারশ্রেণীরও নয়। বরং এই এজেন্টরা যে পরিমাণে দেশীয় শাসকশ্রেণীর রাষ্ট্রযন্ত্রে স্থান পায়, ঠিক সেই পরিমাণে রাষ্ট্রটির উপর বিদেশী নিয়ন্ত্রণ কায়েম হয়। যদি কখনও এই এজেন্টরা [এজেন্ট হিসাবেই অর্থাৎ কোনো সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতি নিধি হিসাবেই] রাষ্ট্রযন্ত্রকে পুরোপুরি কব্জা ক'রে নিতে পারে তখন আর দেশীয় কোনো শ্রেণীর হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা থাকে না। একমাত্র তখনই পুতুল সরকারের উদ্ভব ঘটে, উদ্ভব ঘটে উপনিবেশের অন্তর্বস্তুর এবং নতুন কিছু রূপগত বৈশিষ্ট্যের জন্য দেশটিকে তখন আমরা নয়া-উপনিবেশ বলতে পারি।

তবে জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকদের বিভ্রান্তি এড়াতে গেলে এক্ষেত্রে একটা কথা মনে রাখা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। নিছক এজেন্ট নিয়োগ মারফৎ নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বাড়িয়ে বাড়িয়ে সম্পূর্ণ মসৃণ ও শান্তিপূর্ণ বিবর্তনের পথে আধা-উপনিবেশ থেকে নয়া-উপনিবেশের এই গুণগত পরিবর্তন সাম্রাজ্যবাদীরা হাসিল করতে পারে না। 'নিয়ন্ত্রণ' থেকে রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের উল্লম্ফন সফল করতে গেলে কোনো-না-কোনো আঘাতের দ্বারা দেশীয় শাসকশ্রেণীকে উৎখাত করতে হবেই[২]।

নয়া-উপনিবেশের এই অন্তর্বস্তুগত বৈশিষ্ট্য মনে না রাখলে জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকদের মতো আমরাও নানা হাস্যকর স্ববিরোধে জড়িয়ে পড়ব। অবিশ্বাস্য হলেও এটাই সত্য যে তাঁরা "বাছাই করা ও শিক্ষা-দেওয়া" কিছু এজেন্ট বা ব্যক্তির সঙ্গে একটা গোটা শ্রেণীকে, সেই শ্রেণীর সরকারের সঙ্গে বিদেশী বুর্জোয়ার পুতুল সরকারকে, নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে রাষ্ট্রক্ষমতাকে এবং নয়া-উপ-নিবেশ তথা উপনিবেশের সঙ্গে "মাঝামাঝি পর্যায়" তথা আধা-উপনিবেশকে অকাতরে গুলিয়ে ফেলেছেন এবং এই অদ্ভুত খিঁচুড়িটাকে সাড়ম্বরে ও সগর্বে দুনিয়াময় পরিবেশন ক'রে বেড়াচ্ছেন। এই খিঁচুড়ি একবার পেটে গেলেই

২ এই প্রসঙ্গে কম্বোডিয়ার কথা স্মরণ করা যেতে পারে।

অত্যাশ্চর্য অভিজ্ঞতা ঘটে—কখনও জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান, কখনও সামন্ত দ্বন্দ্ব প্রধান, কখনও আবার একই সঙ্গে দুটোই প্রধান (যেমনঃ 'কাজ শুরুর সময় তো অবশ্যই সামন্তবাদকে প্রধান আঘাত হানতে হবে, কিন্তু সেটাও জাতীয় যুদ্ধেরই অন্তর্ভুক্ত'!) ইত্যাকার নানা অলৌকিক মতলবে মাথা আর কলম একেবারে অস্থির হয়ে ওঠে।

যা হোক, 'নয়া-উপনিবেশ' বর্গটির যে ব্যাখ্যা আমরা উপরে দিয়েছি তা যে আমাদের মনগড়া নয় তা প্রমাণ করার জন্য একটি বাস্তব উদাহরণ নেওয়া যাক। ভিয়েতনাম ওয়ার্কার্স পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসের (১৯৬০) প্রস্তাবে দক্ষিণ ভিয়েতনামকে "মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের এক নতুন ধরনের উপনিবেশ ও সামরিক ঘাঁটি ব'লে আখ্যায়িত করা হয়। সেখানকার সামাজিক-ঐতিহাসিক অবস্থাটা কি ছিল?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে প্রাক্তন সম্রাট বাও দাইকে দিয়ে সায়গনে যখন একটা পুতুল সরকার খাড়া করা হয় **তখন ফরাসী সেনাবাহিনী প্রত্যক্ষভাবে সেখানে উপস্থিত।** এই সরকার ছিল চীনের জাপ-অধিকৃত এলাকার পুতুল সরকারের মতোই একটা পুতুল সরকার। এই সরকার দেশীয় কোনো শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করত না, তা ছিল সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী বুর্জোয়ার প্রতিনিধিত্বকারী। এ পর্যন্ত বুঝতে কারো কোনো অসুবিধা হওয়া উচিত নয়।

১৯৫৫ সালে দিয়েন বিয়েন ফু-তে ফরাসীরা মুক্তিবাহিনীর হাতে পরাজিত হওয়ার পর সেখানে মার্কিন আধিপত্য কায়েম হতে থাকে। এবারই একটু ধাঁধা লাগে, কারণ সাম্রাজ্যবাদীরা এবার আরো একটু আড়ালে চ'লে গেল।

মার্কিনীরা সঙ্গে সঙ্গেই নিজস্ব বাহিনী আমদানী না করলেও তারা সেই ঔপনিবেশিক আমলের পুতুল সরকারকেই গ্রহণ করল এবং "উপদেষ্টা" মারফৎ প্রত্যক্ষভাবে পুতুল বাহিনীকে গ'ড়ে তুলল ও পরিচালনা করতে লাগল। অতএব এই সরকারও দেশীয় কোনো শ্রেণীর প্রতিনিধিতে পরিণত হয়নি, হতে পারতও না।

"১৯৫৩ সাল থেকে শুরু করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ একদিকে ক্রমশ ফরাসীদের স্থান দখল ক'রে নিতে লাগল, অবশেষে তাদের দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে উৎখাত করল; অন্যদিকে যারা বিপ্লবের দ্বারা পরাভূত হয়েছিল সেইসব জমিদারশ্রেণী এবং মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণীর কব্জা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা চালিয়ে তারা তাদের নয়া-ঔপনিবেশিক আগ্রাসীনীতির সামাজিক ভিত্তি হিসাবে মার্কিন সমর্থক জমিদার ও মুৎসুদ্দিদের একটা নতুন শ্রেণী তৈরী করল। দক্ষিণাঞ্চলে তারা ফরাসীরা যেমন করেছিল তেমন কোনো প্রশাসনিক যন্ত্র খাড়া করল না। বরং তারা 'মার্কিন উপদেষ্টা'দের গভীর জাল-ছড়ানো একটা শিখণ্ডী শাসনকে কাজে লাগাল, তারা দক্ষিণ ভিয়েতনামে গভীর থেকে

গভীরতর হস্তক্ষেপ চালানোর উদ্দেশ্যে ডলারের ক্ষমতাকে, সামরিক ও প্রশাসনিক সাহায্যের ক্ষমতাকে ব্যবহার করল। সামরিক ক্ষেত্রে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা প্রত্যক্ষভাবে পুতুল সেনাবাহিনীকে গ'ড়ে তুলল, শিক্ষা দিল, অস্ত্রসজ্জিত করল এবং পরিচালনা করল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, দক্ষিণ ভিয়েতনামকে ক্রমশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের উদ্বৃত্ত পণ্যের একটা বাজারে পরিণত করা হল। প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক সম্পদগুলি ক্রমশ মার্কিন একচেটিয়া পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রণে চ'লে গেল। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে, তারা দুর্নীতিদুষ্ট, ভ্রষ্ট-চরিত্র, কাউবয়-জাতীয় মার্কিন জীবনরীতি প্রচার করতে লাগল এবং আমাদের তরুণদের ও জনগণের মধ্যে তাদের নোংরা, পচা, প্রতিক্রিয়াশীল এবং অধঃপতিত সভ্যতার বিষ ঢুকিয়ে দিল। ফরাসী ও জাপ সাম্রাজ্যবাদীদের যে ভৃত্যের মতো সেবা করেছিল, সামন্তবাদী পাণ্ডা সেই ন্গো দিন দিয়েমকে মার্কিনীরা লালন করতে লাগল এবং 'জাতীয়তাবাদী' সরকার গঠনের জন্য তাকে সাংগনে ফিরিয়ে আনা হল। জনগণকে ধোঁকা দেবার উদ্দেশ্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা এই সরকারের উপর একপ্রস্থ 'প্রজাতান্ত্রিক' এবং 'স্বাধীনতা'র রঙ্ লাগিয়ে দিল" ('ভিয়েতনাম ওয়ার্কার্স পার্টির ইতিহাস', অনুবাদ : নুরুল হুদা মির্জা, বাংলাদেশ)।

সাবেক ঔপনিবেশিক ভিয়েতনামের মতোই নয়া-ঔপনিবেশিক দক্ষিণ ভিয়েতনামেও সাম্রাজ্যবাদী শাসনের "সামাজিক ভিত্তি" ছিল মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও জমিদারশ্রেণীই, কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতা তাদের হাতে ছিল না। সর্বোপরি, দক্ষিণ ভিয়েতনামের সরকারের চরিত্র বোঝার জন্য আরো একটি দিক খেয়াল রাখা দরকার। ফরাসীদের বিরুদ্ধে সমগ্র ভিয়েতনাম জুড়ে যে **জাতীয় যুদ্ধ** চলছিল, দিয়েন বিয়েন ফু-র লড়াই ও জেনেভা চুক্তির মাধ্যমে তার বিজয় ঘটে। দিয়েম সরকার ছিল সেই জাতীয় যুদ্ধের লক্ষ্য অর্জনে ছেদ-সৃষ্টিকারী, জাতীয় পুনরেকত্রীকরণে বাধাদানকারী ও সমগ্র জাতির স্পষ্ট-ব্যক্ত ইচ্ছার নগ্ন লঙ্ঘনকারী একটি মার্কিন হাতিয়ার। যে জাতীয় যুদ্ধ দেশের একটি অংশের মুক্তি অর্জনে সক্ষম হয়েছে, দিয়েম পুতুল সরকারের বিরুদ্ধে চালিত যুদ্ধ ছিল দেশের অপর অংশে সেই একই **জাতীয় যুদ্ধের ক্রমানুবর্তন** এবং তার কেন্দ্রীয় লক্ষ্য ছিল **জাতীয়** পুনরেকত্রীকরণ হাসিল করা।

সব সদ্যস্বাধীন দেশে, বিশেষত উপমহাদেশের দেশগুলিতে, আত্মসমর্পণকারী শ্রেণীগুলির সরকারকে যাঁরা বড় সহজে "পুতুল সরকার" বলেন, তাদের শাসনাধীন দেশকে বলেন "নয়া-উপনিবেশ" এবং প্রধান দ্বন্দ্ব ধরেন জাতীয় দ্বন্দ্বকে, তাঁরা তাকিয়ে দেখুন পুতুল সরকার কাকে বলে, নয়া-ঔপনিবেশিক সমাজটা কেমন এবং কি অবস্থায় জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান হতে পারে।

৬. মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণী

আমরা আগেই বলেছি যে আমাদের মতো পশ্চাৎপদ দেশসমূহের শাসকশ্রেণী-গুলির, বিশেষত মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ার চরিত্র দ্বন্দ্বমূলকভাবে না বোঝার জন্যই এক দল তার আপেক্ষিক স্বাধীন ভূমিকার গৌণ দিককে বড় ক'রে দেখছেন এবং আধা-উপনিবেশকে স্বাধীন দেশের সমপর্যায়ে টেনে তুলছেন। আরেক দল তার আত্মসমর্পণের দিকটাকেই একমাত্র দিক ব'লে মনে করেন, গোটা একটা শ্রেণীকেই প্রায় "পুতুল শ্রেণী" (—এই ধারণাটাই কি স্ববিরোধী ও উদ্ভট নয় ?) ব'লে কল্পনা করেন, আধা-উপনিবেশকে টেনে নামান উপনিবেশ বা নয়া-উপনিবেশের পর্যায়ে এবং তারপর জাতীয় দ্বন্দ্বকে স্থায়ীভাবে প্রধান ব'লে বেঁধে দিতে স্বাভাবিকভাবেই আর কোনো বাধা থাকে না। মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ার চরিত্র সম্বন্ধে এই ব্যাপক বিভ্রান্তির অবসান ঘটানোর জন্য বিষয়টিকে একটু বিশদভাবে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

ঔপনিবেশিক ভারতে প্রত্যক্ষ বিদেশী শাসনের এবং আধা-ঔপনিবেশিক চীনে পরোক্ষ বিদেশী শাসনের সামাজিক ভিত্তি প্রথম দিকে ছিল সামন্তশ্রেণী (চীনে অবশ্য তারা শাসকশ্রেণীও ছিল)। মুৎসুদ্দিরা তখনও ছিল এই শ্রেণীটিরই এক প্রশাখা মাত্র। প্রথমে তারা ছিল বিদেশী বাণিজ্যসংস্থার বেতনভোগী কর্মচারী। পরে কমিশনের প্রথা চালু হয়। শেষে তারা বড়জোর বণিক পুঁজির মালিকে পরিণত হয়। এইভাবে ক্রমে ক্রমে তারা সামন্তশ্রেণীর থেকে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করতে থাকে এবং বিদেশীদের উপর নির্ভরশীল থাকা সত্ত্বেও তার আপেক্ষিক স্বাধীনতার সম্প্রসারণ ঘটতে থাকে, গ'ড়ে উঠতে থাকে তার একটা স্বতন্ত্র শ্রেণীস্বার্থ। কিন্তু তখনও জনগণকে তারা শোষণ করত প্রাক-পুঁজিবাদী কায়দাতেই। সত্যকার অর্থে তারা তখনও মুৎসুদ্দি **বুর্জোয়া** অর্থাৎ পুঁজিবাদী **উৎপাদন-সম্পর্কের** প্রতিনিধি হয়ে ওঠেনি। এইসব কারণেই মুৎসুদ্দি শ্রেণীকে মাও ১৯২৬ পর্যন্ত জমিদারদের সঙ্গে একত্রে উল্লেখ ক'রে বলেছেন যে "এই শ্রেণীগুলো চীনের সবাপেক্ষা পশ্চাৎপদ এবং সবাপেক্ষা প্রতিক্রিয়াশীল উৎপাদন-সম্পর্কের" (অর্থাৎ পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের নয়) "প্রতিনিধিত্ব করে···" ('চীনা সমাজের শ্রেণীবিশ্লেষণ')। আর ১৯৪০এর দিকে 'চীন বিপ্লব ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টি' প্রবন্ধে মাও **বুর্জোয়া**শ্রেণীর মুৎসুদ্দি অংশের, অর্থাৎ মুৎসুদ্দি **বুর্জোয়ার,** উল্লেখ করেছেন—'মুৎসুদ্দি'র উল্লেখ তাতে নেই। অবশ্য ১৯২৬ সালেই মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণীরও আবির্ভাব ঘটেছে, এমন কি তারা তখন প্রাধান্যে আসার মুখে। কথা হচ্ছে, এদের আবির্ভাব কেমন ক'রে ঘটে ?

ইতিপূর্বে সামন্তবাদী সমাজে যে ভাঙন শুরু হয়েছিল, বিদেশী পুঁজিবাদের আঘাতে তা দ্রুততর হয়। পণ্য ও মুদ্রার প্রচলনের বিকাশ ঘটে, আভ্যন্তরীণ

বাজার সম্প্রসারিত হতে থাকে। কিন্তু তার সুযোগ নিতে থাকে প্রধানত বিদেশী পুঁজিবাদ। দেশের মাটিতে বিদেশী পুঁজিবাদের বিকাশ—এটাই সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের অর্থনৈতিক অন্তর্বস্তু। অধিকতর শক্তিশালী বিদেশী পুঁজিবাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপে ক্ষুদ্র উৎপাদকদের মধ্যে পুঁজি সঞ্চয়, অর্থাৎ তাদের মধ্য থেকে বুর্জোয়ার বিকাশ নিদারুণভাবে অবদমিত হয় (যদিও পুঁজিবাদী বিকাশের সেটাই যথার্থ বিপ্লবী পথ)। ইতিমধ্যে কিছু জমিদার, ব্যবসায়ী, আমলা ও মুৎসুদ্দির হাতে বেশ কিছু অর্থ এবং মহাজনী ও বণিক পুঁজি সঞ্চিত হয়েছে। সামন্তবাদী স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতির ভাঙনের ফলে শিল্প-বিনিয়োগের যে ক্ষেত্র উন্মুক্ত হল তার সিংহভাগ বিদেশী পুঁজিপতিরা গ্রাস করার পরে যে সামান্য সুযোগ দেশীয়দের জন্য অবশিষ্ট থাকে তা-ও ক্ষুদ্র উৎপাদকদের কাজে লাগার পরিবর্তে তাকে প্রধানত গ্রাস ক'রে নেয় এই উচ্চতর শ্রেণীগুলি—অর্থাৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর আবির্ভাব ঘটতে থাকে প্রধানত সামন্তশ্রেণীরই বিভিন্ন প্রশাখার মধ্য থেকে (ক্ষুদ্র উৎপাদকদের মধ্য থেকে নয়)। ফলে মুৎসুদ্দিরা ক্রমে বুর্জোয়ায় রূপান্তরিত হতে থাকে, তাদের সঞ্চিত অর্থ ও বণিক পুঁজি রূপান্তরিত হতে থাকে শিল্প পুঁজিতে। এই ধরনের প্রত্যেকটি দেশেই বুর্জোয়ারা অংশত মুৎসুদ্দি হিসাবেই যাত্রা শুরু করে (সৌরীন বসুর নিকট চীন পার্টির পরামর্শ : 'সংস্কৃতি', কার্তিক সংখ্যা, বাংলাদেশ), মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া হিসাবে নয়। তার মানে, মুৎসুদ্দিরা প্রথমে বুর্জোয়াশ্রেণীর জন্ম দিতে থাকে, প্রথমেই তারা মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ার জন্ম দেয় না। পশ্চাৎপদ উৎপাদন-সম্পর্কের পরিবর্তে মুৎসুদ্দিরা যত অগ্রসর (অর্থাৎ পুঁজিবাদী) উৎপাদন-সম্পর্কের উপর দাঁড়াতে থাকে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও মুৎসুদ্দিদের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের অবস্থানে ততই বিপ্লব ঘ'টে যায়, তাদের শ্রেণীচরিত্র বদলে যেতে থাকে, সংহত হতে থাকে তাদের স্বতন্ত্র শ্রেণীস্বার্থ, বাড়তে থাকে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও মুৎসুদ্দিদের সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্ব। অর্থাৎ মুৎসুদ্দিরা যে পরিমাণে বুর্জোয়া হয়ে ওঠে, ঠিক সেই পরিমাণেই তারা অনিবার্যভাবে জাতীয়-গণতান্ত্রিক চরিত্র অর্জন করতে থাকে। অন্যদিকে এটাও ঠিক যে এই ধরনের পরিবেশে সামাজিক বিবর্তন কখনও এতটা অগ্রসর হয় না যার দৌলতে এই উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণী পুরোপুরি পরিণত হয়ে উঠতে পারে এবং সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের সঙ্গে ছিন্ন করতে পারে সকল সংযোগ। ফলে তারা কিছুতেই আপোষহীন জাতীয়-গণতান্ত্রিক ভূমিকা একটানা পালন করতে পারে না। এমন কি মাঝে মধ্যেও তারা বিপ্লবী ভূমিকা নেবে কিনা তা নির্ভর করে ক্ষুদ্র উৎপাদকদের (যারা বিদেশী ও সামন্ত স্বার্থের সঙ্গে সংযোগহীন) মধ্য থেকে বুর্জোয়াশ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশের মাত্রার উপর। সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ দখলীকৃত ভারতে এই শেষোক্ত প্রক্রিয়াটির বিকাশ প্রায় অনুপস্থিত ;

তাই এখানে বুর্জোয়া-**সংস্কারবাদী** জাতীয়তাবাদের এত প্রাবল্য এবং বুর্জোয়া-বিপ্লবী সংগ্রামের অভাব। সাম্রাজ্যবাদের পরোক্ষ নিপীড়নের কবলিত চীনে এই শেষোক্ত প্রক্রিয়াটির বিকাশ ঘটতে পেরেছিল কিছুটা বেশী, তাই সেখানে একটা পর্যায় পর্যন্ত বুর্জোয়া নেতৃত্বে বিপ্লবী সংগ্রাম আমরা মধ্যে মধ্যে দেখতে পাই।

ক্ষুদ্র কৃষি-উৎপাদকরা স্বাধীনভাবে কোনো তাৎপর্যময় সামাজিক-ঐতিহাসিক উদ্যোগ গ্রহণে অক্ষম। তাদের সংগ্রাম একটা সমাজ-রূপান্তরকারী সচেতন চরিত্র অর্জন করতে পারে একমাত্র বুর্জোয়া বা শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে। ভারতে বুর্জোয়াশ্রেণীর বিকাশের অন্তর্নিহিত সংস্কারবাদী সামাজিক ভিত্তিটার ফলেই তারা কৃষক সংগ্রামকে বিপ্লবী জাতীয়-গণতান্ত্রিক পথে পরিচালিত করেনি এবং কৃষকের সংগ্রামগুলি বারে বারে নিঃশেষ হয়ে গেছে বিক্ষিপ্ত খণ্ড-বিদ্রোহের মধ্যে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের আগাগোড়া সংস্কারবাদী বৈশিষ্ট্যটির ব্যাখ্যা একমাত্র এইভাবেই পাওয়া সম্ভব এবং একমাত্র এইভাবেই আমরা বুঝতে পারব শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের উপর ভারতের কৃষকসংগ্রামের অধিকতর নির্ভরতাকে।

যা হোক, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের সঙ্গে সংযোগ ও তজ্জনিত দুর্বলতার জন্যই এই সমস্ত দেশের নবোদিত বুর্জোয়ারা আপোষহীন জাতীয়-গণতান্ত্রিক ভূমিকা একটানা পালন করতে পারে না—বরং তাদের অপেক্ষাকৃত সচ্ছল দক্ষিণপন্থী অংশটি ক্রমেই উপলব্ধি করতে থাকে যে এই ধরনের সমাজ-পরিবেশে, বিরোধের পথে নয়, কেবলমাত্র আপোষের পথেই তারা বৃহৎ বুর্জোয়া হবার জন্য তাদের তাগদকে চরিতার্থ করতে পারবে। অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদও ঐতিহাসিক বিবর্তনের অনিবার্যতাকে ক্রমে স্বীকার ক'রে নেয়, নতুন যুগের হাওয়াকে বুঝতে পারে। সে বুঝতে পারে যে পশ্চাৎপদ উৎপাদন-সম্পর্কের প্রতিনিধিত্বকারী একটি সামাজিক ভিত্তির উপর একান্তভাবে নির্ভর ক'রে থাকা ক্রমেই অসম্ভব হয়ে উঠেছে—তাকে ভিত্তি খুঁজতে হবে এই নবোদিত বুর্জোয়াশ্রেণীরই মধ্যে। তখন তারা এই বুর্জোয়াশ্রেণীর দক্ষিণপন্থী অংশটিকে কিছু কনসেশন দিয়ে তাদের বৃহৎ বুর্জোয়ার স্তরে বিকশিত হওয়ার তাগিদকে পূরণ করতে দেয়। **এইবার** জন্ম হয় এমন একটি গোষ্ঠীর যা একই সঙ্গে অগ্রসর (অর্থাৎ পুঁজিবাদী) উৎপাদন-সম্পর্কের প্রতিনিধি আবার সাম্রাজ্যবাদের মুৎসুদ্দিও। জন্ম হয় মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ার। মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও সামন্তশ্রেণী—সাম্রাজ্যবাদের এই দ্বৈত সামাজিক ভিত্তির নেতৃস্থানীয় ভূমিকাটিকে অগ্রসর উৎপাদন-সম্পর্কের প্রতিনিধিত্বের জোরে অনিবার্যভাবেই দখল করে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণী।

সমাজব্যবস্থায় ব্যাপক মধ্যযুগীয় অবশেষের অস্তিত্ব ও সাম্রাজ্যবাদের নিপীড়নের জন্যই এসব দেশে পুঁজিবাদ তথা বুর্জোয়াশ্রেণীর বিকাশ খণ্ডিত হয়। কিন্তু

বুর্জোয়াশ্রেণী আবার এই দুইয়ের উপরেই অনেকাংশে নির্ভরশীল, তদুপরি গণবিপ্লবের ভয়ে ভীত। এ থেকেই জন্ম নেয় এইসব পশ্চাৎপদ সমাজের জাতীয় বুর্জোয়ার দোদুল্যমানতা ও আপোষপ্রবণতা এবং জাতীয় বুর্জোয়ার এই দোদুল্যমানতা ও আপোষপ্রবণতাই অবশেষে তার দক্ষিণপন্থী অংশটির পূর্ণ বিশ্বাসঘাতকতায় পর্যবসিত হয়, জন্ম দেয় মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ার।

উপরের এই আলোচনার পর এবার আমরা মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া সম্বন্ধে কতগুলি ভ্রান্ত ধারণার পর্যালোচনা করতে পারি।

চারু মজুমদার বলেছিলেন যে এই উপমহাদেশের বুর্জোয়াশ্রেণী "প্রথম থেকেই" মুৎসুদ্দি[৩], অর্থাৎ এখানকার বুর্জোয়াশ্রেণী জন্মলাভই করেছিল মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া হিসাবে এবং এখনও তাদের মধ্য থেকে মাঝারি অংশটি বেরিয়ে এসে নিজের জাতীয় চরিত্র প্রতিষ্ঠিত করেনি, অতএব এখানকার বুর্জোয়াশ্রেণীর কোনো অংশের সঙ্গে মৈত্রীর প্রচেষ্টাকে বর্তমানে নীতিগতভাবেই বাতিল ক'রে রাখতে হবে। কিন্তু আমরা দেখলাম যে এ ধারণা ঠিক নয়। এই উপমহাদেশের বুর্জোয়াশ্রেণীর উদ্ভব নিঃসন্দেহে হয়েছে প্রধানত মুৎসুদ্দিদেরই মধ্য থেকে। কিন্তু যে পরিমাণে তারা বুর্জোয়ায় রূপান্তরিত হয়েছে, ঠিক সেই পরিমাণেই তারা তাদের মুৎসুদ্দি ও সামন্ত চরিত্রও ত্যাগ করেছে, অগ্রসর উৎপাদন-সম্পর্কের প্রতিনিধিত্ব করার দরুণ পেয়েছে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের থেকে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করার অধিকতর শক্তি, রচিত হয়েছে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের সঙ্গে তাদের অল্পাধিক বিরোধিতারও দৃঢ়তর ভিত্তি। সুতরাং আমাদের দেশগুলির বুর্জোয়াশ্রেণী "প্রথম থেকেই" মুৎসুদ্দি—এ কথা বলা উদ্ভট ও অবাস্তব। বরং অন্যান্য সব দেশের মতোই আমাদের দেশগুলির বুর্জোয়াশ্রেণীও—যেখান থেকেই তারা উদ্ভূত হয়ে থাকুক না কেন—"প্রথম থেকেই" কমবেশী জাতীয়-গণতান্ত্রিক; **তাদের মধ্য থেকে** একটা মুৎসুদ্দি অংশের উদ্ভবটাই বরং হয়েছে বিকাশের একটা উচ্চতর পর্যায়ে। মুৎসুদ্দি ও মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ার তফাৎটা আমাদের মধ্যে প্রায় কেউই বোঝেন না: এই দুটোর মধ্যে রয়েছে ঐতিহাসিক বিকাশের একটা সমগ্র পর্যায়কাল। সেই পর্যায়ের পর থেকে 'মুৎসুদ্দি' বললেও আসলে তার দ্বারা বোঝানো হয় 'মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া'কেই। এই অংশটিকে বাদ দিলে বুর্জোয়াশ্রেণীর যারা বাকী থাকে তারা প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত বরাবরই কমবেশী জাতীয়-গণতান্ত্রিক চরিত্রের হয়ে রয়েছে। তবে তাদের পক্ষে বিপ্লবী পথ গ্রহণের জন্য

৩ 'বুর্জোয়ারা মুৎসুদ্দি হিসাবে যাত্রা শুরু করেছিল' (সৌরীন বসুর নিকট চীন পার্টির পরামর্শ) বললে বোঝায় যে তাদের উদ্ভব হয়েছিল মুৎসুদ্দিদের মধ্য থেকে। আর 'বুর্জোয়াশ্রেণী প্রথম থেকেই মুৎসুদ্দি' বললে বোঝায় যে তার জন্মই হয়েছিল মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া হিসাবে। দুটোর মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ।

প্রয়োজন একটা মজবুত কৃষক-বিপ্লবী ভিত্তি। শ্রমিকশ্রেণী যদি সাফল্যের সঙ্গে সেই ভিত্তিস্থাপনের কাজে নেতৃত্ব দিতে পারে তাহলে অবশ্যই এই জাতীয় বুর্জোয়াদেরকে মিত্র (যত দোদুল্যমানই হোক) হিসাবে পাওয়া যাবে'।

মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণী তার শ্রেণীস্বার্থে ও নিজস্ব শ্রেণীচরিত্র অনুযায়ী আবশ্যিকভাবেই সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, শাসন ও অনুপ্রবেশের বাহক এবং তার পায়ে আত্মসমর্পণকারী। কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতা ও তজ্জনিত অর্থনৈতিক সুবিধার পরিমাণ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তার বিরোধও থাকে। রাজনৈতিক ক্ষমতা সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে থাকবে এবং মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ারা তার অধীনে কনসেশন পেয়ে বেঁচে থাকবে, নাকি রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকবে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের (এবং সামন্তশ্রেণীর) হাতে এবং সাম্রাজ্যবাদীরা তারই মারফত শোষণ ও শাসন চালাবে—এই নিয়ে অনবরত চলে দরকষাকষি ও দ্বন্দ্ব। মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ার প্রতি ঘৃণার প্রাবল্যে এই দ্বন্দ্বটা না দেখা অবৈজ্ঞানিক ও ক্ষতিকর হবে। এই দ্বন্দ্বটা না থাকলে 'সমগ্র দেশ বা সমগ্র জাতির সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্ব' এই সূত্রায়ণটাই যে অর্থহীন হত তা আমরা আগেই নির্দেশ করেছি। প্রসঙ্গত এ-ও উল্লেখযোগ্য যে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াকে মাও যেমন "পুরোপুরি সাম্রাজ্যবাদের লেজুড়" বলেছেন অন্যদিকে তেমনি তিনি, কেবলমাত্র জাতীয় বুর্জোয়ারই নয়, সমগ্র বুর্জোয়াশ্রেণীরই দ্বৈত চরিত্রের কথাও উল্লেখ করেছেন ('চীন বিপ্লব ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টি' দ্রষ্টব্য)।

যাঁরা মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণীকে প্রায় একটা "পুতুল শ্রেণী" ব'লেই কল্পনা করেন, জাতীয় দ্বন্দ্বের সেই প্রাধান্য-ঘোষকরা এই পর্যন্ত প'ড়েই নিশ্চয় মার-মার ক'রে উঠবেন। তাঁদের মতে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণীর আত্মসমর্পণের দিক ছাড়া আর কোনো দিকই নেই, সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের থেকে তার পৃথক কোনো শ্রেণীসত্তাই নেই। কিন্তু তাহলে চীনে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণী কেমন ক'রে জাপবিরোধী যুদ্ধে অংশ নিতে পেরেছিল? পাকিস্তানের মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণী কেমন ক'রে সাম্রাজ্যবাদের চাপ প্রতিরোধ ক'রে ভারতের মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া-শ্রেণীর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে অস্বীকার করল এবং চীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতালো? একপেশে চিন্তার অধিকারীরা এইসব প্রশ্নের সামনে হতভম্ব হয়ে যান এবং নানা বাহ্যিক কারণ প্রদর্শন করতে থাকেন, যেমন—জনগণের সংগ্রাম, সাম্রাজ্যবাদী-দের অন্তর্দ্বন্দ্ব, দুই দেশের মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরোধ, ইত্যাদি। কিন্তু এই শ্রেণীর নিজের ভিতরে যদি এই ধরনের স্বাধীন ভূমিকা নেওয়ার ক্ষমতা বিন্দুমাত্র না থাকে তাহলে কি হাজার বাহ্যিক কারণেও তার পক্ষে এ কাজ সম্ভব, হাজার তাপ দিয়েও কি সম্ভব এক টুকরো পাথর থেকে মুরগীর বাচ্চা ফোটানো? আমাদের বুঝতে হবে যে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ারা এমন একটি শ্রেণী যে তার শ্রেণী-স্বার্থের আভ্যন্তরীণ আবশ্যিকতার তাড়নাতেই অনিবার্যভাবে সাম্রাজ্যবাদের

নিকট আত্মসমর্পণ করে, যে তার নিজের শ্রেণীস্বার্থেই দেশীয় রাজনীতি ও অর্থনীতিতে সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণ ও অনুপ্রবেশের বাহন হতে বাধ্য। কিন্তু পুঁজির সঙ্গে পুঁজির দ্বন্দ্ব এখানেও সক্রিয়। তা না হলে কেন তারা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল, কেন তারা তাকে সংস্কারবাদের পথে চালাতে সচেষ্ট ছিল এবং কেন তারা একটা জঘন্য আপোষ ও আত্মসমর্পণের মধ্যে তাকে ডুবিয়ে দিল—এইসব কোনোকিছুই আমরা যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করতে পারব না, ব্যাখ্যা করতে পারব না আজকের তৃতীয় বিশ্বের অভ্যুদয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে [৪]। নিজেদের বিকাশের অধিকতর স্বাধীনতা লাভের জন্য, নিজেদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা পাওয়া ও রক্ষা করার জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্ব থাকে। কিন্তু সেই দ্বন্দ্ব এতটা তীব্র হয় না যার ফলে সাম্রাজ্যবাদী শাসন বা নিয়ন্ত্রণেব অধীন থাকার চেয়ে তারা **গণবিপ্লবের মাধ্যমে** তার পুরোপুরি উৎখাত কামনা করবে। বরং উল্টো। কারণ "বৃহৎ বুর্জোয়ারা বৃটিশের থেকে জনগণকেই বেশী ভয় করে" (জুকভ, উমরের গ্রন্থে বর্ণিত)। অদম্য গণবিদ্রোহের সম্মুখীন হয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ শেষ পর্যন্ত এই শ্রেণী ও তার মিত্র জমিদারশ্রেণীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করাকেই মন্দের ভালো হিসাবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ারাও এই "মাঝামাঝি ব্যবস্থা"র মধ্যে দরকষাকষিব অধিকতর স্বাধীনতা পেয়েই তুষ্ট থাকে।

মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ার ঐতিহাসিক বিকাশ ওতার শ্রেণীচরিত্র সম্বন্ধে ব্যক্ত আমাদের

৪ জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকরা তো তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশকে স্বাভাবিকভাবেই "নয়া-উপনিবেশ" মনে করেন, তা'দের সরকারগুলিকে বলেন "পুতুল সরকার" যাদের হাতে "ক্ষমতার মূল চাবিকাঠি" নেই। সুতরাং উপকূলসীমা বাড়ানো, তৈলাস্ত্র-প্রয়োগ প্রভৃতির জন্য তাদের ঐক্যবদ্ধ ভূমিকাকে তাঁরা একটু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা ক'রে দেখবেন কি? সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও লুণ্ঠনকে প্রতিহত করা এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কে প'রিবর্তন ঘটানোর গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি আলোচনার জন্য জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পর উনত্রিশ বছরের মধ্যে এই প্রথম একটি বিশেষ অধিবেশন (১০ এপ্রিল ১৯৭৪) তারা সম্ভব করল কেমন ক'রে? মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও জমিদারশ্রেণীর সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের যদি একেবারেই কোনো দ্বন্দ্ব না থাকে তবে এই দেশগুলির প্রতি চীন বারংবার যে আহ্বানগুলি দিচ্ছে সেগুলি কি সবই হাওয়ায় তলোয়ার ঘোরানো? চীনের এই আহ্বানগুলিকে অস্পষ্টভাবে 'জনগণের প্রতি আহ্বান' ব'লে এড়িয়ে গেলে চলবে না, কেননা চীন পরিষ্কার বলেছে: "...রাষ্ট্র ও সরকারের প্রধানদের নিয়ে আফ্রো-মৈত্রী সংগঠনের দশম বৈঠক, জোট-বহির্ভূত দেশের চতুর্থ শীর্ষ সম্মেলন, আরব শীর্ষ সম্মেলন ও ইসলামিক শীর্ষ সম্মেলনের কণ্ঠে সার্থকভাবে ধ্বনিত প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রমাণ করেছে ঘৃণ্য শত্রুর বিরুদ্ধে সাধারণ যুদ্ধে উন্নয়নশীল দেশগুলির মৈত্রী ও পারস্পরিক সমর্থনকে শক্তিশালী করার দৃঢ় অভিলাষ ও সঙ্কল্প" (নিম্নরেখা আমাদের, জাতিসঙ্ঘে চীনা প্রতিনিধির বক্তৃতা, ১০ এপ্রিল ১৯৭৪: 'লালতারা', ৭ জুন ১৯৭৪)। 'সাম্যবাদী'রা কিন্তু চীনা প্রতিনিধির এই ভাষণটিকে বড় বেশী পছন্দ করেন।

মতামতগুলির সমর্থনে আমরা এবার কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই।

১৯২৬ সালে লেখা 'চীনা সমাজের শ্রেণীবিশ্লেষণ' নামক প্রবন্ধে মাও চীনের প্রধান শ্রেণীগুলির মধ্যে 'জমিদারশ্রেণী ও মুৎসুদ্দিশ্রেণী' (যারা পশ্চাৎ-পদ উৎপাদন-সম্পর্কের প্রতিনিধিত্ব করত) এবং 'মাঝারি বুর্জোয়াশ্রেণী' (যার দ্বারা "প্রধানত জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীকেই বোঝায়" এবং "যে শ্রেণী চীনে পুঁজি-বাদী উৎপাদন-সম্পর্কের প্রতিনিধিত্ব করে"), এই দুটি শ্রেণীর উল্লেখ করেছেন। এক জায়গায় 'মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া' কথাটি ব্যবহার করলেও তাদেরকে তিনি প্রধান কোনো শ্রেণী বা গোষ্ঠীর মর্যাদা দেননি। বস্তুত ১৯২৬ সালে কু দে'তার পরেই কেবল মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া অংশটি জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্য থেকে খোলাখুলি বেরিয়ে আসে এবং রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদার হয়। এর অর্থ, মুৎসুদ্দিরা প্রথমে থাকে সামন্তশ্রেণীরই অংশ (বুর্জোয়াশ্রেণীর নয়); একটা পর্যায়ে প্রধানত এদেরই মধ্য থেকে বুর্জোয়াদের উদ্ভব ঘটে—যে বুর্জোয়ারা প্রথম থেকেই মুৎসুদ্দি নয়, বরং প্রথম থেকেই 'জাতীয়'। 'চীন বিপ্লব ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টি' লেখায় মাও বলেছেন যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯১৪-১৮) সাম্রাজ্যবাদীরা চীনের উপর তাদের নিপীড়ন কিঞ্চিৎ শিথিল করতে বাধ্য হয়, ফলে এই সুযোগে চীনের জাতীয় পুঁজিবাদ তথা জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী কিছুটা বিকাশ লাভ করতে সক্ষম হয়। সুতরাং ১৯২০ সালেই চীনের জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে একটি অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অংশ গ'ড়ে ওঠে, যারা বৃহৎ বুর্জোয়ার স্তরে উন্নীত হওয়ার জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে আপোষ করতে উৎসুক হয়ে ওঠে। সাম্রাজ্যবাদীরাও নিজেদের আধিপত্যের সামাজিক ভিত্তি হিসাবে এদের গুরুত্ব স্বীকার ক'রে নিতে বাধ্য হয়। চীনে ১৯২৫-২৬ সালেই এই প্রক্রিয়া স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং ১৯২৭ সালে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ার দলত্যাগ সম্পূর্ণ হয়। মাও "আগে থেকেই লক্ষ্য করেছিলেন যে তৎকালীন জাতীয় বুর্জোয়ারা দ্বিধাগ্রস্ত শ্রেণী এবং বিপ্লবের উত্তাল জোয়ারে তা বিভক্ত হয়ে পড়বে, এর দক্ষিণপন্থী অংশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে যাবে। ১৯২৭ সালের ঘটনা থেকেই তা প্রমাণিত হয়েছে" ('চীনা সমাজের শ্রেণীবিশ্লেষণ': চীন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি প্রদত্ত ভূমিকা)। তার মানে মুৎসুদ্দিদের উদ্ভব ঘটে সামন্তশ্রেণীর মধ্য থেকে আর মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের উদ্ভব ঘটে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্য থেকে, আর তাই বুর্জোয়াশ্রেণী কখনোই প্রথম থেকে মুৎসুদ্দি হতে পারে না।

ভারতের ক্ষেত্রেও আমরা একই ব্যাপার দেখতে পাই। জনাব মুজফ্ফর আহমেদের 'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি' গ্রন্থে প্রদত্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম ইশতেহার (১৯২৬) থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ আমরা উদ্ধৃত করছি:

"সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সমাজের উচ্চতর শ্রেণীগুলির মধ্যকার ঝগড়া হচ্ছে

লুটের বখরা নিয়ে। দেশী জমিদার-পুঁজিপতিরাও উৎপাদক জনতার ঘাড়ে চেপে বেঁচে থাকে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের একচেটিয়া পলিসি সুযোগ দিল না তাদের অবাধ অর্থনৈতিক বিকাশের, যা শ্রমিক শোষণ করার জন্য তাদের ক্ষমতা বাড়াতে পারে। ভারতীয় শ্রমিক ও কৃষকদের উৎপাদিত মূল্যের অধিকাংশ যেত সাম্রাজ্যবাদের তহবিল স্ফীত করতে। ভারতীয় বুর্জোয়াদের দেওয়া হত কেবল মধ্যবর্তীর স্বল্প এক অংশ। কালক্রমে তারা লুটের এই সামান্য বখরায় অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছে। তারা চাইল ক্রমবর্ধমান অংশ এবং অবশেষে ভারতীয় জনতার শ্রমশক্তির সমগ্র সম্পদের উপর অগ্রিম অধিকার।"

"সমগ্র জনগণের বিপ্লবী তৎপরতার মধ্য দিয়ে ছাড়া ভারত বৈদেশিক আধিপত্য থেকে মুক্ত হতে পারে না। কিন্তু জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়ার বিক্ষোভ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণ-বিদ্রোহের জন্ম দেয় না।...জনসাধারণ সাধারণভাবে শোষণেরই বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।...দেশের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েমের প্রয়াস অপরিমেয় গুরুত্বের বিপদ-সম্ভাবনায় পূর্ণ হওয়ার ফলে জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়ারা ভারতীয় জনগণকে যৌথভাবে শোষণ করার জন্য সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে এক বোঝাপড়ায় উপনীত হয়।" কিন্তু "সাম্রাজ্যবাদ এই ধরনের বোঝাপড়ায় আসে কেন? অনেক কারণ আছে। প্রথমত, পুঁজিবাদের সাধারণ সংকট সাম্রাজ্যবাদের ভিত এত দুর্বল ক'রে দিয়েছে যে পুরানো ও সনাতন উপনিবেশবাদের পলিসি সংশোধন করতেই হত। দ্বিতীয়ত, জাপান, আমেরিকা, জার্মানি ইত্যাদির দ্বারা ভারতীয় বাজার আক্রান্ত হচ্ছে, কেবলমাত্র ভারতে সস্তা শ্রমে তৈরী মালই এই অনুপ্রবেশ-কারীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে। অতএব সাম্রাজ্যবাদী ফিনান্সের আওতায় ভারতকে শিল্পায়িত করার নীতি বৃটেন গ্রহণ করে। তৃতীয়ত, বৃটেনে পুঁজি-সঞ্চয়ের অবনতির ফলে ভারতকে শিল্পায়িত করার কর্মসূচীকে কার্যকরী করার মতো যথেষ্ট পুঁজি সে ছাড়তে পারে না। ভারতীয় পুঁজি তাকে টেনে আনতেই হয়। চতুর্থত, যুদ্ধ-পরবর্তী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের গণচরিত্র সাম্রাজ্যবাদকে বাধ্য করে দেশীয় সমাজ থেকে ক্রমপ্রসারমান স্তরসমূহকে নিজের দিকে জয় ক'রে আনতে।

"স্থিতিশীল হতে গেলে সরকারের একটা সামাজিক ভিত্তি থাকতেই হবে। (প্রথম) বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ভারতে বৃটিশ সরকারকে দুটো সামাজিক উপাদান সমর্থন করত। তারা ছিল ভূস্বামীশ্রেণী ও কৃষক। উভয়ে ছিল জনসংখ্যার অধিকাংশ। তাই সাম্রাজ্যবাদের ছিল এক সুনিশ্চিত সামাজিক ভিত্তি। কিন্তু এই দুই সামাজিক উপাদান একভাবে বৃটিশ সরকারকে সমর্থন করত না। ভূস্বামীশ্রেণী দিত ইতিবাচক, সচেতন সমর্থন আর কৃষক তার নিষ্ক্রিয় আনুগত্যের দ্বারা দিত অচেতন সমর্থন। যুদ্ধের পর থেকে পরিস্থিতি বদলে

গেছে। কৃষক জনতার নিষ্ক্রিয় আনুগত্য ব্যাহত হয়েছে। তার জায়গায় এসেছে এক স্ফুটন্ত বিদ্রোহের অবস্থা, যা ফেটে পড়ছে বারে বারেই ; ফলে এখন গুরুতরভাবে ন'ড়ে উঠেছে সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি। তাকে মজবুত করার জন্য খুঁজে পেতে হবে কোনো নতুন মিত্র।" "এই নতুন মিত্র হল জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়ারা (ব্যাঙ্কমালিক, বণিক, শিল্পপতি, উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও এইসব শ্রেণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত পেশাজীবী লোকজন)। যুদ্ধের পরের বৎসরগুলিতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বিপ্লবের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। দুর্লক্ষণাক্রান্ত এই সম্ভাবনায় জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়ারা আতঙ্কিত হল। তারা অধিকতর নিরাপদ পথে হাঁটারই সিদ্ধান্ত নিল এবং ভারতীয় জনগণকে শোষণ করার ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ছোটো শরিকানা মেনে নিল।" "বুর্জোয়াদের দলত্যাগ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উপর ছাপ ফেলল। আপোষ আর আত্মসমর্পণই হয়ে উঠল পলিসি। শ্রেণীস্বার্থের বেদীমূলে জনগণকে এইভাবে বলি দেওয়া ১৯২২ থেকেই ধাপে ধাপে চালিয়ে যাওয়া হয়েছে।" "১৯২৫ সালটা চিহ্নিত হল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সম্পূর্ণ ভাঙন দ্বারা। জাতীয় কংগ্রেস ভেঙে পড়ল যুধ্যমান উপদলসমূহে।"

মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ার ঐতিহাসিক বিকাশ ও তার শ্রেণীচরিত্র সম্বন্ধে আমাদের প্রায় সবকটি প্রতিপাদ্যই নিহিত রয়েছে ১৯২৬ সালের ইশ্‌তেহার থেকে উদ্ধৃত অংশগুলোর মধ্যে। অথচ ১৯৭৫ সালেও এ সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তি কত ব্যাপক!

৭. শ্রেণী ও রাষ্ট্রযন্ত্র

আমাদের আলোচ্য দেশগুলি যে নয়া-উপনিবেশ নয়, সেগুলোর সরকার যে পুতুল সরকার নয় এবং সেগুলোর রাষ্ট্রক্ষমতা যে বিদেশী কোনো শ্রেণীর হাতে থাকার পরিবর্তে দেশীয় শ্রেণীগুলির হাতেই রয়েছে, এ কথা প্রমাণ করার জন্য আমরা এই দেশগুলি ও তাদের রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্বের দিকটি আলোচনা করেছি। বস্তুত তাছাড়া আমরা প্রমাণই করতে পারতাম না যে এই সরকারগুলি সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধি নয়, বরং সাম্রাজ্যবাদীদের থেকে **পৃথক** কোনো শ্রেণীর (সে শ্রেণী যত আত্মসমর্পণকারীই হোক) প্রতিনিধি। যে কোনো দুটো জিনিসের মধ্যে পার্থক্য প্রমাণ করতে গেলে দ্বন্দ্ব প্রমাণ করতে হবেই, কেননা "পার্থক্য নিজেই হল দ্বন্দ্ব" ('দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে': মাও)। অতএব সাম্রাজ্যবাদীদের থেকে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও তাদের রাষ্ট্রযন্ত্রের শ্রেণীস্বাতন্ত্র্য প্রমাণ করতে গেলে উভয়ের মধ্যে শ্রেণীদ্বন্দ্বের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে হবেই [নতুবা বিপ্লবের লক্ষ্যবস্তু হিসাবে সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের থেকে স্বতন্ত্র কোনো তাৎপর্য মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের থাকে না, আমাদের বিপ্লবের

চারপাহাড়-ভিত্তিক রণনীতি বাতিল হয়ে যায় এবং এর অবজেকটিভ ফলাফল দাঁড়ায় বিপ্লবের আঘাত থেকে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণীকে রক্ষা করা]।

জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকরা এখানে একটা মোক্ষম প্রশ্ন তুলতে পারেন। যে সরকারগুলির পুতুল চরিত্র নিয়ে কারো কোনো দ্বিমত নেই (যেমন দক্ষিণ কোরিয়ার সিংম্যান রী সরকার, দক্ষিণ ভিয়েতনামের দিয়েম সরকার বা থিউ সরকার) সেগুলোর সঙ্গেও কি সাম্রাজ্যবাদের কখনও কোনো দ্বন্দ্ব দেখা দেয় না? সিংম্যান রী ও দিয়েমকে তো মার্কিনীদের এমন কি সশস্ত্র কু দে'তা ঘটিয়েই হঠাতে হয়েছিল। অতএব এই ধরনের দ্বন্দ্বের দৃষ্টান্তকে ভিত্তি ক'রে কেমন ক'রে আমরা স্থির করব, একটা বিশেষ সরকার দেশীয় কোনো শ্রেণীর রাষ্ট্রক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করছে, নাকি বিদেশী কোনো শ্রেণীর?

আসলে দু-ধরনের দ্বন্দ্বের চারিত্রিক পার্থক্যকে তাঁরা গুলিয়ে ফেলছেন। মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও জমিদারশ্রেণীর সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদীদের যে দ্বন্দ্ব রাজনীতিতে প্রতিফলিত হয় তা হল শ্রেণীগত দ্বন্দ্ব। আর পুতুল সরকারের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের যে দ্বন্দ্ব কখনও কখনও দেখা যায় তা হল একটি শ্রেণী ও তার রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব[৫]। একটি শ্রেণী ও তার রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের মধ্যে যত দ্বন্দ্বই আত্মপ্রকাশ করুক, শেষ বিচারে রাষ্ট্রযন্ত্রকে সেই শ্রেণীর স্বার্থই প্রতিফলিত করতে হয়। এটি এমনই এক অলঙ্ঘনীয় নিয়ম যে শেষ পর্যন্ত তা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবেই এবং পথের সব বাধা অপসারণের জন্য চরমতম পন্থাও গৃহীত হতে পারে। শুধু সিংম্যান রী বা দিয়েমের পুতুল সরকারের ক্ষেত্রেই নয়, স্বাধীন পুঁজিবাদী দেশেও বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে তার রাষ্ট্রযন্ত্রের (বা কোনো বিশেষ রাজনৈতিক প্রতিনিধির) সাময়িক সংঘাত মোটেই বিরল নয়। এক্ষেত্রে কোনো একটি বিশেষ মুহূর্তের বিচ্ছিন্ন কয়েকটি রাজনৈতিক ঘটনা দেখে বিভ্রান্ত হলে চলবে না, বরং লক্ষ্য করতে হবে রাষ্ট্রযন্ত্র মারফৎ **শেষ বিচারে** কোন **শ্রেণীর** স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

শ্রেণী ও তার রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যেকার সম্পর্ককে আমরা যেমন সরল ও সরাসরি মনে করি তা প্রকৃতপক্ষে সঠিক নয়। এখানেও নানা স্বল্পায়ু দ্বন্দ্ব-সংঘাতের আবির্ভাব হয়। বিষয়টিকে বুঝতে গেলে রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র এবং রাষ্ট্রের আপেক্ষিক স্বাধীনতার মার্কসীয় তত্ত্বকে ভালোভাবে বুঝতে হবে।

রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র: "যেহেতু রাষ্ট্রের আবির্ভাব শ্রেণীবিরোধকে সংযত

৫ তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলির ভূমিকা আজ বিশ্ব-রাজনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টরে পরিণত হয়েছে। এমন পাগল কি কেউ আছে যে বলতে পারে যে এদের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদীদের দ্রুত-বর্ধমান দ্বন্দ্বটি একটি মৌলিক শ্রেণীগত দ্বন্দ্ব নয়, তা নেহাৎই সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের সঙ্গে তাদেরই রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের (অর্থাৎ "পুতুল"দের) কতগুলি সাময়িক খিটিমিটির বহিঃপ্রকাশ মাত্র?

করার প্রয়োজন থেকে, এবং সেইসঙ্গে তার উদ্ভব হয় শ্রেণীবিরোধের মধ্যেই, সেজন্য রাষ্ট্র হল সাধারণত সবচেয়ে শক্তিশালী ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রভুত্বকারী শ্রেণীর রাষ্ট্র; এই শ্রেণী রাষ্ট্রের মাধ্যমে রাজনীতির ক্ষেত্রেও আধিপত্যকারী শ্রেণী হয়ে ওঠে এবং তার ফলে নিপীড়িত শ্রেণীর দমন এবং তার শোষণে নতুন হাতিয়ার লাভ করে" ('পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' : এঙ্গেলস)।

রাজনৈতিক প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রের আপেক্ষিক স্বাধীনতা: "গণতন্ত্রী প্রতিনিধিদের সকলকে আসলে দোকানদার বা তাদের উৎসাহী সমর্থক মনে করাও অনুচিত। শিক্ষা ও ব্যক্তিগত অবস্থা অনুযায়ী এদের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য থাকতে পারে। তবু পেটি বুর্জোয়ারা জীবনের ক্ষেত্রে যে সীমারেখা অতিক্রম করে না, এরা মানসক্ষেত্রে সেই সীমারেখা অতিক্রম করে না ব'লেই এরা হল পেটি বুর্জোয়ার প্রতিনিধি, সেইজন্যই বৈষয়িক স্বার্থ ও সামাজিক অবস্থার চাপে যেসব সমস্যা ও সমাধানের দিকে পেটি বুর্জোয়ারা যেতে বাধ্য হয়, এরা তত্ত্বগতভাবে ঠিক সেইসব সমস্যা ও সমাধানের দিকেই পৌছায়। সাধারণভাবে, কোনো শ্রেণীর সঙ্গে সেই শ্রেণীর **রাজনৈতিক** ও **সাহিত্যিক প্রতিনিধিদের** সম্পর্কটা এই রকমই হয়" ('লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার' : মার্কস)। "সমাজের সাধারণ স্বার্থ দেখাশোনার জন্য নিজস্ব সংস্থাদি সমাজ গ'ড়ে তুলেছিল প্রথম দিকে সহজ শ্রমবিভাগের মাধ্যমে। এইসব সংস্থা, আর তার যা শীর্ষস্থানীয় সেই রাষ্ট্রশক্তি, কালক্রমে নিজেদের বিশেষ স্বার্থ অনুসরণ করতে গিয়ে সমাজের সেবক থেকে রূপান্তরিত হল সমাজের প্রভুতে। এটা দেখা যায়, দৃষ্টান্তস্বরূপ, শুধু বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের বেলায় নয়, সমভাবে দেখা যাবে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ক্ষেত্রেও। খাস উত্তর আমেরিকাতে 'রাজনীতি-করা' জাতির ভিতরে যেমন স্বতন্ত্র ও শক্তিশালী গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে, তেমনটি আর কোথাও নয়। সেখানে যে-দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল পাল্টা-পাল্টি ক'রে ক্ষমতায় আসীন থাকে, তাদের উভয়কেই আবার চালিত করছে কতগুলি লোক, রাজনীতি নিয়েই যারা ব্যবসা করে…এবং নিজ দল জয়-লাভ করলে যাদের পুরস্কার জোটে বড় বড় পদ।… সমগ্র জাতি শক্তিহীন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রাজনীতিকদের এই দুটি বিরাট জোটের সমক্ষে, যারা বাহ্যত তার সেবক অথচ প্রকৃতপক্ষে তার কর্তা ও লুণ্ঠনকারী" ('ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ', ভূমিকা : এঙ্গেলস)। "শ্রমবিভাগের দিক থেকে বিষয়টিকে বোঝা সবচেয়ে সহজ। সমাজে এমন কতগুলি সাধারণ কাজের উদ্ভব হয়, যা ছাড়া তার চলে না। এই উদ্দেশ্যে যেসব লোক নিয়োগ করা হয় তারা **সমাজের অভ্যন্তরে** শ্রমবিভাগের একটি নতুন শাখা হয়ে দাঁড়ায়। এতে তাদের

বিশেষ স্বার্থের সৃষ্টি হয়—যাদের নিকট থেকে তারা ভারপ্রাপ্ত হয়েছে তাদের স্বার্থ থেকেও সে স্বার্থ স্বতন্ত্র ; তারা শেষোক্তদের অধীনতা থেকে নিজেদের স্বাধীন ক'রে নেয় এবং এইভাবে রাষ্ট্র গ'ড়ে উঠতে থাকে।…নতুন স্বাধীন শক্তিকে প্রধানত উৎপাদনের গতিপ্রকৃতিকে অনুসরণ করতে হয় বটে, তথাপি সে আবার তার অন্তর্নিহিত স্বাধীনতাবলে অর্থাৎ একবার প্রদত্ত ও পরে ক্রমশ বর্ধিত এই আপেক্ষিক স্বাধীনতাবলে উৎপাদনের অবস্থা ও গতিপ্রকৃতির উপর ক্রিয়া করে। এ হচ্ছে দুটি অসম শক্তির পারস্পরিক ক্রিয়া : একদিকে অর্থনৈতিক গতি, এবং অপর দিকে নতুন রাজনৈতিক শক্তি যা যথাসম্ভব স্বাধীনতালাভের চেষ্টা করে এবং একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে যা নিজস্ব একটা গতিও লাভ করে। সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক গতিটা পথ ক'রে নেয় বটে, কিন্তু তাকেও সইতে হয় সেই রাজনৈতিক গতির প্রতি-ক্রিয়া, যা সে নিজেই প্রতিষ্ঠিত করেছে ও আপেক্ষিক স্বাধীনতায় ভূষিত করেছে ; সইতে হয় একদিকে রাষ্ট্রশক্তির এবং অন্যদিকে যুগপৎ-সঞ্জাত বিরোধের প্রতিক্রিয়া" (শ্‌মিদ সমীপে এঙ্গেলসের পত্র, ১৮৯০)।

সুতরাং আমাদের উপমহাদেশের দেশগুলিতে বেশ কয়েক বছরের হিসাবে যদি দেখা যায় যে ঔপনিবেশিক আমলে এ দেশগুলির মাটিতে সাম্রাজ্যবাদীদের এবং মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া-জমিদারদের অর্থনৈতিক স্বার্থের তুলনামূলক অবস্থান যা ছিল তা সামান্য হলেও শেষোক্তদের অনুকূলে পরিবর্তিত হচ্ছে তাহলেই বুঝতে হবে যে রাষ্ট্রক্ষমতা শেষোক্তদেরই হাতে রয়েছে, প্রথমোক্তদের নয়। সেক্ষেত্রে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও জমিদারশ্রেণীর সঙ্গে তাদের রাষ্ট্রযন্ত্রের যত আংশিক সংঘাতই ঘটুক, শেষ বিচারে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও জমিদারদের অর্থনৈতিক স্বার্থই প্রতিষ্ঠিত হবে। পক্ষান্তরে, পুতুল সরকারের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের আংশিক সংঘাত যতই ঘটুক, মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও জমিদারদের স্বার্থের উপর তাদের স্বার্থের প্রাধান্য শেষ পর্যন্ত বাড়বে, বা একই থাকবে, কিংবা অন্তত তেমন তাৎপর্যপূর্ণ হারে কমবে না।

অবশ্য আধা-ঔপনিবেশিক দেশের রাষ্ট্রযন্ত্রের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আরো ঘোরালো হয়ে দাঁড়ায়। সব দেশেই রাজনীতিকরা নিজেদের পদ ব্যবহার ক'রে ব্যক্তিগত ধনসঞ্চয় করে এবং তার জন্য কখনও কখনও এমন কি নিজেদের শ্রেণীর দু-একজন সদস্যের উপরেও আঘাত হানতে পারে। নিজেদের তথা রাষ্ট্রযন্ত্রের আপেক্ষিক স্বাধীনতাই তাদের এ শক্তি জোগায়। কিন্তু আধা-উপনিবেশে রাজ-নীতিকদের এই প্রবণতা আরো শক্তিশালী হতে পারে সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে মদত পাওয়ার ফলে। বিনিময়ে সাম্রাজ্যবাদীরা ঐ দেশে নানা সুবিধা আদায় ক'রে নেয় এবং ঐসব রাজনীতিক তাদের এজেন্টে পরিণত হয়। এইভাবে আমলা-মুৎসুদ্দি পুঁজির দৌরাত্ম্য অভাবনীয় রকম বেড়ে যায়। এরা জনগণ ও

জাতীয় বুর্জোয়াদের তো লুণ্ঠন করেই, মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও জমিদারশ্রেণীর সদস্য-দেরও আঘাত করার ঘটনা এখানে ঘটতে পারে অপেক্ষাকৃত বেশী। উপরন্তু সুষ্ঠু পুঁজি বিনিয়োগের পরিবেশ না থাকায় এদের উপার্জনটা হয় প্রধানত দুর্নীতি ও লুণ্ঠনের পথে, অর্থাৎ আমলা পুঁজি এখানে অনিবার্যভাবেই এক অস্বাভাবিক লুম্পেন চরিত্র পরিগ্রহ করে। এইসবের ফলে এই ধরনের দেশকে নয়া-উপনিবেশের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলাটা খুব অস্বাভাবিক নয়। এই ভুল এড়ানোর জন্য একদিকে যেমন দেখতে হবে শেষ বিচারে কার অর্থনৈতিক স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি অধ্যয়ন করতে হবে আলোচ্য রাষ্ট্রশক্তির অভ্যুদয়ের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াটিকে (ভিয়েতনামের ক্ষেত্রে যা আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তা আমরা সর্বশেষ অধ্যায়ে আলোচনা করব)। বিশেষ ক'রে বাংলাদেশের সমাজ-চরিত্র নির্ধারণের জন্য উপরের কথাগুলি মনে রাখা অবশ্য প্রয়োজন।

অতএব কোনো একটি সরকারকে দেখে কেমন ক'রে বোঝা যাবে, তা বিদেশী শাসকদের প্রতিনিধিত্ব করছে, নাকি দেশীয় কোনো আত্মসমর্পণকারী শ্রেণীর? অর্থাৎ তা কি পুতুল সরকার, নাকি নির্ভরশীল সরকার?

প্রথমত পুতুল সরকারের ক্ষেত্রে কিছু না কিছু প্রত্যক্ষ সাম্রাজ্যবাদী উপস্থিতি থাকবেই, হোক তা "উপদেষ্টা"র ছদ্মবেশে। দ্বিতীয়ত নির্ভরশীল সরকার কিছু না কিছু স্বাধীন ভূমিকা নেবেই (যেমন মুজিব সরকার আজ রুশ-ভারতের থেকে অনেকাংশে স্বাধীন ভূমিকা নিচ্ছে); এটা যদি সাম্রাজ্যবাদীদের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগেও হয় তাতেও মূল বিষয়টির হেরফের হয় না। তৃতীয়ত নির্ভরশীল সরকার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও কিছু না কিছু স্বাধীন ভূমিকা নেবেই এবং সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক প্রাধান্যের আওতাতেই নিজের শ্রেণীর অধিকতর অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটাবে (ভারত ও পাকিস্তানে যা হয়েছে ব'লে জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকরাও স্বীকার করেন); বাংলাদেশে অবশ্য এই প্রক্রিয়া এখনও তেমন স্পষ্ট নয়, কারণ বিদ্যমান সম্পদের লুণ্ঠন ও পুনর্বণ্টনেই রাজনীতি-করা এখনও ব্যস্ত এবং তা শেষ হলেই যে উল্লিখিত প্রক্রিয়াটি শুরু হবে তা স্থিরনিশ্চিত[৬]। চতুর্থত দ্বিতীয় ও তৃতীয় নিরিখটিকে দুয়েক বছরের ভিত্তিতে

৬ এই দাবীর ভিত্তি আমাদের কোনো মনগড়া তত্ত্ব নয়, বরং একটি অকাট্য মার্কসীয় সিদ্ধান্ত। অন্যান্য দিক থেকে (যেমন রাষ্ট্রটির অভ্যুদয়ের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতের বিচারে) যদি দেখা যায় যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে তবে এ বিষয়ে স্থিরনিশ্চিত থাকা যায় যে জাতীয় পুঁজি-বাদের বিকাশে তা অনুকূল প্রভাব বিস্তার করবেই: "জাতিগত সম্পর্কাবলীর দৃষ্টিকোণ থেকে, জাতীয় রাষ্ট্র নিঃসন্দেহে পুঁজিবাদের বিকাশের সর্বোত্তম শর্তসমূহ জুগিয়ে দেয়" ('জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্বন্ধে': লেনিন)। অবশ্য, উপমহাদেশের দেশগুলি রাজনৈতিক

বিচার করতে চাওয়াটা অবাস্তব হবে, তা বিচার করতে হবে দীর্ঘতর সময়কালের গড়পড়তা ভিত্তিতে [এখানে যে বিষয়টা খুব শিথিলভাবে বলা হয়েছে, পরিসংখ্যান-বিদ্যায় 'ট্রেণ্ড' কথাটির দ্বারা সম্ভবত সেটাকেই আরো যথাযথভাবে প্রকাশ করা হয়ে থাকে]। পঞ্চমত আলোচ্য রাষ্ট্রের উদ্ভবের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতটিও বিচার্য। ষষ্ঠত ভিয়েতনামের পরবর্তী ইতিহাস আপাত-স্ববিরোধী যে শিক্ষাটি দেয় তা হল এই যে বিশুদ্ধ নয়া-ঔপনিবেশিক কায়দায় কোনো দেশকে সাধারণত নয়া-উপনিবেশে পরিণত করা যায় না বা নয়া-উপনিবেশরূপে টিঁকিয়ে রাখা যায় না; দেশীয় শ্রেণীগুলিকে পুরোপুরি ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য বা জনতার সংগ্রামের মুখে পুতুল সরকারকে টিঁকিয়ে রাখার জন্য সাম্রাজ্যবাদকে কোনো না কোনো সময় এবং কোনো না কোনো পরিমাণে সাবেক ঔপনিবেশিক কায়দাও গ্রহণ করতে হয়।

আমাদের মতে এই ছটি নিরিখের সবগুলির (একটি-দুটির নয়) ভিত্তিতেই উপমহাদেশের তথা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে বিচার করার চেষ্টা করতে হবে। কেবলমাত্র তাহলেই আমরা সঠিকভাবে চিনতে পারব এদের মধ্যে কোনোটা নয়া-উপনিবেশ কিনা।

তবু এত কিছুর পরেও কিন্তু আধা-উপনিবেশ ও নয়া-উপনিবেশের (বা উপ-নিবেশের) মধ্যেকার পার্থক্য সম্বন্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটি বলা বাকী থেকে যায়।

উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশ উভয় ক্ষেত্রেই সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য থাকে এবং উভয় ক্ষেত্রেই মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ারা হয় সাম্রাজ্যবাদের ছোটো শরিক—আধা-উপনিবেশেও তারা বড় শরিক হয় না। কাজেই এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য করার জন্য—অর্থাৎ রাষ্ট্রক্ষমতা দেশী কোনো শ্রেণীর হাতে আছে না বিদেশী শ্রেণীর হাতে, তা নিরূপণ করার জন্য—দেশীয় রাজনীতি ও অর্থনীতিতে দেশী ও বিদেশী নিয়ন্ত্রণের তুলনামূলক পরিমাণ একটা নির্ভরযোগ্য ভিত্তি হতে পারে না। লেনিন যখন "শতকরা নব্বইভাগ উপনিবেশ"কেও আধা-উপনিবেশ বলেন, তখনই তা স্পষ্ট ধরা পড়ে। শ্রেণী ও রাষ্ট্র-সম্পর্কিত মার্কসীয় তত্ত্ব প্রয়োগের

স্বাধীনতা লাভ করেছে এই যুক্তিতে "সমাজতান্ত্রিক" বিপ্লবের প্রবক্তারা এদের নির্ভরশীল তথা আধা-ঔপনিবেশিক চরিত্র অস্বীকার করেন এবং বলেন যে এগুলো পুরোপুরিই স্বাধীন। তাঁরা এর দ্বারা রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার দ্বান্দ্বিক সম্পর্ককে নস্যাৎ ক'রে দেন। পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া পূর্ণ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অসম্ভব—প্রথমটি দ্বিতীয়টির পূর্বশর্ত। কিন্তু পূর্ণ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়াও রাজনৈতিক স্বাধীনতা তথা জাতীয় রাষ্ট্র অর্জিত হতে পারে, যদিও শেষ বিচারে তারা অবিচ্ছেদ্য এবং "অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া একটি দেশের স্বাধীনতা অসম্পূর্ণ ও অরক্ষিত" (চীনা প্রতিনিধির বক্তৃতা, পৃঃ ৪১ দেখুন)। ১৯০৯-১৬ সালে আর্জেন্টিনায় জাতীয় রাষ্ট্র থাকা সত্ত্বেও লেনিন তাই তাকে স্বাধীন দেশ বলেননি, বলেছিলেন "নির্ভরশীল দেশ"।

[উপরন্তু পরবর্তী ইতিহাস বাংলাদেশ সম্বন্ধে এই ভবিষ্যদ্বাণীকে নিখুঁতভাবে সফল করেছে।]

ক্ষেত্রে এটাই আধা-উপনিবেশের **অনন্য বিশিষ্টতা**।

কাজেই উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশের পার্থক্যটা একটা **গুণগত** পার্থক্য —রাষ্ট্রক্ষমতা দেশী কোনো শ্রেণীর হাতে না বিদেশী কোনো শ্রেণীর হাতে, তার পার্থক্য ; **এবং এই গুণগত পার্থক্যটা মোটেও নিছক বিদেশী নিয়ন্ত্রণের পরিমাণের ভিত্তিতে রচিত নয়**। জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকদের একটা বিরাট ভুল এই যে তাঁরা মনে করেন, উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশের মধ্যেকার পার্থক্য হল বিদেশী নিয়ন্ত্রণের **পরিমাণের** পার্থক্য। কিন্তু তাহলে উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশের মধ্যেকার গুণগত পার্থক্যটি কিসের ভিত্তিতে রচিত ? এই প্রশ্নটা আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

বিদেশী নিয়ন্ত্রণ পরিমাণগতভাবে প্রধান হলেও আমরা একটা দেশকে আধা-উপনিবেশ বলতে পারি যদি রাষ্ট্রক্ষমতা দেশীয় কোনো শ্রেণীর হাতে থাকে। কিন্তু বিদেশী নিয়ন্ত্রণ পরিমাণগতভাবে প্রধান হলেও কিসের নিরিখে আমরা দেশীয় শ্রেণীর হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা থাকার কথা বলতে পারি ?

হ্যাঁ, সেই নিরিখ আছে এবং তা হল **বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক—যা উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশে সম্পূর্ণ বিপরীত হয়**। এ বিষয়ে আমরা পঞ্চম অধ্যায়ে (২নং অংশের তৃতীয় শিক্ষা দ্রষ্টব্য) বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখন পর্যন্ত এটাই হল উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশকে পৃথক করার সবচেয়ে নিশ্চিত, তীক্ষ্ণ ও সহজ নিরিখ।

আমাদের মতো দেশগুলিতে শ্রেণী ও রাষ্ট্রযন্ত্রের সম্পর্ক-বিচারের দিক থেকে আরেকটা প্রশ্ন বিবেচনার অপেক্ষা রাখে। উপমহাদেশের দেশগুলিকে যাঁরা আধা-উপনিবেশ না ব'লে নয়া-উপনিবেশ বলতে চান, কিংবা একই সঙ্গে দুটো বর্গই ব্যবহার করতে চান, তাঁদের মধ্যে একটা যুক্তি বেশ প্রচলিত : প্রাক্-বিপ্লব চীনে সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থা দুটোই ছিল আধা-ঔপনিবেশিক (ও আধা-সামন্তবাদী), কিন্তু আমাদের দেশগুলিতে সমাজব্যবস্থাটা আধা-ঔপনিবেশিক হলেও রাষ্ট্রব্যবস্থাটা নয়া-ঔপনিবেশিক—তাই এ দেশগুলিকে নয়া-উপনিবেশ বলা যায়। চারু মজুমদার নিজেও এই যুক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার মধ্যে এক দুর্বোধ্য বৈপরীত্য খাড়া ক'রে এই যুক্তির প্রবক্তারা যে কি বলতে চান তা তাঁরাই বোঝেন। এটার যদি কোনো অর্থ থাকে তবে তা এই হতে পারে যে আধা-ঔপনিবেশিক চীনের রাষ্ট্রযন্ত্রটা ইতিপূর্বেকার কোনো ঔপনিবেশিক আমল থেকে উঠে আসেনি ; পক্ষান্তরে আমাদের দেশগুলির রাষ্ট্রযন্ত্রটা সাম্রাজ্যবাদীদের তৈরী, দেশীয় শাসকশ্রেণীগুলি

ঔপনিবেশিক আমল থেকে তাকে উত্তরাধিকারসূত্রে রেডিমেড লাভ ক'রে তার উপর এক "নয়া" পালিশ লাগিয়ে দিয়েছে মাত্র।

কথাটা সত্য, কিন্তু তাতে হয়েছেটা কি? এক শোষকশ্রেণীর স্থলে আরেক শোষকশ্রেণী যখন ক্ষমতায় আসে তখন কোনো ক্ষেত্রেই তো রাষ্ট্রযন্ত্রের আমূল পুনর্গঠন আবশ্যক হয় না। রাষ্ট্রযন্ত্রের গঠনপ্রকৃতি মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকলেও তা বিভিন্ন শোষকশ্রেণীর হাতিয়ারে পরিণত হতে পারে এবং সেই অনুযায়ী তার শ্রেণীচরিত্র বদলে যায়। সামন্ত যুগের রাষ্ট্রযন্ত্র মোটামুটি অপরিবর্তিত অবস্থাতেই ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশগুলির বুর্জোয়াদের নিকট হস্তান্তরিত হয়ে বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রে পরিণত হয়েছিল। পুরোনো রাষ্ট্রযন্ত্রকে আমূল ধ্বংস ক'রে নতুন রাষ্ট্রযন্ত্র গ'ড়ে তোলার প্রয়োজন হয় কেবল সর্বশোষণের অবসানকারী সর্বহারা বিপ্লবের বেলায়।

সুতরাং ঔপনিবেশিক আমলের রাষ্ট্রযন্ত্র অটুট থাকার যুক্তিতেও এই দেশগুলির মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও জমিদারশ্রেণীকে রাষ্ট্রক্ষমতাহীন ব'লে প্রমাণ করা যায় না, আর তাই প্রমাণ করা যায় না এ দেশগুলিকে নয়া-উপনিবেশ ব'লেও।

৮. কয়েকটি সম্ভাব্য আপত্তির জবাবে

এক ॥ "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ কমেনি বরং বেড়েছে এবং এসব দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির উপর সাম্রাজ্যবাদের নিয়ন্ত্রণ আজও অটুট আছে। অতএব এই দেশগুলো আধা-উপনিবেশ নয়, নয়া-উপনিবেশ (=উপনিবেশের অন্তর্বস্তুর অর্থে)।"

জবাব ॥ দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিব উপর নিছক সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণেব প্রাধান্য দিয়ে আধা-ঔপনিবেশকে নয়া-উপনিবেশে পরিণত করা যায় না, বন্ধুগণ! আধা-ঔপনিবেশিক চীনের বেলায় মাও বলেছিলেন: "কেবল চীনের মোক্ষম ফিনান্সীয় ও অর্থনৈতিক ধমনীগুলিকেই নয়, তার প্রশাসনিক ও বিচারবিভাগীয় ক্ষমতাকেও সাম্রাজ্যবাদ নিয়ন্ত্রণ করে।" জাতীয় পুঁজিবাদ "চীনে প্রধান সামাজিক-অর্থনৈতিক রূপ হয়ে ওঠেনি; তা শক্তিতে দুর্বল এবং বিভিন্ন মাত্রায় তা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় সামন্তবাদের সঙ্গে প্রধানত আবদ্ধ" ('চীন বিপ্লব ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টি')। জাতীয় অর্থনীতিতে এই সাংঘাতিক নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও চীন আধা-উপনিবেশই ছিল, উপনিবেশ নয়। আমাদের মতো দেশগুলিতে, বিশেষত ভারত ও পাকিস্তানে, জাতীয় অর্থনীতিতে ঔপনিবেশিক আধিপত্য সে তুলনায় স্বীকৃতভাবেই অনেক কম (আর তাই চীন পার্টি এসব দেশে ঔপনিবেশিক "অবশেষ"এর কথা বলে)। তবু কেন সেগুলো আধা-উপনিবেশ না হয়ে নয়া-উপনিবেশ (=উপনিবেশের অন্তর্বস্তুর অর্থে) হবে? পক্ষান্তরে, যদিও এসব দেশে ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ নিছক "অবশেষ"এ পর্যবসিত

হয়েছে (এমন কি যদি তা ইতিমধ্যে "অপ্রধান" উপাদানও হয়ে গিয়ে থাকে) তবু কেন সেগুলি আধা-উপনিবেশ হতে পারে এবং কেন সেগুলিকে স্বাধীন বলা ভুল হতে পারে, তা আমরা পরে আলোচনা করব।

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা আরো দেখাব : যদিও আমাদের দেশগুলিতে পুঁজিবাদী অর্থনীতি এই দেশগুলিরই কয়েক যুগ আগের অবস্থার তুলনায় এবং প্রাক্-বিপ্লব চীনের তুলনায় অনেক বেশী ব্যাপক (এমন কি যদি তা ইতিমধ্যে "প্রধান" উপাদানেও পরিণত হয়ে গিয়ে থাকে) তবু কেন এদের অর্থনীতি পুঁজিবাদীর পরিবর্তে আধা-সামন্তবাদী হতে পারে। কিন্তু আপাতত যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হল এই যে সামাজিক বিবর্তন স্বভাবতই থেমে থাকেনি এবং তাকে স্বভাবতই অগ্রসর হতে হয়েছে পুঁজিবাদের পথেই। তার মানে আমাদের অর্থনীতিগুলিতে পুঁজিবাদী অংশটি স্থির হয়ে থাকেনি, তা প্রসারিত হয়েছে —এটাকে মনে রেখেই সাম্রাজ্যবাদী শোষণ (যার চরিত্র পুঁজিবাদী) বাড়ার বিষয়টিকে বিচার করতে হবে। কেননা দেশীয় অর্থনীতির পুঁজিবাদী অংশটি যদি স্থির থাকত, তবে বৈদেশিক পুঁজিবাদী শোষণ বাড়ার অর্থই হতে পারত জাতীয় পুঁজিবাদের সংকোচন। কিন্তু যেহেতু আমাদের অর্থনীতির মোট পুঁজিবাদী ক্ষেত্রটাই প্রসারিত হয়েছে, তাই বৈদেশিক-পুঁজিবাদী অনুপ্রবেশ বাড়ার পাশাপাশি জাতীয় পুঁজিবাদও বেড়ে থাকতে পারে। অতএব এক্ষেত্রে সঠিক ধারণা পাওয়া যেতে পারে কেবলমাত্র দুটোরই **বাড়ার** চরিত্রকে তুলনা ক'রে। আর তথ্য এ বিষয়ে আমাদের প্রতিপাদ্যকেই প্রতিষ্ঠিত করে : ১৯৪৮-৬০এর পরিসংখ্যান প্রমাণ করে যে এই সময়টুকুতে ভারতে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ যতটা বেড়েছে তার চেয়ে বেশী বেড়েছে ভারতীয় পুঁজি।

উপরন্তু সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বাড়া দিয়ে কি এটা প্রমাণ হয় যে প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক দখলদারী টিঁকিয়ে রাখতে পারলে তা আরো বেশী বাড়ত না ? না, বরং উল্টোটাই তো স্বাভাবিক, কেননা প্রত্যক্ষ দখলদারীই ফিনান্স পুঁজির পক্ষে সবসময়ে লাভজনক। অতএব রাজনৈতিক ক্ষমতা দেশীয় শ্রেণীগুলির হাতে ছেড়ে দেওয়ার ফলে অর্থনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের সুবিধাও যে সাম্রাজ্যবাদকে বেশ কিছু পরিমাণেই দেশীয় শ্রেণীগুলির হাতে ছেড়ে দিতে হয়েছে, সে বিষয়ে মার্কস-বাদীদের কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না। ভারতের তথ্য আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। ১৯৪৭এর পর থেকে পাকিস্তানের শাসকশ্রেণীগুলি যে পাকিস্তানে অধিকতর পুঁজিবাদী বিকাশ ঘটিয়েছিল তা জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকরা নিজেরাই স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁরা গোলমাল লাগান বাংলাদেশের বেলায়—বাংলাদেশের শাসকশ্রেণীর ধনসঞ্চয়ের লুম্পেন পদ্ধতি দেখিয়ে তাঁরা বাংলাদেশকে নয়া-উপনিবেশ সাজাতে চান। তাঁদের নিকট আমাদের প্রশ্ন হল : ১৯৭১এর পর থেকে বাংলাদেশের পেটি বুর্জোয়া ও মাঝারি বুর্জোয়াশ্রেণীর

মধ্য থেকে একটা অংশ দ্রুত নিজেদের তহবিল স্ফীত করেছে কিনা? এই কাজে তারা রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করেছে কিনা এবং তা করতে গিয়ে কখনও কখনও তারা তাদের বৈদেশিক প্রভুদের বিরক্তিও উদ্রেক করেছে কিনা? তা যদি হয়ে থাকে তবে এদেরই একটা অংশ এবার শিল্প ও ব্যবসায়ে নামবে এবং এইভাবে পুরোনো আমলা-মুৎসুদ্দি শ্রেণীটির সঙ্গে একাকার হয়ে যাবে। রাষ্ট্রশক্তিও পরিচালিত হবে এই পুনর্গঠিত শ্রেণীটিরই নেতৃত্বে। তার লক্ষণ ইতিমধ্যেই সুপরিস্ফুট[৭]।

দুই ॥ "যেসব নিরিখ ও নীতি আপনারা পেশ করছেন, কোনো নির্দিষ্ট, মূর্ত ক্ষেত্রে সেগুলো কি প্রয়োগ করা সম্ভব?"

জবাব ॥ এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে প্রাক্তন উপনিবেশগুলির মধ্যে ভারতই ছিল পুঁজিবাদী পথে সর্বাধিক বিকশিত। আজও পশ্চাৎপদ অ-সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে ভারতই অগ্রসর দেশগুলির অন্যতম। মার্কসীয় পদ্ধতি অনুযায়ী কোনো এক বিশেষ সমাজরূপকে তার কোনো অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ নমুনার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার না ক'রে তার সর্বাধিক বিকশিত নমুনার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করাই সঠিক। তাই আজকের পশ্চাৎপদ অ-সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির টিপিক্যাল দৃষ্টান্তরূপে ভারতকে নেওয়া [বিশেষত এই উপমহাদেশের ক্ষেত্রে] এবং তারপরে তারই আলোকে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশগুলিকে পরীক্ষা করাটাই বিজ্ঞানসম্মত হবে।

'বৃটেনেও তো মার্কিন অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, কিন্তু বৃটেন কি তাই ব'লে আধা-উপনিবেশ?'—এই ধরনের যুক্তি দিয়ে "সমাজতান্ত্রিক" বিপ্লবের ফেরীওয়ালারা ভারতকে 'স্বাধীন' প্রতিপন্ন করতে চান। বৃটেনের উপর মার্কিন অর্থনৈতিক কব্জার পরিমাণ ও গুণগত চরিত্রের সঙ্গে ভারতের উপর বিদেশী অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের পরিমাণ ও গুণগত চরিত্রের তফাৎকে তাঁরা গুলিয়ে দেন। কয়েক বৎসর আগের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বৃটেনের জাতীয় অর্থনীতির শতকরা দশভাগ মার্কিন-কবলিত। নিঃসন্দেহে এটা বৃটেনের স্বাধীনতার প্রতি এক গুরুতর হুমকি, কিন্তু তাকে এখনই আধা-উপনিবেশে পরিণত করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাছাড়া ভারতে বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণের গুণগত বৈশিষ্ট্য হল এই যে তা ভারতের জাতীয় অর্থনীতির সবকটি প্রাণকেন্দ্রে আজও অটুট ও প্রায় একচ্ছত্র। বৃটেনে কি তাই? উপরন্তু বৃটেনের মতো দেশকে যদি কখনও কথাচ্ছলে আধা-উপনিবেশ বলাও হয়, তবু ভারতের আধা-ঔপনিবেশিক (ও আধা-সামন্তবাদী) চরিত্রের সঙ্গে তার গুণগত তফাৎ থাকে এবং তা আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে

৭ [আগেই বলা হয়েছে যে বইটি লেখার সময় যেগুলি ছিল "লক্ষণ" মাত্র, বাংলাদেশের পরবর্তী ইতিহাসে সেগুলি সুপরিণত ঘটনা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে।]

উদ্‌ঘাটন ক'রে দেখিয়েছি।

আরেক দল (জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকরা) আবার ভারতের অর্থনীতিতে বৈদেশিক প্রাধান্য অটুট থাকায় যুক্তিতে বলতে চান যে আজও তা উপনিবেশই রয়ে গেছে এবং ১৯৪৭এর পরে তা উপনিবেশ থেকে গুণগতভাবে আধা-উপনিবেশে পরিণত হয়নি। তাঁরা ভুলে যান যে আধা-উপনিবেশেরও আভ্যন্তরীণ পুঁজিবাদে বিদেশী পুঁজিবাদ বড় শরিক হতে পারে, আবার উপনিবেশেও দেশীয় পুঁজিপতিরা কিছু না কিছু শরিকানা পায়ই। অতএব সেদিক থেকে উপনিবেশ আর আধা-উপনিবেশের পার্থক্য নিরূপণ করা প্রায় অসম্ভব। তাই ভারতের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক দিক থেকে যদি কিছু বিচার্য থাকে তবে তা এইটুকুই: ১৯৪৭ সালের ক্ষমতা হস্তান্তরের পরে ভারতীয় অর্থনীতির পুঁজিবাদী ক্ষেত্রে বিদেশী ও দেশী পুঁজির আপেক্ষিক পরিমাণে কোনো লক্ষ্যণীয় **পরিবর্তন** ঘটেছে কিনা। যদি ঘ'টে থাকে তবে নিঃসন্দেহে তা আর উপনিবেশ নেই।

এবার আমরা কিছু পরিসংখ্যানের সাহায্যে বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতের আধা-ঔপনিবেশিক চরিত্র বিচার করব এবং ভারত সম্বন্ধে উপরোক্ত দুটি ভ্রান্তিকেই খণ্ডন করার চেষ্টা করব। ১৯৭৩ সালের আগষ্ট সংখ্যা 'অনীক' পত্রিকায় তরুণ রায় তাঁর একটি প্রবন্ধে এই পরিসংখ্যানগুলি ব্যবহার করেছিলেন; তিনি যেসব সূত্র থেকে সেগুলি সংগ্রহ করেছিলেন তা-ও আমরা উল্লেখ ক'রে দিলাম।

রিজার্ভ ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ার (আর. বি. আই এর) হিসাব অনুযায়ী ১৯৪৮ সালের ৩০ জুন ব্যাংকিং, নৌপরিবহন ও বীমা বাদে অন্যান্য ক্ষেত্রে ভারতে মোট বিদেশী বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৫৯৬ কোটি টাকা। ভারতের প্রাইভেট সেক্টরের মোট শিল্প-পুঁজির ৪৪·১% ছিল বিদেশী। "ভারতীয় চা বাগিচার ৮৫%, পাট শিল্পের ৭০-৯৫%, পশম শিল্পের ৬৫-৭৫%, কয়লা শিল্পের ৬১-৭১%, অন্যান্য খনিজ শিল্পের ৭৩%, আভ্যন্তরীণ বাষ্পীয় নৌ-পরিবহনের ৮৫% (১৯৪৫), সোনা ও ম্যাগনেসিয়াম খনির ১০০%, বিদেশগামী জাহাজের ১০০%. আমদানীর ৩৪-৩৯%, রপ্তানীর ৩৭-৪৪%, পেট্রোলিয়ামের ৯৭%, রবার শিল্পের ৯৩%, রবার বাগিচার ৫৪%, দেশলাই শিল্পের ৯০%, আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্যের অর্থের ৬৬%, এবং অ-জীবন বীমা ব্যবসার ৪৭% অংশই ছিল বিদেশী পুঁজির হাতে ('ফরেন ইনভেস্টমেণ্টস ইন ইণ্ডিয়া': কিড্রন; আর. বি. আই. বুলেটিন)। তাছাড়া ফিনান্স, ব্যাংকিং ও বাণিজ্যিক কার্যকলাপেরও প্রধান অংশই ছিল বিদেশী পুঁজির নিয়ন্ত্রণে।" "১৯৪৭ সালে ব্যাংকিং ও ইনসিওরেন্স বাদে দীর্ঘকালীন বিদেশী পুঁজির মোট পরিমাণ ছিল ২৬৪·৬ কোটি টাকা, ১৯৫৮ সালে এর পরিমাণ ছিল ৫৬২·৫ কোটি টাকা এবং ১৯৬৮তে

১৫৪২'৮ কোটি টাকা (আর. বি. আই. বুলেটিন, আগস্ট '৬৯ ও মার্চ '৭১)। এই হিসেবে ১৯৭২ সালের শেষে এর পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে ২০৪০ কোটি টাকা। অর্থাৎ ২৫ বছরে বৃদ্ধির পরিমাণ সাড়ে সাত গুণ।" "...বিড়লার পাঁচটি বৃহৎ যৌথ-উদ্যোগ সংস্থার পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে—বিড়লার প্রতি টাকা পিছু বিনিয়োগের পাশাপাশি বিনিয়োজিত বিদেশী পুঁজির পরিমাণ ২'৩ থেকে ১৩'৬ টাকা" (উদ্ধৃতি, 'ফ্রন্টিয়ার', ২৯ নভেম্বর ১৯৬৮)।

পি. এল. ৪৮০ সূত্রে পাওয়া মার্কিন ঋণের পরিমাণ ১৯৭২ পর্যন্ত ২৮০০০ কোটি টাকা। "ভারতে বেশী দামে খাদ্য বিক্রি-বাবদ পাওয়া এই টাকা ভারতীয় কারেন্সিতে ভারতেই থেকে গেছে, এবং এর ফলে ভারতের মোট টাকার জোগানের বিরাট একটা অংশই এসে গেছে আমেরিকার হাতে।...এই টাকার প্রায় ৮০% তারা ভারত সরকারকে আবার অর্থনৈতিক 'সাহায্য' হিসেবে ধার দিয়ে থাকে, অর্থাৎ নতুন ক'রে এই টাকাকে তারা পুঁজি হিসেবে বিনিয়োজিত করে। ৯% অংশ ভারতের প্রাইভেট সেক্টরে পুঁজি হিসেবে নিয়োজিত হয়। এবং বাকী ১৩% ভারতে মার্কিন সরকারের কাজে অর্থাৎ প্রচার, গুপ্তচরবৃত্তি, অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ ইত্যাদির জন্য ব্যয়িত হয়।" ১৯৬৭তে রাশিয়া 'সাহায্য' দিয়েছে ৪২ কোটি টাকা, কিন্তু ঋণ পরিশোধ বাবদ নিয়েছে ৫৩ কোটি টাকা। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতের মোট বিদেশী ঋণ ছিল ৩২'০৩ কোটি টাকা, আর ১৯৭১-৭২এ ৬৯৮৭ কোটি টাকা—২০ বছরে ২০০ গুণেরও বেশী বৃদ্ধি। "এই বিপুল পরিমাণ বিদেশী 'সাহায্যে'র অধিকাংশই ব্যবহৃত হয় ভারতের পাব্লিক সেক্টরে"—যা ভারতীয় অর্থনীতির ⅔ অংশ অধিকার ক'রে আছে এবং যার "প্রধান স্রষ্টা" রাশিয়া (ব্লিৎজ)। এই পাব্লিক সেক্টর মোটেও সমাজতন্ত্রের হাতিয়ার নয় বরং তা বৃহৎ ও একচেটিয়া আমলা-মুৎসুদ্দি পুঁজিপতিদের প্রাইভেট সেক্টরেরই সেবা করে (অলাভজনক প্রকল্প-গুলিকে তা প্রাইভেট সেক্টরের স্বার্থে সরকারী খরচে চালু রাখে, সুলভ ঋণের সিংহভাগ তুলে দেয় একচেটিয়া গোষ্ঠীর হাতে, ইত্যাদি)। উপরন্তু এই পাব্লিক সেক্টরের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় অর্থনীতিতে বিদেশী নিয়ন্ত্রণও বেড়ে চলেছে। প্রথম পরিকল্পনার সময় থেকে ১৯৭১-৭২ পর্যন্ত সরকারী বিনিয়োগে বিদেশী সাহায্যের অংশ ৯'৬% থেকে ৫ গুণ বেড়ে ৪৭%এ দাঁড়িয়েছে।

ভারতীয় অর্থনীতিতে সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের অবস্থান এই রকম: "ভারতের ভারী যন্ত্রপাতি শিল্পের ৮৫%, ভারী বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির ৬০%, ইস্পাত উৎপাদনের ৩০%, তৈল পরিশোধনের ৩৫%, বৈদ্যুতিক শক্তির ২০%, বৈদ্যুতিক মোটরের ৭৫%, তেল নিষ্কাশন ও গবেষণামূলক শিল্প উৎপাদনের ৮০%, অ্যালুমিনিয়ম উৎপাদনের ২৫%, বৈদেশিক বাণিজ্যের ১০-২০% আজ সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের নিয়ন্ত্রণে ('হু রিয়েলি হেলপ্‌স

৫

ইণ্ডিয়া?' : 'মেনস্ট্রীম', ২১ ডিসেম্বর ১৯৬৮)।"

ভারতে সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনের মোট বার্ষিক পরিমাণ কত? ২০০০ কোটি টাকার দীর্ঘকালীন বিদেশী পুঁজিতে ১০% লাভ ধরলেও মোট মুনাফা দাঁড়ায় ২০০ কোটি টাকা (তাও ব্যাংকিং, নৌ-পরিবহন ও ইনসিওরেন্স বাদে)। রয়্যালটি ইত্যাদি ও বিদেশী টেকনিশিয়ানদের আয় বাবদ বেরিয়ে যায় আরো ৫৫ কোটি টাকা। ৭০০০ কোটি টাকার মোট বিদেশী ঋণের উপর অন্তত ৪% হারে মোট বার্ষিক সুদ ২৮০ কোটি টাকা। আমদানী-রপ্তানীর ব্যবধান হিসাবে যায় ২৫৩ কোটি টাকা। সুতরাং মোট সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনের ন্যূনতম বার্ষিক পরিমাণ=২০০+৫৫+২৮০+২৫৩=৭৮৮ কোটি টাকা (খাতীব আনসারী, 'পিপল্‌স পাওয়ার', ডিসেম্বর '৭২; 'ফরেন কোলাবরেশন্‌স ইন ইণ্ডিয়া', আর. বি. আই. ১৯৬৮)। ১৯৫১ সালে এই ধরনের সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনের পরিমাণ ছিল ১২৪.৫২ কোটি টাকা ('ক্রাইসিস অব বৃটেন অ্যাণ্ড দি বৃটিশ এম্পায়ার : রজনী পাম দত্ত)—অর্থাৎ বিশ বছরে এই লুণ্ঠন বেড়েছে ৫ গুণেরও বেশী। "এমন কি নেহরু পর্যন্ত স্বীকার করেছিলেন, বৃটিশ ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশ ১৯৬৩ সালে ভারত থেকে যে পরিমাণ মুনাফা লুটত, ১৯৪৭এর আগেও তারা তত মুনাফা লুটতে পারেনি" ('ইণ্ডিয়া টুডে', ১৯৭০ সংস্করণ : রজনী পাম দত্ত)।

এইসব পরিসংখ্যান দেখার পরে ভারতকে 'স্বাধীন পুঁজিবাদী দেশ' ভাবা এবং ভারত ও বৃটেন উভয় দেশে বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণকে সমগোত্রীয় ভাবা যে কতখানি অযৌক্তিক তা এক লহমায় ধরা পড়ে। কিন্তু ভারত যে আর উপনিবেশ নেই, ১৯৪৭ সালের ক্ষমতা হস্তান্তরের পরে বিদেশী আধিপত্য ও দেশীয় পুঁজি-পতিদের তুলনামূলক অবস্থানে যে সুস্পষ্ট পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে, নিছক অর্থনৈতিক দিক থেকে তার সমর্থনে আমরা কি তথ্য হাজির করতে পারি? ১৯৪৭এর পর থেকে আজ পর্যন্ত বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ বেড়ে থাকলেও, তা যত বেড়েছে তার চেয়ে যে বেশী বেড়েছে ভারতীয় পুঁজি বিনি-য়োগ—তা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। এবার আরেকটি দিক দেখানো যাক।

১৯৪৭এর পূর্বে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের পুঁজি ভারতে বিনিয়োগ করত সরাসরি। তখন সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা থাকায় এটাই ছিল তাদের পুঁজি বিনিয়োগের প্রধান পদ্ধতি। পুঁজি বিনিয়োগের একটা গৌণতর অংশই আসত দেশীয় পুঁজিপতিদের কাছ থেকে। কিন্তু ১৯৪৭ সালে আমলা-মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ারা রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হবার পর থেকে সাম্রাজ্যবাদীদের সরাসরি পুঁজি বিনিয়োগ আগের চেয়ে অনেক বেশী প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে এবং ক্রমেই তাদের বেশী বেশী ক'রে আসতে হচ্ছে দেশীয় পুঁজিপতিদের সঙ্গে যৌথ বিনি-

য়োগের পথে। যদিও এই ধরনের যৌথ বিনিয়োগ ১৯৪৭এর আগেই শুরু হয়েছিল তবু "১৯৪৭ সালে বিদেশী পুঁজির যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শিল্প বা ব্যবসায়িক সংস্থার সংখ্যা ছিল ৫০এরও কম। ১৯৫৭ সালে এটা বেড়ে দাঁড়ায় ৪৪৭, ১৯৬০এ ১০৮০, ১৯৬৫তে ২৭৬৪ এবং ১৯৭০এ ৩৫৫৭। এই হিসেবে ১৯৭২এর শেষে এর পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে খুব কম ক'রেও ৪০০০ ('ইকনমিক টাইমস', ২৪ অক্টোবর '৭২)। অর্থাৎ গত ২৫ বছরে যৌথ উদ্যোগের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে"—হ্যাঁ—"৮০ গুণ।" জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকরা একবার চিন্তা ক'রে দেখুন: রাষ্ট্রক্ষমতা সত্যিই হস্তান্তরিত হয়েছে কিনা, নাকি তা নেহাৎই একটা "আনুষ্ঠানিক ব্যাপার" ও একটা নিছক "রূপের বদল" মাত্র। জবাব দিন: কেন ঠিক ১৯৪৭এর পর থেকেই বিদেশী বিনিয়োগকে বাড়তে হচ্ছে প্রধানত যৌথ উদ্যোগেরই পথে, কেন সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতের বৃহৎ বুর্জোয়াকে আগের চেয়ে এত বেশী গুরুত্ব দিতে বাধ্য হচ্ছে? আমরা জানি, তার কারণ হল বৃহৎ বুর্জোয়ার হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা অর্থাৎ ঔপনিবেশিক অবস্থা থেকে আধা-ঔপনিবেশিক অবস্থায় ভারতের উত্তরণ।

তিন ॥ "চীন পার্টি বলেছে: 'নয়া-উপনিবেশবাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদীরা কতগুলি অঞ্চলে তাদের প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক শাসনের পদ্ধতি বদলাতে এবং তাদের বাছাই-করা ও শিক্ষা-দেওয়া এজেন্টদের উপর নির্ভর ক'রে নতুন ধরনের ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের পদ্ধতি নিতে বাধ্য হয়।' তার মানে সাম্রাজ্যবাদীদের ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের পুরোনো রূপ ও পদ্ধতির স্থলে নতুন রূপ ও পদ্ধতি এসেছে মাত্র। অতএব পুরোনো উপনিবেশগুলিও আজ নয়া-উপনিবেশে পরিণত হয়েছে মাত্র—এর বেশী আর কিছুই নয়।"

জবাব ॥ নয়া-উপনিবেশবাদের মধ্যে কতটুকু "নয়া" তা আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি। কিন্তু সে প্রশ্ন বাদ দিলেও এটা একটা অদ্ভুত যুক্তি। সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের অন্তর্নিহিত চরিত্র ও সারবস্তুতে যেহেতু কোনো পরিবর্তনই ঘটেনি, অতএব তাদের সক্রিয়তার পরিবেশেও কোনো পরিবর্তন ঘটতে পারে না এবং তাদের শাসন-শোষণের কবলিত উপনিবেশগুলির অবস্থা-তেও কোনো হেরফের ঘটতে পারে না—এই উদ্ভট চিন্তার উপর যুক্তিটি দণ্ডায়মান। কিন্তু সনাতন উপনিবেশবাদ যে দেশের উপর প্রযুক্ত হত তাই কি অনিবার্যভাবে উপনিবেশ হয়ে যেত? তা যে হত না তার প্রমাণ আধা-ঔপনিবেশিক চীন। তাহলে নয়া-উপনিবেশবাদ আজ যেসব দেশের উপর প্রযুক্ত হচ্ছে সেগুলিই বা অনিবার্যভাবে নয়া-উপনিবেশ হবে কেন? কেন সেগুলি আধা-উপনিবেশ হতে পারবে না? 'নয়া-উপনিবেশবাদ' থেকে এক লাফে 'নয়া-উপনিবেশ'এ পৌঁছে যাবার যুক্তি কি? এখানেও একটা "মাঝামাঝি পর্যায়"এর

উদ্ভব হতে পারবে না কেন ?

যেখানেই নয়া-উপনিবেশবাদ প্রযুক্ত হয় সেখানেই নয়া-উপনিবেশের উদ্ভব ঘটে, আলোচ্য দেশটির নির্ভরশীলতা এবং অধীনতার স্তর ও প্রকৃতি বিচারের আর কোনো প্রয়োজন সেখানে থাকে না—ভাবতে অবাক লাগলেও এই শিশুসুলভ আষাঢ়ে তত্ত্বই জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকদের সমস্ত বিভ্রান্তির একটি প্রধান উৎস। এঁদের তত্ত্ব অনুযায়ী বৃটেন, ভারত, দক্ষিণ ভিয়েতনামের অধিকৃত অঞ্চল প্রভৃতি সবগুলিকেই 'নয়া-উপনিবেশ' বর্গের আওতায় ফেলা উচিত, কেননা সবগুলিই নয়া-ঔপনিবেশিক পদ্ধতির সম্মুখীন !

প্রমাণস্বরূপ প্রথমে "সাম্যবাদী"দের বক্তব্য নেওয়া যাক, যাঁরা 'নয়া-উপনিবেশ' বর্গটিকে উপনিবেশের অন্তর্বস্তুগত অর্থে গ্রহণ করেন। তাঁরা "পুতুল সরকার" "নির্ভরশীল সরকার" ও "নিয়ন্ত্রিত সরকার" এই তিনটিকেই "নয়া-উপনিবেশ" নামে অভিহিত করেছেন। অথচ এতক্ষণের আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পেয়েছি যে এদের মধ্যে একমাত্র প্রথমটির ক্ষেত্রেই উপনিবেশের অন্তর্বস্তুর উদ্ভব ঘটে, বাকী দুটি থাকে "মাঝামাঝি পর্যায়"এ অর্থাৎ আধা-ঔপনিবেশিক অবস্থায়। সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের পরোক্ষতা অর্থাৎ নিছক রূপগত দিকটি ছাড়া এদের মধ্যে আর কোনো মিলই নেই[৮]। কিন্তু "সাম্যবাদী"রা জাতীয় দ্বন্দ্বকে প্রধান করার তাগিদে সেই রূপগত সাদৃশ্যটাকেই আঁকড়ে ধরলেন এবং তার আড়ালে মুছে দিলেন প্রধান দ্বন্দ্ব নির্ধারণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিরিখটিকে অর্থাৎ উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশের অন্তর্বস্তুগত পার্থক্যকে। কিন্তু এত স্থূল হাত-সাফাইয়ের দিন যে শেষ হয়ে গেছে, শ্রদ্ধেয় নেতৃবৃন্দ !

আবার এই উপমহাদেশের দেশগুলিকে যাঁরা আধা-উপনিবেশ মনে করেন তাঁদের অবস্থাটা কি ? তারাও প্রায় সকলেই উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশের অন্তর্বস্তুগত পার্থক্য মুছে দেন এবং সব নয়া-উপনিবেশকেই আধা-উপনিবেশের সমার্থক বা কাছাকাছি ব'লে গণ্য করেন। এঁদের অনেকেই এতদিন সামন্ত দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষক ছিলেন, এবং তা স্বাভাবিকও বটে, কেননা নয়া-উপনিবেশকে অন্তর্বস্তুর দিক থেকে তাঁরা আধা-উপনিবেশই মনে করতেন। আজ যখন তাঁরা জাতীয় দ্বন্দ্বের স্থায়ী প্রাধান্য-ঘোষকদের দলে ভিড়বেন ব'লে ঠিক করেছেন তখন 'নয়া-উপনিবেশ' বর্গটি ও তার ব্যাখ্যায় এই বিশৃঙ্খলাটি তাঁদের সাহায্য করেছে খুব। 'নয়া-উপনিবেশ' বর্গটা বজায় রেখেই তাঁরা গোপনে তার অর্থটা বদলে দিতে পারছেন, আধা-উপনিবেশের ধারণা পরিত্যাগ ক'রে অলক্ষ্যে তাঁরা এগিয়ে যেতে পারছেন উপনিবেশের ধারণার দিকে এবং 'নয়া-উপনিবেশ'

৮ [পরে অবশ্য বুঝতে পারি ('সম্পাদকের কৈফিয়ৎ জবাবে', ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য) যে এদের মধ্যে এমন কি এই রূপগত মিলটাও নেই, কেননা নয়া-উপনিবেশেও সাম্রাজ্যবাদী শাসন উপনিবেশের মতোই প্রত্যক্ষ, আধা-উপনিবেশের মতো পরোক্ষ নয়।]

নামটার আড়ালে ঢেকে রাখতে পারছেন তাঁদের জামা-বদল। এঁরা এখনও সরাসরি ও খোলাখুলি উপনিবেশের ধারণাকে গ্রহণ করেননি, কিন্তু গুঁড়ি মেরে এগিয়ে যাচ্ছেন সেইদিকেই। পাঠকরা আমাদের ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ রাখবেন: জাতীয় দ্বন্দ্বকে স্থায়ীভাবে প্রধান করার যে লাইন তাঁরা গ্রহণ করেছেন তা তাঁদের চক্ষুলজ্জা হরণ করবেই, আলোচ্য দেশগুলিকে অন্তর্বস্তুর দিক থেকে উপনিবেশ ব'লে গ্রহণ করার পরিণতিতে তাঁদের পৌছাতে হবেই[৯]।

'নয়া-উপনিবেশ' বর্গটার সংজ্ঞা নিয়ে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মহলে বিভ্রান্তি যে কত ব্যাপক তার আরেকটি দৃষ্টান্ত দেখুন। সি, পি আই.।(এম-এল)এর কর্মসূচীতে (১৯৭০) ভারতকে একবার বলা হয়েছে আধা-উপনিবেশ, আরেকবার বলা হয়েছে রুশ-মার্কিনের নয়া-উপনিবেশ। তার মানে সেখানে আধা-উপনিবেশ ও নয়া-উপনিবেশকে সমার্থক ধরা হয়েছে। তার উপর ভিত্তি ক'রে তাতে তখন সামন্ত দ্বন্দ্বকেই প্রধান ব'লে নির্দেশ করা হয়েছিল। আবার ১৯৭১এর ১৬ই ডিসেম্বরের পরেই বাংলাদেশকে বলা হল নয়া-উপনিবেশ, কিন্তু তার ক্ষেত্রে জাতীয় দ্বন্দ্বকে প্রধান করা হল। কারণ কি? না, বাংলাদেশে "বৈদেশিক আক্রমণ" ঘটেছে। আমরা পরে দেখাব যে বাংলাদেশে বৈদেশিক আক্রমণ আসলে ঘটেনি, তা ঘটেছিল পাকিস্তানে। কিন্তু সে কথা বাদ দিলেও প্রশ্ন থাকে: আধা-উপনিবেশেও তো বৈদেশিক আক্রমণ ঘটলে জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান হয়[১০], তাহলে এখানে অতিরিক্ত একটা শব্দ 'নয়া-উপনিবেশ' আমদানী ক'রে বিভ্রান্তি বাড়ানো হচ্ছে কেন?

প্রকৃতপক্ষে 'নয়া-উপনিবেশ' শব্দটির দ্বারা উপনিবেশ, আধা-উপনিবেশ, সামন্ত দ্বন্দ্বের প্রাধান্য, জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য ইত্যাদি সবকিছুই বোঝানো হচ্ছে এবং তার মানে যথাযথভাবে কিছুই বোঝানো হচ্ছে না — নিজেদের চিন্তার অবৈজ্ঞানিক অপরিচ্ছন্নতাকে আড়াল করা হচ্ছে মাত্র। "যেখানেই নয়া-উপনিবেশবাদ সেখানেই নয়া উপনিবেশ" এই ফর্মুলাটি আসলে কিছু "প্রগতিশীল" বিলেতী অর্থনীতিবিদের উদ্ভাবন। আমাদের সুপণ্ডিত নেতৃবৃন্দ তাকে বিনা-সমালোচনায় গ্রহণ ক'রে দেশ ও দশের অশেষ হিতসাধন করেছেন। সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক শোষণের কায়দাটা নতুন হোক আর পুরোনো হোক, তার কবলিত বিভিন্ন দেশের অবস্থাটা কিন্তু সেই আগের মতো তিন রকমেরই হতে পারে: স্বাধীন, পরাধীন আর "মাঝামাঝি পর্যায়"। নয়া-উপনিবেশবাদের আমলেও চতুর্থ

৯ [বাংলাদেশের আলাউদ্দীন সাহেব যে এই ভবিষ্যবাণীকে অক্ষরে অক্ষরে সফল করেছেন তা আমি আগেই উল্লেখ করেছি।]

১০ [অবশ্য এই বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে আমি যে সিদ্ধান্তে পৌছেছি তা হল এই যে আধা-উপনিবেশে বৈদেশিক আক্রমণ ঘটার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান হয়ে যায় না — জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান হওয়ার জন্য বৈদেশিক আক্রমণ আবশ্যক কিন্তু যথেষ্ট নয়।]

কোনো অবস্থা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে চতুর্থ একটি শব্দ আমদানী ক'রে এত· বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার দরকারটা কি? আমাদের দিক থেকে আমরা মনে করি যে নয়া-উপনিবেশবাদের আমলেও 'স্বাধীন', 'উপনিবেশ' ও 'আধা-উপনিবেশ' এই তিনটি বর্গই সব রকম সম্ভাব্য অবস্থা বোঝানোর জন্য যথেষ্ট—কেবল সাম্রাজ্যবাদের নবতর বৈশিষ্ট্য থেকে উদ্ভূত নতুন কিছু বৈশিষ্ট্য খেয়ালে রাখলেই চলবে। অর্থাৎ আমাদের প্রস্তাব: 'নয়া-উপনিবেশবাদ' বর্গটি চলুক, কিন্তু 'নয়া-উপনিবেশ' বর্গটিকে বাদ দিয়ে 'উপনিবেশ' দিয়ে কাজ চালানোটাই ভালো। (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, চীন পার্টি 'নয়া-উপনিবেশবাদ' বর্গটি ব্যবহার করলেও আজ পর্যন্ত কোনো জায়গায় 'নয়া-উপনিবেশ' বর্গটি ব্যবহার করেনি, এমন কি দক্ষিণ ভিয়েতনামকেও তাঁরা সরাসরি উপনিবেশই ব'লে থাকেন।) আর যদি 'নয়া-উপনিবেশ' বর্গটি একান্তই ব্যবহার করতে হয় তবে তার ব্যাখ্যায় এই যথেচ্ছ নৈরাজ্যের অবসান ঘটাতেই হবে, যথাযথ একটি সংজ্ঞা নিরূপণ করতেই হবে [—'নয়া-উপনিবেশ' বর্গটি যাঁরাই ব্যবহার করবেন এটা তাঁদের দায়িত্ব]। মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠিত প্রথা অনুযায়ী নয়া-উপনিবেশের অন্তর্বস্তুগত অর্থ যে উপনিবেশই এবং ভিয়েতনাম ওয়ার্কার্স পার্টি যে এই অর্থেই বর্গটিকে ব্যবহার করেছেন তা আমরা ইতিপূর্বেই দেখিয়েছি।

চার ॥ "একটা স্বাধীন দেশ সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়নের ফলে আধা-উপনিবেশ হতে পারে, যেমন হয়েছিল চীন; কিন্তু যে দেশ একবার উপনিবেশ হয়ে গেছে তা আবার আধা-উপনিবেশ হবে কেমন ক'রে? অন্তর্বস্তুর দিক থেকে হয় তাকে উপনিবেশই থেকে যেতে হবে (রূপের কিছু বদল হতে পারে), নতুবা তাকে স্বাধীন হয়ে যেতে হবে।"

জবাব ॥ নয়া-উপনিবেশওয়ালারা তাঁদের এই প্রিয় যুক্তিটি নিয়ে বড় বেশী হৈ-চৈ ক'রে থাকেন। কিন্তু এইভাবে শুনলে যুক্তিটার মাথামুণ্ড উদ্ধার করা অসম্ভব। একটা দেশ একবার উপনিবেশ হয়ে এমন কি অপরাধ করেছে যে তা কোনোমতেই সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তার সম্পর্কের ক্ষেত্রে অধীনতার "মাঝামাঝি পর্যায়"এ উঠতে পারবে না? আসলে তাঁদের বক্তব্যের মর্মার্থটা হল এই:

> এই উপমহাদেশ প্রথমে ছিল স্বাধীন। পরে প্রধানত বৃটিশ ঔপনিবেশিকদের আক্রমণে তা আধা-উপনিবেশ হয়। তারপর অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলা ও ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সমগ্র ভারত উপনিবেশ হয়ে যায় এবং ১৯৪৭ পর্যন্ত সেই অবস্থাই বলবৎ থাকে। অতএব দ্বন্দ্বতত্ত্বের নাকচনের নাকচন (negation of negation) নিয়ম অনুযায়ী এখানকার দেশগুলি আর কোনোমতেই সেই একদা-অতিক্রান্ত আধা-ঔপনিবেশিক অবস্থায় ফিরতে পারে না, কেননা পূর্ববর্তী কোনো অবস্থায় ফেরা সম্ভব কেবলমাত্র গুণগতভাবে ভিন্ন এক সমাজব্যবস্থার ভিত্তিতেই, অর্থাৎ কেবলমাত্র

সমাজের আধা-সামন্তবাদী চরিত্রের বদল হলে পরেই। তা যখন হয়নি তখন এই দেশগুলিকে উপনিবেশই থেকে যেতে হবে, নতুবা নতুন সমাজব্যবস্থা অর্থাৎ নয়া-গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ভিত্তিতে তাদের সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে যেতে হবে (যেহেতু নয়া-গণতান্ত্রিক দেশ উপনিবেশ বা আধা-উপনিবেশ হতে পারে না)। সুতরাং নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব না হওয়া পর্যন্ত এই দেশগুলি উপনিবেশই থেকে যেতে বাধ্য—শুধু রূপের কিছু পরিবর্তন হয়েছে ব'লে সেগুলোকে নয়া-উপনিবেশ বলতে হবে।

উপনিবেশ হওয়ার আগে এই উপমহাদেশ একটা আধা-ঔপনিবেশিক পর্যায় অতিক্রম করেছিল কিনা, আপাতত সে তর্কে আমরা যাব না। বরং তা মেনে নিয়েই আমরা প্রমাণ করব যে তবু আধা-ঔপনিবেশিক পর্যায়ের পুনরাবৃত্তি মোটেও অসম্ভব নয় এবং তার দ্বারা দ্বন্দ্বতত্ত্বের কোনো নিয়ম লঙ্ঘিত হয় না।

প্রথমে দেখা যাক নাকচনের নাকচন নিয়মটা কি।

বিশ্বজগতের সব কিছুই অবিরাম বিকাশমান। প্রত্যেকটি অবস্থা নাকচ হয়ে পরবর্তী অবস্থার উদ্ভব হচ্ছে এবং তা-ও আবার কালক্রমে নাকচ হয়ে যাচ্ছে। এই বিকাশের পথে যদি কখনও পূর্ববর্তী একটি অবস্থার পুনরাবৃত্তিও ঘটে তবু সেটার একেবারে হুবহু পুনরাবৃত্তি হতে পারে না; পুনরাবৃত্তিটা হয় একটা উচ্চতর ভিত্তিতে, নবতর বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত হয়ে।

একটি বার্লিদানাকে মাটিতে পুঁতলে যথাসময়ে তা নাকচ হয়ে বার্লিগাছ হয়, সেই বার্লিগাছ আবার নাকচ হয়ে পুনর্জন্ম দেয় বার্লিদানার। কিন্তু এই বার্লি-দানার পুনরাবৃত্তিটা হয় পরিমাণগতভাবে একটা উচ্চতর ভিত্তিতে—একটি দানার জায়গায় পাওয়া যায় অনেকগুলো দানা। অতএব নাকচনের নাকচন নিয়ম অনুযায়ী পুনরাবৃত্তি যে কেবল গুণগতভাবে ভিন্ন ভিত্তিতেই হতে পারে তা নয়, পরিমাণগতভাবে ভিন্ন ভিত্তিতেও হতে পারে[১১]।

আবার ডালিয়ার মতো সহজে পরিবর্তনীয় কোনো বীজের বেলায় প্রত্যেকটি পুনরাবৃত্তিতেই পরিমাণগত ও গুণগত পরিবর্তন দুই-ই ঘটতে থাকে।

মানবসমাজের সূচনা হয়েছিল যৌথ মালিকানা দিয়ে। তা নাকচ হয়ে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিণত হল। আজ সেই ব্যক্তিগত মালিকানা নাকচ হয়ে যৌথ মালিকানার পুনরুদ্ভব ঘটতে চলেছে, কিন্তু তা সেই আদিম, প্রাগৈতিহাসিক স্তরের নয়। তার ভিত্তি পরিমাণগত ও গুণগত উভয় দিক থেকেই ভিন্ন।

সংক্ষেপে এই হল 'অ্যান্টি-ড্যুরিং'এ এঙ্গেলসের বর্ণিত নাকচনের নাকচন

১১ [অবশ্য 'পরিমাণ' ও 'গুণ'এর এই রকম পৃথকীকরণের মূল্যও নিতান্ত সীমাবদ্ধ ও আপেক্ষিক।]

নিয়মটি।

এই উপমহাদেশ যখন আধা-উপনিবেশ ছিল ব'লে তাঁরা দাবী করেন তখন এই সমাজের আভ্যন্তরীণ অর্থনীতি ছিল সামন্তবাদী। আজ তা আধা-সামন্তবাদী। অতএব আজ এই গুণগতভাবে ভিন্ন ভিত্তিতে কেন আধা-ঔপনিবেশিক অবস্থার পুনরাবৃত্তি হতে পারবে না?

আবার গুণগতভাবে অভিন্ন আভ্যন্তরীণ অর্থনীতির ভিত্তিতেও যে নির্ভরশীলতার বিভিন্ন পর্যায়ের পুনরাবৃত্তি হতে পারে তার দুটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। প্রথমত ১৯৩৭ পর্যন্ত চীন ছিল আধা-ঔপনিবেশিক, ১৯৩৭-৪৫ সালে তা হয় ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক, কিন্তু ১৯৪৫-৪৯ সালে তার ঔপনিবেশিক অংশগুলো আবার আধা-ঔপনিবেশিক অবস্থায় ফিরে গিয়েছিল এবং সমগ্র চীন আবার পরিণত হয়েছিল আধা-উপনিবেশে—যদিও তার আভ্যন্তরীণ অর্থনীতি ঐ তিনটি পর্যায় জুড়েই ছিল আধা-সামন্তবাদী। এটাকে একটা "আংশিক ব্যাপার" ব'লে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না, কেননা আপনাদের কল্পিত নাকচনের নাকচন "নিয়মটি" (যে গুণগতভাবে পৃথক ভিত্তিতে ছাড়া একটি অবস্থার পুনরাবৃত্তি হতে পারে না) যদি সত্য হয় তবে আংশিকভাবেই বা তা লঙ্ঘিত হয় কেমন ক'রে? দ্বিতীয়ত বেলজিয়াম স্বাধীন থেকে উপনিবেশ ও তা থেকে আবার স্বাধীন হয়েছে, অর্থাৎ তার ক্ষেত্রে একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে যদিও তার অর্থনীতি একই (পুঁজিবাদী) থেকে গেছে। (এইসব ক্ষেত্রে একটি অবস্থা ও তার পুনরাবৃত্তির মাঝখানে পরিমাণগত পরিবর্তন অর্থাৎ পুঁজিবাদের বিকাশের মাত্রাবৃদ্ধি অবশ্যই ঘটেছে।)

কিন্তু এবার অন্য একটি দিক পরীক্ষা করা যাক। জলকে গরম ক'রে আমরা বাষ্প তৈরী করতে পারি, আবার বাষ্পকে ঠাণ্ডা ক'রে ফিরে আসতে পারি একই পরিমাণ জলে। গুণগত বা পরিমাণগত পরিবর্তনের ভিত্তি ছাড়াই জলের পুনরুদ্ভব সম্ভব হচ্ছে কেমন ক'রে? 'জল ফেরৎ আসছে ঠিকই, কিন্তু বিশুদ্ধতর অবস্থায়'--এইসব গোঁজামিল ধোপে টিঁকবে না, কেননা আমরা বিশুদ্ধ জল নিয়ে শুরু ক'রে আবার বিশুদ্ধ জলই ফেরৎ পেতে পারি। নয়া-উপনিবেশওয়ালারা এবার নিশ্চয় চেঁচিয়ে উঠবেন: "আরে জলের দৃষ্টান্তটা তো পরীক্ষাগারে কৃত্রিমভাবে নিয়ন্ত্রিত একটি প্রক্রিয়া—কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা!"···খুবই দুঃখিত, মহাশয়গণ! আপনাদের এ যুক্তিটাও খুবই, যাকে বলে, ছেঁদো। আপনাদের কল্পিত নাকচনের নাকচন নিয়মটি যদি সত্য হয়ে থাকে তবে হাজার কৃত্রিম নিয়ন্ত্রণেও তা লঙ্ঘিত হয় কেমন ক'রে?

কিন্তু তাহলে আসল ব্যাপারটাই বা কি? নাকচনের নাকচন কি তবে সার্বজনীন কোনো নিয়ম নয়? সার্বজনীন নিয়ম হলে জলের এই বিশেষ দৃষ্টান্তে তা খাটছে না কেন? নাকি খাটছে ঠিকই, কিন্তু আমরা ধরতে পারছি না?

"…নাকচনের নাকচনটা কি ? প্রকৃতি, ইতিহাস ও চিন্তার বিকাশের একটি অত্যন্ত সাধারণ—এবং সেই কারণেই অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী ও গুরুত্বপূর্ণ একটি নিয়ম…" ('অ্যান্টি-ড্যুরিং' : এঙ্গেলস)। কিন্তু তা "অত্যন্ত সাধারণ" একটি নিয়ম ব'লেই তা থেকে প্রতিটি বিশেষ প্রক্রিয়ার বিশেষ চরিত্র ও চরিত্রের পরিবর্তন উপপাদন করার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। সাধারণ নিয়মকে অবশ্যই বিশেষ প্রক্রিয়াটি অধ্যয়ন করার দিশারী হিসাবে ব্যবহার করতে হবে, কিন্তু সাধারণ নিয়ম দ্বারা কোনো বিশেষ প্রক্রিয়ার বিশেষ নিয়ম ও তার বিশেষ ফলাফলকে প্রমাণ করা যায় না। বরং উল্টো। বিশেষ প্রক্রিয়াটি অধ্যয়ন ক'রেই তার মধ্যে সাধারণ নিয়মের কার্যকারিতার বিশেষ ধরনটি খুঁজে পেতে হয়।

"নাকচনের নাকচন নিয়ম অনুযায়ী" ঔপনিবেশিক কোনো দেশ আধা-উপনিবেশ "হতে পারে" কিনা—এইভাবে প্রশ্নটিকে উত্থাপন করাই মার্কসবাদের এক গুরুতর লঙ্ঘন। অনুসন্ধানের ধারাটি হওয়া উচিত এই রকম : একটা দেশ কিসে 'স্বাধীন' হয়, কিসে 'উপনিবেশ' হয়, আর কি হলে তা "মাঝামাঝি অবস্থা" অর্থাৎ আধা-ঔপনিবেশিক অবস্থায় থাকে ? সেই নিরিখগুলির ভিত্তিতে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আজ কি অবস্থায় এসে পৌঁছেছে ? এবং এই সমগ্র প্রক্রিয়াটির মধ্যে নাকচনের নাকচন নিয়মটি **কিভাবে** কার্যকর হয়েছে ? অর্থাৎ নয়া-উপনিবেশওয়ালাদের কর্তব্য ছিল সাধারণ নিয়ম নিয়ে কচকচি না ক'রে প্রথমে এই দেশগুলির নির্দিষ্ট অবস্থার নির্দিষ্ট বিশ্লেষণ করা এবং তার মধ্য দিয়ে সাধারণ নিয়মের, অর্থাৎ নাকচনের নাকচন নিয়মের, কার্যকারিতার বিশেষ ধরনটিকে আবিষ্কার করা, কেননা "সাধারণ সত্যের সরল যুক্তিগত সম্প্রসারণের মধ্যে মূর্ত প্রশ্নগুলির জবাব খোঁজার চেষ্টা হল মার্কসবাদের ইতরীকরণ ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের প্রতি ডাহা বিদ্রূপ" ('দি ডেভেলপমেন্ট অব ক্যাপিটালিজম ইন রাশিয়া' : লেনিন)।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ইউরোপে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত ছিল ক্ষুদ্র উৎপাদকদের বিক্ষিপ্ত ব্যক্তি-সম্পত্তি (private property) ও ব্যষ্টি-সম্পত্তি (indivdual property)। পুঁজিবাদ তাকে নাকচ ক'রে ক্ষুদ্র উৎপাদকদের সর্বহারায় পরিণত করল, উদ্ভূত হল কেন্দ্রীভূত পুঁজিবাদী সম্পত্তি। তা আজ আবার নাকচ হওয়ার মুখে ; তার ফলে ব্যষ্টি-সম্পত্তি আবার ফিরে আসবে, কিন্তু তা নবতর ভিত্তিতে, এবং ক্ষুদ্র উৎপাদকদের ব্যক্তি-সম্পত্তি আর ফিরবে না। মার্কস তাঁর 'পুঁজি' গ্রন্থে বলেছেন : "এটা নাকচনের নাকচন। উৎপাদকের জন্য তা ব্যক্তি-সম্পত্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে না, কিন্তু তা তাকে পুঁজিবাদের উপার্জনগুলির অর্থাৎ জমি ও উৎপাদনের যৌথ দখলের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ব্যষ্টি-সম্পত্তি দান করে।" ড্যুরিং আপত্তি তুললেন যে মার্কসের এই সিদ্ধান্তের প্রমাণগত ভিত্তি হল স্রেফ একটা সাধারণ নিয়মে, 'নাকচনের নাকচন' নিয়মে, মার্কসের বদ্ধমূল

বিশ্বাস। এঙ্গেলস তার জবাবে বললেন : "১৯১ পৃষ্ঠায় এবং তার পরবর্তী পৃষ্ঠা-গুলিতে মার্কস তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তগুলিকে পেশ করেছেন, **যেগুলি তিনি পুঁজির তথাকথিত আদিসঞ্চয় সম্বন্ধে তৎপূর্ববর্তী পঞ্চাশ পৃষ্ঠাব্যাপী অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক অনুসন্ধান থেকে নিষ্কাশন করেছেন।** ...এইভাবে প্রক্রিয়াটিকে নাকচনের নাকচনরূপে চরিত্রায়িত করার দ্বারা মার্কস প্রমাণ করতে চান না যে প্রক্রিয়াটি ঐতিহাসিকভাবে আবশ্যিক। বরং উল্টো : **ইতিহাস থেকে** তিনি প্রমাণ করেছেন যে প্রক্রিয়াটি ইতিমধ্যেই আংশিকভাবে ঘ'টে গেছে ও ভবিষ্যতে আংশিকভাবে ঘটবেই, এবং **কেবলমাত্র তার পরেই** তিনি তাকে **উপরন্তু** এমন একটি প্রক্রিয়া ব'লে চরিত্রায়িত করেছেন যা একটি নির্দিষ্ট দ্বান্দ্বিক নিয়ম অনুযায়ী বিকাশলাভ করে" (বড় হরফ আমাদের)।

নয়া-উপনিবেশওয়ালারা যদি প্রথমে "অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক অনুসন্ধান থেকে" এই দেশগুলিকে নয়া-উপনিবেশ ব'লে প্রমাণ করতেন এবং "কেবলমাত্র তার পরেই... তাকে উপরন্তু এমন একটি প্রক্রিয়া ব'লে চরিত্রায়িত" করতেন যার মধ্যে নাকচনের নাকচন নিয়ম ক্রিয়াশীল [এবং দেখাতেন তা **কিভাবে** ক্রিয়াশীল], তাহলে আমাদের কারো কিছু বলার থাকত না, আর তাঁরাও এত ভ্রান্তিতে জড়িয়ে পড়তেন না।

জল-সহ সব কিছুর জন্যই অবিরাম বিকাশ বাধ্যতামূলক এবং তার ফলে নাকচনের নাকচন জলের ক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই প্রযোজ্য। অবশ্য জলের মতো একটি জিনিসের ক্ষেত্রে এই অবিরাম বিকাশ সব সময় প্রত্যক্ষগোচর নয়, নয় নাকচনের নাকচন নিয়মের সক্রিয়তাও : "দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ দাবী করে যে একটা জিনিসকে তার বিকাশে, পরিবর্তনে, 'স্বয়ংগতি'তে (হেগেল যেমন কখনও কখনও বলতেন) গ্রহণ করতে হবে। কাচপাত্রের মতো একটা জিনিসের বেলায় তা তৎক্ষণাৎ প্রত্যক্ষগোচর হয় না, কিন্তু তা-ও নিয়ত-পরিবর্তনশীল—আর এটা বিশেষভাবে সত্য তার উদ্দেশ্য, ব্যবহার এবং চারপাশের দুনিয়ার সঙ্গে তার সংযোগের ক্ষেত্রে" ('ট্রেড ইউনিয়ন সম্বন্ধে আরেকবার' : লেনিন)। সুতরাং জলের "নিজের" মধ্যে কোনো পরিমাণগত বা গুণগত পরিবর্তন ছাড়াই জলের পুনরুদ্ভব হতে পারে এবং নাকচনের নাকচন নিয়মটা তাতে মোটেও লঙ্ঘিত হবে না। কারণ জল "নিজে" পরিমাণগত বা গুণগতভাবে না বদলালেও তার পারিপার্শ্বিকের অন্য সব-কিছু যেহেতু নিত্য-চলমান তাই পুনরুদ্ভবের আগে নিঃসন্দেহেই বদলে গেছে সেই জলের "উদ্দেশ্য, ব্যবহার এবং চারপাশের দুনিয়ার সঙ্গে তার সংযোগ" এবং এই শেষোক্ত অর্থেই বদলে গেছে পুনরাবৃত্তিরও ভিত্তি। এইভাবে অটুট থাকছে 'নাকচনের নাকচন' নিয়ম, কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেত্রে তা ক্রিয়া করছে আগের দৃষ্টান্তগুলির থেকে ভিন্ন ধরনে।

তাহলে নয়া-উপনিবেশওয়ালাদের ভুলগুলো কি কি? প্রথমত তাঁরা নাকচনের

নাকচন নিয়মটাকেই বোঝেননি। তাঁরা ভেবেছেন, নাকচনের নাকচন নিয়ম অনুযায়ী পুনরাবৃত্তির জন্য বুঝি গুণগতভাবেই একটা ভিন্ন ভিত্তি অপরিহার্য। অথচ তা ঠিক নয়। ভিত্তিটা গুণগতভাবে এক থেকেও যদি পরিমাণগতভাবে বদলে থাকে তবে তা-ই পুনরাবৃত্তির জন্য যথেষ্ট। শুধু তাই নয়, একটা জিনিস "নিজে" পরিমাণগত বা গুণগত কোনোভাবেই বিন্দুমাত্র না বদলেও ঠিক পূর্ব-রূপেই ফিরে আসতে পারে, কারণ তার "উদ্দেশ্য, ব্যবহার এবং চারপাশের দুনিয়ার সঙ্গে তার সংযোগ"এর পরিবর্তনই পুনরাবৃত্তির জন্য যথেষ্ট। কাজেই একটা সমাজের আভ্যন্তরীণ অর্থনীতি যদি গুণগত বা পরিমাণগত কোনোভাবেই না-ও বদলে থাকে (এটা অসম্ভব; আমরা নেহাতই তর্কের খাতিরে বলছি) তবু তার ক্ষেত্রে আধা-ঔপনিবেশিক অবস্থার পুনরাবৃত্তি হতে পারে নিছক বহির্জগতের সঙ্গে তার সম্পর্কের পরিবর্তিত ভিত্তিতেই। আমাদের সমাজ যখন আধা-ঔপনিবেশিক ছিল ব'লে তাঁরা দাবী করেন তারপর থেকে "চারপাশের দুনিয়ার সঙ্গে তার সংযোগ" যে বদলে গেছে (যেমন আগে যেখানে ছিল একটা দেশ, আজ সেখানে তিনটা দেশ; আগে সাম্রাজ্যবাদ যত সবল ও উদ্ধত ছিল আজ আর ততটা নেই, ইত্যাদি) এ কথা কে অস্বীকার করবে? অতএব "নাকচনের নাকচন নিয়ম অনুযায়ী" কেন এখানে আধা-ঔপনিবেশিক অবস্থার পুনরাবৃত্তি হতে পারবে না? দ্বিতীয়ত তাঁরা সাধারণ নিয়ম থেকেই একটা বিশেষ ক্ষেত্রের বিশেষ ফলাফলকে উপপাদন করার চেষ্টা করেছেন। এটা মার্কসবাদ-বিরোধী। একই সাধারণ নিয়ম ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কার্যকরী হয়। একটি বিশেষ ক্ষেত্রে তা কি বিশেষ ধরনে কার্যকরী হয়ে কি বিশেষ ফল প্রসব করবে তার হদিশ সেই সাধারণ নিয়মের মধ্যে পাওয়া যায় না—তাকে খুঁজতে হয় সেই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রটির নির্দিষ্ট বিশ্লেষণের মধ্যে। তৃতীয়ত ভারত যে সময় আধা-ঔপনিবেশিক ছিল ব'লে তাঁরা দাবী করেছেন (এ দাবী সত্য কিনা সে কথা স্বতন্ত্র) তখন তার আভ্যন্তরীণ অর্থনীতি ছিল সামন্তবাদী। আজ আর আধা-ঔপনিবেশিক অবস্থার পুনরাবৃত্তি হতে পারে না ব'লে তাঁরা যখন ঘোষণা করেন তখন স্পষ্টই বোঝা যায় যে হয় তাঁরা এ সত্য জানেন না কিংবা তাঁরা বোঝেন না যে সেদিনের সামন্তবাদী অর্থনীতি আর আজকের আধা-সামন্তবাদী অর্থনীতির মধ্যে, কেবল পরিমাণগত নয়, একটা গুণগত পার্থক্যও বিদ্যমান। আর যদি মেনেও নেওয়া যায় যে সামন্তবাদ ও আধা-সামন্তবাদের মধ্যে কেবল পরিমাণগত পার্থক্যই রয়েছে তবু তা-ই কি পুনরাবৃত্তির পক্ষে যথেষ্ট নয়?...আবারও প্রমাণ হয় যে নাকচনের নাকচন নিয়ম সম্বন্ধে শোচনীয় অজ্ঞতাই তাঁদের এই হাস্যকর অবস্থার জন্য দায়ী।

অতএব শেষ পর্যন্ত যা দাঁড়াল তা এই। নাকচনের নাকচন নিয়ম দ্বারা এই উপমহাদেশের দেশগুলির জন্য স্বাধীন, ঔপনিবেশিক, আধা ঔপনিবেশিক প্রভৃতি-

সব অবস্থাই "প্রমাণ" করা যায় এবং এসবের কোনোটাতেই নাকচনের নাকচন লঙ্ঘিত হবে না। কিন্তু তাতে কেবল এটুকুই প্রমাণ হয় যে নাকচনের নাকচন দ্বারা এসবের কোনোকিছুই প্রমাণ হয় না, বিকাশের ঐ গুরুগম্ভীর নিয়মটি এক্ষেত্রে একেবারেই অবান্তর এবং কর্মীসাধারণকে ভড়কে দেওয়ার জন্যই তাঁরা তাঁদের এই কাগুজে বাবটিকে আসরে নামিয়েছেন। সবচেয়ে বড় কথা, তাঁরা নাকচনের নাকচন নিয়মটাকেই ঠিকমতো বোঝেন না এবং ড্যারং সাহেবের মতোই দ্বন্দ্বতত্ত্বকে দেখেন একটা "প্রমাণ উৎপাদনের যন্ত্র" হিসাবে।

৪

'আধা-ঔপনিবেশিক' ও 'আধা-সামন্তবাদী' বর্গদুটির বিশ্লেষণ ও সংজ্ঞানির্ধারণ

কতগুলি বিশেষ সমাজকে আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্তবাদী বলা সঠিক কিনা এটা নিয়ে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মহলে উত্তপ্ত বিতর্ক চলছে। আমাদের মতো পশ্চাৎপদ সমাজগুলির অধিকাংশকে কেউ আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্তবাদী বলতে চান, কেউ তার বিরোধী। কিন্তু এই দুই দলের কেউই এই বর্গদুটির অর্থকে প্রথমে সাধারণভাবে (অর্থাৎ বিশেষ কোনো সমাজে বর্গদুটি প্রযোজ্য কিনা সে প্রশ্ন প্রথমে মুলতবী রেখে) বিশ্লেষণ ক'রে ও তাদের সংজ্ঞা যথাযথভাবে নির্ধারণ ক'রে, তারপর তারই আলোকে কোনো একটি বিশেষ সমাজ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিচার ক'রে দেখছেন না সেই সমাজ উক্ত নিরিখগুলির কষ্টিপাথরে এই চরিত্রায়ণের আওতায় পড়ে কিনা। এই প্রশ্নে আমাদের মধ্যে যে সর্বব্যাপী বিভ্রান্তি আজ বিরাজ করছে তার মূল কারণ নিহিত রয়েছে এইখানে।

১. বর্গদুটি সম্বন্ধে কিছু প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ

প্রথমেই লক্ষ্য করা দরকার যে 'আধা-ঔপনিবেশিক' বর্গটির দ্বারা এমন এক ধরনের দেশকে বোঝাতে হবে যা গুণগতভাবেই স্বাধীন দেশ ও উপনিবেশের থেকে পৃথক। অনুরূপভাবে 'আধা-সামন্তবাদী' বর্গটির দ্বারা এমন এক ধরনের সমাজকে বোঝাতে হবে যা গুণগতভাবেই সামন্তবাদী সমাজ ও পুঁজিবাদী সমাজের থেকে পৃথক। 'আধা' কথাটি থাকার দরুণ মনে হতে পারে সেগুলি বুঝি কেবল পরিমাণগত পার্থক্যই নির্দেশ করে। কিন্তু সহজবুদ্ধিতেই বোঝা যায় যে নিছক পরিমাণগত পার্থক্যের জন্য পৃথক একটি বর্গ উদ্ভাবনের প্রয়োজন হয় না। পৃথক পৃথক ক্ষেত্রে একই বর্গের ব্যবহার একই গুণ নির্দেশ করে এবং পৃথক বর্গের ব্যবহার পৃথক গুণ নির্দেশ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, দুটি পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজিবাদের বিকাশের মাত্রায় পরিমাণগত পার্থক্য থাকেই, কিন্তু তার জন্য পৃথক দুটি বর্গ ব্যবহারের কথা কেউ চিন্তা করে না; দুটি সমাজের ক্ষেত্রেই 'পুঁজিবাদী' বর্গটি ব্যবহার করার অর্থ তারা গুণগতভাবে অভিন্ন।

অতএব 'আধা-ঔপনিবেশিক' ও 'আধা-সামন্তবাদী' বর্গদুটিতে 'আধা' কথাটি

কোনো পরিমাণগত পার্থক্য নির্দেশ করার জন্য ব্যবহৃত হয় না। 'আধা-ঔপনিবেশিক বর্গটি ব্যবহার করলে তার 'আধা' কথাটি বুঝিয়ে দেয় যে আলোচ্য দেশটি উপনিবেশের থেকে গুণগতভাবে পৃথক আর 'ঔপনিবেশিক' কথাটি বুঝিয়ে দেয় যে তা স্বাধীন দেশের থেকেও গুণগতভাবে পৃথক। অনুরূপভাবে 'আধা-সামন্তবাদী' বর্গটি ব্যবহার করলে তার 'আধা' কথাটি বুঝিয়ে দেয় যে আলোচ্য সমাজটি সামন্তবাদী সমাজের থেকে গুণগত ভাবে পৃথক আর 'সামন্তবাদী' কথাটি বুঝিয়ে দেয় যে তা পুঁজিবাদী সমাজের থেকেও গুণগতভাবে পৃথক।

'আধা-ঔপনিবেশিক' বা 'আধা-সামন্তবাদী' বর্গের দ্বারা স্বাধীন ও ঔপনিবেশিক অবস্থার থেকে কিংবা পুঁজিবাদী ও সামন্তবাদী চরিত্রের থেকে পৃথক তৃতীয় কোনো গুণ নির্দেশ করা হয়। এই তৃতীয় গুণ নির্দেশের জন্য নিশ্চয়ই তৃতীয় কোনো বাস্তব ভিত্তি আছে। অথচ 'আধা-ঔপনিবেশিক' হচ্ছে এমন এক দ্বন্দ্ব যার দুটি দিক হল স্বাধীনতা ও পরাধীনতা। এখানে তৃতীয় কোনো ভিত্তির উদ্ভব হতে পারে কিভাবে? অনুরূপভাবে 'আধা-সামন্তবাদী' হচ্ছে এমন এক দ্বন্দ্ব যার দুটি দিক হল সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদ। এখানেই বা সেই তৃতীয় ভিত্তির উদ্ভব হতে পারে কিভাবে?

২. দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ও গুণ নির্ধারণের সমস্যা

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মতে একটি জিনিসের গুণ কিভাবে নির্ধারিত হয়—এই প্রশ্ন বিচার করলে বর্গদুটির অন্তর্নিহিত সমস্যা আরো প্রকট হয়ে উঠবে।

মাও তাঁর 'দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে' প্রবন্ধটির চতুর্থ অধ্যায়ের বিভিন্ন স্থানে বলেছেন "একটা জিনিসের প্রকৃতি প্রধানত নির্ধারিত হয় দ্বন্দ্বের **প্রধান** দিকটির দ্বারা…। আর **যে মুহূর্তে** নতুন দিক পুরোনো দিকটির উপর প্রাধান্য লাভ করে **সেই মুহূর্তেই** পুরোনো জিনিসটি গুণগতভাবে একটি নতুন জিনিসে পরিবর্তিত হয়ে যায়…যে পরিবর্তন নির্ধারিত হয় জিনিসটির বিকাশপথে অপর দিকটির বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রত্যেকটি দিকের শক্তির **হ্রাস বা বৃদ্ধির** দ্বারা" (বড় হরঃ আমাদের)। এই ভাবেই পরিমাণগত পরিবর্তন এক সময় গুণগত পরিবর্তনেরক জন্ম দেয়। তার মানে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মতে একটি জিনিসের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের যে দিকটি অপর দিকের উপর তিলমাত্রও পরিমাণগত প্রাধান্য বিস্তার ক'রে থাকে, কেবলমাত্র তারই ভিত্তিতে জিনিসটির গুণ নির্ধারিত হয়। জিনিসটির গুণ নির্ধারণে গৌণ দিকটি কোনো অংশ নেয় না।

সুতরাং একটি দেশে স্বাধীনতার পরিমাণ যতক্ষণ অধীনতার পরিমাণের চেয়ে তিলমাত্রও বেশী থাকবে ততক্ষণ সে দেশটিকে স্বাধীন দেশ বলতে হবে, আবার অধীনতার পরিমাণ যদি স্বাধীনতার পরিমাণের চেয়ে তিলমাত্রও বেশী হয় তবে তাকে বলতে হবে উপনিবেশ। অনুরূপভাবে একটি সমাজে সামন্তবাদ যতক্ষণ

পুঁজিবাদের চেয়ে তিলমাত্রও বেশী থাকবে ততক্ষণ তাকে সামন্তবাদী বলতে হবে, আবার যেই পুঁজিবাদের পরিমাণ সামন্তবাদের চেয়ে তিলমাত্রও বেশী হয়ে যাবে অমনি সমাজটাও হয়ে যাবে পুঁজিবাদী। কিন্তু তাহলে মাঝখান থেকে 'আধা-ঔপনিবেশিক', 'আধা-সামন্তবাদী' এই তৃতীয় ধরনের বর্গ তথা গুণগুলির উদ্ভব হচ্ছে কেমন ক'রে? একটিমাত্র উপায়েই তা সম্ভব। এদের প্রত্যেকটির বেলায় নিশ্চয় দ্বন্দ্বের **দুটি দিকই** (তাদের মধ্যে যেটাই প্রধান বা গৌণ হোক) গুণনির্ধারণে অংশ নিচ্ছে। কিন্তু দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সঙ্গে সেটাই বা সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে কিভাবে?

কেউ কেউ অবশ্য একটা সম্ভাবনার কথা তুলতে পারেন। স্বাধীনতা ও অধীনতা, পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদ – এগুলোর কোনোটাই তার বিপরীত দিকটির চেয়ে প্রধান বা গৌণ নয়, বরং ঠিক সমান-সমান বা আধা-আধি; এবং তারই ফলে গুণনির্ধারণে উভয় দিককে আমরা সমান-সমান বা আধা-আধি অংশ দিতে বাধ্য হচ্ছি।

কিন্তু তা মানতে গেলে এটাও মানতে হয় যে বছরের পর বছর ধ'রে চীনের আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্তবাদী সমাজ ঠিক আধা-আধি বিন্দুতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সবচেয়ে গোঁড়া ব্যক্তিটির দ্বারাও এমন আষাঢ়ে যুক্তি প্রত্যাখ্যাত হতে বাধ্য। তাছাড়া লেনিন নিজেও "শতকরা নব্বইভাগ উপনিবেশ"কে উপনিবেশ না ব'লে আধা-উপনিবেশ বলেছেন; আবার যে রাশিয়া নিজেই ছিল সাম্রাজ্যবাদী তাকেও অর্থনৈতিক পরনির্ভরশীলতার কারণে স্তালিন কোনো এক প্রসঙ্গে আধা-উপনিবেশ বলেছিলেন। এসব থেকেই প্রমাণ হয় যে 'আধা' কথাটিতে আধা-আধি বোঝায় না, নব্বইভাগ থেকে দশভাগ পর্যন্ত সবই বোঝাতে পারে। কিন্তু তার মানে হ'ল, 'আধা' নামক পরিমাণবাচক শব্দটি এক্ষেত্রে আদৌ কোনো পরিমাণবাচক অর্থই প্রকাশ করে না! বরং, যদিও কোন দিক পরিমাণগতভাবে প্রাধান্যে রয়েছে তারই চুলচেরা পরিমাপের ভিত্তিতে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মতে সমগ্র জিনিসটির গুণ সাধারণত নির্ধারিত হয় ও গৌণ দিকটা গুণনির্ধারণ থেকে বাদ যায়, তবু এক্ষেত্রে কোন দিক প্রাধান্যে রয়েছে তার চুলচেরা পরিমাপ একেবারেই অবান্তর হয়ে গেছে, কেননা গৌণ দিকটাকে যদি গুণনির্ধারণ থেকে বাদ দেওয়া না-ই যায় তাহলে আর সেই চুলচেরা পরিমাপে লাভ কি?

পরিমাণগতভাবে যে দিকটা প্রধান তা যে গুণনির্ধারণে অংশ নেবে, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের পদ্ধতির দিক থেকে তাতে নতুনত্ব কিছুই নেই। কিন্তু এক্ষেত্রে গৌণ দিকটাও গুণনির্ধারণে অংশ নিচ্ছে -- আলোচ্য বর্গদুটির এখানেই নতুনত্ব।

কিন্তু গৌণ দিকটা আদৌ কিভাবে গুণনির্ধারণে অংশ নিতে পারে? গৌণ দিকটি পরিমাণগতভাবে গৌণ হয়েও অন্য কোনো উৎস থেকে, অন্য কোনো কারণে, যদি তা নিজের পরিমাণের তুলনায় এত বেশী শক্তি ও গুরুত্ব অর্জন

করে[1] যে গুণনির্ধারণে তাকে তুচ্ছ করলে গুরুতর ভ্রান্তি (বিশেষত বিপ্লবের নীতি ও কৌশল প্রণয়নে) অনিবার্য, একমাত্র তাহলেই এটা সম্ভব। এটাই হবে তৃতীয় ধরনের গুণ নির্দেশের তৃতীয় বাস্তব ভিত্তি।

কাঁটায়-কাঁটায় আধা-আধির সম্ভাবনা আমরা যুক্তিসঙ্গত কারণেই ইতিপূর্বে বিবেচনা থেকে বাদ দিয়েছি। তা বাদ দিলে আর দুটিমাত্র যৌক্তিক সম্ভাবনা বাকী থাকে :

হয় (ক) **স্বাধীনতার দিকটি অধীনতার দিকটির চেয়ে, এবং পুঁজিবাদের দিকটি সামন্তবাদের দিকটির চেয়ে, পরিমাণগতভাবে গৌণ**; এক্ষেত্রে দেখাতে হবে : কেন এবং কোন অবস্থায় একটি সমাজ তা সত্ত্বেও ঔপনিবেশিক ও সামন্তবাদী না হয়ে আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্তবাদী হতে পারে অর্থাৎ স্বাধীনতা ও পুঁজিবাদের দিকদুটি পরিমাণগতভাবে গৌণ হয়েও কি কারণে সমাজ-চরিত্রায়ণ ও বিপ্লবের নীতি-কৌশল প্রণয়নে এত গুরুত্ব অর্জন করতে পারে যে তাদের তুচ্ছ করা তো যায়ই না বরং 'আধা' কথাটির মধ্য দিয়ে তাদের সুস্পষ্ট স্বীকৃতি দিতে হয় ;

নতুবা (খ) **অধীনতার দিকটি স্বাধীনতার দিকটির চেয়ে, এবং সামন্তবাদের দিকটি পুঁজিবাদের দিকটির চেয়ে, পরিমাণগতভাবে গৌণ**; এক্ষেত্রে দেখাতে হবে : কেন এবং কোন অবস্থায় একটি সমাজ তা সত্ত্বেও স্বাধীন ও পুঁজিবাদী না হয়ে আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্তবাদী হতে পারে অর্থাৎ অধীনতা ও সামন্তবাদের দিকদুটি পরিমাণগতভাবে গৌণ হয়েও কি কারণে সমাজ-চরিত্রায়ণ ও বিপ্লবের নীতি-কৌশল প্রণয়নে এত গুরুত্ব অর্জন করতে পারে যে তাদের তুচ্ছ করা তো যায়ই না বরং 'ঔপনিবেশিক' ও 'সামন্তবাদী' কথাদুটিকে রেখে দিয়ে তাদের সুস্পষ্ট স্বীকৃতি দিতে হয়।

এবার আমরা একে একে এই দুটি যৌক্তিক সম্ভাবনাকে বিচার করব। কিন্তু মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে আরো একটি বিষয় পরিষ্কার ক'রে দেওয়া প্রয়োজন। 'আধা-ঔপনিবেশিক' ও 'আধা-সামন্তবাদী' বর্গদুটির তাৎপর্য আমরা এখানে বিচার করব বিশেষভাবে আমাদের মতো পশ্চাৎপদ ও অধোনত (under-

১ [কিন্তু কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে তা সত্যিই করেছে কিনা সেটা নির্ধারণ করার জন্য আমাদের হাতে এমন একটি নিকষ থাকা প্রয়োজন যা যথাযথভাবে যাচাইযোগ্য, এমন কি সম্ভব হলে পরিমাপযোগ্য (অর্থাৎ যার কোনো এক ধরনের পরিমাণগত মাত্রা রয়েছে)। আধা-উপনিবেশ ও আধা-সামন্তবাদ সংক্রান্ত বিতর্কে ঠিক এই বিষয়টাই মনে রাখা হয় না এবং বিতর্কটা চলে কেবল বিচারে প্রত্যেকের নিজস্ব পছন্দসই আন্দাজের উপর নির্ভর ক'রে। কাজেই তেমন একটি নিকষ আবিষ্কারকেই বর্তমান অধ্যায়ের লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।]

developed) সমাজগুলিরই পরিপ্রেক্ষিতে। আজকের শিল্পোন্নত দেশগুলির শৈশবকালের বিভিন্ন পর্যায় সম্বন্ধে মার্কসবাদীরা অনেক সময় ঐ কথাদুটিকে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তার তাৎপর্য আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গের পক্ষে মোটেও গুরুত্বপূর্ণ নয়। কেন? এটা ঠিক যে ঐ বর্গদুটি ব্যবহার করার অর্থই হল, কোন দিকটা অপর দিকের চেয়ে পরিমাণগতভাবে প্রধান হয়ে আছে তার চুলচেরা পরিমাপ উপেক্ষা করা, কিন্তু উল্লেখিত ক্ষেত্রগুলিতে যেহেতু বর্গদুটিকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ নীতি বা কৌশল প্রণয়নের ভিত্তিরূপে ব্যবহার করা হয়নি তাই সেই চুলচেরা পরিমাপ প্রয়োজনীয়ও ছিল না। পক্ষান্তরে আমাদের মতো সমাজে সমগ্র বিপ্লবের রণনীতি ও রণকৌশল চুলচেরাভাবে নির্ধারণ করার জন্য এমনই দুটি বর্গকে কেউ কেউ ভিত্তি করতে চাইছেন যাদের মধ্যে পরস্পরবিরোধী দিক-দুটির আপেক্ষিক পরিমাণগত প্রাধান্যের চুলচেরা পরিমাপ অবান্তর হয়ে গেছে। এটাই সমস্যাটিকে অনন্য বৈশিষ্ট্য দান করেছে এবং এই বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতেই এখানে আমরা সমস্যাটিকে বিচার ও সমাধান করার চেষ্টা করব।

৩. প্রথম সম্ভাবনা

এক্ষেত্রে আমাদের সমস্যাটি হচ্ছে: আমাদের মতো সমাজগুলিতে যদি অধীনতার চেয়ে স্বাধীনতার দিক এবং সামন্তবাদের চেয়ে পুঁজিবাদের দিক অনেক "কম"ও হয় তবু কেন সেগুলিকে নয়া-উপনিবেশ (= সঠিক অর্থে অর্থাৎ উপনিবেশের অন্তর্বস্তুগত অর্থে) এবং সামন্তবাদী বলা যাবে না? অন্যান্য জিনিসের গুণনির্ধারণে গৌণ দিকটির বিবেচনা অবান্তর হলেও এক্ষেত্রে কেন 'আধা' কথাটির মধ্য দিয়ে গৌণ দিকগুলিকে সর্বদা নজরে রাখতে হচ্ছে?

অবশ্য প্রথমেই আমাদের কৈফিয়ৎ দিতে হবে, এ ধরনের কোনো সম্ভাবনাকে আদৌ বিবেচনা করার কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা। 'আধা-ঔপনিবেশিক' ও 'আধা-সামন্তবাদী' বর্গদুটির ক্ষেত্রে যুক্তিগতভাবে এই সম্ভাবনার উদ্ভব যে অখণ্ডনীয় তা আমরা উপরে দেখিয়েছি। তাছাড়া মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা ব্যাপকভাবে বিশ্বাস ক'রে থাকেন যে ঐতিহাসিকভাবেও এ সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হয়েছিল—যেমন প্রাক-বিপ্লব চীনে। চীনের আধা-ঔপনিবেশিক চরিত্রে প্রধান (শতকরা নব্বইভাগ) ছিল ঔপনিবেশিক দিক, গৌণ (শতকরা দশভাগ) ছিল স্বাধীনতার দিক (লেনিনের উক্তি স্মরণীয়[২]) আর তার আধা-সামন্তবাদী চরিত্রে

২ [এখানে লেনিনের উক্তি উল্লেখ করার তাৎপর্য নিছক উদাহরণমূলক। কাজেই কেউ যদি তর্ক তোলেন যে "শতকরা নব্বই ভাগ উপনিবেশ" বলতে লেনিন এটা বোঝাতে চাননি যে উপনিবেশের দিক স্বাধীনতার দিকের তুলনায় ৯০:১০ অনুপাতে প্রধান হয়ে আছে (অর্থাৎ আমাদের বিচার্য প্রথম সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হয়েছে), বরং এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে উপনিবেশ হতে গেলে

প্রধান ছিল সামন্তবাদের দিক, গৌণ ছিল পুঁজিবাদের দিক : "এটি আর পুরোপুরি সামন্তবাদী সমাজ নয়, এটি এখন আধা-সামন্তবাদী সমাজ—যদিও সামন্তবাদী অর্থনীতি এখনও প্রধান" ('নয়া গণতন্ত্র সম্বন্ধে' : মাও) ; চীন বিপ্লবের বিজয়ের এক বৎসর পরেও চীনের সমাজ ছিল "শতকরা ৩০ ভাগ পুঁজিবাদী আর শতকরা ৭০ ভাগ সামন্তবাদী" ('রুরাল ক্লাস স্ট্যাটাস অ্যাণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস : লাইয়ো লু-ইয়েন ; 'প্রলেতারিয়ান এরা' পত্রিকায় উদ্ধৃত, কলকাতা, ৭ নভেম্বর ১৯৭৪) ।

কিন্তু বর্তমানে বিবেচ্য এই প্রথম সম্ভাবনার ক্ষেত্রে 'আধা-ঔপনিবেশিক' ও 'আধা-সামন্তবাদী' বর্গদুটি ব্যবহারের পেছনকার প্রচ্ছন্ন অনুমিতিটা নিশ্চয়ই এই : উপনিবেশ আর আধা-উপনিবেশের মধ্যে এবং সামন্তবাদ ও আধা-সামন্তবাদের মধ্যে পরিমাণগত কোনো পার্থক্য যদি না-ও থাকে তবু তাদের মধ্যে নিশ্চয় কোনো কারণে এমন এক গুণগত পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে যার দরুণ একটিকে অপরটির সঙ্গে সমার্থক করা কোনোমতেই সম্ভব নয় ; বিশেষ ক'রে তা এইজন্য সম্ভব নয় যে তা করলে বিপ্লবের নীতি ও কৌশল নির্ধারণে মারাত্মক বিচ্যুতি অনিবার্য। এই গুণগত পার্থক্যটি থাকতেই হবে, নতুবা ৯০% উপনিবেশকে উপনিবেশ না বলা এবং ৭০% সামন্তবাদী সমাজকে সামন্তবাদী না বলাটা কোনো রকমেই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে না। আমাদের বর্তমান বইটির মূল প্রসঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে এই কথাটা বোঝা অত্যন্ত প্রয়োজন, কারণ জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকরা নিছক জাতীয় নিপীড়নের প্রাধান্য ও স্বাধীনতার দিকটির গৌণতার যুক্তিতেই (এ যুক্তি বাস্তবের সঙ্গে মেলে কিনা সে প্রশ্ন আপাতত না হয় মুলতবীই রাখা গেল) উপনিবেশ আর আধা-উপনিবেশের মধ্যেকার গুণগত পার্থক্যটিকে অবলুপ্ত ক'রে দেন এবং আধা-উপনিবেশকে নয়া-উপনিবেশ বানিয়ে বসেন—কেউ তা করেন খোলাখুলি, কেউ খিড়কীর দরজা দিয়ে।

উপনিবেশ আর আধা-উপনিবেশের মধ্যে প্রধান গুণগত পার্থক্যটা এই যে

উপনিবেশের দিকের অনুপাত কমপক্ষে যা হওয়া দরকার (৫০%এর বেশী) তার ৯০% (অর্থাৎ ৪৫%) রয়েছে (অর্থাৎ উপনিবেশের দিক পরিমাণগতভাবে গৌণই রয়েছে)—তবে তাঁকে শুধু এইটুকুই বুঝতে অনুরোধ করব যে উদাহরণমূলক একটি উল্লেখের ক্ষেত্রে তাঁর ব্যাখ্যাটি যদি সঠিকও হয় তবু তাতে মূল বিচার্য বিষয়ের বিশেষ কিছু এসে যায় না। তাছাড়া সেক্ষেত্রে আবার প্রশ্ন ওঠে, দেশটিকে কেন স্বাধীন বলা হচ্ছে না—অর্থাৎ আমাদের আলোচ্য গুণনির্ধারণের মূল সমস্যাটিই আবার আরেক রূপে ফিরে আসে। আমার সমস্ত তাত্ত্বিক কাঠামোর অন্যতম বানিয়াদরূপে কাজ করেছে লেনিন, মাও ইত্যাদি থেকে পল্লবগ্রাহী কায়দায় আহরিত কয়েকটি উদ্ধৃতি—কোনো পাঠক যাতে এই অসতর্ক ধারণার কবলিত না হন সেই উদ্দেশ্যেই বিষয়টা এত বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করছি।]

শেষোক্তটা যদি "শতকরা নব্বইভাগ উপনিবেশ"ও হয় তবু তা উপনিবেশ নয়, কারণ সেখানে রাষ্ট্রক্ষমতায় রয়েছে দেশীয় একটি শ্রেণী (সে শ্রেণী যত আত্মসমর্পণকারীই হোক না কেন)। শতকরা মাত্র দশভাগ স্বাধীনতারও এক্ষেত্রে গুণগত গুরুত্ব এত বেশী যে তা বিপ্লবের ব্যবহারিক নীতি-কৌশলে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে এবং উপনিবেশের বিপ্লব ও আধা-উপনিবেশের বিপ্লবের মধ্যে এমন পার্থক্যের সৃষ্টি করে যা গুলিয়ে ফেললে সমূহ ক্ষতি অনিবার্য।

বিপ্লবের কেন্দ্রীয় প্রশ্ন হচ্ছে রাষ্ট্রক্ষমতা, অর্থাৎ যে শ্রেণী বা শ্রেণীগুলি রাষ্ট্রক্ষমতায় আছে তাদের উৎখাত করা। অতএব কোন শ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতায় আছে, বিপ্লবের নীতি-কৌশল প্রণয়নের তা হল প্রথম সমস্যা। আবাব আমরা দেখতে পাই, কোন শ্রেণী বা শ্রেণীগুলি (তারা কি দেশী না বিদেশী) রাষ্ট্রক্ষমতায় রয়েছে—এই প্রশ্নের মধ্যেই নিহিত রয়েছে উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশের মধ্যেকার গুণগত পার্থক্যটিও।

উপনিবেশে যেহেতু বিদেশী বুর্জোয়ারা রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকে তাই তার সঙ্গে সমগ্র জাতির দ্বন্দ্ব অর্থাৎ "বাহ্যিক" দ্বন্দ্বটাই স্বভাবত স্থায়ীভাবে প্রধান থাকে। পক্ষান্তরে আধা-উপনিবেশে যেহেতু রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকে জাতির অভ্যন্তরের কোনো শ্রেণী বা শ্রেণীসমূহ তাই স্বভাবত এখানে আভ্যন্তরীণ কোনো দ্বন্দ্বই প্রধান থাকা নিয়ম—কেননা সেই শ্রেণীর রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকার মাধ্যমেই যদি বিদেশী শোষণ-নিপীড়ন সমাজে চালু থাকে তবে তারও সমাধান ঘটতে পারে কেবল সেই শ্রেণীকে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ ক'রেই। একমাত্র একটি বিশেষ পরিস্থিতিতেই (পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) ব্যতিক্রম হিসাবে জাতীয় দ্বন্দ্ব আধা-উপনিবেশে প্রধান হতে পারে। জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকরা প্রায় সকলেই কোনো-না-কোনোভাবে স্বীকার করেছেন যে আমাদের দেশগুলিতে আভ্যন্তরীণ শ্রেণীগুলিই রাষ্ট্রক্ষমতাসীন, অথচ তাঁরা এই শ্রেণীগুলির কোনো একটার সঙ্গে প্রধান দ্বন্দ্ব নির্ধারণ না ক'রে[৩], এবং এদের ডিঙিয়ে ও এড়িয়ে গিয়ে, প্রধান দ্বন্দ্ব নির্ধারণ করেছেন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে। দেশীয় কোনো শ্রেণীর শাসনাধীন দেশে সাধারণ নিয়ম হিসাবে জাতীয় দ্বন্দ্বকে প্রধান করার অর্থ বিপ্লবের কেন্দ্রীয় প্রশ্নকেই সাধারণ নিয়ম হিসাবে ডিঙিয়ে ও এড়িয়ে যাওয়া এবং কমিউনিজমের মহত্তম নীতিমালার সঙ্গে নির্লজ্জভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করা। আমাদের প্রতিপক্ষীয়দের বক্তব্যের সংশোধনবাদী অন্তর্বস্তুটি নিহিত রয়েছে এইখানে।

৩ [বইটি লেখার এই পর্যায় পর্যন্ত প্রধান দ্বন্দ্ব (অর্থাৎ তার সামাজিক বিষয়বস্তু) এবং তার মেরুদ্বয়ের শ্রেণীগত গঠন, এই দুটোর পার্থক্য আমার চিন্তায় যথেষ্ট স্পষ্ট ছিল না। সেটা সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে দ্বিতীয় খণ্ডের 'সম্পাদকের চিঠির জবাবে' লেখার সময়।]

যাহোক, তাহলে আধা-উপনিবেশের বিপ্লবের সাধারণ নিয়ম হল : স্বাধীনতার দিকটির উপর ভিত্তি ক'রে, অর্থাৎ দেশীয় শাসকশ্রেণীই যে ক্ষমতায় আছে এই বাস্তবতার উপর ভিত্তি ক'রে বিদেশী আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। (উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশের মধ্যেকার গুণগত পার্থক্য সম্বন্ধে অধিকতর আলোচনার জন্য পঞ্চম অধ্যায়, দ্বিতীয় অংশ, "তৃতীয় শিক্ষা" দ্রষ্টব্য।)

এবার আসতে হয় আধা-সামন্তবাদের প্রশ্নে : এই ধরনের সমাজ যদি "শতকরা ৭০ ভাগ সামন্তবাদী"ও হয় তবু কেন তাকে সামন্তবাদী ব'লে চরিত্রায়িত করা চলে না? তার কারণ "শতকরা ৩০ ভাগ" পুঁজিবাদের এই দিকটি নিশ্চয় এত গুরুত্বপূর্ণ এক গুণগত পার্থক্য রচনা করেছে যা বিপ্লবের ব্যবহারিক নীতি-কৌশল নির্ধারণে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে এবং যাকে অগ্রাহ্য করলে বিরাট বিচ্যুতি অনিবার্য।

পুঁজিবাদের বিকাশের ফলে, যত সামান্য মাত্রাতেই হোক, জন্ম হয় কতগুলি নতুন শ্রেণীর—যেমন বুর্জোয়া, পেটি বুর্জোয়া ও বিশেষত শ্রমিকশ্রেণীর। অধিকন্তু, যত সামান্য মাত্রাতেই হোক, জন্ম হয় বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক উপাদান-সমূহের। আধা-সামন্তবাদী সমাজকে কার্যত পুরো সামন্তবাদী ধ'রে নিলে এগুলোকে অগ্রাহ্য করা হয় এবং তারই বিষময় ফলাফল বিধৃত রয়েছে এই উপমহাদেশের মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের সাম্প্রতিক কার্যকলাপের ইতিহাসে। আমরা শ্রমিকশ্রেণী ও তার নেতৃত্বের গুরুত্ব ভুলে গিয়েছিলাম, ভুলে গিয়েছিলাম এই সত্য যে "ইতিহাসের প্রক্রিয়ায় সর্বহারাশ্রেণীর শক্তি সমগ্র জনসংখ্যায় তার অংশের চেয়ে অপরিমেয় গুণ বেশী" ('দি ডেভেলপমেণ্ট অব ক্যাপিটালিজম ইন রাশিয়া' : লেনিন)। আমরা যেন ভুলেই গিয়েছিলাম যে আধা-সামন্তবাদী সমাজে রয়েছে পেটি বুর্জোয়াশ্রেণী, রয়েছে বুর্জোয়াশ্রেণীও। আমরা যেন ভুলেই গিয়েছিলাম যে আধা-সামন্তবাদী সমাজে অনিবার্যভাবেই কিছু বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক উপাদানেরও জন্ম হয়—তাকে ব্যবহার না ক'রে, তাকে ভিত্তি না ক'রে, আমরা কোনো বিপ্লবই সম্পন্ন করতে পারব না, নির্মূল করতে পারব না সামন্তবাদকে।

৪. দ্বিতীয় সম্ভাবনা

এবার আমাদের বিচার্য সম্ভাবনাটি হল : স্বাধীনতার দিকের চেয়ে অধীনতার দিক এবং পুঁজিবাদের দিকের চেয়ে সামন্তবাদের দিক পরিমাণগতভাবে গৌণ হয়ে গেছে, কিন্তু তবু সমাজটি কিভাবে আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্তবাদী হতে পারে।

কিন্তু এই সম্ভাবনাটিকেই বা বিচার করার প্রয়োজনীয়তা কতটুকু? প্রথমত আলোচ্য বর্গদুটির প্রাথমিক বিশ্লেষণ থেকেই আমরা দেখিয়েছি যে এই দ্বিতীয়

সম্ভাবনাটিও বর্গদুটির মধ্যে যুক্তিগতভাবে অন্তর্নিহিত—অন্তত এই সম্ভাবনার উদ্ভব হতে বর্গদুটির মধ্যে যুক্তিগত কোনো বাধা নেই। দ্বিতীয়ত আমাদের সমাজগুলিতে (বিশেষত সেগুলোর টিপিকাল দৃষ্টান্ত হিসাবে ভারতে) এই দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি ইতিমধ্যেই বাস্তবায়িত হয়েছে ব'লেই মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা ব্যাপকভাবে মেনে নিচ্ছেন। নইলে চীন পার্টি আমাদের মতো দেশগুলিতে উপনিবেশবাদের অস্তিত্বের কথা না ব'লে উপনিবেশবাদের "অবশেষ"এর অস্তিত্বের কথা বলছে কেন? আর সামন্তবাদের কথা না ব'লে সামন্তবাদের "অবশেষ"এর কথা তো এসব দেশের মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের অনেকেই আজকাল বলতে শুরু করেছেন।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের প্রথাসিদ্ধ নিয়ম অনুযায়ী এ সমাজগুলিকে স্বাধীন ও পুঁজিবাদী বলা উচিত। আর যদি এত কিছু সত্ত্বেও এগুলোকে আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্তবাদী বলতে হয় তবে দেখাতে হবে স্বাধীন পুঁজিবাদী সমাজের সঙ্গে কোথায় এগুলোর গুণগত পার্থক্য এবং প্রাক-বিপ্লব চীনা সমাজের সঙ্গে (যদি সেখানে প্রথম সম্ভাবনাটি বাস্তবায়িত হয়ে থাকে তা সত্ত্বেও) কোথায় মৌলিক গুণগত সাদৃশ্য। অর্থাৎ দেখাতে হবে যে সামন্তবাদ ও অধীনতার দিকদুটি পরিমাণগতভাবে গৌণ হলেও কোনো এক বিশেষ কারণে তারা সমাজবিকাশকে এমন প্রবলতা ও স্থায়িত্বের সঙ্গে বাধা দিচ্ছে যা তাদের পরিমাণগত গৌণতার সঙ্গে অন্তত আপাতদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ সঙ্গতিহীন এবং সেই কারণে বিপ্লবের মৌলিক কর্তব্য এখানেও চীনের মতোই সামন্তবাদ ও পরাধীনতার অবশেষগুলির ধ্বংসসাধন।

আমাদের সমস্যাটিকে আবার স্মরণ করা যাক: কোনো সমাজে পুঁজিবাদের চেয়ে সামন্তবাদ এবং স্বাধীনতার চেয়ে অধীনতার দিক যদি পরিমাণগতভাবে গৌণও হয় তবু কোনো কারণে তারা গুরুত্ব ও শক্তির বিচারে বিপরীত দিকগুলির উপর এমন প্রাধান্য অর্জন করতে পারে কি যার ফলে সমাজটিকে স্বাধীন ও পুঁজিবাদী না ব'লে আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্তবাদী বলাটাই সমাজ-চরিত্রায়ণ ও বিপ্লবের নীতি-কৌশল প্রণয়নের দিক থেকে সঠিক হবে?

এর সমাধান আমরা খুঁজতে শুরু করব মাওয়ের এই উক্তিগুলি থেকে: "আর যে মুহূর্তে নতুন দিক পুরোনো দিকটির উপর প্রাধান্যলাভ করে সেই মুহূর্তেই পুরোনো জিনিসটি গুণগতভাবে একটি নতুন জিনিসে পরিবর্তিত হয়ে যায়।" "…আর পুরোনো দিকটি প্রধান থেকে অপ্রধানে পরিবর্তিত হয় ও ক্রমশ লোপ পেয়ে যায়…" ('দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে')। তার মানে নতুন দিক প্রাধান্যে আসার সঙ্গে সঙ্গে কেবলমাত্র তারই ভিত্তিতে জিনিসটির গুণ নির্ধারিত হয় কিন্তু পুরোনো দিক তৎক্ষণাৎ অবলুপ্ত হয় না, তা "ক্রমশ" লোপ পেতে থাকে। অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দ্বন্দ্বতত্ত্ব অনুযায়ী কোনো জিনিসের গুণনির্ধারণের

পদ্ধতিটি অনেকাংশে অগ্রিম অনুমানের চরিত্রসম্পন্ন : যেহেতু পুরোনো দিকটি অপ্রতিরোধ্যভাবে লোপ পাচ্ছে, তাই তার পূর্ণ অবলুপ্তির আগেই তার পূর্ণ অবলুপ্তির অনিবার্যতাকে ধ'রে নেওয়া হচ্ছে এবং কেবলমাত্র সদ্য-প্রাধান্যে-আসা দিকটি দিয়েই সমগ্র জিনিসটির গুণ নির্ধারিত হচ্ছে। ফলে এর মধ্যে কিছুটা অযথার্থতা থেকে যেতে বাধ্য। কিন্তু যেহেতু দ্বন্দ্বতত্ত্বের মতে সবকিছুই গতিশীল ও প্রবহমান, তাই যা অপ্রতিরোধ্যভাবে লীয়মান তাকে আগে থেকেই লুপ্ত ধ'রে নেওয়ার দরুণ যে অযথার্থতা ঘটে তার ফল তত মারাত্মক হয় না এবং দ্বন্দ্বতত্ত্ব সচেতনভাবেই এইটুকু অযথার্থতা স্বীকার ক'রে নিতে পারে। অবশ্য সবচেয়ে বড় কথা এই যে এইটুকু অযথার্থতাকে এড়ানোর কোনো পথ নেই, কারণ সবকিছুই গতিশীল ও প্রবহমান হলেও 'নির্ধারণ' বা 'চরিত্রায়ণে'র ধারণাটাই একটা স্থিতিশীল ধারণা (static concept)। এই দ্বন্দ্বের ফলে অযথার্থতা অবশ্যম্ভাবী[8]।

কিন্তু অযথার্থতা তো কত রকমেরই হতে পারে। যা আজও সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়নি, কিন্তু যা নিয়তই লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে ও কালই যা হয়তো সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যাবে, তাকে আজই লুপ্ত ব'লে ধ'রে নেওয়ার মতো অযথার্থতা ঘটতে পারে, আবার যা লীয়মান তাকে বর্ধমান ব'লে কল্পনা করা কিংবা যা বর্ধমান তাকে লীয়মান ব'লে ভুল করার মতো অযথার্থতাও অসম্ভব নয়। এই সবগুলির মধ্যে কেবল প্রথম ধরনের অযথার্থতা যেহেতু বিকাশধারার গতিমুখের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ—অর্থাৎ যা বাস্তবে ঘটছে তাকেই সামান্য একটু বাড়িয়ে দেখা হচ্ছে মাত্র—সমস্ত সম্ভাব্য ধরনের অযথার্থতার মধ্যে এটাই সবচেয়ে বাস্তবানুগ ও সর্বাপেক্ষা কম ক্ষতিকর। চরিত্রায়ণের মধ্যে অযথার্থতাকে একেবারে এড়ানো কোনো-মতেই সম্ভব নয়, তাই অযথার্থতার সবচেয়ে কম ক্ষতিকর ধরনটিকেই দ্বন্দ্বতত্ত্ব বেছে নেয়। এইজন্যই রাশিয়ার গ্রামাঞ্চলকে ক্ষুদ্র পণ্যোৎপাদক-অধ্যুষিত পুঁজি-

৪ [কিন্তু এখন আমার মনে হয় আমার চিন্তাকে এখানে যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে সূত্রায়িত করতে পারিনি কেননা শেষ দুটি বাক্য পড়ে স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে, বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে, বাস্তবতা ও মানবচেতনার মধ্যে, বুঝি-বা এক মৌলিক বিরোধ এই অর্থে বিদ্যমান যে বাস্তবে যদিও স্থায়িত্বের নামগন্ধও নেই তবু চেতনার মধ্যে স্থায়িত্বের উপাদান রহস্যজনকভাবে অন্তর্নিহিত। কিন্তু তা আসলে ঠিক নয়। স্থায়িত্ব ও অস্থায়িত্ব বাস্তবেই অবিচ্ছেদ্য এবং দ্বান্দ্বিক সম্পর্কে ঐক্যবদ্ধ। জগতে সবকিছুর অবিরাম অস্থায়িত্বের মধ্যেও আপেক্ষিক স্থায়িত্ব—অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য ও নির্দিষ্ট শর্তাধীনে কতগুলি গুণ ও দিকের স্থায়িত্ব—একটি অনস্বীকার্য বাস্তব ঘটনা এবং সেইজন্যই ও তার প্রতিফলন হিসাবেই, মানুষের চেতনাতেও 'চরিত্রায়ণ', 'নির্ধারণ' ইত্যাদি "স্থিতিশীল" ব্যাপারের সাক্ষাৎ মিলতে পারে।

অবশ্য এতে অযথার্থতা-সংক্রান্ত আমাদের মূল প্রতিপাদ্য খণ্ডিত হয় না। যে কোনো ধারণা গঠন, যে কোনো গুণ নির্ধারণ, যে কোনো জিনিসের চরিত্রায়ণ করতে গেলেই মানুষকে বাস্তবতার অসংখ্য অস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্য থেকে বিমূর্তায়ন করতে হয়, সেগুলোকে উপেক্ষা করতে

বাদী গ্রামাঞ্চল ব'লে বর্ণনা করার পর লেনিন বলেছিলেন : "যদি আমাদের বলা হয় যে এইরকম একটা দাবী করার মধ্য দিয়ে আমরা বেশী এগিয়ে যাচ্ছি, তাহলে এই হবে আমাদের জবাব। যে-কেউই একটা জীবন্ত ব্যাপারকে(phenomenonকে) তার বিকাশধারার মধ্যে দেখতে চান তিনিই অনিবার্য ও আবশ্যিকভাবে হয় এগিয়ে যাওয়া নাহয় পিছিয়ে পড়ার উভয়সঙ্কটের সম্মুখীন হন। মাঝামাঝি কোনো পথ নেই। আর যদি সবগুলি তথ্য প্রমাণ করে যে সামাজিক বিবর্তনের চরিত্রটাই ঠিক এমনি যে এই বিবর্তন ইতিমধ্যেই অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গেছে..., এবং উপরন্তু, যসব পরিস্থিতি ও বিধিবিধান এই বিবর্তনকে ব্যাহত করে সেগুলোর সম্বন্ধে যদি যথাযথ উল্লেখ করা হয়, তবে এই ধরনের এগিয়ে যাওয়াতে কোনো ভুল নেই" ('দি ডেভেলপমেণ্ট অব ক্যাপিটালিজম ইন রাশিয়া')। আমাদের বর্তমান সমস্যার প্রসঙ্গে লেনিনের এই উক্তিটিকে বোঝা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। "যেসব পরিস্থিতি ও বিধিবিধান এই বিবর্তনকে ব্যাহত করে সেগুলোর সম্বন্ধে উল্লেখ" করার পরেও সত্যটা দাঁড়ায় এই যে সমস্ত প্রতিবন্ধ অতিক্রম ক'রে রাশিয়ার পুঁজিবাদ অপ্রতিরোধ্যভাবেই এগিয়ে যাচ্ছিল এবং সামন্ত অবশেষগুলির পূর্ণ বিলুপ্তি ছিল অনিবার্য; তাই সেখানে কিছুটা "এগিয়ে যাওয়াতে" কোনো ভুল ছিল না, বরং সমাজব্যবস্থার যথাসম্ভব সঠিক চরিত্রায়ণের জন্যই তা ছিল অপরিহার্য। কিন্তু, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ভারতের ক্ষেত্রে কি চরিত্রায়ণের স্বার্থে সামন্ত অবশেষকে পূর্ণ অবলুপ্ত ব'লে ধ'রে নেওয়াটা [অর্থাৎ ভারতীয় সমাজকে পুঁজিবাদী ব'লে চরিত্রায়িত করাটা] অনুমোদনযোগ্য হতে পারে? পারে, কেবলমাত্র যদি সামন্ত অবশেষ এখানেও রাশিয়ার মতোই উত্তরোত্তর বিলীয়মান হয়ে থাকে। কিন্তু তা যদি না হয়েথাকে?

হয়। তাত্ত্বিক চিন্তায় বিমূর্তায়ন তথা এই ধরনের অযথার্থতাকে সাধারণভাবে এড়ানোর কোনো পথ নেই। কিন্তু বাস্তবে বিদ্যমান কতগুলি বিষয়কে উপেক্ষা করার এই "অযথার্থতা"ও সঠিক বা যথার্থ বলে গৃহীত হয় কেবলমাত্র তখনই যখন তা বাস্তবের সঙ্গে খাপ খায়—অর্থাৎ বাস্তবতা নিজেই যখন সেগুলোকে "উপেক্ষা" করে ও সেগুলো থেকে "বিমূর্তায়ন" করে কিংবা, আরো স্পষ্ট ক'রে বললে, নির্দিষ্ট কতগুলি ফলাফলের উদ্ভবের পেছনে যখন সেগুলোর কোনো উল্লেখযোগ্য অবদান বাস্তবেই থাকে না। কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে আমাদের তাত্ত্বিক চিন্তা এই শর্ত পূরণ করছে কিনা তা কেমন ক'রে বোঝা যাবে? বিভিন্ন দিককে উপেক্ষা ক'রে একটি বিমূর্ত তত্ত্ব নির্মাণের পর তা থেকে যৌক্তিক প্রক্রিয়ায় লব্ধ সিদ্ধান্তগুলি যখন বাস্তবের দ্বারা সমর্থিত হয়—অর্থাৎ নিত্য-বিকাশমান বাস্তবে এবং বাস্তবকে বদলানোর জন্য মানুষের সংগ্রামে লভ্য ফলাফলগুলির বিষয়ে যখন সেই তত্ত্ব সঠিকভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে—তখনই বোঝা যায় যে বিমূর্তায়নের প্রক্রিয়াটি (ও তার মধ্যে অন্তর্নিহিত "অযথার্থতা"টি) বাস্তবসম্মত ছিল। নইলে বলতে হবে, ছিল না। গুণ-নির্ধারণের ক্ষেত্রে এমন-লীয়মান গৌণ দিকটিকে উপেক্ষা করা সাধারণত বাস্তবসম্মত ও সঠিক। কিন্তু কখনও কখনও যে তা না-ও হতে পারে এবং না হলে তা কি কারণে—এই বিষয়টা অনুসন্ধান করাই বর্তমান আলোচনার লক্ষ্য।]

মাওয়ের উদ্ধৃত উক্তিগুলির পরিপ্রেক্ষিতে একটি অভিনব সম্ভাবনার কথা এবার বিবেচনা করা যাক। মনে করুন, নতুন দিকটি পরিমাণগত প্রাধান্য অর্জন করার পরেও পুরোনো দিকটির বিলুপ্তি কোনো কারণে রুদ্ধ হয়ে গেল অথবা অন্তত তার বিলুপ্তিকে অনিবার্য ব'লে ধ'রে নেওয়ার কোনো আবশ্যিক কারণ প্রক্রিয়াটির অভ্যন্তরে খুঁজে পাওয়া গেল না। এই অবস্থায় জিনিসটির গুণ কিভাবে নির্ধারিত হবে? যদিও নতুন দিকটি পরিমাণগতভাবে প্রাধান্য অর্জন করেছে তবু কেবল তারই দ্বারা জিনিসটির গুণনির্ধারণ অযৌক্তিক ও অশুদ্ধ হবে কারণ এক্ষেত্রে পুরোনো দিকটির অনিবার্য বিলুপ্তি সম্বন্ধে কোনো অগ্রিম অনুমান করার যুক্তিযুক্ততা নেই। আবার কেবল পুরোনো দিকটির দ্বারাও জিনিসটির গুণনির্ধারণ করা ঠিক হবে না, কারণ তা ইতিমধ্যেই পরিমাণগতভাবে গৌণ হয়ে গেছে। এই উভয়সঙ্কটের সমাধান কি একমাত্র এমন কোনো গুণবাচক বর্গই করতে পারে না যার মধ্যে দ্বন্দ্বরত দিকদুটির উভয়েই গুণনির্ধারণে অংশ নিচ্ছে এবং তার ফলে পরিমাণগতভাবে কোনটা প্রধান আর কোনটা গৌণ তার চুলচেরা পরিমাপ অবান্তর হয়ে গেছে? আমরা আগেই দেখেছি যে 'আধা-ঔপনিবেশিক', 'আধা-সামন্তবাদী'—এই জাতীয় বর্গগুলি চমৎকারভাবে এই উভয়সঙ্কটের সমাধান করতে সক্ষম।

কাজেই আমাদের মতো দেশগুলির ক্ষেত্রে (যেগুলোর টিপিকাল দৃষ্টান্ত ভারত) 'আধা-ঔপনিবেশিক' ও 'আধা সামন্তবাদী' বর্গদুটিকে প্রযোজ্য ব'লে প্রমাণ করা যাবে একমাত্র তখনই যখন আমরা দেখাতে পারব যে অধীনতা ও সামন্ত অবশেষের দিকদুটি যদি-বা তাদের বিপরীত দিকদুটির চেয়ে পরিমাণগত-ভাবে গৌণ হয়ে গিয়ে থাকে তবু কোনো বিশেষ কারণে তাদের পূর্ণ বিলুপ্তিকে অনিবার্য ব'লে ধ'রে নেওয়া অসম্ভব হয়ে উঠেছে কিংবা অন্তত তেমন ধ'রে নেওয়ার কোনো যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি সমাজবিকাশের বর্তমান ধারার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এটা যদি আমরা না দেখতে পারি তাহলে মেনে নিতেই হবে যে আমাদের মতো সামাজগুলিকে 'স্বাধীন ও পুঁজিবাদী' না ব'লে 'আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্তবাদী' বলাটা আমাদের নিছক একটা বাস্তববিমুখ গোঁয়ার্তুমি ছাড়া আর কিছুই নয়। এ আত্মসমালোচনা আমাদের করতেই হবে যে "সমাজতান্ত্রিক" বিপ্লবের প্রবক্তাদের যুক্তির বিরুদ্ধে এই অন্ধ গোঁয়ার্তুমি ছাড়া আমাদের এতদিন আর কোনো জবাবই ছিল না।

আবার বলা দরকার, বর্তমান আলোচনাটির প্রাসঙ্গিকতা বিশেষভাবে রয়েছে আমাদের মতো পশ্চাৎপদ অধোনত (**underdeveloped**) সমাজগুলিরই ক্ষেত্রে। রাশিয়ার মতো সমাজের কোনো বিশেষ অনুন্নত পর্যায়ে 'আধা-ঔপনিবেশিক' ও 'আধা-সামন্তবাদী' কথাদুটিকে কখনও কখনও ব্যবহার করা হলেও তার তাৎপর্য শুধু এইটুকুই ছিল যে কোন দিকটা অপর দিকের চেয়ে

পরিমাণগতভাবে প্রধান তার চুলচেরা পরিমাপকে উপেক্ষা করা হচ্ছে (এবং যেহেতু বর্গদুটিকে বিপ্লবের নীতি-কৌশল প্রণয়নের ভিত্তি করা হয়নি তাই সে পরিমাপ প্রয়োজনীয়ও ছিল না)। কিন্তু যখনই সেখানে সমাজচরিত্রের যথাযথ নির্ধারণ ও বিপ্লবের নীতি-কৌশল প্রণয়নের প্রশ্ন উঠেছে তখনই সেখানে দ্বন্দ্বরত দিকগুলির আপেক্ষিক পরিমাণ-নির্ধারণের প্রশ্নও সামনে আসাটাই স্বাভাবিক ; আর যদি সেখানেও এই ধরনের পরিমাণগত পরিমাপেব কঠোরতা শিথিল করার দরকার হয়ে থাকে (এবং তা-ই হয়েছিল) তাহলে তা পুঁজিবাদী বিকাশের অনুকূলে করাটাই যুক্তিযুক্ত—অর্থাৎ সেখানে পুঁজিবাদী বিকাশকে কিছুটা বাড়িয়ে দেখার ঝুঁকি নেওয়াটা তবু চলতে পারত এবং তা স্বভাবতই তেমন গুরুতর ভ্রান্তির উৎস হত না, কারণ পুঁজিবাদ সেখানে অপ্রতিরোধ্যভাবে বাড়ছিল এবং অপ্রতিরোধ্যভাবে কমছিল সামন্ত অবশেষ। কিন্তু যদি দেখা যায় যে সামন্ত অবশেষের অপ্রতিরোধ্য পূর্ণ-বিলুপ্তির শর্তটি আমাদের সমাজে অনুপস্থিত তাহলে স্বভাবতই এখানে পরিমাণগত পরিমাপের কঠোরতা শিথিলযোগ্য হবে উল্টোদিকে, অর্থাৎ পুঁজিবাদী বিকাশকে বাড়িয়ে দেখার চেয়ে বরং সামন্ত অবশেষের স্থায়িত্বকে বাড়িয়ে দেখাটাই [অর্থাৎ সামন্ত অবশেষ পরিমাণগতভাবে গৌণ হয়ে গিয়ে থাকলেও 'আধা-সামন্তবাদী' বর্গ ব্যবহার করাটাই] তবু হবে তুলনামূলকভাবে কম ভ্রান্তিজনক।

কিন্তু সামন্ত অবশেষের পূর্ণ বিলুপ্তিকে রোধ করতে পারে এমন কোনো শক্তি আদৌ আমাদের মতো সমাজগুলিতে ক্রিয়া করছে কি? করছে, এবং তা শেষ বিচারে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-পীড়ন [উপরন্তু, পরে দেখব, পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর বহুগুণ-বর্ধিত প্রতিরোধ]—যা আমাদের সমাজে পুঁজিবাদের বিকাশকে পঙ্গু ক'রে রেখেছে। সামন্ত অবশেষগুলি যদি ইতিমধ্যে পরিমাণগতভাবে গৌণও হয়ে থাকে তবু সাম্রাজ্যবাদের শোষণ-পীড়ন পুঁজিবাদের বিকাশকে এমন ত্রুটিপূর্ণ ক'রে রেখেছে যে দীর্ঘদিন যাবৎ তা সামন্তবাদের এই অবশেষগুলিকেও পুরোপুরি মুছে দিতে পারছে না, অর্থাৎ শেষ বিচারে প্রধানত সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-পীড়নের পরোক্ষ মদতটা পেয়েই এই সামন্ত অবশেষগুলি নিজস্ব পরিমাণের চেয়ে অনেকগুণ বেশী শক্তি ও স্থায়িত্বক্ষমতা অর্জন করেছে। আমাদের মতো সমাজগুলির এই বৈশিষ্ট্যসূচক দিককে অবজ্ঞা ক'রে তাদেরকে লঘুভাবে (নিছক 'সামন্ত অবশেষ অপ্রধান' এই যুক্তিতে) 'পুঁজিবাদী' ব'লে চরিত্রায়িত করা ঠিক নয়। কেননা এটা হওয়া খুবই সম্ভব, এবং মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা ব্যাপকভাবে বিশ্বাসও করেন, যে আমাদের মতো সমাজগুলির কোনো পূর্ণ-পুঁজিবাদী ভবিষ্যৎ নেই, পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের সমাধান এখানে কোনোদিনই পুঁজিবাদের পূর্ণ বিজয়ের মধ্যে ঘটবে না। [আমরা শুধু এখানে প্রমাণ ক'রে দেখাচ্ছি, এই আপাতনিরীহ প্রতিজ্ঞাটি কিভাবে

আমাদের মতো সমাজগুলির 'আধা-সামন্তবাদী' চরিত্রায়ণকেও যুক্তিগতভাবে অনিবার্য ক'রে তোলে।] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে একমাত্র এই প্রতিজ্ঞাটি থেকেই মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের আরেকটি বহুবিদিত মতেরও যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব : কেন বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা নয়, বরং সর্বহারা নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে জনগণ-তান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠাই আমাদের মতো সমাজগুলিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের একটি অপরিহার্য পূর্বস্তর। রাশিয়ায় কিন্তু অবস্থা এরকম ছিল না। সেখানে সর্বহারা নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও পুঁজিবাদের বিকাশ অব্যাহতভাবেই চলছিল, তাই বুর্জোয়ারা গণতান্ত্রিক বিপ্লব ক'রে নিজেদের ক্ষমতা কায়েম করতে পেরেছিল এবং তারই ফলে শ্রমিকশ্রেণী নিজ নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করতে না পেরেও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে প্রবেশ করতে পেরেছিল[৫]। সর্বহারা নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক বিপ্লব রাশিয়ায় একটা সম্ভাবনা-মাত্র ছিল এবং তা ব্যর্থ হলে পরেও শ্রমিকশ্রেণী সরাসরি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের

৫ রাশিয়ায় ১৯১৭ সালে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের মাধ্যমে বুর্জোয়াদের রাষ্ট্রক্ষমতা কায়েম হয়েছিল। তাই তখন থেকে শুরু হয়েছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর শুরু হওয়া, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু হওয়া এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সামাজিক দায়িত্বসমূহের রূপায়ণ শুরু হওয়া এক জিনিস নয়। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরের সূচনা নির্ধারিত হয় বুর্জোয়াশ্রেণীর ক্ষমতাদখল দ্বারা, আর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সূচনা নির্ধারিত হয় শ্রমিকশ্রেণীর একচ্ছত্র ক্ষমতা কায়েমের দ্বারা। (শ্রমিকশ্রেণীর সেই সরকার কখন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সামাজিক দায়িত্বসমূহের রূপায়ণ শুরু করতে পারছে তার দ্বারা নয়)। যদিও কৃষিপ্রধান রাশিয়ার বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের ফলে সর্বশ্রেণীর কৃষকের যৌথ ক্ষমতা কায়েম হয়েছিল এবং যদিও দীর্ঘ এক বছর যাবৎ গ্রামের বিপ্লব বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক স্তরের সীমা অতিক্রম করেনি, তবু যেহেতু শ্রমিকশ্রেণী একচ্ছত্র ভাবেই রাশিয়ায় কেন্দ্রীয় অর্থাৎ নির্ধারক ক্ষমতা দখল ক'রে নিতে পেরেছিল, তাই বলা হয় যে অক্টোবর বিপ্লব ছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সূচনা। আমাদের মতো দেশগুলিতে "সমাজতান্ত্রিক" বিপ্লবের প্রবক্তারাও এই রাজনৈতিক অর্থে, অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর একক ক্ষমতা কায়েমের অর্থেই, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা বলেন। তাঁদের বক্তব্য : (১) বুর্জোয়ারা ক্ষমতা-দখল করেছে, (২) সুতরাং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর শুরু হয়ে গেছে, (৩) সুতরাং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব করার জন্য অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর একক ক্ষমতা কায়েমের জন্য চেষ্টা শুরু হওয়া উচিত, (৪) তবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সামাজিক দায়িত্বসমূহের রূপায়ণ করে শুরু করা যাবে তা ভিন্ন প্রশ্ন। অথচ আমরা যখন তাঁদের যুক্তি খণ্ডন করতে যাই তখন অধিকাংশ সময়েই অন্যায়ভাবে ধ'রে নিই যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব করার কথা ব'লে তাঁরা বুঝি এক ধাক্কায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সব সামাজিক ব্যবস্থা কার্যকর করার কথা তথা সর্বপ্রকার ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদের কথা বলছেন। এতে প্রকৃতপক্ষে তাঁদের তত্ত্বের খণ্ডন হয় না, তার আয়ু বাড়িয়ে দেওয়া হয় মাত্র। আমাদের যুক্তির ধারাটা হওয়া উচিত এইরকম : (১) আমাদের দেশগুলিতে বুর্জোয়াশ্রেণীর একচ্ছত্র ক্ষমতা নেই—ক্ষমতায় যৌথভাবে রয়েছে বুর্জোয়াশ্রেণীর আমলা-মুৎসুদ্দি বৃহৎ একচেটিয়া অংশ এবং সামন্তশ্রেণী, বিশেষত তার বৃহৎ অংশ, (২) সুতরাং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর শুরু হয়নি, (৩) সুতরাং সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লব করার জন্য চেষ্টা শুরু হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, (৪) সুতরাং বিপ্লবের স্তর এখনও বুর্জোয়া-

আশা করতে পারত। পক্ষান্তরে আমাদের মতো সমাজে যদি জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের একটি অলঙ্ঘনীয় পূর্বস্তর হতে হয় তবে তা হতে পারে কেবলমাত্র এই কারণে যে আমাদের মতো সমাজে সামন্ত অবশেষ পরিমাণগতভাবে যত গৌণই হোক পুঁজিবাদের দ্বারা তার পূর্ণ অপসারণ অসম্ভব অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক বিপ্লব ছাড়া তার পূর্ণ অপসারণ অসম্ভব ; আবার আমরা এটাও দেখিয়েছি যে ঐ কারণটাই হতে পারে কোনো সমাজকে 'আধা-সামন্তবাদী' ব'লে চরিত্রায়িত করার যথেষ্ট ও একমাত্র নিরিখ। [এখানে যা দাবী করা হচ্ছে তা সংক্ষেপে এই। 'আধা-সামন্তবাদী' চরিত্রাংণের একমাত্র যুক্তিসঙ্গত নিরিখটি আমরা খুঁজে বের করতে পেরেছি এবং উক্ত নিরিখটি আরো সমর্থিত হচ্ছে এই বিষয়টির দ্বারা যে কেবলমাত্র তা-ই মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের দ্বারা ব্যাপকভাবে পোষিত আরেকটি বক্তব্যকেও প্রথমবারের মতো সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে এবং সে বক্তব্যটি হল এই যে আধা-সামন্তবাদী সমাজে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের একটি অলঙ্ঘনীয় পূর্বস্তর।]

আবার প্রতিটি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নিশ্চয়ই এটা স্বীকার করবেন যে বুর্জোয়া স্বাধীনতারও আবশ্যিক অর্থনৈতিক অন্তর্বস্তু হল পুঁজিবাদের বিকাশ দ্বারা সামন্ত অবশেষের পূর্ণ বিলুপ্তির প্রবণতা, কেননা কোনো সমাজে স্বাধীন

গণতান্ত্রিক, যাতে শ্রমিক থেকে শুরু করে জাতীয় বুর্জোয়া পর্যন্ত সব শ্রেণীই কমবেশি অংশ নেবে ও যৌথ ক্ষমতা কায়েম করবে।

বুর্জোয়ারা একক ক্ষমতা কায়েমের পর থেকেই (সুতরাং বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক সংস্কারের মাধ্যমে সামন্ত অবশেষ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হওয়ার আগেই) শুরু হতে পারে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর, সর্বহারা একনায়কত্ব স্থাপনের স্তর। কিন্তু তার মানে এই নয় যে বুর্জোয়ারা সামন্ত অবশেষ নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলার আগেই যেন-তেন-প্রকারেণ সর্বহারা একনায়কত্ব কায়েম করতে হবে যাতে "সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমেই বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অসমাপ্ত কাজ" সমাপ্ত করা যায়। বরং বুর্জোয়ারা ক্ষমতায় ব'সে সামন্ত অবশেষ নিশ্চিহ্ন করার আগেই শ্রমিকশ্রেণীর একক ক্ষমতাদখলের উপযোগী পরিস্থিতি সৃষ্টি না হওয়াটাই সাধারণ নিয়ম : রাশিয়ায় তা হতে পেরেছিল কতগুলি ব্যতিক্রমমূলক অবস্থার দরুণ এবং "তেমন বা অনুরূপ অবস্থাগুলির পুনরাবৃত্তি এত সহজে ঘটবে না" ('বামপন্থী কমিউনিজম ও শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলা' : লেনিন)। [তাছাড়া বুর্জোয়ারা ক্ষমতাদখল করার পর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর শুরু হওয়ার অর্থ নিশ্চয়ই এই নয় যে তখন থেকে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক স্তরের সীমায় আবদ্ধ তার কোনো সামাজিক-রাজনৈতিক ওলটপালট ঘটতে পারবে না বা ঘটলেও শ্রমিকশ্রেণীর তাতে কিছুই করার থাকবে না।]

যাহোক, বুর্জোয়ারা ক্ষমতাদখল করার আগেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব করতে চাওয়াটা নগ্ন ট্রটস্কিবাদী হঠকারিতা। আমাদের দেশগুলির "সমাজতান্ত্রিক" বিপ্লবের প্রবক্তারা অতটা নগ্ন হতে চান না ব'লেই দোষ কাটিয়ে নিতে চান এই ব'লে যে বুর্জোয়ারা তো এখানে ক্ষমতাদখল করেইছে। তাঁদের এই দাবী অবশ্যই খণ্ডনযোগ্য, কিন্তু তর্কের খাতিরে যদি তা মেনেও নেওয়া যায় তা থেকে কি এটা প্রমাণিত হয় যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমেই সামন্ত অবশেষকে বিলুপ্ত করতে হবে ?

বুর্জোয়া রাষ্ট্রক্ষমতার ঐতিহাসিক লক্ষ্য হল সেই সমাজকে পূর্ণ পুঁজিবাদী সমাজে রূপান্তরিত করা এবং দ্বিতীয়টি যদি কোথাও আবশ্যিকভাবেই অসম্ভব হয় তাহলে সেখানে প্রথমটিও (অর্থাৎ স্বাধীন বুর্জোয়া রাষ্ট্রক্ষমতার উদ্ভবও) সম্ভব হতে পারে না। সুতরাং কোনো সমাজে পুঁজিবাদের বিকাশ দ্বারা সামন্ত অবশেষের পূর্ণ বিলুপ্তির আবশ্যিক প্রবণতা আছে কিনা এই একই নিরিখে এটাও নির্ধারণ করা যেতে পারে যে সেই সমাজের কোনো অনিবার্য বুর্জোয়া স্বাধীনতার (অর্থাৎ অধীনতার দিকটির পূর্ণ বিলুপ্তির) ভবিষ্যৎ আছে কিনা[৬]। এখন, যেহেতু সাম্রাজ্যবাদের শোষণ-পীড়ন আমাদের সমাজগুলিতে পুঁজিবাদের বিকাশকে এমন ত্রুটিপূর্ণ ক'রে রেখেছে যে দীর্ঘদিন যাবৎ তা সামন্তবাদের অবশেষগুলিকে পুরোপুরি মুছে দিতে পারছে না, তাই আমাদের সমাজগুলির এই বৈশিষ্ট্যসূচক দিককে অবজ্ঞা ক'রে তাদেরকে লঘুভাবে (নিছক 'অধীনতার দিক অপ্রধান' এই যুক্তিতে) 'স্বাধীন' ব'লে চরিত্রায়িত করাও ঠিক নয়। এ থেকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের দ্বারা ব্যাপকভাবে পোষিত আরেকটি বক্তব্যেরও যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, বোঝা যায় কেন বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে স্বাধীন পুঁজিবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা নয় বরং সর্বহারা নেতৃত্বে জাতীয়-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে জনগণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠাই আমাদের মতো (অর্থাৎ ঔপনিবেশিক বা আধা-ঔপনিবেশিক) দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের একটি অপরিহার্য পূর্বস্তর।

হয় না, কারণ তা সবসময় করতে চাওয়ার অর্থ একটি ব্যতিক্রমমূলক ঐতিহাসিক নজীরের পুনরাবৃত্তির অলীক আশার উপর বিপ্লবের সাধারণ কর্মসূচী দাঁড় করানো। ইতিমধ্যে বৈপ্লবিক সঙ্কট আবির্ভূত হবে এবং সেগুলো হবে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক চরিত্রসম্পন্ন ও জনগণের যৌথ এক-নায়কত্ব কায়েমেরই সম্ভাবনাপূর্ণ, কিন্তু সর্বহারা একনায়কত্বের নামে নিজ দলের একক গদীদখলের লোভ অনিবার্যভাবে এইসব সুযোগকে হাতছাড়া বা বানচাল করবে। "সমাজতান্ত্রিক" বিপ্লবের প্রবক্তারা স্বভাবতই নিজ দলের একক ক্ষমতা দখলের জন্য সচেষ্ট হবেন, অথচ অবজেকটিভ অবস্থা তাদের একক ক্ষমতাদখলের অনুকূল না হওয়ায় বাধ্য হয়েই তাদেরকে বিভিন্ন দলের সঙ্গে ঐক্যের আলোচনা চালাতে হবে। কিন্তু তাদের একক ক্ষমতাদখলের লক্ষ্যের সঙ্গে তা সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলে সঙ্গত কারণেই এসব আলোচনা অন্যদের নিকট প্রতিভাত হবে নীতিহীন, আন্তরিকতাহীন, ধূর্ত কৌশলগত চাল রূপে এবং স্বভাবতই পণ্ড হবে গণ-ঐক্য গড়ার প্রক্রিয়া। তারা চান আর না চান এই চূড়ান্ত সুবিধাবাদই হবে তাদের ভ্রান্ত তত্ত্বের অনিবার্য ফল। পক্ষান্তরে চীনের কমিউনিস্টরা জনগণতান্ত্রিক রণনীতি ও জনগণতান্ত্রিক ঐক্যের প্রতি তাদের আন্তরিকতা প্রমাণ করেছিলেন সর্বহারা একনায়কত্বের আশু সম্ভাবনাকে সুস্পষ্টভাবে বাতিল ক'রে এবং ক্ষমতার সংস্থাগুলিতে পার্টি সদস্যদের অনুপাত আইন ক'রে এক-তৃতীয়াংশে বেঁধে দিয়ে। এখানেই হল নীতিভিত্তিক কৌশল আর নীতিহীন কৌশল, মার্কসবাদী কৌশল আর সুবিধাবাদী কৌশল, এই দুইয়ের তফাৎ।

৬ [দেশী ও বিদেশী পুঁজির আপেক্ষিক হ্রাসবৃদ্ধির ভিত্তিতে এমন কোনো নিরিখ বের করা সম্ভব কিনা যার দ্বারা অধীনতার দিকটির ক্ষয়ের প্রক্রিয়ার চরিত্রকে আরো প্রত্যক্ষভাবে বিচার করা যাবে, সে সম্বন্ধে আমি এখনও নিশ্চিত নই।]

[পূর্বের দুটি অনুচ্ছেদে একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রচ্ছন্ন রয়েছে যাকে আরো স্পষ্টভাবে উপস্থিত না করলে অন্যায় হবে :

যে সমাজে পুঁজিবাদের বিকাশ-প্রক্রিয়াটাই এমন যে তা সামন্ত অবশেষের পূর্ণ বিলুপ্তিকে আবশ্যিক ক'রে তোলে, কেবলমাত্র সেই সমাজেই, উক্ত অর্থ-নৈতিক প্রবণতার রাজনৈতিক অভিব্যক্তি হিসাবেই, বুর্জোয়াশ্রেণী ক্ষমতায় আসীন হতে পারে। এতে অবশ্য মার্কসবাদীদের অবাক হওয়ার কিছু নেই কেননা তাঁরা জানেন যে একটি সমাজের পূর্ণ-পুঁজিবাদী রূপান্তরের আবশ্যিকতাকে বাস্তবায়িত করার জন্যই বুর্জোয়াশ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হয়। অতএব কেবল-মাত্র এই ধরনের সমাজেই বুর্জোয়াশ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হতে পারে অর্থাৎ পুরোনো ধরনের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব রাজনৈতিক দিক থেকে সম্পন্ন হতে পারে, রাষ্ট্রক্ষমতাসীন বুর্জোয়াশ্রেণীর দ্বারা বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সামাজিক কর্তব্যাবলী (অর্থাৎ পুঁজিবাদের দ্বারা সামন্ত অবশেষের বিলোপসাধন) সম্পাদনের পর্যায় ও শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায় একই সঙ্গে শুরু হতে পারে এবং এমন কি, আরো কতগুলি শর্ত পূরণ হলে, বুর্জোয়াশ্রেণীর দ্বারা বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সামাজিক কর্তব্যাবলী (অর্থাৎ পুঁজিবাদের দ্বারা সামন্ত অবশেষের বিলোপসাধন) সমাপনের আগেই শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল তথা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবও ঘ'টে যেতে পারে।

বিপরীতক্রমে যদি কোনো সমাজে পুঁজিবাদের বিকাশ-প্রক্রিয়াটাই এমন হয় যে তাতে সামন্ত অবশেষের পূর্ণ বিলুপ্তি অসম্ভব তবে তৎক্ষণাৎ তা নির্দেশ করবে যে (১) বুর্জোয়াশ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতায় নেই বা আসতেও পারে না (কেননা পুঁজিবাদের দ্বারা সামন্ত অবশেষের বিলুপ্তি যেখানে অসম্ভব সেখানে নিশ্চয়ই জনগণতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির দ্বারা সামন্ত অবশেষের বিলোপ ঘটানোর জন্য বুর্জোয়ারা ক্ষমতায় আসবে না) ; (২) এখানে ক্ষমতায় থাকতে পারে বুর্জোয়াশ্রেণী ছাড়া দেশী বা বিদেশী অন্য কোনো শ্রেণী কিংবা বড়জোর বুর্জোয়াশ্রেণীর এমন একটা অংশ যার স্বার্থ হাসিল হতে পারে কেবল বুর্জোয়া-শ্রেণীর সঙ্গে ও তার ঐতিহাসিক ভূমিকা অর্থাৎ সমাজের পূর্ণ-পুঁজিবাদী রূপান্তর ঘটানোর দায়িত্বের সঙ্গে বেইমানী ক'রে (এইদিকে এগোলেই মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ার "আত্মসমর্পণপ্রধান" চরিত্রকে যথাযথভাবে সংজ্ঞায়িত করার অতিপ্রয়োজনীয় নিরিখটি পাওয়া যাবে ব'লে আমার বিশ্বাস) ; (৩) কাজেই এখানে সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বস্তর হিসাবে পুরোনো ধরনের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব অসম্ভব এবং সর্বহারা নেতৃত্বে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব অপরিহার্য।]

যাহোক, শেষ পর্যন্ত যা দাঁড়াল তা এই। আলাদাভাবে 'আধা-ঔপনিবেশিক' বা আলাদাভাবে 'আধা-সামন্তবাদী,' কিংবা এই দুটি দিকের নিছক পাশাপাশি অবস্থান, কোনোটাই আমাদের মতো সমাজগুলির চরিত্রবৈশিষ্ট্য নয়। তাদের

চরিত্রবৈশিষ্ট্য হল 'আধা-ঔপনিবেশিক' ও 'আধা-সামন্তবাদী' এই দুটি দিকের— কিংবা আরো যথাযথভাবে বললে পরাধীনতা ও সামন্ত অবশেষের দিকদুটির— এক অদ্ভুত ও বিশিষ্ট পরস্পরসংবদ্ধতা (interlocking)। দৃষ্টান্তস্বরূপ রাশিয়ায় বিদেশী অর্থনৈতিক আধিপত্য ও সামন্ত অবশেষ দুই-ই ছিল, কিন্তু ছিল না তাদের ঠিক এই জাতীয় পরস্পরসংবদ্ধতা অর্থাৎ বিদেশী অর্থনৈতিক আধিপত্য সেখানে পুঁজিবাদের বিকাশকে এমনভাবে ব্যাহত করতে পারেনি যাতে তার দ্বারা সামন্ত অবশেষের বিলুপ্তি অসম্ভব হয়ে ওঠে। এ ব্যাপারে সম্ভবত নির্ধারক বিষয় হল: বিদেশী আধিপত্যের চরিত্র ও তীব্রতা এবং একটি সমাজ তার বিবর্তনের ঠিক কোন মূহূর্তে বিদেশী আধিপত্যের আওতায় আসছে। রাশিয়ার বেলায় অগ্রসর সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি পৃথিবীর অন্য প্রান্তেই প্রধানত ব্যস্ত ছিল, তার উপর তারা প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক আধিপত্য প্রয়োগ করতে পারেনি, দেশীয় পুঁজিবাদের বিকাশের মাধ্যমেই রাশিয়া ইঙ্গ-ফরাসী পুঁজির সংস্পর্শে এসেছিল এবং এই সংস্পর্শ দেশীয় পুঁজিবাদের বিকাশকে খর্ব করার পরিবর্তে তাকে মোটের উপর বরং ত্বরান্বিতই করেছিল। পক্ষান্তরে আমাদের সমাজগুলি বিদেশের প্রচণ্ড রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্যের কবলিত হয় এমন এক সময় যখন সামন্তবাদী সমাজের ভাঙন খুবই অনগ্রসর। বিদেশী পুঁজিবাদ একদিকে যেমন সামন্তবাদের ভাঙনকে দ্রুততর করেছে, অন্যদিকে তেমনি দেশীয় পুঁজিবাদকে আঁতুড়ঘরে পেয়ে প্রথম থেকেই পঙ্গু ক'রে দিয়েছে তার বিকাশ।

৫. সামন্ত অবশেষ ও উপনিবেশবাদের অবশেষ কি নিশ্চল?

অধীনতা ও সামন্ত অবশেষের দিকদুটির বিলুপ্তির অসম্ভবতাকে আমরা 'আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্তবাদী' চরিত্রায়ণের নিরিখ হিসাবে নির্ণয় করেছি। কিন্তু তার মানে কি এই যে ঐ দিকদুটি একেবারে অচল-অনড় হয়ে আছে, বৎসরের পর বৎসর ধ'রে তাদের পরিমাণে কোনো হেরফেরই ঘটছে না?

এমন ভাবা কোনোদিক থেকেই সঙ্গত নয়। যেমন ধরুন, সামন্তবাদের আদৌ কোনো ক্ষয় যদি না ঘটে তবে গতকাল যে সামন্তবাদ পরিমাণগতভাবে প্রধান ছিল আজ তার পরিমাণগতভাবে গৌণ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাটাই আমরা বিচার করছি কি যুক্তিতে? তাছাড়া চোখের সামনেই তো দেখতে পাচ্ছি যে ১৯৪৭ সালে ভারতে সামন্ত অবশেষ যতখানি ছিল আজ আর ঠিক ততখানি নেই। সামন্ত অবশেষ নিশ্চল হয়ে থাকলে তা কিভাবে সম্ভব? অবশ্য প্রথমে আমরা কিছুটা সরলীকৃত কল্পনাই ক'রে নিয়েছিলাম, ধ'রে নিয়েছিলাম যে অধীনতা ও সামন্ত অবশেষের দিকদুটির বিলুপ্তি রুদ্ধ হয়ে থাকাটাই আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্তবাদী চরিত্রায়ণের নিরিখ। এবার আমরা তা সংশোধন ক'রে

বাস্তবের আরো কাছাকাছি আসছি এবং নিরিখটিকে বাস্তবে-প্রয়োগযোগ্য ক'রে তুলছি। এটাই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।

যাহোক, তাহলে সামন্ত অবশেষের ক্রমিক ক্ষয় ঠিকই ঘটছে। কিন্তু তবু তার পূর্ণ বিলুপ্তি অসম্ভব হতে পারে কেমন ক'রে? এই প্রশ্নের বিরাট অভিজ্ঞতামুখী প্রাসঙ্গিকতাও রয়েছে কারণ আমাদের সমাজগুলিতে সামন্ত অবশেষের ক্রমিক ক্ষয়ের পাশাপাশি তার স্থায়িত্বের দিক, নাছোড়বান্দার মতো তার অস্বাভাবিক দীর্ঘমেয়াদী টিঁকে-থাকাটাও, আমাদের চোখের সামনে দেখা একটা বাস্তব সত্য যার জোরে মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা সাহস পাচ্ছেন এই সমাজগুলির পূর্ণ-পুঁজিবাদী রূপান্তরের সম্ভাবনাকে নাকচ ক'রে দিতে[৭]। কিন্তু উল্লেখিত প্রশ্নটির যথাযথ জবাব না দেওয়া পর্যন্ত এই নাকচ-ক'রে-দেওয়াটা কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তির নিশ্চয়তা লাভ করতে পারে না। সুতরাং সামন্ত অবশেষের ক্রমিক ক্ষয় এবং স্থায়িত্ব এই দুটোই একসঙ্গে সত্য হতে পারে কিভাবে – 'আধা-সামন্তবাদী' চরিত্রায়ণের নিরিখ নির্ধারণের জন্য এ প্রশ্নের জবাব আমাদের দিতেই হবে।

সামন্ত অবশেষের ক্রমিক ক্ষয়ের কারণ পুঁজিবাদের ক্রমিক বিকাশ। আবার সামন্ত অবশেষের স্থায়িত্বের কারণও পুঁজিবাদী বিকাশেরই স্থবিরতা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। পুঁজিবাদই এখানে সক্রিয় উপাদান[৮]; সামন্ত অবশেষের ক্ষয় ও স্থায়িত্ব দুটোই তার ফলাফল। তাই আমাদের প্রশ্নটা আসলে গিয়ে দাঁড়ায়: পুঁজিবাদ বিকাশমান কিন্তু স্থবির, এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা কি?

আমরা এই জাতীয় একটা ব্যাখ্যার দিকে প্রলুব্ধ হতে পার: সাম্রাজ্যবাদী

৭ "গত প্রায় দেড়শো বছর ধ'রে আমাদের সমাজের আধা-সামন্তবাদী বৈশিষ্ট্যগুলির কমবেশী হেরফের ঘটলেও মূলগতভাবে সেগুলো অবলুপ্ত হয়নি, অবলুপ্তির কোনো প্রক্রিয়া বর্তমানেও দৃষ্টি-গোচর নয়। এর কারণ সাম্রাজ্যবাদী শোষণ…অর্থাৎ আমাদের ঔপনিবেশিক বা আধা-ঔপনিবেশিক অবস্থা।…আসলে পুঁজিবাদের উত্থানের যুগ আজ শেষ। আমাদের মতো দেশগুলিতে পাশ্চাত্য সমাজের কায়দায় পুঁজিবাদী রূপান্তর কখনও ঘটেনি, আর কোনোদিন ঘটবেও না। এমন কি বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদেরাও এই সত্যেরই স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন, যখন তাঁরা বলেন যে এ সমাজগুলো নিছক **undeveloped** নয়, এগুলো **underdeveloped**, অর্থাৎ পাশ্চাত্য দেশগুলোর প্রথাসিদ্ধ পথে বিকাশ এখানে সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু সমাজ নিশ্চয়ই থেমে থাকবে না, তার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের সমাধান হবেই। বুর্জোয়া নেতৃত্বে পুঁজিবাদী সমাধান এ যুগে আর সম্ভব নয়। তাই অনিবার্য সমাধান ঘটবে সর্বহারা নেতৃত্বে জনগণতন্ত্রের মধ্যে" (ঢাকার 'সংস্কৃতি' পত্রিকায় কার্তিক ১৩৮১ সংখ্যায় ফারুক চৌধুরীর অর্থাৎ বর্তমান লেখকের প্রবন্ধ)। [বর্তমান অধ্যায়ের সবকটি মূল প্রতিপাদ্যই বীজাকারে নিহিত ছিল উদ্ধৃত অংশটির মধ্যে।]

৮ আবার পুঁজিবাদের এই ধরনের বিকলাঙ্গ বিকাশের জন্য দায়ী [প্রধানত] সাম্রাজ্যবাদ। সুতরাং "সক্রিয় উপাদান" হল শেষ বিচারে সাম্রাজ্যবাদ – সামন্তবাদ নয়। কিন্তু পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখাব যে 'কোনটা সক্রিয় উপাদান' এই প্রশ্নের সঙ্গে 'জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান না সামন্ত দ্বন্দ্ব প্রধান' এই প্রশ্নের কোনো সম্পর্ক নেই।

শোষণ-পীড়নের ফলে পুঁজিবাদের বিকাশ এত মন্থর যে এই প্রক্রিয়ার মধ্যে — অর্থাৎ পুঁজিবাদের দ্বারা সামন্তবাদ অপসারিত হওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে — সামন্তবাদের পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটার আগেই অমীমাংসেয় সামাজিক সঙ্কট অনিবার্যভাবে বিপ্লবের জন্ম দেবে এবং তার ফলে সামন্ত অবশেষের বিলুপ্তি পুঁজিবাদের বিকাশ দ্বারা না ঘ'টে ঘটবে অন্যভাবে।

কিন্তু পুঁজিবাদী বিকাশ "এত" মন্থর — শুধু এইটুকু বলাই কি বিষয়টা ব্যাখ্যা করার জন্য যথেষ্ট? যত মন্থরই হোক, বিকাশ যখন আছে তখন একদিন-না-একদিন তা সামন্ত অবশেষের পূর্ণ বিলুপ্তির সীমায় উপনীত হতে পারবে না কেন? তার আগেই আবশ্যিকভাবে বিপ্লব আসবে এ আশা করার বাস্তব ভিত্তি কি? আর, সবচেয়ে বড় কথা, যদিই-বা আসে তবে তার **পরেও** পুঁজিবাদী বিকাশ ঘ'টে ঘ'টে সামন্ত অবশেষকে বিলুপ্ত করতে পারবে না কেন?

এই প্রশ্নগুলি, বিশেষত শেষ প্রশ্নটি, আমাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়: পুরোনো ধরনের গণতান্ত্রিক বিপ্লব আর নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যেকার পার্থক্য। বাজি ধ'রে বলা যায় ১০,০০০ কমিউনিস্টের মধ্যে ৯৯৯৯ জনেরই মনে নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্বন্ধে যে আবছা ধারণা চালু আছে তা হল, বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের শীর্ষে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব বসিয়ে দিলেই তা নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব হয়ে যায়।

কিন্তু রাশিয়ায় তো ১৯০৫ সালে (এবং ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে) শ্রমিকশ্রেণী বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের উপর নিজ নেতৃত্ব স্থাপনের চেষ্টা করেছিল। তা সফল হয়নি, কিন্তু হলেও কি তা নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব হত? নিশ্চয়ই না, তা পুরোনো ধরনের গণতান্ত্রিক বিপ্লবই থাকত। অথচ চীনে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবটা ছিল নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব। কেন? পার্থক্যটা কোথায়? আমরা দেখব যে এই পার্থক্যটাও টানা সম্ভব কেবলমাত্র পুঁজিবাদের দ্বারা সামন্ত অবশেষের পূর্ণ অবলুপ্তির অসম্ভবতার ভিত্তিতেই।

পুরোনো ধরনের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব (তা সর্বহারা নেতৃত্বেই হোক আর বুর্জোয়া নেতৃত্বেই হোক) যখন সংঘটিত হচ্ছিল, পুঁজিবাদের ঊর্ধ্বগতি তখনও শেষ হয়নি, ফুরিয়ে যায়নি তার প্রগতিশীল ভূমিকা[৯]। বিশেষত অনুন্নত দেশগুলিতে তার প্রকাশ ঘটত পুঁজিবাদের এমন এক ধরনের বিকাশের মধ্যে যা তখনও সাম্রাজ্যবাদের চাপে খণ্ডিত না হয়ে দ্রুতবেগে তার সমাজরূপান্তরকারী

৯ অবশ্য বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হয়েছিল, বিশ্ব-পরিসরে নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল তার প্রগতিশীল ভূমিকা। কিন্তু বিশ্ব-ইতিহাস চুলচেরা সন-তারিখের হিসাবে মাপা যায় না, তাই বিভিন্ন দেশে বিচ্ছিন্নভাবে (যেমন ১৯০৫এর রাশিয়ায়) তার ঊর্ধ্বগতি তখনও বজায় থাকা সম্ভব ছিল।

ভূমিকা পালন করতে পারছিল। বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের (তা সর্বহারা নেতৃত্বেই হোক আর বুর্জোয়া নেতৃত্বেই হোক) দায়িত্ব ছিল পুঁজিবাদের এই ধরনের বিকাশেরই চাহিদা পূরণ করা ও তার অনুকূল উপরিকাঠামো প্রতিষ্ঠা করা। "পুঁজিবাদী রূপান্তরের এই ঐতিহাসিক গতিবেগ এমনই অমোঘ ছিল যে যেসব প্রতিক্রিয়াশীলেরা বুর্জোয়া-বিপ্লবকালীন বিভিন্ন অভ্যুত্থান দমন করত, তারাও পরমুহূর্তেই বাধ্য হত বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক সংস্কারগুলিকেই কার্যকর করতে" (ঐ: ফারুক চৌধুরী; চিন্তাটি লেনিনের থেকে নেওয়া)। শুধু তাই কেন, শ্রমিকশ্রেণীও যদি কৃষক ও পেটি বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে যৌথভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে পারত তবু সে পুঁজিবাদী বিকাশের পথ এড়িয়ে যেতে পারত না। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে ক্ষমতাদখলের পরেও পুঁজিবাদী বিকাশ যে শুধু সম্ভব ছিল তা নয়, বরং পুঁজিবাদী বিকাশের সম্ভাবনা তখনও নিঃশেষ হয়নি [পুঁজিবাদের নিছক পরিমাণগত বৃদ্ধির সম্ভাবনা নয় বরং পুঁজিবাদের এমন বিকাশের সম্ভাবনা যা সামন্ত অবশেষকে নিঃশেষে বিলুপ্ত করতে সক্ষম] ব'লেই তা অপরিহার্যও ছিল[১০]। তাই "পণ্য উৎপাদনের অধীনে আদৌ যতটা কল্পনা করা যায় শ্রমিক ও কৃষক জনতার পক্ষে সেই সর্বোত্তম পরিস্থিতিতে **পুঁজিবাদী ভিত্তিতে** উৎপাদনশক্তির দ্রুততম ও মুক্ততম বিকাশ" ঘটানোই ছিল লেনিন-পরিকল্পিত সর্বহারা ও কৃষকের বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের দায়িত্ব ('দি ডেভেলপমেণ্ট অব ক্যাপিটালিজম ইন রাশিয়া': লেনিন; বড় হরফ আমাদের)। তিনি বলেছিলেন, "…পুঁজিবাদের অধিকতর বিকাশ ছাড়া অন্য কিছুতে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি সন্ধান করার ধারণা **প্রতিক্রিয়াশীল**।…অতএব পুঁজিবাদের ব্যাপকতম, মুক্ততম ও দ্রুততম বিকাশে শ্রমিকশ্রেণী **অত্যন্ত নিশ্চিতভাবে আগ্রহী**" ('গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোস্যাল-ডেমোক্রেসির দুই কৌশল': লেনিন)। রাষ্ট্রক্ষমতাসীন শ্রেণীর

১০ শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের অধীনেও পুঁজিবাদের এই অব্যাহত বিকাশ কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন বিপ্লবের মার্কসীয় ধারণাকে মোটেও খণ্ডন করে না। বিপ্লব নিরবচ্ছিন্ন থাকবে না থাকি তাতে ছেদ পড়বে তা নির্ধারিত হয় রাষ্ট্রক্ষমতার দৃষ্টিকোণ থেকে [স্তালিনের 'লেনিনবাদের ভিত্তি' দ্রষ্টব্য]। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে যৌথ গণতান্ত্রিক ক্ষমতা একটি উত্তরণশীল অবস্থা। এই অবস্থা থেকে রাষ্ট্রক্ষমতা যদি ধাপে ধাপে শ্রমিকশ্রেণীর হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে সর্বহারা একনায়কত্ব কায়েম হয় তবে বলতে হবে যে বিপ্লব নিরবচ্ছিন্নভাবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে উত্তীর্ণ হল। কিন্তু উক্ত অবস্থা থেকে রাষ্ট্রক্ষমতা যদি মাঝখানে বুর্জোয়াদের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে বুর্জোয়া একনায়কত্ব কায়েম হয় তবে বলতে হবে যে বিপ্লব আর নিরবচ্ছিন্ন থাকল না। মার্কসবাদীরা অবশ্য মনে করেন যে বিপ্লবের নিরবচ্ছিন্ন উত্তরণ সম্ভব এবং তার জন্য চেষ্টা করা অবশ্যকর্তব্য। পুরোনো ধরনের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগে শ্রমিক-কৃষক একনায়কত্বের অধীনে পুঁজিবাদের দ্রুততম বিকাশ ঘটিয়ে এই নিরবচ্ছিন্ন উত্তরণের বৈষয়িক শর্তাবলী প্রস্তুত করাটাই ছিল লেনিনীয় কর্মসূচী।

ইচ্ছা অনুযায়ী অর্থনৈতিক বিবর্তন নির্ধারিত হয় না, বরং অর্থনৈতিক বিবর্তনের অমোঘ দাবী যে শ্রেণী মেটাতে পারে একমাত্র সে-ই রাষ্ট্রক্ষমতায় বসতে ও টিঁকে থাকতে পারে।

ইতিমধ্যে পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হল। তার ঊর্ধ্বগতি শেষ হয়ে গেল, ফুরিয়ে গেল তার প্রগতিশীল ভূমিকা। সাম্রাজ্যবাদ তথা আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ তার উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলিতে দেশীয় পুঁজিবাদের বিকাশকে খর্ব করতে লাগল, পুঁজিবাদ দাঁড়াল পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে। এইসব পশ্চাৎপদ দেশে [পুঁজিবাদের বিকাশ নিশ্চয়ই ঘটতে থাকল কিন্তু] পুঁজিবাদের সমাজরূপান্তরকারী ভূমিকা আর বাস্তব সত্য রইল না অর্থাৎ স্থায়িত্বক্ষমতা পেল সামন্তবাদ। যে পুঁজিবাদী ভবিষ্যৎ এ যাবৎ সমস্ত অনুন্নত দেশের জন্য অপরিহার্য ছিল, এবার প্রশ্ন উঠল তাকে পরিহার করা সম্ভব কিনা। লেনিন জবাব দিলেন যে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সাহায্য পেলে এইসব পশ্চাৎপদ দেশের পক্ষে পুঁজিবাদী স্তর এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব। আসলে কিন্তু 'পুঁজিবাদী স্তর পরিহার করা সম্ভব কিনা' এই প্রশ্নের চেয়েও বড় প্রশ্ন ছিল 'পুঁজিবাদী স্তরটা এসব দেশের পক্ষে আদৌ সম্ভব কিনা' এবং তা ইতিমধ্যে অসম্ভব হয়ে উঠেছে ব'লেই মানবমন নিজের অজ্ঞাতসারে তাকে পরিহার করার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী নির্ধারণ করতে ব্যাপৃত হয়েছিল।

সেই অধিকতর মৌলিক প্রশ্নটির সম্মুখীন হতে হয়েছিল মাওকে এবং তিনি তার জবাব দিয়েছিলেন অত্যন্ত স্পষ্টভাবে: "…আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ বা সাম্রাজ্যবাদ চীনদেশে বুর্জোয়া একনায়কত্বের অধীনে পুঁজিবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে দেবে না।…সাম্রাজ্যবাদ হল 'মরণোন্মুখ পুঁজিবাদ'।… তবে সে মরণোন্মুখ, ঠিক এই কারণেই সে তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আরো অধিক পরিমাণে উপনিবেশ বা আধা-উপনিবেশগুলির উপর নির্ভর করছে এবং সে অবশ্যই কোনো উপনিবেশ বা আধা-উপনিবেশে সেই দেশের নিজস্ব বুর্জোয়া একনায়কত্বের অধীনে পুঁজিবাদী সমাজের মতো কোনো একটা কিছু প্রতিষ্ঠা করতে দেবে না" ('নয়া-গণতন্ত্র সম্বন্ধে')। তার মানে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-পীড়নের দরুণ এইসব পশ্চাৎপদ সমাজ কোনোদিনই পূর্ণ-পুঁজিবাদী স্তরে উত্তীর্ণ হবে না[১১]। কিন্তু তার অর্থ এই যে পুঁজিবাদের অব্যাহত বিকাশের ফল হিসাবে

১১ [যদি কেউ আপত্তি তোলেন যে চীনে "পুঁজিবাদী সমাজ" প্রতিষ্ঠিত হতে না পারার অর্থ সামন্ত অবশেষের লেশহীন "পূর্ণ-পুঁজিবাদী" স্তরে উত্তীর্ণ হতে না পারা নয় বরং কেবলমাত্র সামন্তবাদের তুলনায় পুঁজিবাদ "প্রধান" হতে না পারা তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গিয়ে সেই পুরোনো প্রশ্নটার সঙ্গেই আবার ঠোক্কর খেতে হবে: চীনের বৈশিষ্ট্য যদি এটাই ছিল যে সেখানে সামন্তবাদের তুলনায় পুঁজিবাদ প্রধান হতে পারছে না তাহলে চীনা সমাজকে সামন্তবাদী না ব'লে আধা-সামন্তবাদী বলা হত কোন যুক্তিতে? আসলে 'আধা-সামন্তবাদী' চরিত্রায়ণের একমাত্র

সামন্ত অবশেষগুলি কোনোদিনই স্বতস্ফূর্তভাবে পুরোপুরি বিলুপ্ত হবে না, তাই সর্বহারার আত্মগত প্রয়াস দ্বারা সেগুলোর বিলোপ ঘটানোটাই ঐতিহাসিক দায়িত্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং সাধারণভাবে সেগুলোর সঙ্গে ব্যাপক জনগণের দ্বন্দ্বটাই প্রধান থাকে।

অবশ্য সব সামাজিক পরিবর্তনেই মানুষের আত্মগত প্রয়াস জড়িত থাকে, কিন্তু ক্ষেত্রভেদে তার চরিত্রে তফাৎ ঘটে।

সামন্তবাদী সমাজের গর্ভে নতুন অর্থাৎ পুঁজিবাদী উৎপাদনসম্পর্ক স্বতস্ফূর্তভাবে জন্ম নেয় এবং সামন্তবাদী উৎপাদনসম্পর্ককে ক্রমাগত ক্ষয় ক'রে স্বতস্ফূর্তভাবেই উত্তরোত্তর নিজে প্রাধান্যলাভ করতে থাকে ও শেষ পর্যন্ত সামন্ত অবশেষকে একেবারে নিশ্চিহ্ন ক'রে দেয়। এইরকম পরিবেশে পুঁজিবাদ সামন্তবাদের উপর প্রাধান্যলাভের সঙ্গে সঙ্গেই, এমন কি তার কিছু আগেও, সমাজটি হয়ে যায় [অর্থনৈতিক ভিত্তির দিক থেকে] পুঁজিবাদী। এই ধরনের বিকাশমান পুঁজিবাদী সমাজে পুরোনো ধরনের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব (সর্বহারা নেতৃত্বে হলেও) নতুন কোনো উৎপাদনসম্পর্ক সৃষ্টি করে না বরং স্বতস্ফূর্ত ও অপ্রতিরোধ্যভাবে বিকাশমান পুঁজিবাদেরই হাতিয়াররূপে কাজ ক'রে তার প্রাধান্যলাভের পথ উন্মুক্ত ক'রে দেয় মাত্র।

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য এই যে পুঁজিবাদী সমাজের গর্ভে নতুন কোনো উৎপাদনসম্পর্ক আপনা থেকেই জন্ম নেয় না। মানুষের সচেতন আত্মগত প্রয়াস দ্বারা সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে হয়।

আধা-ঔপনিবেশিক (বা ঔপনিবেশিক) ও আধা-সামন্তবাদী সমাজে সামন্ত অবশেষ পুঁজিবাদের অব্যাহত বিকাশের মুখে স্বতস্ফূর্তভাবে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় না, তাই তাকে সর্বহারা নেতৃত্বে জনগণের সচেতন আত্মগত প্রয়াস দ্বারা বিলুপ্ত করতে হয়। কিন্তু তার দ্বারা ইতিমধ্যে বিদ্যমান পুঁজিবাদী উৎপাদনসম্পর্কের বিকাশ সবলতর হয় না ; নতুন যে উৎপাদনসম্পর্ক আসে তা তৎক্ষণাৎ সমাজতান্ত্রিক চরিত্রের হয় না বটে, তবে ক্রমে ক্রমে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনসম্পর্ককেই সচেতন প্রয়াস দ্বারা সৃষ্টি করতে হয়। ফলে নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব অর্থনৈতিক দিক থেকেও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্নভাবে যুক্ত (যা পুরোনো ধরনের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বেলায় খাটে না, কারণ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে তার নিরবচ্ছিন্নতা কেবল রাজনৈতিক দিক থেকেই সত্য)।

নিবিথ হতে পারে পুঁজিবাদের এমন বিকাশ যাব বৈশিষ্ট্য একই সঙ্গে দুটো : প্রথমত সামন্ত অবশেষ অপ্রধান হয়ে গিয়ে থাকলেও পুঁজিবাদের দ্বারা তার পূর্ণ বিলুপ্তি অসম্ভব (ফলে আলোচ্য সমাজটি পুঁজিবাদী নয়), দ্বিতীয়ত সামন্তবাদ এখনও প্রধান থাকলেও পুঁজিবাদের তুলনায় তার অপ্রধান হয়ে যাওয়াটাই আবশ্যিক পরিণতি (ফলে আলোচ্য সমাজটি সামন্তবাদী নয়) এ সম্বন্ধে পরে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে।]

পুরোনো ধরনের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সর্বহারাশ্রেণীর ঠিক তেমনভাবে একাই "গ'ড়ে তোলা"র প্রয়োজন হত না। পুঁজিবাদী বিকাশের দ্বারা সমাজের পূর্ণ রূপান্তর সুনিশ্চিত থাকার দরুণ কমিউনিস্ট পার্টি প্রধানত ব্যস্ত থাকত তার মৌলিক দায়িত্ব পালনে—সর্বহারাশ্রেণীকে তার চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করার কাজে; সেই লক্ষ্য অভিমুখে এগিয়ে যাওয়ার পথে যখন বহুলাংশে তার সাহায্য ছাড়াই বিস্ফোরিত এক বুর্জোয়া বিপ্লবের সাক্ষাৎ মিলত তখন সে চেষ্টা করত তার উপর একটি "সর্বহারা ছাপ" এঁকে দিতে ও তার নেতৃত্ব ছিনিয়ে নিতে এবং স্বভাবতই এই প্রয়াসের প্রধান রঙ্গভূমি হত পুঁজিবাদী বিকাশের প্রাণকেন্দ্র শহরগুলি[১২]। পক্ষান্তরে নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পটভূমি হল পুঁজিবাদী বিকাশের এমন এক ধরনের স্থবিরতা ও দুর্বলতা যে তার তাগিদে বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়াশ্রেণী নিজস্ব উদ্যোগে সর্বহারার সামনে বুর্জোয়া বিপ্লবকে এনে দিতে বাধ্য হয় না; তাই এ বিপ্লব গ'ড়ে তোলা, সংগঠিত করা ও বিস্ফোরিত করার প্রতিটি ধাপে আগাগোড়া সর্বহারাশ্রেণী ও তার পার্টির সচেতন আত্মগত প্রয়াসের প্রয়োজন অত্যধিক[১৩] এবং গ্রামে শ্রেণীসংগ্রামটাকে নিছক ভালোমতো জ্বালিয়ে তোলার জন্যই কমিউনিস্ট পার্টির প্রত্যক্ষ উদ্যোগ-গ্রহণ অপরিহার্য।

পুরোনো ধরনের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবে (এমন কি তা যদি শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত হত তবুও), এবং তার পরে, শ্রমিকশ্রেণী হাজার চাইলেও পুঁজিবাদী বিকাশের পথ [সমাজের পূর্ণ পুঁজিবাদী রূপান্তরের পথের অর্থে] এড়াতে পারত না। আর নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবে, এবং তার পরে, বুর্জোয়ারা হাজার চাইলেও [সমাজের *পূর্ণ* পুঁজিবাদী রূপান্তর ঘটানোর মতো] পুঁজিবাদী বিকাশের পথ উন্মুক্ত করতে পারে না, কারণ সাম্রাজ্যবাদের যুগে এসব দেশে পুঁজিবাদের পথে উৎপাদনশক্তির সে ধরনের বিকাশ আর সম্ভবই নয়, আর তাই এই বিপ্লবের পর উৎপাদনশক্তির বিকাশের পথ অনিবার্যভাবে সমাজতন্ত্রের দিকে। এইজন্যই নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর চীনে যারা পুঁজিবাদী পথের ওকালতি করত তারা আসলে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্তবাদী চীনেই ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করছিল, কেননা সে অবস্থায় চীনের সামনে দুটিমাত্র সম্ভাবনা বিরাজ করছিল—হয় তাকে সমাজতন্ত্রের দিকে এগোতে হবে নতুবা ফিরে আসতে হবে আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্তবাদী অবস্থায়

১২ [অর্থাৎ এক্ষেত্রে বিরাট কারখানাটার প্রত্যেকটি মেশিনকে আলাদাভাবে কষ্ট ক'রে চালু করার প্রয়োজন নেই। সম্পূর্ণ কারখানাটা ইতিমধ্যেই পুরোদমে চলতে শুরু করেছে, তাই লড়াইটা সীমাবদ্ধ হয়েছে কারখানার কণ্ট্রোলরুমে, সুইচবোর্ডের দখলকে কেন্দ্র ক'রে।]

১৩ আবার সেইজন্যই পুশ্‌বাদী আত্মগত প্রয়াসের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকাটাও এখানে আরো বেশী দরকার।

এবং এইদুটো সম্ভাবনার মাঝখানে পুঁজিবাদী চীন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার তৃতীয় কোনো সম্ভাবনা বাস্তবেই বিদ্যমান ছিল না। অবশ্য আজ যখন সামন্ত অবশেষ ধ্বংস হয়েছে, নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্তব্যগুলি সম্পূর্ণ হয়েছে, সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তার আওতায় উৎপাদনশক্তির বিপুল বিকাশ ঘ'টে গেছে — আজ এই অবস্থায় পুঁজিবাদী চীনের উদ্ভব যদি-বা সম্ভবপর হয়ে থাকে তবু উৎপাদনশক্তির অধিকতর বিকাশ আর কিছুতেই সেই পুঁজিবাদী পথে সম্ভব হবে না।

বুর্জোয়ারা বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক ব'লেই যে আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্তবাদী সমাজ পুঁজিবাদী সমাজে রূপান্তরিত হতে পারে না তা নয়, বরং এ সমাজের পূর্ণ পুঁজিবাদী রূপান্তর অসম্ভব ব'লেই বুর্জোয়ারা এখানে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করতে অক্ষম এবং পুরোনো ধরনের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব এখানে অসম্ভব। আর শ্রমিকশ্রেণী নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবে নেতৃত্ব দেয় ব'লেই যে আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্তবাদী সমাজ পুঁজিবাদী সমাজে রূপান্তরিত হতে পারে না তা নয়; বরং এ সমাজের পূর্ণ পুঁজিবাদী রূপান্তর অসম্ভব ব'লেই গণতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব অপরিহার্য হয়ে পড়ে এবং বিপ্লবের পরেও এখানে সমাজবিকাশকে অনিবার্যভাবে এগিয়ে যেতে হয় পুঁজিবাদের পরিবর্তে সমাজতন্ত্রের দিকে।

মূল আলোচনা থেকে কিছুটা ছিটকে পড়লেও এতে একটা বিরাট লাভ হয়েছে। আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি যে আধা-ঔপনিবেশিক (বা ঔপনিবেশিক) ও আধা-সামন্তবাদী সমাজগুলি সম্বন্ধে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের যে প্রতিষ্ঠিত মূল্যায়ন (চীন সম্বন্ধে মাওয়ের পূর্বোল্লিখিত উক্তি, এসব সমাজে নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অপরিহার্যতা) তার প্রচ্ছন্ন কিন্তু অনিবার্য তাৎপর্য হল এই যে এই সমাজগুলিতে পুঁজিবাদের ক্রমিক বিকাশ ঘটতে থাকলেও সাম্রাজ্যবাদের যুগে তারা কখনও পুঁজিবাদের দ্বারা সামন্ত অবশেষের পূর্ণ বিলোপ মারফৎ পূর্ণ-পুঁজিবাদী রূপান্তর হাসিল করতে পারবে না। অতএব একমাত্র এটাই হতে পারে আমাদের অন্বিষ্ট সেই নিরিখ নির্ধারণের একমাত্র মার্কসবাদ-লেনিনবাদসম্মত ভিত্তি, যার দ্বারা আমরা নিঃসংশয়ে নিরূপণ করতে পারব কোনো সমাজ স্বাধীন ও পুঁজিবাদী নাকি আধা-ঔপনিবেশিক (বা ঔপনিবেশিক) ও আধা-সামন্তবাদী।

কিন্তু অনবরত পুঁজিবাদী বিকাশ ঘটছে, তবু তা কিছুতেই পূর্ণ-পুঁজিবাদী লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারছে না — এই দ্বন্দ্বের সমাধান কি?

নিছক বিকাশের মন্থরতা দিয়ে এর সমাধান করা সম্ভব নয়, কেননা মন্থরতা বিলম্বের কারণ হতে পারে কিন্তু কোনোদিনই লক্ষ্যে উপনীত না হওয়ার আবশ্যিক কারণ হতে পারে না। পূর্ণ পুঁজিবাদী রূপান্তর সম্পন্ন হওয়ার আগেই কেন একটা

বিপ্লব ঘ'টে যাবে তারও কোনো আবশ্যিক কারণ বিকাশের মন্থরতার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। সবচেয়ে বড় কথা, তার আগে যদি বিপ্লব ঘটেও, এবং সে বিপ্লব যদি শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বেও হয়, তবু পুঁজিবাদী বিকাশের ধরনটাই যেখানে এমন যে তার দ্বারা সামন্ত অবশেষের পূর্ণ অবলুপ্তি তথা সমাজের পূর্ণ পুঁজিবাদী রূপান্তর সম্ভব সেখানে, সে রূপান্তর যতই মন্থর হোক না কেন, বিপ্লবের পরেও সেটা যে শুধু সম্ভব থাকবে তা-ই নয় বরং সেটাই হবে বাধ্যতামূলক[১৪]। কাজেই এ দ্বন্দ্বের সমাধান করতে পারে পুঁজিবাদী বিকাশের **অন্য কোনো ধরনের** চরিত্রবৈশিষ্ট্য। দেখা যাক, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মধ্যে এই জাতীয় কোনো গতির সন্ধান পাওয়া যায় কিনা, কেননা ১৮৬৩ সালে মার্কস তো তাঁর 'পুঁজি' গ্রন্থের প্রাথমিক রচনাকর্মে লিখেছিলেন যে "সব জ্ঞানেই অন্তর্লীন রয়েছে" প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (এঙ্গেলসের 'ডায়ালেকটিক্স অব নেচার'এ রাশিয়ার ইনস্টিটিউট অব মার্কসিজম-লেনিনিজম প্রদত্ত মুখবন্ধ)।

যেমন ধরুন ইউরেনিয়ামের তেজস্ক্রিয়া, ইউরেনিয়ামের পরমাণুর ভাঙন থেকে যার উদ্ভব। প্রতি পাউণ্ড ইউরেনিয়াম থেকে প্রতি সেকেণ্ডে একশো কোটিরও বেশী পরমাণু ভেঙে পড়ে। প্রতি সেকেণ্ডে যদি এই পরিমাণ পরমাণু **অপরিবর্তিত হারে** ভাঙত তবে হিসাব ক'রে দেখা গেছে যে এক পাউণ্ড ইউরেনিয়াম পুরোপুরি ভেঙে পড়তে প্রায় তিন কোটি বৎসর লাগত। কিন্তু প্রতি সেকেণ্ডে ভেঙে-পড়া পরমাণুর সংখ্যা আবার ইউরেনিয়ামের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল— অর্থাৎ পরমাণু ভাঙার ফলে ইউরেনিয়ামের পরিমাণ যত কমে ততই ক'মে আসে প্রতি সেকেণ্ডে ভেঙে-পড়া পরমাণুর সংখ্যাও। ইউরেনিয়াম যত ক্ষয় হয় ততই ক'মে আসে তার ক্ষয়ের সেকেণ্ড-পিছু হার, ফলে এক পাউণ্ড ইউরেনিয়াম ভাঙতে লাগে অসীম সময় অর্থাৎ তা ক্রমাগত বিলুপ্ত হতে থাকলেও তার পূর্ণ-বিলুপ্তির লক্ষ্যে কোনোদিনই উপনীত হতে পারে না।

অবশ্য ইউরেনিয়ামের দৃষ্টান্তটা ইউরেনিয়ামের ক্ষয়-সংক্রান্ত। তাই পুঁজিবাদের বিকাশের চেয়ে তা বরং সামন্ত অবশেষের ক্রমিক ক্ষয়ের পক্ষেই বেশী প্রযোজ্য। কিন্তু সামন্ত অবশেষের ক্ষয়ের সক্রিয় কারণ হচ্ছে পুঁজিবাদের বিকাশ। অর্থাৎ পুঁজিবাদ একটা বিশেষ ধরনে বিকশিত হলে পরে তারই ফল, প্রতিক্রিয়া ও বিপরীত-প্রতিফলন হিসাবেই সামন্ত অবশেষের ক্রমিক ক্ষয়টা

১৪ [পক্ষান্তরে নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের আবশ্যিক সামাজিক পটভূমি হচ্ছে পুঁজিবাদের এমন এক ধরনের বিকাশ যে তার দ্বারা সামন্ত অবশেষের পূর্ণ বিলোপ তথা সমাজের পূর্ণ পুঁজিবাদী রূপান্তর অসম্ভব। স্বভাবতই নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পরেও পুঁজিবাদী বিকাশের এই সীমাবদ্ধতা বলবৎ থাকে, তাই শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে ব্যাপক জনগণের সচেতন আত্মগত প্রয়াস দ্বারা সামন্ত অবশেষ বিলুপ্ত ক'রে নয়া-গণতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করতে হয় এবং সমাজ-রূপান্তরের ঐতিহাসিক দায়িত্ব সম্পন্ন করতে হয় সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হয়ে।]

ইউরেনিয়ামের ক্ষয়ের ধরন অনুসরণ করতে পারে। অতএব ইউরেনিয়ামের ক্ষয়ের ধরনটিকে উল্টে নিলেই পাওয়া যাবে আধা-ঔপনিবেশিক (বা ঔপনিবেশিক) ও আধা-সামন্তবাদী সমাজে পুঁজিবাদের বিকাশের ধরনটিকে। তবু এটাকেও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের একটা দৃষ্টান্ত থেকে ইতিবাচকভাবে বোঝার চেষ্টা করা যাক।

যেমন ধরুন আইনস্টাইন-আবিষ্কৃত আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব—যা প্রমাণ করেছে যে কোনো ভারী জিনিসে শক্তি সঞ্চারিত ক'রে তার গতিবেগ যতই বাড়ানো যাক না কেন তা কখনও আলোর গতিবেগ অর্জন করতে পারবে না। এটা কিভাবে সম্ভব হতে পারে? পদার্থবিদ্যার মতে কোনো জিনিসের ভর হচ্ছে তার মধ্যে নিহিত বস্তুর পরিমাণ; আবার অন্যদিক থেকে দেখতে গেলে এই ভরই হল কোনো জিনিসের গতিপরিবর্তনে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা[১৫]। আইনস্টাইনের আগে পর্যন্ত নিউটনীয় পদার্থবিদ্যা মনে করত যে একটা জিনিসের ভর সর্বদা ও সর্বক্ষেত্রেই ধ্রুব, তা জিনিসটার গতিবেগের উপর নির্ভরশীল নয়—অর্থাৎ যে কোনো গতিবেগেই একটা জিনিস তার গতিপরিবর্তনকে সমানভাবে বাধা দেয়। কিন্তু আইনস্টাইন প্রমাণ করলেন যে তা ঠিক নয়; একটা জিনিসের গতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার ভর—অর্থাৎ গতিপরিবর্তনকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা—বাড়তে থাকে। আমাদের সচরাচর-পরিচিত গতিবেগগুলিতে ভরের এই হেরফের এত কম হয় যে কোনো পরিমাপযন্ত্রেই তা ধরা সম্ভব নয়। কিন্তু গতিবেগ যত আলোর গতিবেগের কাছাকাছি যেতে থাকে ভরের বৃদ্ধি ততই প্রচণ্ডতর হতে থাকে—হিসাব ক'রে দেখা গেছে যে আলোর গতিবেগের শতকরা নব্বইভাগ গতিবেগে চললে তার ভর প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়, আর আলোর সমান গতিবেগে ভর হয়ে যায় অসীম। কিন্তু "যেহেতু একটা অনন্ত ভরের পদার্থ গতিবৃদ্ধিকে অনন্তভাবে বাধা দেবে, অতএব…কোনো পদার্থই আলোর গতিবেগে চলতে পারে না" ('বিশ্বরহস্যে আইনস্টাইন': লিংকন বার্নেট লিখিত ও আইনস্টাইনের ভূমিকা-সংবলিত 'দি ইউনিভার্স অ্যাণ্ড ডক্টর আইনস্টাইন' পুস্তকের অধ্যাপক এম. এ. জব্বার-কৃত অনুবাদ)। অর্থাৎ সংক্ষেপে বলতে গেলে, একটা জিনিসে শক্তিসঞ্চার করার ফলে তার গতি যত বৃদ্ধি পেতে থাকে তত বাড়তে থাকে গতিবৃদ্ধিকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা (তাই তত কমতে থাকে তার গতিবৃদ্ধির হার) এবং তা এমনভাবে বাড়তে থাকে যে আলোর গতিবেগে পৌঁছালে গতিবৃদ্ধিকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা অসীম (ও

১৫ ভরের এই দুটো সংজ্ঞাই কিন্তু সমার্থক. কেননা একটা জিনিসের মধ্যে বস্তুর পরিমাণ যত বেশী থাকে তার গতি বাড়াতে বা কমাতে বা তার গতির দিক পরিবর্তন করতে যে তত বেশী বল প্রয়োজন হয়, আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাই তার সাক্ষ্য দেয়।

গতিবৃদ্ধির হার শূন্য) হয়ে যায়—তারই দরুণ জিনিসটি কখনও আলোর গতিবেগে পৌছাতে পারে না। কিন্তু গতি এক ধরনের শক্তি। এই শক্তি যত বাড়ানো হয়, ততই তা ক্রমবর্ধমান হারে তার বিপরীতে, অর্থাৎ গতিবৃদ্ধিকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতায়, রূপান্তরিত হতে থাকে : "যে শক্তিকে বহির্জগতের নিকট প্রদর্শন করার বিপরীতে পদার্থটি, বলতে গেলে, আভ্যন্তরীণভাবে ব্যয় করে" তা-ই হল ভর ('এ বি সি অব রিলেটিভিটি' : বার্ট্রাণ্ড রাসেল)। "ভর নামে যে বিষয়টি আমরা জানি তা শক্তিরই জমাট অবস্থা। সোজা কথায় পদার্থই শক্তি এবং শক্তিই পদার্থ। তাদের পার্থক্য সম্পূর্ণ অস্থায়ী" (ঐ : লিংকন বার্নেট)। এতে অবশ্য মার্কসবাদীদের অবাক হওয়ার কিছু নেই কারণ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বহু আগেই ব'লে রেখেছে যে এই দুনিয়ায় সব পার্থক্যই আপেক্ষিক ও অস্থায়ী।

সে যা হোক, আধা-ঔপনিবেশিক (বা ঔপনিবেশিক) ও আধা-সামন্তবাদী সমাজে পুঁজিবাদের ক্রমাগত বিকাশ সত্ত্বেও কোনোমতে পূর্ণ পুঁজিবাদী রূপান্তর সম্ভব হতে পারে না—মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সামগ্রিক অবস্থানের এই যে অকাট্য তাৎপর্য তা যদি সঠিক হতে হয় তবে সেখানেও ব্যাপারটা ঐরকমই কিছু না হয়ে উপায় নেই। অর্থাৎ সেখানে পুঁজিবাদ যত বিকশিত হচ্ছে ততই মন্থর হয়ে আসছে তার বিকাশ, আর তারই ফলে সামন্ত অবশেষ ক্ষয় হতে থাকলেও তা কখনোই এই প্রক্রিয়ার মধ্যেই পুঁজিবাদের বিকাশ দ্বারা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হতে পারে না। এই ধরনের ক্ষেত্রে সর্বদাই প্রয়োজন হয় এই অন্তহীন প্রক্রিয়ার একটি আকস্মিক ছেদ, এক প্রক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর একটি প্রক্রিয়ায় গুণগত উল্লম্ফন। তাই প্রয়োজন বিপ্লব, প্রয়োজন সর্বহারা নেতৃত্বে নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রক্রিয়ার উদ্বোধন।

৬. আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্তবাদী চরিত্রায়ণের নিরিখ[১৬]

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বে 'আধা-ঔপনিবেশিক' ও 'আধা-সামন্তবাদী' বর্গদুটি হামেশাই ব্যবহৃত হলেও এখন পর্যন্ত সেগুলির কোনো যথাযথ সংজ্ঞা নিরূপিত হয়নি। কিন্তু বর্গদুটির প্রকৃতিই এমন যে তাদের সংজ্ঞা দ্বন্দ্বরত দিকদ্বয়ের সরাসরি পরিমাণগত তুলনার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তাই বর্তমান অধ্যায়ের এত দীর্ঘ বিশ্লেষণটির লক্ষ্য ছিল এই দুটি চরিত্রায়ণের প্রত্যেকটির জন্য এমন যুক্তিসঙ্গত নিরিখ স্পষ্ট ও যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত করা : (১) যা হবে, দ্বন্দ্বরত দিকদ্বয়ের কোনটি অপরটির তুলনায় পরিমাণগতভাবে প্রধান,

১৬ এই উপ-পরিচ্ছেদের পুরোটাই আমি জেল থেকে বেরিয়ে এসে যোগ করেছি।

গুণ নির্ধারণের জন্য দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের এই সচরাচর-প্রযুক্ত নিরিখ থেকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন; (২) অথচ যার যথাসম্ভব যথাযথ পরিমাপযোগ্যতা থাকবে যাতে এ সম্বন্ধে সমস্ত বিতর্কের একটি সুষ্ঠু ও সন্দেহাতীত মীমাংসা ঘটানো যায়; (৩)যা হবে সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তির সঙ্গে যথাসম্ভব সম্পর্কিত; এবং (৪) যা বর্গদুটির প্রত্যেকটিকে একটি **অনন্য** বাস্তব গুণের নাম হিসাবে সংজ্ঞায়িত করবে।

এই লক্ষ্য সফল করতে গিয়ে আমরা অত্যন্ত সঠিকভাবেই নিম্নলিখিত যৌক্তিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছি:

"প্রথম সম্ভাবনা" নামক একটি পরিস্থিতি আমরা কল্পনা করেছি যাতে দ্বন্দ্বরত দিকদ্বয়ের এমন একটি দিক অপরটির তুলনায় প্রধান যে এক্ষেত্রে 'ঔপনিবেশিক' ও 'সামন্তবাদী' চরিত্রায়ণই সাধারণভাবে সঠিক হত; আমরা জানতে চেয়েছি 'আধা-ঔপনিবেশিক' ও 'আধা-সামন্তবাদী' চরিত্রায়ণ তা সত্ত্বেও কোনো বিশেষ কারণে এক্ষেত্রে আবশ্যিক হতে পারে কিনা এবং হলে তা কোন নিরিখে নির্ণয়যোগ্য হবে।

তারপর "দ্বিতীয় সম্ভাবনা" নামক একটি পরিস্থিতি আমরা কল্পনা করেছি যাতে দ্বন্দ্বরত দিকদ্বয়ের আপেক্ষিক পরিমাণের সম্পর্ক "প্রথম সম্ভাবনা"র বিপরীত; আমরা জানতে চেয়েছি 'স্বাধীন' ও 'পুঁজিবাদী' চরিত্রায়ণের পরিবর্তে 'আধা-ঔপনিবেশিক' ও 'আধা-সামন্তবাদী' চরিত্রায়ণ তা সত্ত্বেও কোনো বিশেষ কারণে এক্ষেত্রে আবশ্যিক হতে পারে কিনা এবং হলে তা কোন নিরিখে নির্ণয়যোগ্য হবে।

সম্ভাব্য বিভ্রান্তি এড়ানোর জন্য পাঠককে পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে যে এই পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে আমাদের সমগ্র যুক্তিকাঠামো ও সিদ্ধান্তগুলি কিন্তু আদৌ 'পুঁজিবাদের দিক', 'সামন্ত অবশেষের দিক', 'স্বাধীনতার দিক', 'অধীনতার দিক' এই **সবগুলি** ধারণার নিখুঁত পরিমাণীকরণ (quantification) ও সরাসরি পরিমাণগত তুলনার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েনি—বরং উল্টো, এই পদ্ধতি অবলম্বনের ফলেই তা থেকে স্বাধীন হয়ে গেল। কেননা এই পদ্ধতির চূড়ান্ত ফল তো দাঁড়াল এই যে প্রথম ও দ্বিতীয় সম্ভাবনা **নির্বিশেষে** —অর্থাৎ দ্বন্দ্বরত দিকদুটির যেটাই অপরটার তুলনায় পরিমাণগতভাবে প্রধান হয়ে থাকুক না কেন—'আধা-ঔপনিবেশিক' বা 'আধা-সামন্তবাদী' চরিত্রায়ণ উভয় ক্ষেত্রেই নির্ধারিত হবে "অন্য কোনো" নিরিখ দ্বারা; ফলে 'কোন দিক অপরটির তুলনায় পরিমাণগতভাবে প্রধান'—গুণনির্ধারণের এই প্রচলিত বিবেচনাটাই একেবারে অবান্তর হয়ে গেল এবং এইভাবে এটা নিশ্চিত হল যে এই পদ্ধতিতে যে নিরিখদুটিতে আমরা পৌছাব তা বর্গদুটির চরিত্রের অন্তর্নিহিত দাবীকে মেটাতে পারবে। কিন্তু এর অর্থ কি এই যে 'আধা-

সামন্তবাদী সমাজে সামন্তবাদী অর্থনীতিই প্রধান' এবং 'আধা-ঔপনিবেশিক দেশে স্বাধীনতার দিকই প্রধান' কিংবা 'তার শাসকশ্রেণীগুলি সাম্রাজ্যবাদের ছোটো শরিক ও তাদের আত্মসমর্পণের দিকই প্রধান' ইত্যাদি কথাগুলির ব্যবহারই এখন থেকে তুলে দিতে হবে? তা নিশ্চয়ই নয়। শুধু এইটুকু মনে রাখতে হবে যে 'প্রধান', 'ছোট শরিক' ইত্যাদি শব্দগুলির মধ্যে পরস্পর-বিপরীত দিকগুলির কোনো সরাসরি পরিমাণগত তুলনা প্রচ্ছন্ন নেই। সুতরাং যদি, উদাহরণস্বরূপ, বলা হয় যে আধা-সামন্তবাদী সমাজে সামন্তবাদই সর্বদা প্রধান থাকে তবে তার একমাত্র অর্থ এই যে পুঁজিবাদের সঙ্গে সরাসরি পরিমাণগত তুলনায় সামন্তবাদ প্রধান বা অপ্রধান যা-ই হোক না কেন—এমন কি তা যদি অপ্রধান হয়ে গিয়ে থাকে তবু—সামন্তবাদের **কার্যকরী শক্তিই**[১৭] এখনও এক অর্থে প্রধান হয়ে আছে, নইলে তা কিভাবে সমাজের পুঁজিবাদী রূপান্তরের শক্তিকে এমন খর্ব ক'রে রাখতে পারছে যে পূর্ণ পুঁজিবাদী রূপান্তর অসম্ভব হয়ে থাকছে? কেউ কেউ হয়তো বলবেন: 'এ আর নতুন কথা কি? "সমাজতান্ত্রিক" বিপ্লবের প্রবক্তারা যখন দাবী করে যে আমাদের এই দেশগুলিতে অধীনতা ও সামন্ত অবশেষের উপাদান ইতিমধ্যেই পরিমাণগতভাবে অপ্রধান হয়ে গেছে তখন তো আমরা বলিই যে তা হয়ে থাকলেও ওগুলোর গুরুত্ব, তাৎপর্য—এমন কি "শক্তি"—এখনও প্রধান।' কিন্তু যে কোনো পাঠক একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন যে কেন এক্ষেত্রে একটি "দিক"এর পরিমাণগত প্রাধান্যের পরিবর্তে তার "শক্তি"র প্রাধান্য খুঁজতে হবে এবং সে প্রাধান্য নির্ধারণেরই বা যথাযথ নিরিখ কি, এই প্রশ্নদুটির জবাব না দেওয়া পর্যন্ত "সমাজতান্ত্রিক" বিপ্লবের প্রবক্তাদের বিরুদ্ধে ঐ যুক্তি দেওয়ার কোনো অধিকার আমাদের নেই—কেননা মূল সমস্যাটা থেকেই যায়। তা হল: দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদী পদ্ধতি অনুযায়ী গুণনির্ধারণের জন্য যে পরিমাণগত তুলনা (তা সরাসরিভাবে "দিক"-দুটিরই হোক বা তাদের "শক্তি"রই হোক) অপরিহার্য, **নিখুঁত পরিমাণীকরণ ও সমমেয়তার অভাব সত্ত্বেও** সেটাকে অতিক্রম করার সমস্যা।

কিন্তু আমাদের মতো দেশগুলির সমাজচরিত্রায়ণের ক্ষেত্রে কেন এমন দুটি বর্গ ব্যবহার করতে হচ্ছে যাদের চরিত্রবৈশিষ্ট্যই হল দ্বন্দ্বরত দিকগুলির পরিমাণের তুলনাকে উপেক্ষা করা? তার কারণ হল আমাদের মতো সমাজগুলির তাত্ত্বিক চরিত্রায়ণের জন্য যেসব অভিজ্ঞতালব্ধ মালমশলার উপর আমাদের নির্ভর করতে হয় সেগুলো দুটো কারণে এই ধরনের সরাসরি পরিমাণগত তুলনার অনুমতি

[১৭] এখানে বিবৃত ধারণাটি মাওয়ের একটি পূর্বোদ্ধৃত উক্তির মধ্যেই আভাসিত, যেখানে তিনি বলছেন যে গুণগত পরিবর্তন নির্ধারিত হয় দ্বন্দ্বরত দিকদুটির আপেক্ষিক "শক্তি"র হ্রাস বা বৃদ্ধির দ্বারা ('দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে' দ্রষ্টব্য)।

দিতে পারে না। প্রথমত আমাদের ব্যবহৃত উপাত্তগুলি (data) থেকে পুঁজিবাদী রূপান্তরের মাত্রা বা পরিমাণের একটা পরিমাপ যদি সম্ভব হয়ও, সামন্ত অবশেষের তেমন কোনো পরিমাপ মোটেই সম্ভব নয়; দ্বিতীয়ত সামন্ত অবশেষের পরিমাণীকরণ করা যদি বা সম্ভব হত তবু তা তৎক্ষণাৎ পুঁজিবাদী রূপান্তরের সঙ্গে তুলনীয় ও সমমেয় (commensurable) হত এ কথা বলা যায় না। তাই, যেসব সমাজে পুঁজিবাদী রূপান্তর শুরু হয়েছে কিন্তু সামন্ত অবশেষ এখনও বিদ্যমান সেগুলোর ক্ষেত্রে উপাত্তের এই সীমাবদ্ধতাগুলির কারণেই আমাদের এমন একটি পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয় যার দ্বারা দ্বন্দ্বরত দিকদুটির উভয়েরই পরিমাণীকরণের সমস্যা এড়ানো যায় এবং কেবলমাত্র পুঁজিবাদী রূপান্তরের দিকের উপর নির্ভর ক'রেই যথাসাধ্য নিখুঁত চরিত্রায়ণ সম্ভব হয়। পুঁজিবাদী রূপান্তরের ধরনটা এমন কিনা যা পূর্ণ পুঁজিবাদী রূপান্তর সুনিশ্চিত করতে পারে, এটাই তখন একটি মৌলিক নিরিখ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে—**এবং তা শুধু আধা-সামন্তবাদী সমাজের চরিত্রায়ণের জন্যই নয়, অনুন্নত পুঁজিবাদী সমাজের চরিত্রায়ণের জন্যও**[১৮]। উদাহরণস্বরূপ মার্কস যখন দাবী করলেন যে তাঁর আবিষ্কৃত পুঁজিবাদী সমাজের নিয়মগুলি জার্মানির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য এবং ইংলণ্ডের দিকে অঙ্গুলীনির্দেশ ক'রে যখন জার্মানিকে বললেন, 'এ কাহিনী তোমারই বর্ণনা' তখন তিনি যে যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন তা হল: "পুঁজিবাদী উৎপাদনের স্বাভাবিক নিয়মাবলী থেকে উদ্ভূত সামাজিক বিরোধসমূহের বিকাশের উচ্চতর বা নিম্নতর মাত্রার প্রশ্ন মূলত এটা নয়। প্রশ্নটা হল স্বয়ং এই নিয়মাবলীরই, লৌহদৃঢ় আবশ্যিকতার সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী ফলাফলসমূহের দিকে ক্রিয়মান এই প্রবণতাগুলির। যে দেশ শিল্পগতভাবে অধিকতর বিকশিত তা কম বিকশিত দেশটিকে কেবল তার নিজ ভবিষ্যতের প্রতিরূপটাকেই দেখিয়ে দেয়" ('পুঁজি' গ্রন্থের প্রথম জার্মান সংস্করণের মুখবন্ধ)। অর্থাৎ ইংলণ্ডের মতো পূর্ণ পুঁজিবাদী রূপান্তরের অনিবার্যতাই ছিল অনুন্নত জার্মানিকেও পুঁজিবাদী ব'লে চরিত্রায়িত করার প্রচ্ছন্ন ভিত্তি। তাছাড়া লেনিন যখন 'দি ডেভেলপমেণ্ট অব ক্যাপিটালিজম ইন রাশিয়া'তে তাঁর দেশকে পুঁজিবাদী ব'লে চরিত্রায়িত করেছেন তখন তিনিও কোথাও তার সমর্থনে এমন পরিসংখ্যান হাজির করেননি যা পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদের পরিমাণগত তুলনার প্রশ্নকে ফয়সালা করতে পারে, তাঁর ব্যবহৃত পরিসংখ্যানগুলি কেবল অব্যাহত পুঁজিবাদী রূপান্তরের প্রবণতাটিকেই প্রমাণ করেছিল। পরে আরো বিশদভাবে দেখানো যাবে যে "সমাজ-

১৮ এবং তা-ই যুক্তিসঙ্গত ও অনিবার্য। নইলে দুটোকে আমরা পৃথক করব কেমন ক'রে? আর এ দুটোকে পৃথক করাটাই তো একটা মূল সমস্যা।

তান্ত্রিক" বিপ্লবের প্রবক্তাদের সঙ্গে আমাদের প্রায় সম্পূর্ণ বিতর্কটাই এতদিন অর্থহীন হয়ে থেকেছে কারণ দুপক্ষের কেউই আমরা আমাদের ব্যবহৃত উপাত্ত ও উদ্দিষ্ট চরিত্রায়ণগুলির উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য মনে রাখিনি।

যাহোক, আমাদের পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে যে ফলাফলগুলিতে আমরা এ পর্যন্ত উপনীত হয়েছি সেগুলি পূর্বোল্লেখিত মাপকাঠিসমূহের বিচারে কতদূর সন্তোষজনক? বিশেষত এ দাবী আমরা কতটা মেটাতে পেরেছি যে প্রথম ও দ্বিতীয় **উভয়** সম্ভাবনার ক্ষেত্রেই আধা-সামন্তবাদকে চরিত্রায়িত হতে হবে **একই** নিরিখ দ্বারা (আধা-উপনিবেশকেও তা-ই)? লক্ষ্য করা দরকার যে এ দাবী মেটাতে না পারলে আধা-সামন্তবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় না সামন্তবাদী ও পুঁজিবাদী সমাজ থেকে স্বতন্ত্র, বাস্তবে-বিরাজমান একটি **অনন্য** গুণ হিসাবে এবং আধা-উপনিবেশও প্রতিষ্ঠিত হয় না উপনিবেশ ও স্বাধীন দেশ থেকে স্বতন্ত্র, বাস্তবে-বিরাজমান একটি **অনন্য** গুণ হিসাবে। ব্যাপারটা এমন হয়ে দাঁড়ায় যেন প্রথম ও দ্বিতীয় সম্ভাবনার দুই ভিন্ন পরিস্থিতিতে দুই ভিন্ন নিরিখে নির্ধারিত দুই ভিন্ন ধরনের সমাজকে আমরা অনন্যোপায় হয়ে একই বর্গের আওতায় ফেলতে বাধ্য হচ্ছি নেহাত শ্রেণীবিন্যাস (classification) ও নামকরণের (nomenclatureএর) ফ্যাসাদের একটা আনুষ্ঠানিক সমাধান হিসাবে। বলা বাহুল্য, এ জাতীয় কসরতের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক মূল্য একেবারেই শূন্য। উপরন্তু এর ফলে আমাদের চরিত্রায়ণের নিরিখ দ্বন্দ্বরত দিক-গুলির নিখুঁত পরিমাণীকরণের উপর নির্ভরশীলতা থেকে প্রকৃতপক্ষে মুক্ত হতে পারে না। কেননা প্রথম ও দ্বিতীয় সম্ভাবনার ক্ষেত্রে যদি দুই ভিন্ন নিরিখ প্রযোজ্য হয় তবে কখন কোন নিরিখ প্রয়োগ করতে হবে সেটা জানতে গেলেই আগে জানতে হবে দুই সম্ভাবনার মধ্যে কোনটা বাস্তবায়িত হয়েছে—দ্বন্দ্বরত দিকগুলির নিখুঁত পরিমাণীকরণ ছাড়া যা অসম্ভব।

এখন, এটা মানতেই হবে যে পূর্বোক্ত মাপকাঠিগুলির বিচারে আমাদের বিশ্লেষণের সাফল্য এখন পর্যন্ত পুরোপুরি সন্তোষজনক হয়নি। কিন্তু কেন? ঘাটতিগুলো কতদূর পূরণ করা যায়? আলোচ্য বর্গদুটিকে এক এক ক'রে ধরা যাক।

আধা-সামন্তবাদ : পুঁজিবাদের ক্রমহ্রাসমান হারে বিকাশ (যার ফলে সামন্ত অবশেষ কিছুতেই পুঁজিবাদের দ্বারা সম্পূর্ণ অপসারিত হতে পারে না) নিশ্চয়ই আধা-সামন্তবাদকে চরিত্রায়িত করার জন্য প্রয়োজনীয় নিরিখটির একটি দিক হবে, কারণ তা দ্বিতীয় সম্ভাবনার জন্য—অর্থাৎ পুঁজিবাদী সমাজ থেকে আধা-সামন্তবাদী সমাজকে আলাদা করার জন্য—এমন একটি তীক্ষ্ণ পার্থক্য-নির্দেশক যা সঠিক নিরিখের পূর্বকথিত প্রয়োজনীয় শর্তগুলির অধিকাংশকেই পূরণ করে। কিন্তু : (১) প্রথম সম্ভাবনার জন্য—অর্থাৎ সামন্তবাদী সমাজ থেকে

আধা-সামন্তবাদী সমাজকে আলাদা করার জন্য—তেমন কোনো পার্থক্য-নির্দেশক আমরা এখনও বের করতে পারিনি, (২) প্রথম ও দ্বিতীয় সম্ভাবনার পার্থক্যনির্দেশক-দুটিকে **একই** নিরিখের (অর্থাৎ পুঁজিবাদের বিকাশের কোনো নির্দিষ্ট ধরনের) দুটি বৈশিষ্ট্য বা দিক হিসাবে আমরা লাভ করতে পারিনি। এই ত্রুটিগুলি সংশোধন করতে গেলে পুঁজিবাদের বিকাশের এমন একটি ধরন আমাদের খুঁজে বের করতে হবে যার দুটি দিক প্রথম ও দ্বিতীয় সম্ভাবনার দুটি প্রয়োজনীয় শর্তকে **উভয়** সম্ভাবনা **নির্বিশেষে** পূরণ করবে। দ্বিতীয় সম্ভাবনার প্রয়োজনীয় শর্তটি আমরা ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছি। প্রথম সম্ভাবনার প্রয়োজনীয় শর্তটি কি হতে পারে? আমরা আগেই দেখিয়েছি যে সামন্তবাদ ঠিক কতক্ষণ পর্যন্ত বিকাশমান পুঁজিবাদের তুলনায় পরিমাণগতভাবে প্রধান হয়ে আছে এবং ঠিক কখন পুঁজিবাদ সামন্তবাদের উপর পরিমাণগত প্রাধান্য অর্জন করছে তা সরাসরি পরিমাপ করার আশা আমরা করতে পারি না। সুতরাং আমরা বড়জোর পুঁজিবাদের বিকাশের এমন একটি বৈশিষ্ট্য সূত্রায়িত করার আশা করতে পারি যার অস্তিত্বের অর্থই হবে এই যে সামন্ত-বাদের উপর পুঁজিবাদের পরিমাণগত প্রাধান্য অর্জন ইতিমধ্যেই যুক্তিগতভাবে সুনিশ্চিত হয়ে গেছে—সে প্রাধান্য ইতিমধ্যে বাস্তবায়িত হয়ে থাকুক বা না থাকুক। এটাই হবে সামন্তবাদী সমাজ ও আধা-সামন্তবাদী সমাজের পার্থক্য-নির্দেশক বৈশিষ্ট্য। সুতরাং সব মিলিয়ে এবার আধা-সামন্তবাদী চরিত্রায়ণের নিরিখটি আমরা এইভাবে সূত্রায়িত করতে পারি :

> আধা-সামন্তবাদী সমাজ হল এমন একটি সমাজ যেখানে এখনও সামন্তবাদ বিদ্যমান কিন্তু উৎপাদনসম্পর্কের পুঁজিবাদী রূপান্তর (ও সেই অনুপাতে সামন্তবাদের বিলোপ) শুরু হয়েছে এবং এই পুঁজিবাদী রূপান্তরের প্রক্রিয়াটি ইতিমধ্যেই এমন একটি সুনির্দিষ্ট চরিত্র পরিগ্রহ করেছে যা একই সঙ্গে নিম্নলিখিত শর্তদ্বয় পূরণ করে—
>
> (১) সামন্তবাদের অর্ধেক বিলোপের পর্যায় (যে পর্যায়ে সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদ "পরিমাণগতভাবে সমান" হওয়ার কথা) পেরিয়ে যাওয়াটা যুক্তিগতভাবে সুনিশ্চিত এবং
>
> (২) পুঁজিবাদী রূপান্তর ক্রমহ্রাসমান গতিবেগে অগ্রসর হওয়ার ফলে তার দ্বারা সামন্তবাদের পূর্ণ অপসারণ অসম্ভব।

এই ধরনের দ্বৈতশর্তপূরণকারী রূপান্তরপ্রক্রিয়ার হদিশ পাওয়া যে সম্ভব তার প্রমাণ ইউরেনিয়ামের পূর্বোল্লেখিত তেজস্ক্রিয় রূপান্তরের দৃষ্টান্ত। আধা-সামন্তবাদী সমাজে সামন্তবাদের মতোই অর্ধেক বিলোপের পর্যায় পেরিয়ে-যাওয়াটা ইউরেনিয়ামের জন্যও সুনিশ্চিত ব'লেই তার 'আধা-জীবনকাল' (half-life) পরিমাপ করা সম্ভব হয়; অন্যদিকে একই সঙ্গে এটাও সুনিশ্চিত যে এই

প্রক্রিয়া কখনও ইউরেনিয়ামের পূর্ণ বিলোপসীমায় উপনীত হতে পারবে না। কিন্তু সে যা-ই হোক, আধা-সামন্তবাদী সমাজের এই নিরিখের বিপরীতে সামন্ত-বাদী সমাজ ও পুঁজিবাদী সমাজের নিরিখগুলি কি দাঁড়ায়?

সামন্তবাদী সমাজ হল এমন একটি সমাজ যেখানে সামন্তবাদ বিদ্যমান এবং উৎপাদনসম্পর্কের পুঁজিবাদী রূপান্তর শুরু হয়ে থাকলেও তা এখনও ১নং শর্তটি পূরণ করার মতো কোনো নির্দিষ্ট চরিত্র পরিগ্রহ করেনি।

পুঁজিবাদী সমাজ হল এমন একটি সমাজ যেখানে সামন্তবাদ এখনও বিদ্য-মান থাকলেও পুঁজিবাদী রূপান্তরের প্রক্রিয়াটি ইতিমধ্যেই এমন একটি নির্দিষ্ট চরিত্র পরিগ্রহ করেছে যা ১নং শর্ত পূরণ করে কিন্তু ২নং শর্তের পরিবর্তে বরং পুঁজিবাদের দ্বারা সামন্তবাদের পুর্ণ অপসারণকেই সুনিশ্চিত ক'রে তোলে।

'পুঁজিবাদী রূপান্তর'এর উপযুক্ত পরিমাপক বা parameter নির্ধারণ করতে হলে এবং উপরোক্ত নিরিখগুলিকে আরো তীক্ষ্ণ, যথাযথ ও প্রয়োগযোগ্য রূপ দিতে গেলে গণিত, অর্থনীতি, অর্থমিতি (econometrics) ইত্যাদিতে যে টেকনিক্যাল জ্ঞান থাকা দরকার তা আমার নেই। তবে এ সম্বন্ধেও কোনো সন্দেহ নেই যে এ বিষয়ে অধিকতর গবেষণাকে বর্তমান অধ্যায়ের সাধারণ গতিধারা অবলম্বন ক'রেই এগোতে হবে।

আধা-উপনিবেশ: আধা-উপনিবেশকে চরিত্রায়িত করার যে নিরিখটি আমরা পেয়েছি তা পূর্বোল্লেখিত চারটি বাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দুটির অধিকারী। প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় সম্ভাবনার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হওয়ার ফলে একদিকে যেমন তা দ্বন্দ্বরত দিকদ্বয়ের পরিমাণগত তুলনাকে অপ্রয়োজনীয় ক'রে তুলেছে, অন্য-দিকে তেমনি তা আধা-উপনিবেশকে চিহ্নিত করেছে একটি **অনন্য** গুণ হিসাবে। এই নিরিখটিকে আমরা এভাবে সূত্রায়িত করতে পারি:

আধা-উপনিবেশ হল এমন একটি দেশ যার রাষ্ট্রীয় উপরিকাঠামো একই সঙ্গে নিম্নলিখিত শর্তদ্বয় পূরণ করে—

(১) রাষ্ট্রক্ষমতা রয়েছে দেশীয় শ্রেণীসমূহের হাতে (যা প্রথম সম্ভাবনার জন্য অর্থাৎ উপনিবেশ বা নয়া-উপনিবেশ থেকে আধা-উপনিবেশকে পৃথক করার জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত), এবং

(২) রাষ্ট্রক্ষমতাসীন দেশীয় শ্রেণীগুলি এমন আত্মসমর্পণকারী চরিত্রের যে বুর্জোয়া-স্বাধীন সমাজের উদ্ভব সে দেশে অসম্ভব (যা দ্বিতীয় সম্ভাবনার জন্য অর্থাৎ বুর্জোয়া-স্বাধীন দেশ থেকে আধা-উপনিবেশকে পৃথক করার জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত)।

অবশ্য কোনো সমাজ এই নিরিখটি পূরণ করছে কিনা তা নিরূপণ করার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে আবার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের নিরিখ ও বিবেচনা আলাদাভাবে বা একসঙ্গে প্রয়োগ করার দরকার

হতে পারে, এমন কি সেগুলো নিয়ে প্রচুর মতান্তর ও বিতর্কও থাকতে পারে, কিন্তু তাতে সাধারণভাবে নিরিখটির যুক্তিযুক্ততা বা তার উল্লেখিত দুটি বাঞ্ছনীয় বৈশিষ্ট্য আদৌ ক্ষুণ্ণ হয় না। নিরিখটিকে প্রয়োগ করার মূল পদ্ধতি হল: নিরিখটা পূর্ণ হয়েছে এটা ধ'রে নিলে আলোচ্য দেশটির বিভিন্ন প্রকার ঘটনার সঠিক ও যথাযথ ব্যাখ্যা মেলে কিনা তা-ই (তৃতীয় অধ্যায়ের ৭নং অংশ ও দ্বিতীয় খণ্ডের 'বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ও কমিউনিস্ট রণকৌশলের সমস্যা' দ্রষ্টব্য)।

এটা অবশ্য ঠিক যে এই নিরিখটি অন্য বাঞ্ছনীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নয়— তার সরাসরি কোনো অর্থনৈতিক চরিত্র ও পরিমাপযোগ্যতা নেই। কিন্তু তার সঙ্গত কারণও রয়েছে। একটা সমাজ সামন্তবাদী না পুঁজিবাদী না আধা-সামন্তবাদী এটা হল সেই সমাজের উৎপাদনসম্পর্ক-বিষয়ক প্রশ্ন, তাই তা ফয়সালা করার একটা সরাসরি অর্থনৈতিক ও পরিমাপযোগ্য নিরিখ পাওয়া অপেক্ষাকৃত সহজে সম্ভব হতে পারে। পক্ষান্তরে একটা দেশ স্বাধীন না (নয়া-) উপনিবেশ না আধা-উপনিবেশ এটা হল উপরিকাঠামো-বিষয়ক প্রশ্ন, যার ফলে: (১) এ জবাব দেওয়ার মতো কোনো বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক নিরিখ পাওয়া আদৌ সম্ভব কিনা সেটা নিয়েই সন্দেহ থাকতে পারে, এবং (২) অর্থনৈতিক কোনো নিরিখ পাওয়া গেলেও এমন হতে পারে যে তা সমাজটির অর্থনৈতিক ভিত্তির চরিত্র এবং তা কোন ধরনের উপরিকাঠামো দাবী করছে কেবল সেটুকুই নির্দেশ করতে পারবে, কিন্তু সেই উপরিকাঠামো ইতিমধ্যেই বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা তা স্থির করার জন্য নির্ভর করতেই হবে অর্থনীতি-বহির্ভূত অন্য ধরনের নিরিখ-সমূহের উপর। তবে এরই ফলে এটাও ঠিক যে উপরিকাঠামোর চরিত্র নির্ধারণ করার জন্য যেহেতু শেষ পর্যন্ত অর্থনীতি-বহির্ভূত নিরিখ স্বীকার করতেই হচ্ছে এবং যেহেতু এই ধরনের নিরিখ দ্বারা রাজনৈতিক উপরিকাঠামোর শ্রেণীচরিত্র নির্ধারণের সফল নজীর ইতিমধ্যেই মার্কসীয় তত্ত্বে রয়েছে,[১৯] সুতরাং বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক নিরিখ নির্ধারণ করা না গেলেও যদি অন্য কোনো ধরনের নিরিখ দ্বারা আমরা আলোচ্য প্রশ্নটি ফয়সালা করার চেষ্টা করি তাহলে সেটা মোটেও দোষাবহ কিছু হবে না।

তবু যেহেতু উপরোক্ত নিরিখ প্রয়োগের ব্যাপারে অর্থনৈতিক বিবেচনাও একেবারে অপ্রাসঙ্গিক নয় তাই প্রশ্ন থেকেই যায়: অর্থনৈতিক নিরিখ নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্য কতখানি? এর উপযোগিতাও অনস্বীকার্য। কেননা

১৯ [যেমন ধরুন, ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পরে লেনিন তা না হলে কেমন ক'রে বললেন যে রাষ্ট্র-ক্ষমতা এবার হস্তান্তরিত হয়েছে বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে—যে বুর্জোয়াশ্রেণী তার আগেই অর্থনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ত ক'রে নিয়েছিল?]

যে কোনো উপরিকাঠামো প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে তার উপযুক্ত অর্থনৈতিক ভিত্তির উদ্ভব ঘটতেই হবে (অর্থাৎ যে কোনো উপরিকাঠামোর জন্ম তার উপযুক্ত অর্থনৈতিক ভিত্তিটি একটি আবশ্যিক শর্ত)। সুতরাং তা না ঘ'টে থাকলে সঙ্গে সঙ্গেই চোখ বুঁজে ব'লে দেওয়া যাবে যে উক্ত উপরিকাঠামো আলোচ্য সমাজটিতে প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং হতেও পারে না (যদিও অবশ্য একটি বিশেষ ধরনের অর্থনৈতিক ভিত্তির উদ্ভব ঘটার সঙ্গে সঙ্গে এ কথা বলা যায় না যে তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ উপরিকাঠামোটিও ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, কারণ যে কোনো উপরিকাঠামোর জন্য তার উপযুক্ত অর্থনৈতিক ভিত্তিটি যথেষ্ট শর্ত নয়)।

প্রথম সম্ভাবনার জন্য অর্থাৎ উপনিবেশ বা নয়া-উপনিবেশ থেকে আধা-উপনিবেশকে পৃথক করার জন্য যে অর্থনৈতিক নিরিখটি হেলিও জাগুয়ারিবে প্রস্তাব করেছেন তা আমরা তৃতীয় অধ্যায়ের ২নং অংশে উদ্ধৃত করেছি, কিন্তু সেইসঙ্গে এ-ও বলেছি যে তার গুণাগুণবিচারে আমি এখনও সক্ষম হইনি। এছাড়া তৃতীয় অধ্যায়ের ৮নং অংশে (দ্বিতীয় আপত্তির জবাবে) ঔপনিবেশিক ভারত ও আধা-ঔপনিবেশিক ভারতের মধ্যে দুটি অর্থনৈতিক পার্থক্য আমি নির্দেশ করেছি। ঐ পার্থক্যদুটি তাৎপর্যপূর্ণ কারণ একদিকে এটা আশা করা নিশ্চয় সঙ্গত যে উপনিবেশ থেকে আধা-উপনিবেশে উত্তরণের মধ্যেএমন কোনো আবিষ্কারযোগ্য অর্থনৈতিক পরিবর্তনও নিহিত থাকবে যাকে ব্যাখ্যা করা যাবে কেবল উপনিবেশ থেকে আধা-উপনিবেশে উত্তরণটির দ্বারাই, অন্যদিকে ভারতের অর্থনীতির ঐ দুটো পরিবর্তনকে আর কোনোভাবে ব্যাখ্যা করা যায় ব'লেও আমাদের মনে হয় না। তবে এটাও ঠিক যে উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি পৃথক করার সার্বজনীন নিরিখ হিসাবে ঐ দুটো পরিবর্তনকে কেবলমাত্র ভারতের দৃষ্টান্তের ভিত্তিতে সাধারণীকরণ করা যায় না—অর্থাৎ এ কথা বলা যায় না যে: (১) যেখানেই একটি উপনিবেশ আধা-উপনিবেশে রূপান্তরিত হবে সেখানেই উক্ত দুটি অর্থনৈতিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হবে, এবং (২) যে আধা-উপনিবেশ আগে উপনিবেশ ছিল না (যেমন চীন) তা-ও উপনিবেশের তুলনায় উক্ত দুটি অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবে।

দ্বিতীয় সম্ভাবনার জন্য অর্থাৎ স্বাধীন দেশ থেকে আধা-উপনিবেশকে পৃথক করার জন্য অর্থনৈতিক মালমশলার কিছুটা বিশ্লেষণ তৃতীয় অধ্যায়ের ৮নং অংশে দ্বিতীয় আপত্তির জবাবে করা হয়েছে, কিন্তু সেখানেও কোনো অর্থনৈতিক নিরিখ তীক্ষ্ণভাবে বেরিয়ে আসেনি। অবশেষে বর্তমান অধ্যায়ে এসে আমরা প্রতিষ্ঠিত করলাম যে অর্থনৈতিক ভিত্তির পূর্ণ-পুঁজিবাদী রূপান্তরের যে অসম্ভবতা আধা-সামন্তবাদী সমাজকে অগ্রসর পুঁজিবাদী সমাজ থেকে পৃথক ক'রে রাখে সেটাই আধা-ঔপনিবেশিক (ও ঔপনিবেশিক) দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে

বুর্জোয়া-স্বাধীন দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি থেকে পৃথক করারও নিরিখ হিসাবে স্বচ্ছন্দে ব্যবহৃত হতে পারে।

অবশ্য দেশী ও বিদেশী পুঁজির তুলনামূলক হ্রাসবৃদ্ধির ভিত্তিতে আধা-সামন্তবাদের নিরিখটির হুবহু সমান্তরাল একটি নিরিখ যদি আমরা আধা-উপনিবেশের ক্ষেত্রেও বের করতে পারতাম তাহলে আমাদের সমগ্র তাত্ত্বিক কাঠামোটা সমমিতির (symmetryর) সৌষ্ঠবে অনেক বেশী মণ্ডিত হত। কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে কাজটা যত সহজ মনে হয় আসলে ততটা নয়। কেননা স্বাধীন দেশেও বিদেশী পুঁজি বিনিয়োজিত হয়। সুতরাং এ কথা বলা যায় না যে আধা-উপনিবেশের বিপরীতে স্বাধীন দেশের বৈশিষ্ট্য বিদেশী পুজির **পূর্ণ** বিলোপের নিশ্চয়তা; কিন্তু দেশী পুঁজির বিকাশের ফলে বিদেশী পুঁজি অপসারিত হতে হতে ঠিক **কি পরিমাণ** ও চরিত্র অর্জন করলে তাতে 'অধীনতার দিক'এর পূর্ণ বিলুপ্তি বোঝাবে তা-ও নির্ধারণ করতে পারার সম্ভাব্যতা যথেষ্ট সংশয়াচ্ছন্ন।

আরো দুটো কথা ব'লে এ অংশটা শেষ করতে চাই।

আধা-উপনিবেশ ও আধা-সামন্তবাদী চরিত্রায়ণের যথাযথ নিরিখ নির্ধারণে আমি কতটুকু অগ্রসর হতে পেরেছি এবং কতটা বাকী থেকে গেল তা যথাসাধ্য স্পষ্টভাবে বিবৃত করলাম। এর পেছনে এই আশাটা কাজ করেছে যে পাঠকদের মধ্যে গণিত, পরিসংখ্যান, অর্থনীতি, অর্থমিতি ইত্যাদিতে যথেষ্ট টেকনিক্যাল জ্ঞানসম্পন্ন এমন কেউ হয়তো থাকবেন যিনি এ অধ্যায়ে অবলম্বিত অনুসন্ধানের সাধারণ ধারাটিকে সঠিক মনে করবেন এবং এদিকে এগিয়ে বাকী কাজটুকু সম্পন্ন করতে উৎসাহী হবেন

দ্বিতীয়ত যে ধরনের নিরিখসমূহের দিকে আমি এগোতে চেয়েছি সেগুলো যে এখনও চূড়ান্ত প্রয়োগযোগ্য রূপ পায়নি শুধু তা-ই নয়, সেগুলোর ভিত্তিতে আমাদের উপমহাদেশের দেশগুলির চরিত্রায়ণও—বিশেষত আধা-সামন্তবাদী চরিত্রায়ণ—চূড়ান্তভাবে যাচাই হয়নি। এদিক থেকে পুঁজিবাদী রূপান্তরের ধরনটি যাচাই করাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এই একটিমাত্র নিরিখেই নির্ধারিত হয়ে যাবে এই সমাজগুলির চরিত্র স্বাধীন, পুঁজিবাদী চরিত্রের থেকে পৃথক কিনা। তবে এ কাজ বাকী থাকলেও তা এই বইয়ের আশু উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে না। কারণ বইটির আশু উদ্দেশ্য ছিল এই উপমহাদেশের দেশগুলির সমাজচরিত্র বিচার ও প্রধান দ্বন্দ্ব নিরূপণের ক্ষেত্রে জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকদের ও "সমাজতান্ত্রিক" বিপ্লবের প্রবক্তাদের পদ্ধতি ও সিদ্ধান্তের স্ববিরোধগুলিকে এবং সেগুলোর সঙ্গে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌলিক বিরোধকে উদ্ঘাটিত ক'রে দেওয়া। এটা ঠিক যে পুঁজিবাদী সমাজ থেকে আধা-সামন্তবাদী সমাজকে এবং

স্বাধীন দেশ ও উপনিবেশ থেকে আধা-উপনিবেশকে পৃথক করার জন্য যেসব লক্ষণের উপর আমরা সবাই এতদিন নির্ভর ক'রে এসেছি সেগুলোর তীক্ষ্ণতা ও যথাযথতা সন্তোষজনক ছিল না ; বর্তমান অধ্যায়ের উদ্দেশ্য এই ত্রুটি দূর ক'রে পুরো বিতর্কটাকে একটা **চূড়ান্ত** নিষ্পত্তিযোগ্য স্তরে উন্নীত করা। কিন্তু আমাদের এতদিনকার ব্যবহৃত এই পার্থক্যসূচক লক্ষণগুলি যত অসন্তোষজনকই হয়ে থাক, জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য ঘোষকরা ও "সমাজতান্ত্রিক" বিপ্লবের প্রবক্তারা এমন কি সেগুলোর প্রয়োগেও সঙ্গতিনিষ্ঠ থাকতে পারেননি। যদি পারতেন তবে তাঁরা একেবারে নিখুঁতভাবে না হলেও অন্তত মোটামুটিভাবে বুঝতে পারতেন যে আলোচ্য সমাজগুলি 'পুঁজিবাদী' বা 'সামন্তবাদী' কোনো ধারণার সঙ্গেই ঠিক খাপ খায় না (অতএব সেগুলো 'আধা-সামন্তবাদী' ছাড়া আর কি হতে পারে ?), ঠিক খাপ খায় না 'স্বাধীন' বা 'উপনিবেশ' ধারণার সঙ্গেও (আর তাই সেগুলো 'আধা-উপনিবেশ' ছাড়া আর কি ?)। কেবলমাত্র বর্তমান অধ্যায়টি ছাড়া এই বইয়ের অন্য সর্বত্র আমি বর্তমান অধ্যায়ের বক্তব্যের থেকে যথাসম্ভব স্বাধীনভাবে এ বিষয়টাই প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছি। অবশ্য তার চেয়েও বড় কথা, আলোচ্য সমাজগুলি যে আধা-সামন্তবাদী এটা নিয়ে আমাদের সঙ্গে অন্তত জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকদের মতানৈক্য নেই ; উপরন্তু এই দেশগুলি যে স্বাধীন নয় এবং সেগুলির রাষ্ট্রক্ষমতা যে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও সামন্তশ্রেণীর হাতে তা-ও তাঁরা স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁদের এই স্বীকৃতিগুলির সঙ্গে এই দেশগুলির উপনিবেশ বা নয়া-উপনিবেশ চরিত্রায়ণ, এগুলির জন্য তাঁদের প্রধান দ্বন্দ্ব নিরূপণের পদ্ধতি ও এগুলিতে বর্তমানে জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য ঘোষণা যে অসঙ্গতিপূর্ণ এবং তা কেন — এটুকু দেখানোই আমাদের আশু উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যথেষ্ট এবং তা আমরা বর্তমান অধ্যায়ের বিশ্লেষণ বাদ দিয়েই দেখাতে পেরেছি ব'লে আশা করি। অধিকন্তু এই দেশগুলিকে অধোনত ব'লে মেনে নেওয়ার সঙ্গে "সমাজ-তান্ত্রিক" বিপ্লবওয়ালাদের "স্বাধীন পুঁজিবাদী" চরিত্রায়ণও কেন খাপ খায় না সেটারও কিছুটা ইঙ্গিত আমরা এই অধ্যায়েই একটু পরে দেওয়ার চেষ্টা করব। সর্বোপরি এটা আশা করার নানা দিক থেকেই খুব জোরালো কারণ রয়েছে যে পুঁজিবাদী রূপান্তরের ক্রমহ্রাসমান গতিবেগের নিরিখ এ সমাজগুলির প্রত্যেকটাই পূরণ করবে[20] — আমার যেসব বন্ধু এ বিষয়ে বিশেষভাবে পড়াশোনা

২০ স্মরণীয় : "যে অর্থে আমরা জানি যে ২×২=৪, কিংবা দূরত্বের বর্গফল অনুসারে বস্তুর আকর্ষণ বাড়ে বা কমে, সেই অর্থে আমরা অবশ্যই এটা জানি না। কিন্তু তত্ত্বগত প্রকৃতিবিজ্ঞানে — যা প্রকৃতি সম্বন্ধে নিজের দৃষ্টিভঙ্গীকে যথাসম্ভব একটা সুসমঞ্জস সমগ্রতারূপে গ'ড়ে তোলে এবং যাকে ছাড়া আজকাল এমনকি সবচেয়ে চিন্তাবিমুখ অভিজ্ঞতাবাদীটিও কোনো কুল পান না — তাতে অসম্পূর্ণ-ভাবে জ্ঞাত রাশিসমূহ নিয়ে অতি-প্রায়শই আমাদের হিসাব করতে হয় এবং ত্রুটিপূর্ণজ্ঞানকে অতিক্রম করার জন্য নিতে হয় চিন্তার সুসঙ্গতির সহায়তা" ('ডায়ালেকটিকস অব নেচার' : এঙ্গেলস)।

করেছেন তাঁরা তো আশ্বাস দিচ্ছেন যে এটা এসব সমাজের জন্য ইতিমধ্যেই প্রায়-স্বীকৃত একটি সত্য।

৭. পুঁজিবাদী রূপান্তরের ধরনটির অর্থনৈতিক ভিত্তি

প্রথমেই বলা দরকার, কোনো পূর্ণাঙ্গ অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ আমরা এখানে হাজির করার চেষ্টা করব না। আমাদের লক্ষ্যের পরিধি খুবই সংকীর্ণ। পুঁজিবাদী রূপান্তরের যে ধরনটিকে আমরা আধা-ঔপনিবেশিক (বা ঔপনিবেশিক বা নয়া ঔপনিবেশিক) ও আধা-সামন্তবাদী সমাজের আবশ্যিক বৈশিষ্ট্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি তা আমাদের উপমহাদেশের দেশগুলিতেও খুঁজে পাওয়া যাবে এমন আশা করা অর্থনৈতিক দিক থেকে কতদূর যুক্তিসঙ্গত তার একটা আভাসমাত্র দেওয়াই এই আলোচনার উদ্দেশ্য।

পুঁজিবাদী রূপান্তরের উক্ত ধরনটির তুলনা দিতে গিয়ে আমরা গতিবেগবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পদার্থের ভরবৃদ্ধির দৃষ্টান্ত ব্যবহার করেছি। পদার্থের গতিবেগ যত বাড়ানোর চেষ্টা করা হয় ততই সেই গতিশক্তির এক ক্রমবর্ধমান অংশ পদার্থের অধিকতর গতিবেগবৃদ্ধির প্রতিকূলতায় এমনভাবে রূপান্তরিত হতে থাকে যে তা কোনোমতেই আলোর গতিবেগে উপনীত হতে পারে না। অনুরূপভাবে আমাদের উপমহাদেশের দেশগুলিতে পুঁজিবাদী রূপান্তরের আলোচ্য ধরনটিকে যদি বাস্তবায়িত হতে হয় তাহলে পুঁজিবাদ যতই বাড়ছে ততই তা নিজেই নিশ্চয় অধিকতর পুঁজিবাদী বিকাশের প্রতিকূলতায় রূপান্তরিত হচ্ছে। আমরা এখানে সংক্ষেপে দেখতে চাই যে নিছক অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তা খুবই প্রত্যাশিত।

যে কোনো সমাজের পুঁজিবাদী রূপান্তরের প্রারম্ভবিন্দু হল কৃষির তথা জমিদার ও কৃষকের ক্রমাগত বাণিজ্যীকরণ। কিন্তু এই পুঁজিবাদী বিকাশ দুটো পথে এগোয়ঃ

(১) সামন্তশ্রেণী ক্রমে ক্রমে তার প্রাক-পুঁজিবাদী শোষণের বদলে পুঁজিবাদী শোষণকে আশ্রয় করতে থাকে, স্বভাবতই এই পথে বিকাশটা হয় অত্যন্ত মন্থর ও যন্ত্রণাদায়ক, কেননা সামন্তশ্রেণী নিজ স্বার্থেই দীর্ঘকাল ধ'রে সামন্ত অবশেষ টিঁকিয়ে রাখে।

(২) সামন্ত শোষণের কবলিত ক্ষুদ্র উৎপাদকেরা ক্ষুদ্র পণ্য-উৎপাদকে রূপান্তরিত হতে থাকে এবং তার ফলে অনিবার্যভাবে তারা ভাগ হয়ে যেতে থাকে বুর্জোয়া ও সর্বহারায়; সামন্ত অবশেষ ধ্বংস ক'রে পুঁজিবাদী বিকাশ ও পুঁজিবাদী রূপান্তর ঘটানোর এটাই অধিকতর বিপ্লবী ও বেগবান পদ্ধতি।

সব সমাজেই এই উভয় প্রক্রিয়া চলতে থাকে, তবে ক্ষেত্রভেদে ও সময়-

ভেদে একটা বা অন্যটা প্রাধান্যলাভ করে এবং তদনুযায়ী কমবেশী হয় পুঁজিবাদী বিকাশ ও সমাজের পুঁজিবাদী রূপান্তরের গতিবেগ। সামন্তশ্রেণী যখন পুঁজিবাদী যুগের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে বাধ্য হয় তখন তারা পুঁজিবাদী বিকাশের গতিমুখকে প্রথম পথে পরিচালিত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালায়, নিয়োগ করে তার যাবতীয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি। এর সঙ্গে যদি একটা উন্নততর পুঁজিবাদী দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য যুক্ত হয় তাহলে তা যে দ্বিতীয় পথের বিকাশকে আরো বেশী দুর্বল ক'রে দেবে এ কথা সহজেই বোঝা যায়। দেশের সামন্তবাদী অর্থনীতির ক্ষয়ের সুযোগ নেবে প্রধানত বিদেশী বুর্জোয়ারা আর ছিঁটেফোঁটা কিছু সুযোগ তারা কনসেশন হিসাবে দেবে (বা দিতে বাধ্য হবে) প্রধানত দেশের সামন্তশ্রেণীকে এবং এর ফলে শেষোক্তটির একটি অংশের ধীরে ধীরে বাণিজ্যীকরণ ঘটতে থাকবে ও তারা বুর্জোয়ায় রূপান্তরিত হবে।

কিন্তু কোনো দেশে পুঁজিবাদের বিকাশ যদি প্রধানত প্রথম পথেও হয় তবু শেষ পর্যন্ত মন্থরগতিতে হলেও একটা পূর্ণ-পুঁজিবাদী সমাজ উদ্ভূত হতে বাধ্য—যেমন হয়েছিল জার্মানিতে। সাম্রাজ্যবাদ-কবলিত কোনো পশ্চাৎপদ দেশে অবশ্য পুঁজিবাদী রূপান্তর ও বিকাশের প্রথম পথটি দ্বিতীয় পথের চেয়ে আরো বেশী শক্তিশালী হবে, ফলে আরো অনেক ক'মে আসবে পুঁজিবাদী রূপান্তরের গতিবেগ, কিন্তু তা-ও পূর্ণ-পুঁজিবাদী রূপান্তরের অসম্ভবতার আবশ্যিক কারণ হতে পারে না। অতএব, আমাদের আলোচ্য সমাজগুলির পূর্ণ পুঁজিবাদী রূপান্তর অসম্ভব হতে গেলে, জার্মানির মতো দেশে পুঁজিবাদী রূপান্তর ও বিকাশের প্রথম পথটি যেভাবে কার্যকর হয়েছিল আর এ সমাজগুলিতে তা যেভাবে কার্যকর হচ্ছে এদুটোর মধ্যে, কেবল প্রাধান্যের মাত্রার তফাৎ নয়, চরিত্রগত পার্থক্যও অবশ্যই থাকতে হবে। কিন্তু তেমন পার্থক্য খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা কতখানি? আমাদের মতে, প্রচুর।

পাশ্চাত্যের যেসব দেশে প্রধানত প্রথম পথেই পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটেছে সেখানেও বৃহৎ পুঁজিবাদী শিল্পোদ্যোগগুলি ছিল সেই সমাজগুলিরই আভ্যন্তরীণ বিবর্তনের চূড়ান্ত ফল। সামন্ত প্রভুরা সকলেই ধীরে ধীরে বুর্জোয়ায় রূপান্তরিত হওয়ার ফলে তাদের জমিদারীগুলি বিভিন্ন অন্তর্বর্তী স্তর অতিক্রম ক'রে ধাপে ধাপে পূর্ণ-পুঁজিবাদী খামারে পরিণত হত এবং তা হত তার চারপাশের সামাজিক পরিমণ্ডলের আমূল পুঁজিবাদী রূপান্তর ঘটিয়ে। তারা যেসব শিল্পোদ্যোগ স্থাপন করত সেগুলিও একইভাবে ছোটো (অবশ্যই ক্ষুদ্র উৎপাদকদের মতো এত ছোটো নয়) থেকে মাঝারি এবং তা থেকে বৃহতে রূপান্তরিত হত। অর্থনৈতিক এককগুলি এইভাবে সামন্তবাদী থেকে পুঁজিবাদী উদ্যোগে পরিণত হওয়ার দিকে অব্যাহত গতিতে এগিয়ে যেত। ফলে প্রত্যেকটি বৃহৎ পুঁজিবাদী উদ্যোগের

পিছনে থাকত উৎপাদনসম্পর্কের ব্যাপক রূপান্তরের এক নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাস, তলায় থাকত আমূল-রূপান্তরিত পূর্ব-পুঁজিবাদী সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তি; ফলে ব্যাপক সমাজদেহের সঙ্গে তার কোনো অলঙ্ঘ্য ব্যবধান থাকত না, নানা অন্তর্বর্তী স্তরের শিরা-উপশিরা দিয়ে তা থাকত সমাজদেহের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী-সম্পর্কিত। সমাজদেহের নিরবচ্ছিন্ন পুঁজিবাদী বিবর্তনের মধ্য থেকে উত্থিত হয়ে তারা তাই সমাজের উপর জোরালো প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করত ও সমাজ-রূপান্তরের গতিবেগকে আরো প্রচণ্ডভাবে বাড়িয়ে দিতে পারত।

কিন্তু আমাদের মতো সমাজগুলির বৃহৎ-পুঁজিবাদী শিল্প সমাজের নিরবচ্ছিন্ন আভ্যন্তরীণ বিবর্তনের ফল নয় – প্রায় সর্বাংশেই তাদের বাইরে থেকে আরোপ করা হয়েছে, উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। অনেকে এইসব বৃহৎ শিল্পোদ্যোগ দেখে প্রতারিত হন এবং ভাবেন: আমাদের সমাজগুলি তবে পুঁজিবাদী নয় কেন? তাঁরা খেয়াল রাখেন না যে আজকের শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে এক-একটি বৃহৎ উদ্যোগ সামগ্রিক সামাজিক সম্পর্কের যে পরিমাণ রূপান্তরের প্রতিনিধিত্ব করে আমাদের মতো সমাজগুলিতে তা করে না। এখানে রয়েছে একটা মৌলিক তফাৎ, যাকে না দেখাটা একটা মস্ত ভুল।

একটা বিষয় বিবেচনা করলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। একটি উন্নত ও জটিল দেহগঠন-বিশিষ্ট প্রজাতি (species) যে কেউ উপর থেকে সৃষ্টি ক'রে একবারে এই মর্ত্যজগতের উপর চাপিয়ে দেয়নি, বরং তা যে সরলতম ও নিম্নতম কোনো জীবনরূপ থেকেই ধাপে ধাপে বিবর্তিত হয়েছে, এটা প্রমাণ করার জন্য ডারউইনকে কি করতে হয়েছিল? তা হল, উন্নততর ও জটিলতর প্রজাতি এবং অপেক্ষাকৃত নিম্নপর্যায়ের সরলতর প্রজাতির মধ্যে অসংখ্য মধ্যবর্তী স্তরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা এবং তারপর বিলুপ্ত ও বিদ্যমান এই মধ্যবর্তী স্তরগুলিকে পাশাপাশি সাজিয়ে যথাসম্ভব নিখুঁত একটি সিরিজ তৈরী ক'রে দেখানো। একমাত্র এটা করার পরেই তিনি প্রাকৃতিক নির্বাচন-সংক্রান্ত তাঁর যুগান্তকারী তত্ত্বটিকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। যে কোনো পুঁজিবাদী সমাজে অধুনা-বিলুপ্ত বা অধুনা-বিদ্যমান বিভিন্ন মধ্যবর্তী স্তর পরপর সাজিয়ে একেবারে নিখুঁততম একটি সিরিজ তৈরী করা সম্ভব এবং এই সিরিজ বেয়ে বৃহত্তম পুঁজিবাদী উদ্যোগগুলি থেকে পিছিয়ে পিছিয়ে পৌছানো সম্ভব সরলতম পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক এককগুলিতে: "...বৃহৎ, এমন কি বৃহত্তম ফ্যাক্টরী-মালিকদের অনেকেই একদিন ছিল ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র শিল্পপতি..." ('দি ডেভেলপমেণ্ট অব ক্যাপিটালিজম ইন রাশিয়া': লেনিন)। আমাদের দেশগুলির যে কোনো বৃহৎ শিল্পকে তার চারপাশের গ্রামাঞ্চলের ক্ষুদ্র পণ্য-উৎপাদনের ভীরু সূচনাগুলির সঙ্গে মনে মনে এক নিরবচ্ছিন্ন সিরিজ মারফৎ যুক্ত করার চেষ্টা ক'রে দেখলেই তার চাপিয়ে-দেওয়া আরোপিত চরিত্রটি যে কারো কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

যাহোক, এর ফলে যা দাঁড়াল তা এই : আমাদের সমাজগুলিতে বৃহৎ পুঁজিবাদী উদ্যোগগুলির পিছনে উৎপাদনসম্পর্কের ব্যাপক রূপান্তরের নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাস নেই, তার তলায় নেই আমূল-রূপান্তরিত পূর্ণ-পুঁজিবাদী সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তি ; ব্যাপক সমাজদেহের বিবর্তনের স্তর ও এইসব বৃহৎ শিল্পের মধ্যে ব্যবধান দুস্তর—নানা অন্তর্বর্তী স্তরের শিরা-উপশিরা মারফৎ সেগুলো সমাজদেহের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী-সম্পর্কিত নয়, বরং প্রায় সম্পূর্ণই বিচ্ছিন্ন। ফলে, অন্যান্য ধরনের সমাজে বৃহৎ শিল্প একবার উদ্ভূত হলে তা ব্যাপক সমাজ-রূপান্তরে যদিও এক বিশেষ শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে পারে, আমাদের মতো সমাজে তার সে ভূমিকা হয় নগণ্যমাত্র। বরং তার চেয়ে অনেক বেশী মাত্রায় তা সমাজের অধিকতর পুঁজিবাদী রূপান্তরের প্রতিকূলতা করতে থাকে। কিভাবে, সেটাই আমরা এবার দেখাব।

আমাদের মতো দেশগুলিতে যে বৃহৎ শিল্প দেখা যায় তার অধিকাংশ—বিশেষত গুণগতভাবে তার নির্ধারক অংশগুলি—সাম্রাজ্যবাদীদের দখলে। তারা সরাসরি সেগুলোকে নিজেদের উন্নততর পুঁজিবাদী সমাজ থেকে আমদানী ক'রে আমাদের সমাজের দুর্বলতর পুঁজিবাদী বিকাশের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। সেগুলোর বিপুল মুনাফা তারা স্বদেশে পাচার ক'রে দেয়, অথচ আমাদের দেশগুলিতে ব্যয়িত হলে তা এই সমাজগুলির পুঁজিবাদী রূপান্তরে বিরাট অবদান রাখতে পারত। কিন্তু সে কথা বাদ দিলেও, সাম্রাজ্যবাদীদের এই শ্রেষ্ঠতর ও সবলতর পুঁজির **উপস্থিতিটাই** সমাজের পুঁজিবাদী রূপান্তরের প্রতিকূলতা করতে থাকে[২১], কেননা তা দেশের ক্ষুদ্রতর ও দুর্বলতর মুদ্রা-পুঁজিকে শিল্প-পুঁজিতে পরিণত হতে ভীত ও নিরুৎসাহিত করে। ক্ষুদ্র উৎপাদকদের মধ্যে পুঁজিসঞ্চয়, বুর্জোয়ার উদ্ভব ও পুঁজি-বিনিয়োগকে—এক কথায় পুঁজিবাদী বিকাশের দ্বিতীয় পথকে—তো তা বাধা দেয়ই, উপরন্তু এমন কি পুঁজিবাদী

২১ [উন্নত পুঁজিবাদী সমাজগুলির সঙ্গে কারিগরী মান ও অর্থনৈতিক শক্তির দিক থেকে আমাদের মতো সমাজগুলির যে বাহ্যিক ফারাক রয়েছে তা এইভাবে এই শেষোক্ত সমাজগুলিতে একটি আভ্যন্তরীণ ফ্যাক্টররূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই ফারাক যতক্ষণ খুব বেশী না হয় ততক্ষণ বিদেশী বিনিয়োগ একটি সমাজের পুঁজিবাদী রূপান্তরকে সাহায্য করতে পারে, কিন্তু একটা নির্দিষ্ট মাত্রা অতিক্রম ক'রে গেলেই তা বরং উক্ত সমাজের পুঁজিবাদী রূপান্তরকে দমন করতে থাকে : "...মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশী বিনিয়োগ জুগিয়েছিল এমন কিছু ব্যক্তি ও ছোটো প্রতিষ্ঠান যারা তাদের উদ্যোগের সাফল্য দ্বারাই স্বতস্ফূর্তভাবে জাতীয়কৃত হয়ে গিয়েছিল। আজ কিন্তু বিদেশী পুঁজি জোগাচ্ছে দৈত্যাকার কর্পোরেশনসমূহ, যাদের অধিকাংশই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত, এবং সম্পদ ও প্রত্যাশিত আয়ুর দিক থেকে যারা প্রায়ই কয়েকগুণ ছাড়িয়ে যায়, যেসব সমাজে তারা বিনিয়োগ করছে, সেগুলিকে।" আর তাই বিদেশী পুঁজি ডেকে এনে অধোনত দেশগুলিকে উন্নত করার কোনো আশাই থাকতে পারে না ('ইকনমিক অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট' : জাগুয়ারিবে, নিম্নরেখা আমাদের)।]

বিকাশের প্রথম পথটিকেও তা নিদারুণভাবে খর্ব করতে থাকে। সামন্তশ্রেণী সামগ্রিকভাবে ধাপে ধাপে বুর্জোয়ায় রূপান্তরিত হওয়ার পরিবর্তে তার একাংশমাত্র বুর্জোয়ায় পরিণত হয় এবং তার আবার ক্ষুদ্রতর অংশটি সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে কনসেশন আদায় ক'রে ও তার সঙ্গে আপোষ ক'রে দ্রুতগতিতে আমলা-মুৎসুদ্দি বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজিপতির স্তরে আরোহণ করে। বৃহৎ শিল্পের যেটুকু এদের দখলে থাকে তা-ও তলা থেকে ধাপে ধাপে বিবর্তিত নয়, বরং সাম্রাজ্যবাদীদের সহায়তায় উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া—দেশের সমাজ-বিবর্তনের স্তরের সঙ্গে তা সঙ্গতিহীন, তা থেকে বিচ্ছিন্ন ও অনেক বেশী অগ্রসর। ফলে তা-ও আবার একইভাবে সমাজের ব্যাপক পুঁজিবাদী রূপান্তরের প্রতিকূলতা করতে থাকে: ক্ষুদ্র উৎপাদকদের সচ্ছলতর অংশের তো বটেই, এমন কি সামন্তশ্রেণীরও সঞ্চিত অর্থ উত্তরোত্তর পুঁজিবাদী বিনিয়োগের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে বরং বারে বারে আধা-সামন্তবাদী শোষণকর্মেই পুনর্নিয়োজিত হতে থাকে[২২]।

তাছাড়া এই আমলা-মুৎসুদ্দি একচেটিয়া বুর্জোয়ারা যে কেবল সমাজের পুঁজিবাদী রূপান্তরকে নিষ্ক্রিয়ভাবে নিরুৎসাহিত করতে থাকে তা নয়, সক্রিয়ভাবেও তারা পুঁজিবাদী অগ্রগতির সম্ভাবনাকে ধ্বংস করতে থাকে। তারা লুণ্ঠন করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি বুর্জোয়াদের—রাষ্ট্রযন্ত্রের অপব্যবহার ও দুর্নীতি, ফিনান্সীয় কারচুপি, মুদ্রানীতির রদবদল ও মুদ্রাস্ফীতি, ট্যাক্স, কালো টাকা ইত্যাদি বিভিন্ন পথে তারা ব্যর্থ ক'রে দেয় দেশীয় পুঁজিবাদের ভীরু বিকাশপ্রয়াস। "কর ফাঁকি দেওয়াব এবং কালো টাকা জমাবার কারণগুলি লুকিয়ে রয়েছে ভারতের আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে। ভারতীয় মুৎসুদ্দিরা" (—অর্থাৎ মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ারা—) "বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের সহযোগিতায় প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করেছে। অথচ এই পুঁজি স্বাধীনভাবে শিল্পে বিনিয়োগ করা অসম্ভব—কারণ শিল্পে বিনিয়োগের ব্যাপারটা সাম্রাজ্যবাদীদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার[২৩]

২২। মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের আত্মসমর্পণের দিক যে "প্রধান" তার হদিশ কোনো সরাসরি পরিমাপের মধ্য দিয়ে পাওয়া সম্ভব নয়, তার হদিশ পাওয়া যায় কেবল এই ঘটনার মধ্য দিয়ে যে সাম্রাজ্যবাদীদের সহায়তায় মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ারা সমগ্র সামন্তশ্রেণীর বুর্জোয়া রূপান্তরের তথা সমগ্র সমাজের পুঁজিবাদী রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় মোটের উপর এক <u>বিরুদ্ধ শক্তি</u> হিসাবে আবির্ভূত হয় এবং এইভাবে তাদের চরিত্রের প্রধান দিক হয়ে ওঠে বুর্জোয়াশ্রেণীর ঐতিহাসিক দায়িত্বপালনের পরিবর্তে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ারের দায়িত্বপালন। এটাই 'মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া' কথাটির একমাত্র সম্ভবপর সংজ্ঞা, এবং এইদিক থেকে বিচার করলে, যে সমাজে ক্রমহ্রাসমান গতিবেগে পুঁজিবাদী রূপান্তর চলছে ও পুঁজিবাদের দ্বারা সামন্ত অবশেষের পূর্ণ বিলুপ্তি অসম্ভব হয়ে আছে সে সমাজের বৃহৎ একচেটিয়া বুর্জোয়ারাই <u>সংজ্ঞাগতভাবে</u> মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া। এ কথা হামেশাই বলা হয়ে থাকে যে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের আত্মসমর্পণের দিকই প্রধান, কিন্তু তা যে ঠিক কি অর্থে প্রধান সে সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণা আজও আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়নি]।

২৩ "ইচ্ছা-অনিচ্ছা"র কথা বলাটা অবশ্য সঠিক বস্তুবাদী সূত্রায়ণ নয়।

উপর নির্ভর করে। …এই ধনী মুৎসুদ্দি গোষ্ঠী (অনেক সময়েই প্রাক-পুঁজিবাদী কায়দায়) শেয়ার বেচাকেনা, শস্য ও অন্যান্য ভোগ্যদ্রব্যের ফাটকাবাজারী, অতি উচ্চ সুদে টাকা ধার দেওয়া প্রভৃতির মাধ্যমে নিজেদের সঞ্চিত পুঁজিকে বাড়াবার চেষ্টা করেছে। যেহেতু এসব কাজ তথাকথিত 'আইনী' ব্যাংকিং আওতার মধ্যে সম্ভব নয়, তাই কর ফাঁকি চলছে এবং ব্যাপক কালো টাকা জমা হচ্ছে" ('সাম্প্রতিক বাজেটের স্বরূপ প্রসঙ্গে': 'লালতারা' কলকাতা, ৭ এপ্রিল ১৯৭৪)। এবং এ সবই হচ্ছে সমাজের সুস্থ পুঁজিবাদী বিকাশের ঘোর শত্রু। এই আমলা-মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ারা তাদের উদ্বৃত্ত অর্থকে হয় নিজেরাই, কিংবা অন্যদের হাত মারফৎ, বিভিন্ন ধরনের আধা-সামন্তবাদী শোষণে নিয়োগ ক'রে থাকে।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীরা ও এই আমলা-মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ারা যেহেতু ইতিমধ্যেই আমাদের অর্থনীতিতে এক শক্তিশালী অবস্থানের অধিকারী তাই পুঁজিবাদের যত বিকাশ হয় তত এদেরই অবস্থান আরো বেশী বেশী শক্তিশালী হতে থাকে। পুঁজিবাদী বিকাশের যেটুকু অবকাশ উন্মুক্ত হয়, তাকে পূরণ করার জন্য পাঁচ হাজার ক্ষুদ্র-উৎপাদনসংস্থা বা পঞ্চাশটি সামন্তপ্রভুর কৃষিখামার ধাপে ধাপে পুঁজিবাদী উদ্যোগে বিকশিত হওয়ার পরিবর্তে বাইরে থেকে হয়ত একটিমাত্র শ্রেষ্ঠতর মানের শিল্প চাপিয়ে দিয়ে সেই সীমিত অবকাশটুকুকে দখল ক'রে নেওয়া হয় এবং তা আবার উপরে বর্ণিত পথেই অধিকতর পুঁজিবাদী বিকাশের প্রতিবন্ধকতা করতে থাকে। অর্থাৎ পুঁজিবাদ যত বাড়ে ততই তা ক্রমবর্ধমান হারে নিজের বিকাশের প্রতিকূলতায় পরিণত হতে থাকে। সোজা কথায়, পুঁজিবাদী বিকাশের "ভর" বেড়ে যেতে থাকে।

আমাদের মতো সমাজগুলিতে এই প্রক্রিয়াটি যদি না থাকত তাহলে বর্তমান অধ্যায়ে সূত্রায়িত পুঁজিবাদী বিকাশের বিশিষ্ট ধরনটিকে এই সমাজগুলিতে খুঁজে পাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই থাকত না। তাই এটার একটা সামান্য আভাসমাত্র দেওয়াই ছিল এ আলোচনার লক্ষ্য।

আমাদের উপমহাদেশের দেশগুলিতে পুঁজিবাদী বিকাশের আলোচিত ধরনটি বাস্তবে পরিলক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা আরেকটি দিক বিবেচনা করলেও খুব জোরালো হয়ে দেখা দেয়[২৪]।

এটা সবাই মানেন যে এই দেশগুলো 'অধোনত' (**underdeveloped**) দেশের কাতারে পড়ে। এখন 'অধোনত দেশ' আর 'অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশ' এই দুইয়ের মধ্যে নিশ্চয় তফাৎ রয়েছে। আজকের উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলো এক সময় পুঁজিবাদী বিকাশের মাত্রা ও সামন্ত অবশেষের অস্তিত্বের দিক থেকে আজকের অধোনত দেশগুলোর সমপর্যায়েই ছিল, কিন্তু সেগুলোতে তখনই

২৪ এখান থেকে শুরু ক'রে এই উপ-পরিচ্ছদের বাকী অংশটুকু জেল থেকে বেরিয়ে এসে যোগ করা।

নিশ্চয় পুঁজিবাদী বিকাশের এমন একটি প্রক্রিয়া চালু ছিল, কিংবা অন্তত তেমন প্রক্রিয়া অর্জন করার বাস্তব সম্ভাবনা ছিল, যার ফলে তারা আজকের পূর্ণ-পুঁজিবাদী রূপান্তর হাসিল করতে পেরেছে। কিন্তু অধোনত দেশগুলির মূল বৈশিষ্ট্যই হল এই যে এগুলোতে পুঁজিবাদী বিকাশের তেমন প্রক্রিয়াটাই অনুপস্থিত এবং তেমন প্রক্রিয়া ভবিষ্যতে উদ্ভূত হওয়ারও কোনো সম্ভাবনা নেই, তাই প্রথাসিদ্ধ পথে এগুলোর পুঁজিবাদী বিকাশ—অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত পূর্ণ-পুঁজিবাদী রূপান্তর—অসম্ভব। অর্থনীতিবিদেরা অধোনতির এই বৈশিষ্ট্যগুলিকেই আরো নির্দিষ্টভাবে এই প্রায়-সর্বসম্মত আকারে সূত্রায়িত ক'রে থাকেন: (১) অধোনত সমাজে সামন্তবাদী উৎপাদনসম্পর্কের অবশেষের অস্তিত্ব থাকে; (২) অধোনত সমাজ 'টেক-অফ' পর্যায়ে উপনীত হয়নি, অর্থাৎ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্রমবর্ধমান হার অর্জন করেনি[২৫], (৩) 'টেক-অফ' পর্যায়ে উপনীত হওয়ার অর্থাৎ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্রমবর্ধমান হার অর্জন করার কোনো প্রবণতা বা সম্ভাবনাও অধোনত সমাজে পরিলক্ষিত হয় না।

অন্যদিকে দীর্ঘ বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই অধ্যায়েই আমরা দেখিয়েছি: অনুন্নত পুঁজিবাদী সমাজের বৈশিষ্ট্য হল এই যে সেগুলোতে সামন্ত অবশেষের অস্তিত্ব থাকলেও সেগুলো পুঁজিবাদী রূপান্তরের ক্রমবর্ধমান হার অর্জন করেছে, আর আধা-ঔপনিবেশিক (বা ঔপনিবেশিক বা নয়া-ঔপনিবেশিক) ও আধাসামন্তবাদী সমাজের বৈশিষ্ট্য হল এই যে সেগুলোতে সামন্ত অবশেষের অস্তিত্ব আছে এবং সেগুলোর পুঁজিবাদী রূপান্তর ক্রমহ্রাসমান হারে অগ্রসর হচ্ছে।

এখন এটা যদি মেনে নেওয়া যায় যে পুঁজিবাদী ও প্রাক-পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতিসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সঠিক অর্থে কেবল পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতিরই বৈশিষ্ট্য আর তাই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কোনো-না-কোনোভাবে পুঁজিবাদী রূপান্তর ও বিকাশকেই প্রতিফলিত করে, তাহলে উপরের আলোচনা থেকে দুটো তাৎপর্য অত্যন্ত পরিষ্কারভাবেই বেরিয়ে আসে:

(১) যে দেশ 'অধোনত' তা কিছুতেই 'স্বাধীন পুঁজিবাদী' হতে পারে না। সুতরাং আমাদের উপমহাদেশে "সমাজতান্ত্রিক" বিপ্লবের প্রবক্তাদের একটা বিরাট তাত্ত্বিক বিভ্রান্তি রয়েছে এইখানে যে তাঁরা আমাদের আলোচ্য দেশ-

২৫ অবশ্য 'টেক-অফ' পর্যায়ের জন্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধ্রুব হারই যথেষ্ট, কিন্তু এই ধ্রুব হারকে বিশুদ্ধ সময়পিছু বৃদ্ধির হারে রূপান্তরিত করলে তা প্রবৃদ্ধির ক্রমবর্ধমান হারের আকারেই আত্মপ্রকাশ করে। যেমন যে কোনো একটি রাশি ১০ যদি বছরে ২০% এই ধ্রুব হারে বাড়তে থাকে তাহলে দ্বিতীয় বছরে তা হবে (১০+১০×'২=) ১২, তৃতীয় বছরে (১২+১২×'২=) ১৪'৪, চতুর্থ বছরে (১৪'৪+১৪'৪×'২=) ১৭'৮ ইত্যাদি। কিন্তু তার মানে প্রথম একবছরে বৃদ্ধি ২, দ্বিতীয় একবছরে বৃদ্ধি ২'৪, তৃতীয় একবছরে বৃদ্ধি ৩'৪ ইত্যাদি, অর্থাৎ বছরপিছু বৃদ্ধির হার বেড়ে যাচ্ছে।

গুলিকে 'অধোনত' ব'লে স্বীকার ক'রেও সাজাতে চান 'স্বাধীন পুঁজিবাদী' (যদিও অনুন্নত) ব'লে। তাঁদের এক দল তা করেন এই যুক্তিতে যে এগুলোতে সামন্ত অবশেষের অস্তিত্ব থাকলেও পুঁজিবাদের তুলনায় তা অপ্রধান (কিন্তু এই ধরনের সূত্রায়ণের মধ্য দিয়ে প্রশ্নটাকে ফয়সালা করার মতো নিরিখই আসলে উপস্থাপিত হয় না।) আর অন্য দল আরো সেয়ানা : তাঁরা সব ঝামেলা এক-বারে চুকানোর জন্য সামন্ত অবশেষের অস্তিত্বকেই বেমালুম অস্বীকার ক'রে বসেন (কিন্তু প্রথমত তাঁদেরই হাজির করা উপাত্ত থেকে দেখানো যায় তাঁদের অবস্থান কতখানি ভ্রান্ত, আর দ্বিতীয়ত একটা পুঁজিবাদী সমাজ 'অনুন্নত' অথচ তাতে সামন্ত অবশেষের অস্তিত্ব নেই এটা একেবারেই অসম্ভব)।

(২) 'আধা-ঔপনিবেশিক (বা ঔপনিবেশিক বা নয়া-ঔপনিবেশিক) ও আধা-সামন্তবাদী দেশ' এবং 'অধোনত দেশ' এই দুটি ধারণার মধ্যে এক নিবিড় ঐক্য রয়েছে। ফলে দ্বিতীয়টির অর্থনৈতিক কারণ ও ভিত্তি সম্বন্ধে অর্থনীতিবিদদের গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রথমটির বৈশিষ্ট্যসূচক নিরিখের (= সাধারণভাবে পূর্ণ পুঁজিবাদী রূপান্তরের অসম্ভবতার এবং বিশেষভাবে পুঁজিবাদী রূপান্তরের ক্রম-হ্রাসমান হারের) অর্থনৈতিক কারণ ও ভিত্তির উপরেও প্রভূত আলোকপাত করে এবং পুঁজিবাদী রূপান্তরের ক্রমহ্রাসমান হার আমাদের উপমহাদেশের অধোনত দেশগুলিতেও পরিলক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনাকে অনেক বেশী উজ্জ্বল ক'রে তোলে।

বিশেষ ক'রে এই দ্বিতীয় তাৎপর্যটির অপরিসীম গুরুত্ব বোঝার জন্য অধোনতির অর্থনৈতিক কারণ ও ভিত্তি সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছুটা আলোচনা প্রয়োজন।

হেলিও জাগুয়ারিবে তাঁর 'ইকনমিক অ্যাণ্ড পলিটিকাল ডেভেলপমেন্ট : এ থিওরেটিকাল অ্যাপ্রোচ অ্যাণ্ড এ ব্রাজিলিয়ান কেস স্টাডি' গ্রন্থে বলছেন যে শিল্পোন্নত দেশগুলি যখন আজকের অধোনত দেশগুলির তুলনীয় পর্যায়ে ছিল (১৯ শতক কিংবা ২০ শতকের প্রথম দিকে) তখন সেগুলিতে "পুঁজিবাদী বিকাশের একটা স্বতস্ফূর্ত প্রবণতা" ছিল। এর অর্থ হয় সেগুলি ইতিমধ্যেই 'টেক-অফ' পর্যায় অতিক্রম ক'রে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্রমবর্ধমান হার অর্জন করেছিল কিংবা অন্তত সে হার অর্জন করার দিকে তারা অনিবার্য-ভাবে এগিয়ে যাচ্ছিল। পক্ষান্তরে আজকের অধোনত দেশগুলির বৈশিষ্ট্য হল "পুঁজিবাদী বিকাশের একটা স্বতস্ফূর্ত প্রবণতা"র অনুপস্থিতি। এর অর্থ, এগুলি 'টেক-অফ' পর্যায় অতিক্রম ক'রে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্রমবর্ধমান হার অর্জন করেনি এবং অর্জন করাও এদের পক্ষে অসম্ভব। স্পষ্টতই "পুঁজিবাদী বিকাশের একটা স্বতস্ফূর্ত প্রবণতা" থাকতে পারে ততক্ষণই যতক্ষণ পুঁজিবাদের যা একমাত্র প্রণোদনা সেই **মুনাফা** অর্জন সম্ভব হয় পুঁজিবাদী উৎপাদনের **প্রসার** ও **বিকাশের** মধ্য দিয়ে, তা না হলেই সেই মুনাফা খোঁজা হবে "উৎপন্ন দ্রব্যের বৃদ্ধিতে যত না তার চেয়ে বেশী আয়ের শোষণমূলক পুনর্বণ্টনে"

এবং রুদ্ধ হয়ে যাবে পুঁজিবাদী পথে অর্থনৈতিক বিকাশ। অধোনত দেশগুলিতে নিশ্চয় তা-ই ঘটছে, কিন্তু কি কি কারণে? আজকের শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির অতীতের সঙ্গে এদের বর্তমানের পার্থক্য কোথায় কোথায়?

প্রথমত আজকের শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলো ১৯ শতকে বা ২০ শতকের প্রারম্ভে বাহ্যিক বাজারের, কাঁচামালের বাহ্যিক উৎসের এবং সামাজিক ঝামেলাগুলিকে বিদেশে (যেমন বৃটেন থেকে আমেরিকায়) পাচার করার সুযোগের অধিকারী ছিল এবং মুক্ত ছিল বিপুলভাবে অগ্রসর অন্য কোনো পুঁজিবাদী দেশের মারাত্মক চাপ ও প্রতিযোগিতা থেকে। আজকের অধোনত দেশগুলি এইসব সুবিধার প্রত্যেকটি থেকে বঞ্চিত এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো শুধু এদের বিদেশী বাজার নয় বরং দেশীয় বাজারকেও প্রায় নিরঙ্কুশভাবে দখল ক'রে রয়েছে। এরই ফলে ব্যাহত হচ্ছে এগুলোর পুঁজিগঠন ও পুঁজিসঞ্চয় অর্থাৎ, এক কথায়, পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক বিকাশ।

দ্বিতীয়ত আজকের শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে ১৯ শতকে কিংবা ২০ শতকের প্রারম্ভে শ্রেণীসংগ্রামের স্তর এবং শোষিত শ্রেণীর চেতনা ও সংগঠনের মান আজকের অধোনত দেশগুলির তুলনায় অনেক নিচু ছিল। আজকের অধোনত দেশগুলিতে ওগুলো অনেক উঁচু হওয়ার কারণে[২৬] পুঁজিগঠন ও পুঁজিসঞ্চয়—এক কথায় পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক বিকাশ—আভ্যন্তরীণ শ্রেণীসংগ্রামের দ্বারা অনেক বেশী বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

তৃতীয়ত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির 'টেক-অফ' পর্যায়ে উপনীত হওয়ার জন্য যে ন্যূনতম প্রকৌশলগত মানটি প্রয়োজনীয় তা আজকের শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির শৈশবে অনেক নিচু ছিল। আজকের অধোনত দেশগুলির জন্য তা অনেক উঁচু এবং যত দিন যাচ্ছে ততই তা আরো উপরে উঠে যাচ্ছে[২৭]।

সুতরাং শিল্পোন্নত দেশগুলির শৈশবকালের তুলনায় আজকের অধোনত দেশসমূহের সমস্যাকে সংক্ষেপে এইভাবে প্রকাশ করা যায়: অনেক বড় ফারাক (অনেক বড়, কেননা 'টেক-অফ'এর জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরী স্তর আজ

২৬ যেমন শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, আট ঘণ্টার কর্মদিন, ইত্যাদি বহু অধোনত দেশেই ইতিমধ্যে বাস্তবায়িত হয়ে গেছে, কিন্তু বৃটেন, ফ্রান্স ও জার্মানিতে ওগুলো বাস্তবায়িত হয়েছিল পুঁজিবাদী বিকাশের অনেক উচ্চতর স্তরে।

২৭ ১৯ শতকে কিংবা ২০ শতকের গোড়ায় একটা ইস্পাত কারখানার জন্য "১০ টন-দিন"এর একটা ব্লাস্ট ফার্নেস অর্থনৈতিক দিক থেকে উপযোগী ছিল, কিন্তু আজ কমপক্ষে চাই "১০০০ টন-দিন"এর ব্লাস্ট ফার্নেস এবং অধিকাংশ ব্লাস্ট ফার্নেসের ক্ষমতা হচ্ছে "৫০০০ টন-দিন"। 'টেক-অফ' এর জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম কারিগরী মানটি আরো বেশী উঁচু হয়ে দেখা দেয় পুঁজিবাদী পথে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটাতে গেলে, কেননা তখন তাকে পুঁজিবাদী মুনাফারও জোগান দিতে হয় (ঐ: জাগুয়ারিবে)।

অনেক বেশী উঁচু) তাদেরকে অনেক বেশী দ্রুততার সঙ্গে অতিক্রম করতে হবে (অনেক বেশী দ্রুততার সঙ্গে, কেননা 'টেক-অফ'এর জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরী স্তর ক্রমেই উঁচুতে উঠে যাচ্ছে) এবং তা করতে হবে অনেক বেশী প্রতিকূলতার মধ্যে। পুঁজিবাদী পথে এ সমস্যার সমাধান অসম্ভব কারণ তা করতে গেলে প্রয়োজনীয় মানবিক ও বৈষয়িক সম্পদগুলিকে আগে **পুঁজির** উপাদানে পরিণত হতে হবে অর্থাৎ পুঁজিগঠনের হারকে উঠতে হবে এমন এক মানে যা দু কারণে এদের সাধ্যাতীত : (১) সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও পীড়ন (২) আভ্যন্তরীণ শ্রেণীসংগ্রামের বর্ধিত প্রতিরোধ। বৈদেশিক পুঁজি ডেকে এনে এ সমস্যা সমাধান করতে চাওয়ার অর্থ অধোনতির একটি কারণকেই জোরদার করা। এজন্যই অধোনত দেশগুলি পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির 'টেক-অফ' হাসিল করতে পারেনি, কোনোদিন পারবেও না[২৮]।

বিষয়টাকে এবার ঐতিহাসিকভাবেও একটু বোঝার চেষ্টা করা যাক।

জাগুয়ারিবে বলছেন যে বৃটেনে স্বতস্ফূর্ত পুঁজিবাদী বিকাশ যে সম্ভব হয়েছিল তার কারণ : (১) শিল্পবিপ্লব এসেছিল একটি সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্যবাদী (mercantilist) পর্যায়ের পরে, যার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল উপনিবেশগুলির উন্মত্ত লুণ্ঠন ; (২) ফ্রান্স, জার্মানি ইত্যাদি দেশের শিল্পোদ্যোগীদের মতো বৃটিশ শিল্পোদ্যোগীদের 'পুরোনো জমানা'র রক্ষণশীল শক্তিসমূহের বাধার মোকাবেলা করতে হয়নি (কারণ ক্রমওয়েলের "পেটিবুর্জোয়া একনায়কত্বে" তারা পোষ মেনে গিয়েছিল এবং সংসদীয় ব্যবস্থার জোয়ালে লাগামবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল), মোকাবেলা করতে হয়নি জনতার কোনো বিপজ্জনক বিদ্রোহেরও। সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্যবাদী পর্যায়টিই শিল্পবিপ্লব সম্ভব ক'রে তুলল। শিল্পবিপ্লব মেশিন প্রবর্তন ক'রে এবং মজুত বেকারবাহিনী সৃষ্টি ক'রে বুর্জোয়াশ্রেণীর জন্য এনে দিল বিপুল মুনাফা। অবশ্য এরই ফলে ১৯ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে শ্রেণীসংগ্রাম দারুণ তীব্র হয়ে উঠল ; কিন্তু ইউনিয়নগুলির বর্ধমান দরকষাকষির ক্ষমতা, রাস্তায় গণবিপ্লবী আন্দোলন ও নিজেদের ভোটাধিকার—এই তিনটি হাতিয়ার শ্রমিকরা যখন শেষ পর্যন্ত নিজেদের স্বার্থে একত্রে প্রয়োগ করতে পারল, ততদিনে শিল্পবিপ্লবের মাধ্যমে বিপুল পুঁজিসঞ্চয়, পর্যাপ্ত কারিগরী বিকাশ এবং বুর্জোয়াদের অবিশ্বাস্য

২৮ কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির 'টেক-অফ' হাসিল করা এদের পক্ষে অসম্ভব এবং অধোনতিই এদের অলঙ্ঘ্য নিয়তি। এর অর্থ এইটুকুই যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির 'টেক-অফ' হাসিল করতে গেলে এদেরকে পুঁজিবাদের পথ ছাড়তে হবে, নিতে হবে এমন এক পথ যাতে প্রয়োজনীয় সম্পদগুলিকে পুঁজির আকার ধারণ করতে হবে না. অর্থনৈতিক বিকাশের ভিত্তি হবে শোষণের পরিবর্তে নিজেদেরই জন্য জনসাধারণের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আত্মত্যাগ এবং সামাজিক প্রগতি মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের মুনাফা-ক্ষুধার উপর নির্ভরশীল না হয়ে পরিণত হবে সমগ্র জনগণের সচেতনভাবে পরিকল্পিত এক বিপুল কর্মোদ্যোগে।

ধনবৃদ্ধি ইতিমধ্যেই ঘ'টে গেছে। ফলে এবার পুঁজির তহবিল ফতুর না ক'রে কিংবা পুঁজিবাদী বিকাশের অপরিহার্য নেতা বুর্জোয়াশ্রেণীকে দরিদ্র ও নিরুৎসাহিত না ক'রে,অর্থাৎ এক কথায় পুঁজিবাদী বিকাশকে পঙ্গু না ক'রেই,শ্রমিকদের কিছু কিছু দাবী মেটানো সম্ভব হল, ক'মে এল শ্রেণীবিরোধের তীব্রতা।

বিলম্বে আগত ফ্রান্স ও জার্মানির অবস্থা ছিল অপেক্ষাকৃত কঠিন। একদিকে বিলম্বের ফলে পুঁজিবাদী বিকাশের দিক থেকে তারা তখন বৃটেনের চেয়ে বেশ কিছুটা পশ্চাদ্‌বর্তী এবং তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপের সম্মুখীন। অন্যদিকে তাদের আভ্যন্তরীণ শ্রেণীসংগ্রামের স্তরও তখন অনেক উঁচুতে। কিন্তু এর ফলে "পুঁজিবাদী বিকাশের স্বতস্ফূর্ত প্রবণতা" তাদের ক্ষেত্রে দুর্বল হলেও একেবারে অন্তর্হিত হয়নি। তাদের অসুবিধাগুলি তখনও উপযুক্ত রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা দ্বারা অতিক্রমযোগ্য ছিল। তাই, দৃষ্টান্তস্বরূপ, জার্মানিতে অনুসৃত হল বিসমার্কবাদ: রাষ্ট্র রক্ষাশুল্ক-নীতি (protectionist policy) প্রয়োগ করল, প্রধান দুই দ্বন্দ্বরত শ্রেণী (বুর্জোয়া ও সর্বহারা) থেকে আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য অর্জন ক'রে এক শ্রেণীর বিরুদ্ধে অপর শ্রেণীকে খেলিয়ে শ্রেণীবিরোধকে সংযত ক'রে রাখল এবং এইভাবে হাসিল করল পুঁজিবাদী বিকাশ ও পুঁজিবাদী রূপান্তরের লক্ষ্য।

যে কোনো দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী এই পর্যন্ত প'ড়েই নিশ্চয় আগাম বুঝে নেবেন যে পুঁজিবাদী পথে যাত্রারম্ভ যদি এইভাবে বিলম্বিত হতে থাকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে পূর্বোল্লেখিত অসুবিধাগুলি, তাহলে এক সময় অনিবার্যভাবেই পরিমাণ গুণে রূপান্তরিত হবে, অসুবিধাগুলি পুঁজিবাদী পথে অনতিক্রম্য হয়ে উঠবে এবং আবির্ভাব ঘটবে অধোনতির নতুন গুণটির। সাম্রাজ্যবাদের যুগে ঠিক এইটাই ঘটেছে। ব্যাপারটাকে এইভাবে দেখলেই বুর্জোয়া-প্রতিক্রিয়াশীল যেসব ধারণা অধোনতিকে একটা রহস্যময়, চিরস্থায়ী কিছু হিসাবে, এমন কি অধোনত জাতিগুলির মৌলিক প্রকৃতিতেই বদ্ধমূল একটা কিছু হিসাবে দেখাতে চায় সেসবের চরম অন্তঃসারশূন্যতা এক মুহূর্তে ধরা প'ড়ে যায়, বোঝা যায় যে বিলম্বে-আগত দেশগুলি পুঁজিবাদী বিকাশের চেষ্টা করতে গিয়ে যেসব অনিবার্য অসুবিধা ভোগ করতে থাকে সেগুলোর নিছক পরিমাণগত বৃদ্ধি থেকেই খুব স্বাভাবিকভাবে অধোনতির উদ্ভব ঘটে।

'আধা-ঔপনিবেশিক (বা ঔপনিবেশিক বা নয়া-ঔপনিবেশিক) ও আধা-সামন্তবাদী সমাজ' এবং 'অধোনত সমাজ' এই দুই সারি ধারণার মধ্যে নিবিড় যোগসূত্র উদ্‌ঘাটিত হওয়ার ফলে আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ অন্তত দুটি তাৎপর্য উপরের আলোচনা থেকে সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে আসে:

(১) আধা-ঔপনিবেশিক (বা ঔপনিবেশিক বা নয়া-ঔপনিবেশিক) ও আধা-সামন্তবাদী সমাজের যে চরিত্রবৈশিষ্ট্য আমরা প্রতিষ্ঠিত করেছি তা হল,

সাধারণভাবে পূর্ণ-পুঁজিবাদী রূপান্তরের অসম্ভবতা, এবং বিশেষভাবে পুঁজিবাদী রূপান্তরের একটি বিশেষ ধরন (=ক্রমহ্রাসমান হারে অগ্রগতি)। কিন্তু তার কারণ হিসাবে আমরা এতক্ষণ কেবলমাত্র বাহ্যিক একটি কারণই নির্দেশ ক'রে আসছিলাম। তা হল সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও নিপীড়ন। কিন্তু উপরের আলোচনা থেকে দেখা গেল যে অধোনতির একটি আভ্যন্তরীণ কারণও আছে। তা হল অধোনত সমাজে শ্রেণীসংগ্রামের বর্ধিত তীব্রতা। এর ফলে আধা-ঔপনিবেশিক (বা ঔপনিবেশিক বা নয়া-ঔপনিবেশিক) ও আধা-সামন্তবাদী সমাজের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের কারণ-বিশ্লেষণও এতক্ষণের একপেশেমি থেকে মুক্ত হয়ে অনেক বেশী সম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারল। আমরা বুঝতে পারলাম যে এই চরিত্রবৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী কেবল সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-পীড়নই নয় বরং আভ্যন্তরীণ শ্রেণীসংগ্রামও (যার অবজেকটিভ গতিমুখ বর্তমানে সমাজতন্ত্রের দিকে)। এবার অনেক গভীরতর তাৎপর্য নিয়ে আমাদের মনে ফিরে আসে মাওয়ের সেই সিদ্ধান্ত : "প্রথমত আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ বা সাম্রাজ্যবাদ চীনে বুর্জোয়া একনায়কত্বের অধীনে একটি পুঁজিবাদী সমাজ কায়েম হতে দেবে না। ... দ্বিতীয়ত **সমাজতন্ত্র তা হতে দেবে না**" ('নয়া-গণতন্ত্র সম্বন্ধে,' বড় হরফ আমাদের)।

(২) আমরা ইতিপূর্বে বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছি যে আধা-ঔপনিবেশিক (বা ঔপনিবেশিক বা নয়া-ঔপনিবেশিক) ও আধা-সামন্তবাদী সমাজের অপরিহার্য চরিত্রবৈশিষ্ট্য হল পূর্ণ পুঁজিবাদী রূপান্তরের অসম্ভবতা। উপরন্তু পূর্ণ পুঁজিবাদী রূপান্তর অসম্ভব হতে গেলে পুঁজিবাদী রূপান্তরের প্রক্রিয়াটিকে কোন নির্দিষ্ট ধরনে অগ্রসর হতে হয় তা-ও আমরা দেখিয়েছি। কিন্তু তা-ই কি পূর্ণ পুঁজিবাদী রূপান্তরকে অসম্ভব ক'রে তোলার জন্য যথেষ্ট ? না, কেননা এই নির্দিষ্ট ধরনটি **কেন আপনা থেকে অন্য কোনো ধরনে পরিবর্তিত হতে পারবে না** এবং এই নির্দিষ্ট ধরনটিকে বিলুপ্ত করার জন্য **সচেতন মানবিক প্রয়াস কেন অপরিহার্য** সে প্রশ্নের জবাব দেওয়া বাকীই থেকে গেল। তবে অধোনতি সম্বন্ধে উপরের আলোচনাটি এই গুরুতর ঘাটতিটা পূরণ করতে সাহায্য করে। আমরা দেখতে পেলাম যে অধোনত সমাজগুলির পক্ষে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির 'টেক-অফ' পর্যায়ে—অর্থাৎ পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্রমবর্ধমান হার অর্জনের পর্যায়ে—উত্তীর্ণ হওয়ার কোনো আশা নেই এইজন্যই যে 'টেক-অফ'এর জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরী স্তর আজ অনেক উঁচুতে উঠে গেছে ও ক্রমেই তা আরো উঁচুতে উঠে যাচ্ছে। পুঁজিবাদী পথে সেই কারিগরী মান অর্জন করতে গেলে যে বিপুল হারে পুঁজিগঠন প্রয়োজন তা বৈদেশিক শোষণ ও আভ্যন্তরীণ শ্রেণীসংগ্রামের বহুগুণ-বর্ধিত প্রতিকূলতার ফলে এইসব সমাজের সাধ্যাতীত।

৮. বর্তমান অধ্যায়ের সমগ্র বিশ্লেষণ ও নিরিখগুলির তাৎপর্য [২৯]

বর্তমান অধ্যায়ের সমগ্র বিশ্লেষণ ও তা থেকে নিষ্কাশিত নিরিখগুলির সবচেয়ে বড় তাৎপর্য এই যে আমাদের সমাজগুলির চরিত্রায়ণ-সংক্রান্ত বিতর্ক এই প্রথম অর্থহীন বাদানুবাদের স্তর থেকে একটি সুস্পষ্ট নিষ্পত্তিযোগ্য স্তরে উন্নীত হতে পারল।

আমাদের সমাজগুলির জন্য সরাসরি "সমাজতান্ত্রিক" বিপ্লবের প্রেসক্রিপশনদাতারা কিছু অর্থনৈতিক উপাত্ত হাজির ক'রে দাবী করেন যে ঐ উপাত্তগুলি নাকি এসব সমাজে সামন্তবাদের তুলনায় পুঁজিবাদেরই পরিমাণগত প্রাধান্য "প্রমাণ" করে আর তাই এসব সমাজ পুঁজিবাদী, কেননা "মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অনুযায়ী একটা মিশ্র ব্যাপারের (phenomenonএর) চরিত্র নির্ধারিত হয় তার প্রধান চরিত্রের দ্বারা" (এস ইউ সি দলের মুখপত্র 'প্রলেতারিয়ান এরা', কলকাতা, ১ জুলাই ১৯৭৩)। এর জবাবে আমরাও প্রায়শই ঐ একই উপাত্ত হাজির ক'রে দাবী করি যে ঐ উপাত্তগুলি নাকি এসব সমাজে পুঁজিবাদের তুলনায় সামন্তবাদের পরিমাণগত প্রাধান্য প্রমাণ করছে আর তাই এসব সমাজ আধা-সামন্তবাদী (কিন্তু এটা ভেবে দেখি না যে সেক্ষেত্রে তো এগুলো সামন্তবাদী হওয়ার কথা!)।

যে পাঠক বর্তমান অধ্যায়টি মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন তিনি নিশ্চয় বুঝবেন যে এই ধরনের অর্থহীন বিতর্কের কোনো নিষ্পত্তিই সম্ভব নয়, কারণ বিতর্করত দুটি পক্ষই একই ভ্রান্তির শিকার। তাঁরা কেউই খেয়াল রাখছেন না যে: (১) যে উপাত্তগুলির উপর নির্ভর ক'রে বিতর্ক চালানো হচ্ছে সেগুলো পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদের মধ্যে কোনোটাকেই অপরটির চেয়ে পরিমাণগতভাবে প্রধান ব'লে নির্দেশ করতে পারে না, এবং (২) যে সম্ভাব্য চরিত্রায়ণগুলিকে কেন্দ্র ক'রে বিতর্কটা চলছে সেগুলোর মধ্যে যেহেতু অন্তত একটা ('আধা-সামন্তবাদী') পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদের পরিমাণগত তুলনাকে **উপেক্ষা** করার উপর দণ্ডায়মান তাই উক্ত পরিমাণগত তুলনাটা সমগ্র বিতর্কের পক্ষেই একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায় (আর তাই খোঁজ নিলে দেখা যায় যে 'পুঁজিবাদী,' 'আধা-সামন্তবাদী' ইত্যাদি কোনো সমাজ-চরিত্রায়ণের সফল নজীরই উক্ত পরিমাণগত তুলনার ভিত্তিতে আসলে সম্পন্ন হয়নি)।

অবশ্য "সমাজতান্ত্রিক" বিপ্লবের প্রেসক্রিপশনদাতাদের যুক্তি প্রায়ই আরেকটু ঘুরপথে এগোয়। তাঁরা পুঁজিবাদী বিকাশের কিছু পরিমাপক বেছে নিয়ে দেখান যে আমাদের সমাজে ওগুলোর মান অতীতের 'পুঁজিবাদী' রাশিয়ায় ওগুলোর মানেরই সমান কিংবা এমন কি তার চেয়ে বেশী; সুতরাং রাশিয়ার ক্ষেত্রে যদি

[২৯] এই উপ-পরিচ্ছেদটি আমার কারামুক্তির পর সংশোধিত ও পুনর্লিখিত।

তা সামন্তবাদের চেয়ে পুঁজিবাদকে পরিমাণগতভাবে প্রধান প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট হয়ে থাকে তবে আমাদের সমাজগুলিতেও পুঁজিবাদ নিশ্চয় সামন্তবাদের চেয়ে পরিমাণগতভাবে প্রধান, আর তাই আমাদের সমাজগুলিও পুঁজিবাদী! অধিকতর চাতুর্যপূর্ণ এই যুক্তিধারার অন্তঃসারশূন্যতাও পাঠক নিশ্চয় অনায়াসেই ধ'রে ফেলবেন: আলোচ্য উপাত্তগুলির কোনো মানই রাশিয়ায় পুঁজিবাদের পরিমাণকে সামন্তবাদের চেয়ে বেশী ব'লে প্রমাণ করেনি, করতে পারতও না; সুতরাং রাশিয়ার সমাজ যদি সফলভাবে 'পুঁজিবাদী' ব'লে চরিত্রায়িত হয়ে থাকে তবে তার জন্য সচেতন বা অচেতনভাবে নিশ্চয় অন্য কোনো নিরিখ ব্যবহৃত হয়েছিল। উপরন্তু এঁদের যুক্তিধারাটি ভ্রান্ত আরো এই কারণে যে পুঁজিবাদী বিকাশের উক্ত পরিমাপকগুলির একই মান সর্বদেশে ও সর্বকালে সমান পুঁজিবাদী রূপান্তরের প্রতিনিধিত্ব করবে এমন কোনো কথা নেই, বরং না করাটাই স্বাভাবিক[৩০]।

কিন্তু পুঁজিবাদী বিকাশের পরিমাপকগুলির একই মান যদি সর্বদেশে ও সর্বকালে সমান পুঁজিবাদী রূপান্তরের প্রতিনিধিত্ব না করে তাহলে যা দাঁড়ায় তা এই: উক্ত পরিমাপকগুলির মান নির্ণয় দ্বারা কোনো সমাজের পুঁজিবাদী রূপান্তরের অনপেক্ষ (absolute) পরিমাণ সম্বন্ধে কোনো ধারণা পাওয়া কিংবা দুটি সমাজের পুঁজিবাদী রূপান্তরের পরিমাণকে তুলনা করা সম্ভব নয়, কোনো

৩০ যেমন ধরুন, পুঁজিবাদী উৎপাদনের ভিত্তি তো নিশ্চয়ই শ্রমশক্তির ক্রয়বিক্রয়। কিন্তু মজুরী-শ্রমিকের একই শতকরা সংখ্যা কি সর্বত্র একই পরিমাণ পুঁজিবাদী রূপান্তর তথা সামন্তবাদের ক্ষয় সূচিত করবে? না-ও করতে পারে, কারণ কোনো ব্যক্তি তার শ্রমশক্তি বিক্রী ক'রে আনুষ্ঠানিকভাবে মজুরী-শ্রমিকে পরিণত হলেই যে সম্পূর্ণ পুঁজিবাদী অবস্থায় (অর্থাৎ পূর্ণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ভিত্তিতে) শোষিত হয় তা নয়। দুটি লোক আনুষ্ঠানিকভাবে মজুরী-শ্রমিক হওয়া সত্ত্বেও এমন হতে পারে যে তাদের একজন এখনও আসলে প্রায় ভূমিদাসই এবং অন্যজন সম্পূর্ণ মজুরী-শ্রমিক। এই প্রসঙ্গে মার্কসের 'পোভার্টি অব ফিলজফি' গ্রন্থের প্রথম জার্মান সংস্করণের ভূমিকায় (১৮৮৪) এঙ্গেলসের উক্তি স্মরণীয়: "যেখানে এখনও লাঠি আর চাবুকের রাজত্ব, যেখানে গ্রামের সবকটি সুন্দরী মেয়েই কর্তাবাবুর হারেমের সম্পত্তি, সেই পমেরানীয় ইউংকারের জমিদারীতে প্রকৃতপক্ষে এখনও ভূমিদাসত্বে আবদ্ধ দিনমজুর সর্বহারা..." (নিম্নরেখা আমাদের)। উপরন্তু একই পরিমাণ বৃহৎ শিল্প পুঁজিবাদী সমাজে উৎপাদনসম্পর্কের যতখানি পুঁজিবাদী রূপান্তরের তথা সামন্তবাদের ক্ষয়ের প্রতিনিধিত্ব করত, এবং সামন্তবাদের আরো যতখানি ক্ষয়কে অনিবার্য ক'রে তুলত, আমাদের মতো সমাজে যে ততখানি করতে পারে না তা আমরা পূর্ববর্তী উপ-পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছি। বিশেষত কৃষিমজুরের অবস্থার উপর এর বিপুল প্রভাব রয়েছে কেননা মার্কসীয় অর্থনীতির ছাত্রমাত্রেই জানেন যে কৃষিমজুরের দরকষাকষির ক্ষমতার উন্নতি এবং তার জীবন থেকে সামন্তবাদী বন্ধনের প্রকৃত অবলুপ্তি প্রধানত নির্ভর করে শহরে শিল্পীয় পুঁজিবাদের বিকাশ গ্রামা-জীবনের উপর যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তারই উপর। আমাদের মতো সমাজগুলিতে বৃহৎ শিল্পের পূর্বোক্ত সীমাবদ্ধতার জন্য কৃষিমজুরের জীবনে সামন্ত-অবশেষের অস্তিত্ব পুঁজিবাদী সমাজের কৃষি-মজুরের জীবনের চেয়ে অনেক বেশী থাকাটাই অনিবার্য।

সমাজে পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদের পরিমাণগত সম্পর্ক সম্বন্ধে কোনো ধারণা করতে পারা তো দূরের কথা। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে এইখানে প্রশ্ন উঠবে : তাহলে 'আধা-সামন্তবাদী', 'পুঁজিবাদী', ইত্যাদি চরিত্রায়ণের যেসব নিরিখ আমরা এই অধ্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করলাম সেগুলি আদৌ প্রয়োগ করা যাবে কিভাবে? এই আপাত-দুরূহ প্রশ্নটির জবাব কিন্তু আমার খুব সহজ ব'লেই মনে হয়। কোনো বিশেষ দেশে ঐ ধরনের উপযুক্ত কিছু পরিমাপকের মানের **বৃদ্ধি** থেকে নিশ্চয়ই হদিশ পাওয়া যাবে ঐ **একই** দেশে সমাজের পুঁজিবাদী রূপান্তর **কিভাবে অগ্রসর হচ্ছে**, আর বিভিন্ন দেশের ক্ষেত্রে তা বের করতে পারলেই পুঁজিবাদী রূপান্তর বিভিন্ন দেশে যে-যে ভাবে অগ্রসর হচ্ছে তার তুলনাও সম্ভব হবে। এবং পাঠকের তো অবশ্যই স্মরণ আছে যে 'পুঁজিবাদী', 'আধা-সামন্তবাদী', ইত্যাদি চরিত্রায়ণের জন্য পুঁজিবাদী রূপান্তরের অনপেক্ষ পরিমাণের নির্ধারণ আদৌ প্রয়োজন নয়, প্রয়োজন শুধু পুঁজিবাদী রূপান্তর **কিভাবে অগ্রসর হচ্ছে** তা-ই নির্ধারণ করা।

'আধা-সামন্তবাদ' বর্গ-সংক্রান্ত আমাদের বিশ্লেষণটি দেখিয়েছে যে আধা-সামন্তবাদী সমাজে সামন্তবাদ পুঁজিবাদের চেয়ে পরিমাণগতভাবে প্রধান বা অপ্রধান যা-ই হোক না কেন তার এক ধরনের প্রাধান্য সর্বদাই থাকে যার ফলে তা সমাজের গুণনির্ধারণে অংশ নিতে পারে এবং পুঁজিবাদের পরিবর্তে তা-ই হয় সমাজবিকাশের একটি মূল বাধা, আর তাই বিপ্লবের একটি মূল লক্ষ্যবস্তু। সামন্ত অবশেষ যে পরিমাণগতভাবে অপ্রধান হয়েও এই অর্থে প্রধান হতে পারে "সমাজতান্ত্রিক" বিপ্লবের প্রবক্তারা তা মানতে চান না, তাই তাঁদের বক্তব্য খণ্ডনের জন্য আমাদের বিশ্লেষণের উপযোগিতা স্পষ্ট। কিন্তু জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকদের বক্তব্য খণ্ডনেও এর কার্যকারিতা রয়েছে কারণ সামন্ত অবশেষের পরিমাণগত গৌণতার অজুহাতে তার অন্য সর্বপ্রকার প্রাধান্যের সম্ভাবনা নাকচ করার একটা প্রবণতা তাঁদের মধ্যেও বিদ্যমান। কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া যাক :

> "...পণ্যোৎপাদন ও বিনিময় ক্ষেত্রে সামন্তশ্রেণী সরাসরি বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে অনুন্নত দেশে এটা একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য" ('ভুমিবিপ্লবের স্তর নয় কেন' : জহির হোসেন)। "আমাদের লড়াই জাতীয় মুক্তির লড়াই, বর্তমানে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেই এটা সীমাবদ্ধ এবং বিদেশী পুঁজির এজেন্টদের বিরুদ্ধে পরিচালিত" ('আত্রাই', বাংলাদেশ, নভেম্বর '৭৪ ; অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ লড়াই করতে গিয়েও সামন্ত অবশেষকে প্রাধান্য দিতে তাঁরা নারাজ, তাই প্রধান লক্ষ্যস্থল করেছেন "বিদেশী পুঁজির এজেন্টদের")। "এসব নয়া-উপনিবেশে সাম্রাজ্যবাদই হচ্ছে নিয়ামক

শক্তি। সামন্তবাদী ব্যবস্থার ও তার ধারক সামন্তশ্রেণীরও প্রধান রক্ষক হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী শক্তি” (‘গণশক্তি’, বিশেষ সংখ্যা, ঢাকা, ১৯৭৪)। “রণক্ষেত্রে তার পরাজয়ের পর”—অর্থাৎ সম্ভবত ১৮৫৭ থেকে—সামন্তবাদ সর্বদাই একটি “অক্রিয়”, “সাম্রাজ্যবাদের প্রতি অধস্তন ও দাসত্বমূলক ভূমিকা পালন করেছে” (‘বাম ঐক্য স্থাপন সম্বন্ধে’: অজিতা নারায়ণন)। “সামন্তবাদ নির্ভরশীল দুর্বল শক্তি, না সাম্রাজ্যবাদ নির্ভরশীল দুর্বল শক্তি?” (‘পূর্বতরঙ্গ’, কলকাতা, ৫ মার্চ ’৭৪: রথীন ঘোষ; বস্তুত দুটোই দুটোর উপর নির্ভরশীল। অবশ্য সাম্রাজ্যবাদই সক্রিয় ও সবলতর, কিন্তু তার সঙ্গে প্রধান দ্বন্দ্ব নির্ধারণের কোনো সম্পর্ক নেই। তাহলে এঁরা সবাই জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য ঘোষণার জন্য সামন্তবাদের দুর্বলতাকে অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করেন কেন? কারণ দুর্বল ও গৌণ উপাদান সামন্ত অবশেষকে তাঁরা কিছুতেই প্রধান দ্বন্দ্বের উপযুক্ত বিষয় ব’লে কল্পনা করতে পারেন না। শেষের তিনটি উক্তি ও টমসনের পূর্বোদ্ধৃত বক্তব্যের সার কথা একই)।

আসলে জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকদের মতে সামন্ত অবশেষ যেহেতু আমাদের সমাজগুলিতে পরিমাণগতভাবে ইতিমধ্যেই অনেক অপ্রধান হয়ে গেছে তাই তার বিলোপসাধনকে প্রধান কর্তব্য ধ’রে বিপ্লবের রণনীতি ও রণকৌশল দাঁড় করানো কখনোই সম্ভব নয়। অথচ বন্ধুবান্ধব বা কমরেডরা মন্দ বলবে এই ভয়ে আমাদের সমাজগুলিকে তাঁরা সরাসরি ‘পুঁজিবাদী’ ব’লেও আখ্যায়িত করতে চান না। এই উভয়সঙ্কটে পড়লে একদিকে এই সমাজগুলির জন্য ‘আধা-সামন্তবাদী’ নামটা বজায় রেখে অন্যদিকে জাতীয় দ্বন্দ্বকে স্থায়ীভাবে প্রধান করা ছাড়া আর উপায় কি থাকে[৩১]? বস্তুত এই ধরনের গোঁজামিলের প্রাধান্য-ঘোষণাই আজ তাঁদের মুখে জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষণায় পর্যবসিত হয়েছে।

জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকরা যে আমাদের সমাজগুলির জন্য ‘আধা-সামন্তবাদী’ বর্গটি বজায় রেখে সামন্ত অবশেষের নিছক পরিমাণগত গৌণতার অজুহাতে সমাজবিকাশের একটি মূল বাধা ও বিপ্লবের একটি মূল লক্ষ্যবস্তু হিসাবে সামন্ত অবশেষের প্রাধান্য অস্বীকার করতে চান এবং এইভাবে ‘আধা-সামন্তবাদী’ চরিত্রায়ণের অন্তর্বস্তুটাকেই নাকচ ক’রে দিয়ে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ফিরে যান “পুঁজিবাদী” চরিত্রায়ণে, তা আরেক দিক দিয়েও ক্রমেই ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। যত

৩১ এটা লক্ষ্যণীয় যে আজকের জাতীয় দ্বন্দ্বের কোনো কোনো প্রাধান্য-ঘোষক (যেমন বাংলাদেশের শ্রদ্ধেয় জনাব আলাউদ্দীন আহম্মদ) নিছক পুঁজিবাদের পরিমাণগত প্রাধান্যের অজুহাতেই আলোচ্য সমাজগুলিকে “পুঁজিবাদী” বানিয়ে ছেড়ে’ছিলেন। আজ তাঁরা আবার ‘আধা-সামন্তবাদী’ চরিত্রায়ণে ফিরে এসেছেন, কিন্তু ফিরেছেন চোরের মতো, এই পশ্চাদপসরণের কোনো যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা না রেখেই।

দিন যাচ্ছে ততই তাঁরা আধা-সামন্তবাদী সমাজে চীনা পথের পরিবর্তে কার্যত রুশ পথের সর্বনাশা ওকালতির দিকে ঝুঁকছেন। নিছক পরিমাণগত গৌণতার অজুহাতে সমাজবিকাশের একটি মূল বাধা ও বিপ্লবের একটি মূল লক্ষ্যবস্তু হিসাবে সামন্ত অবশেষের প্রাধান্যকে অস্বীকার করার সঙ্গে আধা-সামন্তবাদী চরিত্রায়ণের অসঙ্গতি আমরা আমাদের বিশ্লেষণে দেখিয়েছি, কিন্তু চীনা পথ বা রুশ পথের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক?

বিষয়টা একটা মূর্ত দৃষ্টান্ত থেকে বোঝার চেষ্টা করা যাক।

বাংলাদেশে জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষক জনৈক আবদুল বারী ঢাকার 'সংস্কৃতি' পত্রিকার অগ্রহায়ণ (১৩৮১) সংখ্যায় 'বাংলাদেশের বিপ্লবে সংগ্রামের পদ্ধতি সম্পর্কে' নামক একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তাতে তিনি বাংলাদেশের সমাজকে "নয়া-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্তবাদী" বলেছেন (আর তাঁদের বলাটাই তো একটা প্রমাণ!)। কিন্তু তারপর চীন ও ভিয়েতনামের তুলনায় বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যাবলীর পার্থক্য, প্রতিক্রিয়াশীলদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের অনুপস্থিতি, পুঁজিবাদী অর্থনীতির অধিকতর বিকাশ, ইত্যাদি অসুবিধার অজুহাতে বাংলাদেশে চীনা পথের প্রযোজ্যতাকে তিনি ঠিক "সমাজ-তান্ত্রিক" বিপ্লবের ফেরিওয়ালাদের মতোই সরাসরি নাকচ ক'রে দিয়েছেন। আর সোভিয়েত বিপ্লবের পদ্ধতিকে তিনি কেবল নিষেধ করেছেন "হুবহু" প্রয়োগ করতে। কিন্তু কোনো দেশের সংগ্রামপদ্ধতিই যেহেতু অন্য দেশে হুবহু প্রযুক্ত হয় না তাই সহজেই বোঝা যায় যে এটা আসলে বাংলাদেশে রুশ পথের প্রযোজ্যতা প্রচার করারই একটা নববধূসুলভ টেকনিক।

আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্তবাদী চীন এবং ঔপনিবেশিক আধা-সামন্তবাদী ভিয়েতনাম উভয় সমাজেই বিপ্লবী সংগ্রাম যে চীনা পথ অনুসরণ করেছিল তা বারী সাহেব নিজেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু তার মানে আমাদের সমাজগুলির ঔপনিবেশিক (বা নয়া-ঔপনিবেশিক বনাম আধা-ঔপনিবেশিক চরিত্রায়ণ নিয়ে জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকদের সঙ্গে আমাদের যে মূল পার্থক্য তার সঙ্গে চীনা পথের প্রযোজ্যতা বনাম রুশ পথের প্রযোজ্যতার প্রশ্নটির কোনো সম্পর্ক নেই। সুতরাং এখান থেকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন যে কোনো ব্যক্তি যে প্রশ্ন উত্থাপন করার দিকে অনিবার্যভাবে চালিত হতেন তা হল: কোনো সমাজের চরিত্রবৈশিষ্ট্য যদি হয় একাধারে আধা-সামন্তবাদী অর্থনীতি এবং ঔপনিবেশিক বা আধা-ঔপনিবেশিক যেকোনো ধরনের সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য, তাহলে এই চরিত্রবৈশিষ্ট্যের সঙ্গে উক্ত সমাজে চীনা পথের প্রযোজ্যতার কোনো অনিবার্য সম্পর্ক যুক্তিগতভাবে প্রতিষ্ঠিত করা কি সম্ভব? বারী সাহেব কিন্তু ওদিকে মোটে পা-ই মাড়াননি: বাংলাদেশের সমাজের আলোচ্য চরিত্রবৈশিষ্ট্যটি তিনি মেনে নিয়েছেন বটে

কিন্তু বিনা কৈফিয়তে নাকচ ক'রে দিয়েছেন চীনা পথের প্রযোজ্যতা! পক্ষান্তরে ভারতীয় মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের একটি অংশ কিন্তু প্রশ্নটিকে এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই উত্থাপন করেছেন[৩২]। উপরন্তু তাঁরা দেখিয়েছেন যে আধা-ঔপনিবেশিক (বা ঔপনিবেশিক বা নয়া-ঔপনিবেশিক) ও আধা-সামন্তবাদী সমাজে সামন্ত অবশেষের প্রাধান্য স্বীকার ক'রে নিলে তা থেকে অপ্রতিরোধ্য যুক্তিতে প্রতিপন্ন হয় চীনা পথের প্রযোজ্যতা এবং বিপরীতক্রমে পুঁজিবাদী সমাজে প্রতিপন্ন হয় রুশ পথের প্রযোজ্যতা। কিন্তু আধা-সামন্তবাদী সমাজে সামন্ত অবশেষের কি ধরনের প্রাধান্যের কথা আদৌ বলা চলে এই সমস্যা সম্বন্ধে তাঁরা তখনও সচেতন ছিলেন না। কাজেই বর্তমান অধ্যায়ের বিশ্লেষণটির অবদান নিহিত রয়েছে এটা প্রমাণ করার মধ্যে যে আধা-সামন্তবাদী সমাজে সামন্ত অবশেষের পরিমাণগত প্রাধান্যের প্রশ্নটি একেবারেই অবান্তর এবং তার অন্য কোনো অর্থে প্রাধান্যই হল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এই তাত্ত্বিক অগ্রগতির তাৎপর্য দুটো দিক থেকে সুদূরপ্রসারী:

(১) এর ফলে আধা-সামন্তবাদী সমাজে চীনা পথের অনিবার্যতা এই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হল। সুতরাং এ সম্বন্ধেও নিঃসংশয় হওয়া গেল যে কোনো সমাজ যদি চীনা সমাজের মতো আধা-সামন্তবাদী হয় তাহলে দুটোর মধ্যে বারী সাহেব-বর্ণিত যত গৌণ পার্থক্যই থাক সেগুলো ঐ সমাজে বিপ্লবী সংগ্রামের সামগ্রিক কাঠামোটাতে নানা গৌণ ও রূপগত বৈশিষ্ট্য সংযোজন করবে কিন্তু মৌলিক-ভাবে চীনা পথের উদ্ভবকে কিছুতেই রোধ করতে পারবে না। ভারত ও বাংলা-দেশের মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা এসব সমাজে চীনা পথের প্রযোজ্যতাকে ধ'রে নিয়েই সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বিপ্লবী সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। নানা ভুলভ্রান্তির কারণে তাঁদের সে সংগ্রাম নিদারুণভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই আজ এসব সমাজে চীনা পথের প্রযোজ্যতার বিরুদ্ধেও প্রশ্ন উঠছে। তাই একদিকে আধা-সামন্তবাদ (ও সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য), অন্য-দিকে চীনা পথ—এই দুটোর মধ্যেকার অঙ্গাঙ্গীসম্পর্ক-বিষয়ক সিদ্ধান্তটির গুরুত্ব আজ এ উপমহাদেশে প্রশ্নাতীত। এ উপমহাদেশের দেশগুলি যদি আধা-ঔপ-

৩২ দ্রষ্টব্য: ১৯৭৩-৭৪ সালে তরুণ নন্দী (বর্তমান লেখক) কর্তৃক লিখিত ও সি পি আই (এম-এল)এর ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি কর্তৃক প্রচারিত 'ভারতে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন টিঁকে থাকতে পারে?—১, ২, ৩, ৪' এবং/অথবা ২২ আগষ্ট ১৯৭৫এ গৃহীত ও নভেম্বর ১৯৭৫এ 'কমিউনিষ্ট রিভিউ'তে প্রকাশিত সি পি আই (এম-এল)এর 'ঐক্য কমিটি'র রাজনৈতিক-সাংগঠনিক রিপোর্ট। বারী-সাহেবের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত সমগ্র যুক্তিধারাটি ওখান থেকেই নেওয়া। উৎসাহী পাঠক উক্ত দলিলদুটির যে কোনো একটি সংগ্রহ করলে দেখতে পাবেন যে তাতে ভারতীয় বিপ্লবের বহু মৌলিক ও দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত তাত্ত্বিক সমস্যা প্রথমবারের মতো উত্থাপন করা হয়েছে এবং সমাধানের একটা সিরিয়স প্রচেষ্টা অন্তত চালানো হয়েছে।

নিবেশিক (বা ঔপনিবেশিক বা নয়া-ঔপনিবেশিক) ও আধা-সামন্তবাদী হয়ে থাকে তবে এসব সমাজের কোনো "অসুবিধাজনক" বৈশিষ্ট্যের অজুহাতেই চীনা পথ তথা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের প্রস্তুতি পরিত্যাগ করা কমিউনিস্টের কাজ নয়। কমিউনিস্টের দায়িত্ব হল ঐসব প্রতিকূলতা **সত্ত্বেও** দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে **কিভাবে** টেঁকা যায় তার শর্তাবলী যেভাবে হোক আবিষ্কার করা।

২) চীন বিপ্লবের যে অন্তর্বস্তুটি সব আধা-ঔপনিবেশিক (বা ঔপনিবেশিক বা নয়া-ঔপনিবেশিক) ও আধা-সামন্তবাদী দেশের ক্ষেত্রেই সার্বজনীনভাবে প্রযোজ্য তাকে এই প্রথম চীনের একান্ত নিজস্ব ও স্থানীয় বৈশিষ্ট্যাবলী থেকে পৃথক করা সম্ভব হল। কেননা আধা-সামন্তবাদ এবং ঔপনিবেশিক বা আধা-ঔপনিবেশিক ধরনের সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য—প্রধানত এই দুটি বিষয় থেকে সংগ্রামপদ্ধতির যতখানি কাঠামো উপপাদন করা যাবে তা-ই হবে আলোচ্য প্রসঙ্গে 'চীনা পথ'এর সার্বজনীন অন্তর্বস্তু এবং 'চীনা পথ'এর সংজ্ঞা। 'চীনা পথ'এর নামে যে যার নিজের মনগড়া পথ অনুসরণ করার এবং চীন বিপ্লবের হুবহু যান্ত্রিক অনুকরণ করার যেসব বিচ্যুতি আমাদের সংগ্রামে ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতি ও তিক্ত পরাজয় ডেকে এনেছে, এই প্রথম সেগুলি থেকে মুক্তিলাভের তাত্ত্বিক শর্ত পূরণ হল। উদাহরণস্বরূপ, চীনা পথ ও রুশ পথের কোনো যথাযথ সংজ্ঞা এইভাবে নিরূপিত না হওয়ার কারণেই আমাদের মধ্যে যে ধারণাটা বহুলপ্রচলিত তা হল: চীনা পথ মানে যুদ্ধ আর রুশ পথ মানে অভ্যুত্থান। অথচ আসলে, যেমন যুদ্ধ ও অভ্যুত্থানের মধ্যে, ঠিক তেমনি চীনা পথ ও রুশ পথের মধ্যে কোনো অলঙ্ঘনীয় চীনা প্রাচীর নেই। রুশ পথের মধ্যেও দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ ও সামরিক তৎপরতা অন্তর্ভুক্ত, যদিও অবশ্য অভ্যুত্থানই তার প্রধান দিক; চীনা পথের মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত অভ্যুত্থান, যদিও দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ তথা সামরিক তৎপরতাই তার প্রধান দিক; আর সবচেয়ে বড় কথা, **উভয় পথেই** গণ-সংগ্রামের বাস্তবে-বিদ্যমান স্তরকে ধাপে ধাপে উন্নীত ক'রে **অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়েই** সশস্ত্র সংগ্রামের স্তরে নিয়ে যেতে হয়। এইসব সত্য না জানার ফল কিন্তু হয় বিষময়। "চীনা পথে অভ্যুত্থানের স্থান নেই"—এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়েই যেমন এই উপমহাদেশের মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা একদিন গণসংগ্রাম ও গণ-অভ্যুত্থানকে বর্জন ক'রে হঠকারিতার পথে পা বাড়িয়েছিলেন, আজ তেমনি গণ-সংগ্রাম ও গণ-অভ্যুত্থানকে জায়গা দেওয়ার জন্য সেই একই ধারণা থেকে আসছে আধা-ঔপনিবেশিক (বা ঔপনিবেশিক বা নয়া-ঔপনিবেশিক) ও আধা-সামন্তবাদী সমাজে রুশ পথের ওকালতি ও দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের পথ বর্জনের আত্মঘাতী দক্ষিণ সুবিধাবাদ। এই উভয় ধরনের বিচ্যুতির মূলোচ্ছেদে সাহায্য করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে বর্তমান অধ্যায়ের বিশ্লেষণের

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য।

বর্তমান অধ্যায়ের পুরো বিশ্লেষণটা যদিও গ'ড়ে উঠেছে সমাজচরিত্র বিচারের একটি অত্যন্ত সংকীর্ণ ক্ষেত্রকে উপলক্ষ্য ক'রে তবু তারই মধ্য দিয়ে সাধারণ-ভাবে গুণনির্ধারণের দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদী সমস্যা সমাধানে এক নতুন সম্ভাবনা ও পদ্ধতির উদ্ভব ঘটেছে।

যেখানেই গুণনির্ধারণের জন্য প্রাসঙ্গিক দুটি দ্বন্দ্বরত দিকের কোনোটারই পরিমাণীকরণ সম্ভব নয় এবং দুটি দিকের সমমেয়তার দাবীও মেটানো সম্ভব নয়, কিন্তু যে কোনো একটি দিকের বৃদ্ধি বা হ্রাস কিভাবে ঘটছে তা নির্ধারণ করা সম্ভব, সেখানেই বর্তমান অধ্যায়ের বিশ্লেষণ ও তা থেকে পাওয়া পদ্ধতিটি প্রযোজ্য হওয়া উচিত। উপরন্তু এমন কি সেখানে 'আধা-সামন্তবাদ' জাতীয় "তৃতীয় ধরনের" গুণের সম্ভাবনাও অনস্বীকার্য হয়ে ওঠে।

যেহেতু আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা হামেশাই গুণনির্ধারণের এমন সব সমস্যার সম্মুখীন হই যেখানে দ্বন্দ্বরত দিকদুটির পরিমাণীকরণ ও সমমেয়তার শর্ত পূর্ণ হয় না, তাই বর্তমান অধ্যায়ের বিশ্লেষণ ও তা থেকে পাওয়া পদ্ধতিটির মূল্য সম্বন্ধে অধিক মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। তবে যেখানে উক্ত দুটি শর্ত পূরণ হচ্ছে সেখানেও এর কোনো প্রাসঙ্গিকতা থাকবে কিনা, এবং থাকলেও তা কতখানি, সে সম্বন্ধে এখনই নিশ্চিতভাবে কিছু বলা কঠিন।

৫
সামাজিক দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে মাওয়ের শিক্ষা

প্রধান দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে মার্কসবাদীদের মধ্যে বর্তমানে-প্রচলিত তীক্ষ্ণ ধারণাটি সম্পূর্ণ মাওয়ের অবদান। জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকরা প্রধান দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে বক্তব্য রাখছেন অথচ আশ্চর্যের বিষয় হল, তাঁরা কেউই মাওয়ের প্রাসঙ্গিক তত্ত্বটির উল্লেখ করছেন না। তার পরিবর্তে যে যার ইচ্ছামতো নিজের নিজের জল্পনা-কল্পনা বিপ্লবী কর্মীদের সামনে এমনভাবে উপস্থিত করছেন যেন এ সম্বন্ধে তাঁদের কথাগুলিই প্রথম ও শেষ কথা, যেন মার্কসীয় তত্ত্বের ক্ষেত্রে বিষয়টি ইতিপূর্বে কখনও আলোচিতই হয়নি।

আমরা প্রশ্ন করতে চাই: প্রধান দ্বন্দ্বের ধারণাটি তাঁরা কার কাছ থেকে পেয়েছেন? মাওয়ের থেকেই নয় কি? তা যদি হয়ে থাকে তবে কোন রহস্যময় কারণে তাঁরা মাওয়ের তত্ত্বটি এড়িয়ে যাচ্ছেন? কেন তাঁরা সেটাকে তত্ত্বগত প্রারম্ভবিন্দু ধ'রে আলোচনা শুরু করছেন না?

অবশ্য মাও কোনো কথা বলেছেন ব'লেই যে সেটাকে সর্বকালে ও সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য গুরুবাক্যের মতো বিনা-বিশ্লেষণে মেনে নিতে হবে এমন গোঁড়ামি নিশ্চয়ই মার্কসবাদ-সম্মত নয়। কিন্তু এ সম্বন্ধে তাঁর কোনো সূত্রায়ণ কি ভুল বা বর্তমানে অচল হয়ে গেছে? আবার বলি, হলে তাতে আঁতকে ওঠারও কিছু নেই। কিন্তু সেক্ষেত্রে সৎ ব্যক্তিরা অর্থাৎ মার্কসবাদীরা কি করবেন? তাঁরা বলিষ্ঠভাবে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্তালিন বা মাওয়ের প্রাসঙ্গিক সূত্রায়ণটিকে সামনে রাখবেন, সুস্থির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্বারা তার অসম্পূর্ণতা বা অচলতা প্রমাণ করবেন, বাস্তব প্রয়োজন অনুযায়ী তাকে সংশোধন করবেন এবং এমন কি প্রয়োজনবোধে তাকে বর্জনও করবেন। এটাই মার্কসবাদের সৃজনশীল বিকাশ-সাধনের পদ্ধতি। মার্কস একটা বিশেষ ঐতিহাসিক অবস্থায় ইংলণ্ডে শান্তিপূর্ণ উত্তরণের সম্ভাবনা স্বীকার করেছিলেন; ভিন্নতর পরিস্থিতিতে লেনিন যখন তাকে অচল ব'লে ঘোষণা করেন তখন তিনি এই সৎ পদ্ধতিটিই গ্রহণ করে-ছিলেন। মার্কসের সূত্রায়ণটিকে কূটনৈতিকভাবে পাশ কাটিয়ে নিজের বক্তব্য তিনি গোপনে চাপিয়ে দিতে যাননি। তাহলে জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকরা মাওয়ের প্রাসঙ্গিক তত্ত্বটি থেকে এমন তাড়া-খাওয়া চোরের মতো পালিয়ে

বেড়াচ্ছেন কেন ? তবে কি নতুন অভিজ্ঞতার সারংকলনের মাধ্যমে মার্কসীয় বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটানোটা তাঁদের আসল লক্ষ্য নয় ? তবে কি তাঁদের আসল লক্ষ্য মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ার স্বার্থে মার্কসবাদকে নির্বীর্য করা অর্থাৎ "সংশোধন" করা[১] ? তাহলে কিন্তু বলতেই হবে যে সংশোধনবাদী বের্নস্তাইন এই ভদ্রলোক-দের চেয়ে অনেক বেশী সাহস দেখিয়েছিলেন।

বর্তমান পরিসরে আমরা প্রথমে মৌলিক দ্বন্দ্ব ও প্রধান দ্বন্দ্বের পার্থক্য বোঝার চেষ্টা করব এবং তারপর পশ্চাৎপদ দেশগুলিতে প্রধান দ্বন্দ্ব নির্ধারণ-সংক্রান্ত মাও-চিন্তাধারা থেকে সংগ্রহ করব কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।

১. মৌলিক দ্বন্দ্ব ও প্রধান দ্বন্দ্ব

মাও বলেছেন : "একটা জিনিসের বিকাশের প্রক্রিয়ায় মৌলিক দ্বন্দ্ব এবং এই মৌলিক দ্বন্দ্বের দ্বারা নির্ধারিত প্রক্রিয়াটির অন্তর্বস্তু প্রক্রিয়াটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্তর্হিত হবে না ; কিন্তু একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়ার প্রত্যেকটি পর্যায়ে অবস্থাগুলি সাধারণত ভিন্ন হয়" ('দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে')।

একই প্রক্রিয়া ও একই মৌলিক দ্বন্দ্ব বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তার মধ্যে আবার বিভিন্ন পর্যায়ের উদ্ভব ঘটে কেমন ক'রে ? তার কারণ হিসাবে মাও দেখিয়েছেন যে হয় মৌলিক দ্বন্দ্বের তীব্রতা আগের চেয়ে বেড়ে যায় কিংবা অন্যান্য ছোটো-বড় দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে নানা পরিবর্তন ঘটার ফলে মৌলিক দ্বন্দ্বের সক্রিয়তার পরিমণ্ডলটা যায় বদলে।

বিষয়টা চীনের ইতিহাস থেকে মূর্তভাবে বোঝার চেষ্টা করা যাক।

প্রাক-বিপ্লব চীনে মৌলিক দ্বন্দ্ব ছিল দুটি : (১) জাতীয় দ্বন্দ্ব এবং (২) সামন্ত দ্বন্দ্ব। চীন যতদিন আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্তবাদী ছিল ততদিন তার বিপ্লবের চরিত্র ছিল বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক এবং এই মৌলিক দ্বন্দ্বদুটি সমগ্র প্রক্রিয়া (অর্থাৎ বিপ্লবের সমগ্র স্তর) জুড়েই বজায় ছিল। কিন্তু এই সামগ্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যেও বিভিন্ন পর্যায় ছিল। সেগুলোর কয়েকটির উল্লেখ করছি :

(ক) ১৯২৪-২৭এর প্রথম বিপ্লবী গৃহযুদ্ধ। দুটি মৌলিক দ্বন্দ্বই বিদ্যমান, কিন্তু

১ [তুলনীয় : "…কেবলমাত্র সংশোধনবাদীরাই মার্কসবাদের মৌলিক মতামতগুলি থেকে তাদের বিচ্যুতির দ্বারা এবং তাদের পরিত্যক্ত মতামতগুলির সঙ্গে খোলাখুলি, স্পষ্টভাবে, দৃঢ়ভাবে ও পরিষ্কারভাবে 'হিসাব চুকানো'তে ব্যর্থতার দ্বারা নিজেদের জন্য এক দুঃখজনক খ্যাতি অর্জন করেছিল। নিষ্ঠাবান মার্কসবাদীদেরকে যখন মার্কসের কোনো অচল মতামতের বিরুদ্ধে বক্তব্য ঘোষণা করতে হয়েছে (দৃষ্টান্তস্বরূপ মেরিঙ্, যখন তিনি কিছু ঐতিহাসিক প্রতিজ্ঞার বিরোধিতা করলেন) তখন সর্বদাই তা করা হয়েছে এমন যাথার্থ্য ও সম্পূর্ণতা সহকারে যে কেউ কখনও এই ধরনের সাহিত্যিক উক্তিসমূহে দ্ব্যর্থবোধক কিছু খুঁজে পায়নি" ('মেটিরিয়ালিজম অ্যাণ্ড এম্পিরিও-ক্রিটিসিজম'এর প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধ : লেনিন, ১৯০৮)।]

মাও আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকেই প্রধান ব'লে চিহ্নিত করেছেন। যেহেতু মৌলিক দ্বন্দ্বদুটির মধ্যে কেবলমাত্র সামন্ত দ্বন্দ্বটাই আভ্যন্তরীণ চরিত্রের তাই আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে প্রধান বলা ('গৃহযুদ্ধ' কথাটির মধ্যেই যা অন্তর্নিহিত) মানে সামন্ত দ্বন্দ্বকেই প্রধান বলা। তাছাড়া মাও এ কথাও পরিষ্কারভাবেই বলেছেন যে জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান হওয়ার আগে পর্যন্ত সামন্ত দ্বন্দ্বটাই প্রধান থাকে। সুতরাং ১৯২৪-২৭এর পর্যায়ে মৌলিক দ্বন্দ্বদুটির মধ্যে সামন্ত দ্বন্দ্বই ছিল প্রধান স্থানে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে মৌলিক জাতীয় দ্বন্দ্বটি যেহেতু অন্তর্হিত হয়নি তাই গৃহযুদ্ধের লক্ষ্যবস্তু ছিল কেবল সামন্তশ্রেণী নয় বরং "সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তশ্রেণীগুলির মৈত্রী"। আবার প্রধান স্থানাধিকারী এই সামন্ত দ্বন্দ্বটিও তখন সমগ্র সামন্তশ্রেণীর সঙ্গে সমান তীব্র হয়ে ওঠেনি ; তা তীব্রতম ছিল সামন্তশ্রেণীর একটি অংশ, তথা প্রধানতম ও হিংস্রতম অংশ, যুদ্ধবাজদের সঙ্গে ; তাই এই গৃহযুদ্ধকে কৃষিবিপ্লবী গৃহযুদ্ধ বলা যায় না।

(খ) ১৯২৭-৩৭এর কৃষিবিপ্লবী গৃহযুদ্ধ। দুটি মৌলিক দ্বন্দ্বই বিদ্যমান। মাও বলেছেন যে এক মেরুতে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও দেশী প্রতিক্রিয়ার খোলাখুলি জোট আর অন্য মেরুতে ব্যাপক জনগণ এক্ষেত্রে প্রধান দ্বন্দ্বটিকে গ'ড়ে তুলেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ কথা সুবিদিত যে তখন চীনে সামন্ত দ্বন্দ্বটিই প্রধান ছিল— 'কৃষিবিপ্লবী গৃহযুদ্ধ' নামটির মধ্যেও তা সুপরিস্ফুট। কিন্তু প্রধান স্থানাধিকারী এই সামন্ত দ্বন্দ্বটি তখন তীব্র হয়ে উঠেছে সমগ্র সামন্তশ্রেণীর সঙ্গেই। অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তে ইতিপূর্বের বিপ্লবী ফ্রন্ট ভেঙে গেছে, বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্য থেকে উদ্ভুত মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া অংশটি দলত্যাগ করেছে ও রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে, তাই গৃহযুদ্ধের লক্ষ্যবস্তু কেবল "সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তশ্রেণীর মৈত্রী" নয়, বরং সাম্রাজ্যবাদ, মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও সামন্তশ্রেণীর মৈত্রী।

(গ) ১৯৩৭-৪৫এর জাপবিরোধী প্রতিরোধযুদ্ধ। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে চীনা জাতির দ্বন্দ্ব প্রধান তবে তা বিশেষভাবে তীব্র হয়ে উঠেছে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গেই। সামন্ত দ্বন্দ্ব নামক অন্য মৌলিক দ্বন্দ্বটি মৃদুতর হয়ে এলেও অন্তর্হিত হয়ে যায়নি ; তাই শ্রেণী হিসাবে সামন্তশ্রেণীর উচ্ছেদ বিপ্লবী কার্যক্রম থেকে বাদ গেলেও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে আঘাত একেবারে বাদ যায়নি। জাতীয় যুদ্ধের লক্ষ্যবস্তু হল সাম্রাজ্যবাদ এবং দেশের অভ্যন্তরের কিছু বিশ্বাসঘাতক, আর এদের আঘাত হানার জন্য সাময়িকভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে জাতির সবকটি শ্রেণী।

(ঘ) ১৯৪৫-৪৯এর তৃতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধ বা মুক্তিযুদ্ধ। "সামন্তবাদ ও একনায়কত্বের বিরুদ্ধে এবং স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের অভিমুখে সশস্ত্র চীনা জনগণের সংগ্রামে যুদ্ধের মৌলিক চরিত্র নিহিত রয়েছে" (মাও, ২৫ ডিসেম্বর ১৯৪৭ : জ্যাক বেলডেনের বইয়ে উদ্ধৃত)। গৃহযুদ্ধের অর্থ আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব প্রধান হওয়া এবং আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্তবাদী চীনে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব প্রধান হওয়ার

অর্থ সামন্ত দ্বন্দ্ব প্রধান হওয়া, কেননা মৌলিক দ্বন্দ্বদুটির মধ্যে সামন্ত দ্বন্দ্ব ছাড়া আর কোনো আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব নেই[২]। গৃহযুদ্ধের লক্ষ্যবস্তু আগের মতোই সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় প্রতিক্রিয়ার জোট; কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে প্রধান ভূমিকা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের। তাই গৃহযুদ্ধের প্রধান লক্ষ্যবস্তু "মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ও তাদের পদলেহী কুকুরেরা – আমলা পুঁজিপতি, জমিদার ও এই দুটি শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী কুওমিনতাং প্রতিক্রিয়াশীলেরা" ('জনগণের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসা সম্বন্ধে')।

"কিন্তু যা-ই ঘটুক, এতে আদৌ কোনো সন্দেহ নেই যে একটা প্রক্রিয়ার বিকাশের **প্রত্যেকটি পর্যায়ে** কেবল একটিই প্রধান দ্বন্দ্ব থাকে যা নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করে" এবং "যার অস্তিত্ব ও বিকাশ অন্য দ্বন্দ্বগুলির অস্তিত্ব ও বিকাশকে নির্ধারিত বা প্রভাবিত করে" ('দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে', বড় হরফ আমাদের)।

এতক্ষণের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে :

(ক) মৌলিক ও প্রধান দ্বন্দ্ব যে আবশ্যিকভাবেই এক তা নয়, কেননা মৌলিক দ্বন্দ্ব একাধিক হতেও পারে কিন্তু প্রতিটি বিশেষ সময়ে প্রধান দ্বন্দ্ব থাকে একটাই।

(খ) একটি বিশেষ প্রক্রিয়া যতদিন বলবৎ থাকে সেই সমগ্র সময়কালটি জুড়ে মৌলিক দ্বন্দ্বগুলি অপরিবর্তিত থাকে। প্রধান দ্বন্দ্ব অবস্থাভেদে স্থান পরিবর্তন করে[৩] কিন্তু চীনের দৃষ্টান্ত থেকে আমরা দেখি যে আমাদের মতো সমাজে সর্বদা মৌলিক দ্বন্দ্বগুলিরই কোনো একটা প্রধান দ্বন্দ্বে পরিণত হয় – মৌলিক দ্বন্দ্বগুলির বাইরের কোনো দ্বন্দ্ব কখনও প্রধান হয় না[৪]।

(গ) মৌলিক দ্বন্দ্ব একটি সমগ্র প্রক্রিয়াকে নির্ধারণ করে, তার সম্পর্ক সমগ্র প্রক্রিয়াটির সঙ্গে। সমাজবিপ্লবের ক্ষেত্রে এর অর্থ হল, মৌলিক দ্বন্দ্বের দ্বারা নির্ধারিত হয় বিপ্লবের স্তর অর্থাৎ রণনীতি। পক্ষান্তরে প্রধান দ্বন্দ্বের সম্পর্ক একই প্রক্রিয়ার একটি বিশেষ পর্যায়ের সঙ্গে। অবশ্য দুটি ভিন্ন পর্যায়েও প্রধান দ্বন্দ্ব অভিন্ন হতে হতে পারে কিন্তু তখন তার তীব্রতা ও ব্যাপকতার পরিধি এবং

২ [এখানে অবশ্য ধ'রে নেওয়া হচ্ছে যে মৌলিক দ্বন্দ্বদুটিরই মধ্য থেকে যে কোনো একটিকে প্রধান হতে হবে। মাওয়ের 'দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে' লেখাটির যে এটাই একমাত্র গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা সে সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়ার জন্য এই অধ্যায়ের তৃতীয় উপ-পরিচ্ছেদটিই যথেষ্ট ব'লে আমি আশা করি।]

৩ জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকদের মধ্যে অতি উৎসাহী এমনও কেউ কেউ আছেন যাঁরা জাতীয় দ্বন্দ্বকে স্থায়ীভাবে প্রধান করার উদ্দেশ্যে এই সত্যকেও অস্বীকার করেন। তাঁদের মতে চীনে নাকি নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সারা সময়টা জুড়ে জাতীয় দ্বন্দ্বই প্রধান ছিল! এটা তাঁদের সততার আরেকটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। উদাহরণস্বরূপ ২৫ নভেম্বর ও ১০ ডিসেম্বর ১৯৭৪এর 'পূর্বতরঙ্গে' কিশলয় মিত্রের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৪ ২নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

তার সক্রিয়তার পরিবেশে তফাৎ ঘটে। সমাজবিপ্লবের ক্ষেত্রে এর অর্থ হল, প্রধান দ্বন্দ্ব নির্ধারণ করে বিপ্লবের রণকৌশল।

(ঘ) আঘাতের লক্ষ্যবস্তু ও প্রধান দ্বন্দ্ব এক নয়। 'সামন্ত দ্বন্দ্ব প্রধান' মানে এই নয় যে আঘাতের লক্ষ্যবস্তু কেবল সামন্তশ্রেণী। আঘাতের লক্ষ্যবস্তু স্থায়ীভাবে নির্ধারিত হয়ে যায় মৌলিক দ্বন্দ্বের দ্বারা—চীনে তা ছিল তিন পাহাড় (সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও আমলা-মুৎসুদ্দি পুঁজিবাদ) আর আমাদের আলোচ্য দেশগুলিতে যে চতুর্থ পাহাড়টি বর্তমানে যোগ হয়েছে তা হল সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ। এই পাহাড়গুলিকে খুঁড়ে ফেলার জন্য একটা বিশেষ অবস্থায় কোন দিক থেকে আঘাত শুরু করলে স্বল্পতম সময়ে ব্যাপকতম জনশক্তিকে জাগ্রত ও জমায়েত করা যাবে, কোন স্লোগান এনে দেবে দ্রুততম সাফল্য ও প্রচণ্ডতম গতিবেগ — এই রণকৌশলগত সমস্যাটিরই সমাধান করে প্রধান দ্বন্দ্ব[৫]।

এইবার যে কেউ বুঝতে পারবেন যে জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকরা তাঁদের যুগান্তকারী তত্ত্বটিকে দাঁড় করাতে পেরেছেন কেবলমাত্র মৌলিক দ্বন্দ্ব ও প্রধান দ্বন্দ্বের পার্থক্যকে অম্লানবদনে গুলিয়ে ফেলার ফলেই[৬]। কেননা তাঁরা যে যুক্তিতে তাঁদের কর্মীদের 'বুঝ' দেন সেটা অনেকটা এই রকম : "নিঃসন্দেহে আমাদের কাজের প্রথম পর্যায়ে প্রধান আঘাত হানতে হবে আভ্যন্তরীণ শত্রুকেই, বিশেষত সামন্তশ্রেণীকে। কিন্তু এসবই জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের সামগ্রিক প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। অতএব আমরা অবশ্যই সামন্তবাদবিরোধী লড়াই বাদ দিচ্ছি না, কিন্তু প্রধান দ্বন্দ্বটা থাকছে জাতীয় দ্বন্দ্বই।" আত্মবিশ্বাসে অনুরণিত তাঁদের এই ধরনের যুক্তির একটি দৃষ্টান্ত দেখুন :"…জাতীয়-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান শক্তি

৫ যে কোনো পার্থক্যের মতোই রণনীতি ও রণকৌশলের এই পার্থক্যও আপেক্ষিক ও অস্থায়ী উপবস্তু শেষ বিচারে রণনীতি ও রণকৌশল অবিচ্ছেদ্য। এই সম্পর্কের মধ্যে যদিও রণনীতিই হচ্ছে প্রধান দিক তবু রণকৌশল ভ্রান্ত হলে তা সঠিক রণনীতিকেও নাকচ ক'রে দিতে চায় এবং তখন ভ্রান্ত রণকৌশলের পরিবর্তনসাধনই প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। বিশেষ ক'রে প্রধান দ্বন্দ্বের মতো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রণকৌশলগত প্রশ্নে এ সত্যকে উপলব্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। তাছাড়া 'সামন্ত দ্বন্দ্ব প্রধান না জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান' এই প্রশ্নটি রণকৌশলগত প্রশ্ন হলেও তার মধ্যেই নিহিত রয়েছে শ্রেণীসংগ্রাম পরিত্যাগ ক'রে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের, এমন কি মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ার, লেজুড় হয়ে পড়ার বিপদ—অর্থাৎ কেবল রণনীতিগত স্খলন নয় সামগ্রিক মতাদর্শগত স্খলনেরও বিপদ। প্রধান দ্বন্দ্বের প্রশ্নটিকে "নিছক রণকৌশলগত প্রশ্ন" ব'লে অবজ্ঞা করার বিরুদ্ধে এটাকে কঠোরতম হুঁশিয়ারি হিসাবেই প্রত্যেকের নেওয়া উচিত।

৬ এর জন্য তাঁরা যে কত অসৎ পন্থা নিতে পারেন তার একটি প্রমাণ দেখুন। মাও বলেছেন যে একটা প্রক্রিয়ার বিকাশের "প্রত্যেকটি পর্যায়ে" কেবল একটিই প্রধান দ্বন্দ্ব থাকে। ১০ ডিসেম্বর ১৯৭৪এর 'পূর্বতরঙ্গে' প্রকাশিত কিশলয় মিত্র মাওয়ের উক্তিটি উদ্ধৃত করার সময় "প্রত্যেকটি পযায়ে" কথাগুলির জায়গায় "সমস্ত স্তর জুড়ে" কথাগুলি বসিয়ে দিয়েছেন এবং এই ধরনের হাতসাফাই দিয়েই নিজের দুরূহ বক্তব্য "প্রতিষ্ঠিত" করতে চেয়েছেন।

হল কৃষকশ্রেণী। কৃষকদের এই বিপ্লবী লড়াইয়ের প্রধান লক্ষ্য বিদেশী শক্তি ও তার তাঁবেদার সরকার। জোতদার-মহাজনশ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রেণীসংগ্রামের মধ্য দিয়েই এই লড়াইয়ের বিকাশ ঘটবে। এটা গৃহযুদ্ধ এই অর্থে যে এখন পর্যন্ত আভ্যন্তরীণ শক্তিকেই (মুৎসুদ্দি ও সামন্তশ্রেণী) এই লড়াই আঘাত হানছে।··· তাই এ যাবৎ আমরা যে লড়াই করেছি তাকে জাতীয় মুক্তির লড়াই বলব" ('আমার কথা' : আলাউদ্দীন আহম্মদ)। কিন্তু এর দ্বারা তাঁরা যে আসলে জাতীয় দ্বন্দ্বকেই প্রধান করতে চান তার প্রমাণ : "আজ মৌলিক দ্বন্দ্বগুলির মধ্যে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের সঙ্গে সমগ্র জাতির দ্বন্দ্বই প্রধান হয়েছে" (আলাউদ্দীন সাহেবদের তৎকালীন পার্টি-পত্রিকা 'আত্রাই', নভেম্বর '৭৪)। প্রথমে "কৃষকদের এই বিপ্লবী লড়াইয়ের" প্রধান লক্ষ্য করা হল বিদেশী শক্তিকে, আর আভ্যন্তরীণ উপাদানসমূহের মধ্যে কেবলমাত্র তাঁবেদার সরকারটিকে। তারপর বলা হল যে "এখন পর্যন্ত" এই লড়াই "আভ্যন্তরীণ শক্তিকেই" আঘাত হানছে এবং তাই তা "গৃহযুদ্ধ"। অথচ সেটা এমনই "গৃহযুদ্ধ" যাতে জাতীয় দ্বন্দ্বটাই থাকে প্রাধান্যে ! এই ধরনের 'আমার কথা' পয়সা খরচ ক'রে ছাপানোর মতো লোক এই আক্রার বাজারেও খুঁজে পাওয়া যায় কোত্থেকে ?

বলা বাহুল্য, বাংলাদেশের "সাম্যবাদী" নেতারাও এই জাতীয় স্তোকবাক্য দিয়েই তাঁদের কর্মীসাধারণকে ভুলিয়ে রেখেছেন। কিন্তু প্রধান দ্বন্দ্বের ধারণার সঙ্গে সমগ্র প্রক্রিয়ার সম্পর্ক নেই, তার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে প্রক্রিয়াটির একটা বিশেষ পর্যায়ের। সমগ্র প্রক্রিয়ার সঙ্গে যার সম্পর্ক তা হল মৌলিক দ্বন্দ্ব। কাজেই জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের সামগ্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যেও প্রথম বা অন্য যে কোনো পর্যায়ে যদি প্রধান লক্ষ্যস্থল হয় সামন্তশ্রেণী তবে বলতেই হবে যে ঐ পর্যায়টির জন্য সামন্ত দ্বন্দ্বই প্রধান, আর তা না হলে খোলাখুলি ঘোষণা করতে হবে যে-মাওয়ের প্রাসঙ্গিক তত্ত্বটি ভ্রান্ত। অতটা বলতে আজও তাঁরা সাহস পাননি। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কূটনীতি আমদানী ক'রে অতি চালাকের মতো পাশ কাটিয়ে যাওয়ার অপচেষ্টা বেশীদিন চলবে না। হয় তাঁদের বিষাক্ত লাইন-টিকে সরাসরি পরিত্যাগ করতে হবে নতুবা মাও চিন্তাধারার বিরোধিতা করার দড়ি তাঁদের গলায় পড়বেই। এটা একটা অবজেকটিভ নিয়ম।

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সাহিত্যে আমাদের মতো পশ্চাৎপদ দেশগুলির সম্বন্ধে আলোচনা ও সূত্রায়ণে সর্বদাই সাম্রাজ্যবাদের উপর—অর্থাৎ জাতীয় দিকটির উপর—বেশী জোর পড়ে। তার প্রকৃত কারণগুলি অনুসন্ধান না ক'রে জাতীয় দ্বন্দ্বের সুপণ্ডিত প্রাধান্য-ঘোষকরা তা থেকে সরাসরি বড় সহজেই সিদ্ধান্ত ক'রে বসেন : "অতএব জাতীয় দ্বন্দ্বই তো প্রধান।"

এই প্রসঙ্গে চারটি বিষয় বিবেচনার দাবী রাখে।

এক ‖ চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নবম কংগ্রেসের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে

"…বর্তমান দুনিয়ায় চারটি বড় বড় দ্বন্দ্ব রয়েছে: সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে নিপীড়িত জাতির দ্বন্দ্ব; পুঁজিবাদী ও সংশোধনবাদী দেশের ভিতরে সর্বহারাশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব; সাম্রাজ্যবাদী দেশ ও সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী দেশ এবং বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব; সাম্রাজ্যবাদী ও সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী দেশের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক দেশের দ্বন্দ্ব।" এখানে কি নিপীড়িত জাতিগুলির ক্ষেত্রে সামন্তবাদ বা অন্য কিছুর সঙ্গে দ্বন্দ্বের উল্লেখ আছে? না; সাম্রাজ্যবাদ ছাড়া অন্য কিছুর সঙ্গে কোনো দ্বন্দ্বের উল্লেখ নেই। অতএব প্রত্যেকটি নিপীড়িত জাতির ক্ষেত্রে কি জাতীয় দ্বন্দ্বটাই প্রধান হয়ে দাঁড়াচ্ছে না[৭]?

কিন্তু তা আসলে ঠিক নয়। কারণ এখানে বিশ্ব-রণনীতি নির্ধারণ করা হচ্ছে। বিশ্বপরিসরে আজ সাম্রাজ্যবাদই বিশ্বের সকল জনগণের অভিন্ন প্রধান শত্রু। তাই বিশ্ব-রণনীতি নির্ধারণ করার সময় কেবল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ক্রিয়মান প্রধান দ্বন্দ্বগুলিরই হিসাব নেওয়া হয়, যেসব দ্বন্দ্ব বিশ্ব-পরিসরে সাম্রাজ্যবাদকে প্রত্যক্ষভাবে দুবল করছে শুধু তাদেরই রাখা হয় হিসাবের মধ্যে।

পুঁজিবাদী ও সংশোধনবাদী দেশগুলির আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব বিশ্ব-রণনীতিতে স্থান পেয়েছে, কেননা তা বিদ্যমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে আরো দুর্বল করছে—যে পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ ও আন্তর্জাতিক রূপ হল সাম্রাজ্যবাদ। তাই কেবলমাত্র এক্ষেত্রেই একটি সমাজেব প্রধান দ্বন্দ্ব বিশ্ব-রণনীতির একটি বড দ্বন্দ্বের সঙ্গে মিলে যায়। অন্য কোনো ক্ষেত্রেই তা হয় না। কেননা দুনিয়ায় বিভিন্ন ধরনের সমাজব্যবস্থাসম্পন্ন দেশ রয়েছে; প্রত্যেকটি দেশ বিশ্বব্যাপী এই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লডাইযে তার অবদান রাখবে তার নিজের সমাজব্যবস্থা অনুযায়ী বিপ্লব সাধন ক'রে এবং কোনো বিশেষ পর্যায়ে এই প্রয়োজনই নির্ধারণ করবে সেই সমাজের প্রধান দ্বন্দ্ব। অর্থাৎ বিশ্ব-রণনীতির চারটি বড় দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে একটি দেশের অবস্থান আব কোনো বিশেষ পর্যায়ে সেই সমাজের প্রধান দ্বন্দ্ব—এ দুটি স্বতন্ত্র জিনিস, প্রথমটি থেকে দ্বিতীয়টি উপপাদন করা যায় না।

উদাহরণস্বরূপ চীন একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ। সুতরাং বিশ্ব-রণনীতির দিকে থেকে তা রয়েছে "সাম্রাজ্যবাদী ও সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী দেশের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক দেশের" দ্বন্দ্বটির আওতায়। কিন্তু চীনা সমাজের প্রধান দ্বন্দ্বও কি তাই? না। তার প্রধান দ্বন্দ্ব হচ্ছে রাষ্ট্রক্ষমতা ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদকৃত বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে রাষ্ট্রক্ষমতাসীন শ্রমিকশ্রেণীর দ্বন্দ্ব।

৭ ঠিক এই ছেলেমানুষী যুক্তিটাই রয়েছে ১০ ডিসেম্বর ১৯৭৪এর 'পূর্বতরঙ্গে' প্রকাশিত কিশলয় মিত্রের প্রবন্ধটিতে।

অনুরূপভাবে বিশ্ব-রণনীতির দিক থেকে যে কোনো নিপীড়িত জাতিই রয়েছে "সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে নিপীড়িত জাতির" দ্বন্দ্বটির আওতায়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে কোনো বিশেষ পর্যায়ে সেই নিপীড়িত জাতির সমাজটির প্রধান দ্বন্দ্বও হবে আবশ্যিকভাবে তা-ই। কেবলমাত্র একটা বিশেষ পরিস্থিতিতেই তা হতে পারে, কিন্তু তা আমরা পরে আলোচনা করব।

এই কারণেই চীনে যখন নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব চলছিল তখন তা সাম্রাজ্য-বাদের সঙ্গে নিপীড়িত জাতির বিশ্ব-দ্বন্দ্বটির আওতাতেই ছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও সে বিপ্লবের অধিকাংশ সময় জুড়েই সামন্ত দ্বন্দ্ব ছিল চীনা সমাজের প্রধান দ্বন্দ্ব।

আবার কোনো একটি নিপীড়িত জাতি যদি পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা-বিশিষ্ট হয় তবে যে বিশেষ পরিস্থিতিতে জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান হয় তা বিরাজ না করলে সেই সমাজে বুর্জোয়া-সর্বহারা দ্বন্দ্বটিই প্রধান দ্বন্দ্ব থাকবে।

দুই ॥ আমাদের মতো পশ্চাৎপদ দেশগুলির জনগণের সংগ্রামকে সর্বত্রই "জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম" ব'লে অভিহিত করা হচ্ছে। এর দ্বারা কি আসলে জাতীয় দ্বন্দ্বকেই প্রধান করার ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে না?

কিন্তু তা-ও ঠিক নয়। বিশ্ব-রণনীতির দিক থেকে কি কারণে আমাদের সংগ্রাম "জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম" হতে পারে এবং তবু জাতীয় দ্বন্দ্ব কি কারণে সমাজের প্রধান দ্বন্দ্ব না হতে পারে তা আমরা উপরে উল্লেখ করেছি। কিন্তু বিষয়টির আরো একটি দিক রয়েছে।

ঔপনিবেশিক ও নির্ভরশীল দেশগুলির বুর্জোয়া-সংস্কারবাদী আন্দোলন ও বিপ্লবী গণ-আন্দোলনের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য কমিণ্টার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেস (১৯২০) সিদ্ধান্ত নেয় যে বিপ্লবী গণ-আন্দোলনগুলিকে তখন থেকে ঢালাওভাবে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক আন্দোলন না ব'লে "জাতীয়-বিপ্লবী আন্দোলন" নামে আখ্যায়িত করা হবে। কিন্তু এর সঙ্গে একটা বিশেষ পর্যায়ে উক্ত সমাজগুলির প্রধান দ্বন্দ্বের কি সম্পর্ক? উপরোক্ত পরিভাষা অনুযায়ী প্রাক-বিপ্লবী চীনের সমগ্র বিপ্লবী গণসংগ্রামটাই ছিল "জাতীয়-বিপ্লবী আন্দোলন"। যেহেতু 'জাতীয়' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছিল তাই তার মানে কি এই যে চীনের নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সারা সময়টা জুড়ে জাতীয় দ্বন্দ্বই ছিল প্রধান? না, বরং উল্টো। সেই বিপ্লবের অধিকাংশ সময় জুড়ে যে দ্বন্দ্ব প্রধান ছিল তা হল সামন্ত দ্বন্দ্ব।

আরো একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। ১৯২৫ সালে প্রাচ্যের শ্রমজীবী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিকট ভাষণে ভারত, চীন, প্রভৃতি ঔপনিবেশিক ও নির্ভর-শীল দেশগুলির আন্দোলনকে স্তালিন "জাতীয় মুক্তি আন্দোলন" ব'লে অভিহিত করেছিলেন, কিন্তু তার মানেও এই নয় যে চীনা সমাজে জাতীয় দ্বন্দ্বটাই ছিল আবশ্যিকভাবে প্রধান। বরং উল্টো। আমরা জানি যে সেই ১৯২৫ সালেই প্রথম বিপ্লবী গৃহযুদ্ধ চলছিল এবং তখন সামন্ত দ্বন্দ্বটাই ছিল চীনা সমাজের প্রধান দ্বন্দ্ব।

অতএব আজও আমাদের দেশগুলির আন্দোলনের সাধারণ নাম "জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলন" বা "জাতীয় মুক্তি আন্দোলন" কিংবা "জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম"। বিশ্ব-রণনীতির দিক থেকে এই নামগুলি যুক্তিসঙ্গত এবং তাছাড়াও মার্কসীয় সাহিত্যের প্রচলিত পরিভাষা দ্বারা সেগুলি নির্ধারিত। কিন্তু তার সঙ্গে কোনো এক বিশেষ পর্যায়ে আমাদের সমাজের প্রধান দ্বন্দ্ব নির্ধারণের কোনো সম্পর্ক নেই। পরিভাষার 'জাতীয়' কথাটির দ্বারা প্রধান দ্বন্দ্ব নির্ধারিত হয় না, হয় অন্য কিছুর দ্বারা।

এমন কি যে বিপ্লবী ফ্রন্ট আমরা গ'ড়ে তুলব তারও নাম হতে পারে 'জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট' বা 'জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট'—কিন্তু তারও অর্থ এই হবে না যে জাতীয় দ্বন্দ্বই আবশ্যিকভাবে প্রধান হয়ে গেছে। ১৯২৪-২৭ সালে চীনে যে ফ্রন্ট গ'ড়ে উঠেছিল 'দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে' লেখাতে মাও তার উল্লেখ করেছেন "প্রথম জাতীয় যুক্তফ্রন্ট" ব'লে। কিন্তু সেই লেখাতেই তিনি সেই একই সময়ের প্রধান দ্বন্দ্ব নির্দেশ করেছেন সামন্তবাদের সঙ্গেই।

তিন ॥ সাম্রাজ্যবাদের উপর সর্বত্র এই ধরনের জোর পড়ার আরেকটি কারণ হচ্ছে এই যে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের পরস্পর-নির্ভরশীলতার সম্পর্কটিতে স্বভাবতই সেকেলে সামন্তবাদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত আধুনিক সাম্রাজ্যবাদই থাকে নেতৃস্থানীয়, প্রধান, শক্তিশালী ও সক্রিয় ভূমিকায়। জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকদের কেউ কেউ মনে করেন এটা বুঝি তাঁদের আজগুবি তত্ত্বের সপক্ষে একটা জোরালো যুক্তি[৮]। কিন্তু তাঁরা হয়তো শুনে অবাক হবেন যে এটা মেনে নিতে আমাদেরও কোনো আপত্তি নেই।

কেননা এমন কোনো সময়ই কেউ কখনও দেখাতে পারবে না যখন সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের পরস্পর-নির্ভরশীলতার সম্পর্কটিতে সাম্রাজ্যবাদ এই ভূমিকায় ছিল না। সামন্তবাদের তুলনায় সাম্রাজ্যবাদ সর্বদাই সাধারণভাবে নেতৃস্থানীয়, প্রধান, শক্তিশালী ও সক্রিয় ভূমিকায় থাকে কিন্তু তার ফলেই যে জাতীয় দ্বন্দ্বকে প্রধান হয়ে যেতে হবে এমন ভাবাটা একটা ডাহা মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ, সামন্তবাদ প্রভৃতির মধ্যে কোনটা অপেক্ষাকৃত সক্রিয় বা "প্রধান" উপাদান তা আদৌ প্রধান দ্বন্দ্ব নির্ধারণের কোনো প্রধান সমস্যা নয়। সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের (আরো সম্পূর্ণ ক'রে বলতে গেলে চার পাহাড়ের) পরস্পর-নির্ভরশীলতার সম্পর্কটিকে এই মুহূর্তে কোন দিক থেকে আক্রমণ করাটা ফলপ্রদ হবে—এই রণকৌশলগত সমস্যাটির সমাধান করাই হল প্রধান দ্বন্দ্ব নির্ধারণের মূল কথা। আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্তবাদী সমাজে সামন্তবাদ

৮ ২৫ নভেম্বর ও ১০ ডিসেম্বর ১৯৭৪এর 'পূর্বতরঙ্গে' ঠিক এই যুক্তিটাকেই কিশলয় মিত্র সবিস্তারে ফেনিয়েছেন।

যদি পুঁজিবাদের চেয়ে পরিমাণগতভাবে গৌণও হয়ে গিয়ে থাকে তবু [তার "কার্যকরী শক্তি"এখনও এক অর্থে প্রধান এবং] সমাজের একটি গুরুত্বহীন কোণে আবদ্ধ হয়ে থাকার পরিবর্তে তা এই গৌণ রূপেই সারা সমাজদেহে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে, সমাজবিকাশের প্রতিবন্ধকতা করছে, ও সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের জনসংখ্যার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কৃষক-জনগণের অগ্রগতির সামনে তাৎক্ষণিক বাধা হিসাবে আজও টিঁকে রয়েছে। তাই একটিমাত্র বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া অন্য সব অবস্থায় সাধারণভাবে সামন্ত অবশেষের বিলোপসাধনই হবে প্রধান দ্বন্দ্ব নির্ধারণের রণকৌশলগত সমস্যাটির সঠিক সমাধান। একশো পাঁচ ডিগ্রী থেকে জ্বর যখন নিরানব্বই ডিগ্রীতেও নেমে আসে তখনও তা সারা মানবদেহেই পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে এবং তার পূর্ণ বিলোপ যদি নিশ্চিত না হয় তবে তার আরোগ্যসাধনই থাকে চিকিৎসকের "প্রধান দ্বন্দ্ব"।

সাম্রাজ্যবাদ সক্রিয় উপাদান হলেও যে সামন্ত দ্বন্দ্ব প্রধান হতে পারে তাব কয়েকটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক।

'চীনে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন টিঁকে থাকতে পারে?' লেখায় মাও বলছেন যে যুদ্ধবাজদের দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামকেই প্রতিফলিত করে। অতএব শ্বেতশাসনের মধ্যেকার যুদ্ধবিগ্রহের সমগ্র ঘটনাটিতে নেতৃস্থানীয, প্রধান ও সক্রিয় ভূমিকায় কে রয়েছে? সাম্রাজ্যবাদ। কিন্তু ঐ একই সময়ে অর্থাৎ ১৯২৮ সালে প্রধান দ্বন্দ্ব কি ছিল? অবাক হবেন না, চীনে তখন সামন্ত দ্বন্দ্বটাই ছিল প্রধান। কেন? কারণ বিশ্ব-রণনীতির দিক থেকে সাম্রাজ্যবাদ সারা বিশ্বের পক্ষে একটি আভ্যন্তরীণ বিষয় হলেও, এবং সেই কারণেই তা প্রধান দ্বন্দ্ব হতে পারলেও, চীনের মতো একটি দেশের বেলায় তা বাহ্যিক কারণ, যা বাহ্যিক থাকা অবস্থাতে কখনও প্রধান হতে পারে না এবং যা কার্যকরী হতে পারে কেবলমাত্র আভ্যন্তরীণ কারণের মাধ্যমেই। তাই 'যুদ্ধ ও রণনীতির সমস্যা'য় শ্বেতশাসনের মধ্যেকার যুদ্ধবিগ্রহ সম্বন্ধে তিনি বলছেন যে তা সম্ভব হচ্ছে "দেশটির সামন্তবাদী ভাগাভাগির কারণে"ই।

আবার 'একটি স্ফুলিঙ্গ' লেখাতে তিনি বলছেন: "সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে চীনকে কেড়ে নেওয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা যখনই তীব্রতর হয়ে ওঠে তখনই সাম্রাজ্যবাদ ও সমগ্র চীনের দ্বন্দ্ব, সাম্রাজ্যবাদীদের পরস্পরের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব চীনের মাটিতে একই সঙ্গে বিকাশলাভ করে", এবং তারই ফলে চীনের বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব (সামন্ত দ্বন্দ্ব সহ) তীব্র হয়ে ওঠে ব'লে তিনি বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছেন। কে এখানে নেতৃস্থানীয়, প্রধান, শক্তিশালী ও সক্রিয় ভূমিকায়? সাম্রাজ্যবাদ। কিন্তু ঐ একই সময়ে, অর্থাৎ ১৯৩০ সালে, কোন দ্বন্দ্ব প্রধান ছিল?... নাঃ, আপনাদের ভাগ্যটা সত্যিই খারাপ, জাতীয় দ্বন্দ্বের শ্রদ্ধেয় উকিলবৃন্দ! বাস্তব তথ্যগুলো সবই যেন জেদ ধ'রে আপনাদের পেছনে লেগেছে, তাই না?

তাঁদের ল্যাজে-গোবরে অবস্থাটা ভালো ক'রে উপলব্ধি করার জন্য তাঁদের কয়েকটি সুচিন্তিত উক্তির দিকে তাকিয়ে দেখুন।

বাংলাদেশের "সাম্যবাদী" নেতারা নিশ্চিন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তাঁদের লাইনের সমর্থনে বলছেন: "এসব নয়া-উপনিবেশে সাম্রাজ্যবাদই হচ্ছে নিয়ামক শক্তি।" জাতিসংঘে চীনা প্রতিনিধির ভাষণ অনুযায়ী "সাম্রাজ্যবাদই হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলির মুক্তি ও বিকাশের পথে সবচেয়ে বড় বাধা।" "বলা বাহুল্য উপরের দুই শক্তির" (অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের) "মধ্যে বর্তমানে যে শক্তিটি সবচেয়ে বড় বাধা হবে তার সাথেই হবে বর্তমানে সর্বপ্রধান (প্রিন্সিপাল) দ্বন্দ্ব⋯" 'গণশক্তি,' বিশেষ সংখ্যা, ১৯৭৪)। চীনা প্রতিনিধি বলেছেন সাম্রাজ্যবাদই সবচেয়ে বড় বাধা, অতএব তার সঙ্গেই তো প্রধান দ্বন্দ্ব। কি চমৎকার সমাধান, প্রধান দ্বন্দ্ব নির্ধারণের কি প্রাঞ্জল পদ্ধতি। যে পাঠক ক্ষণপূর্বের আলোচনাটি একটু মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন তিনি হাসি সামলাতে পারছেন তো?

আমরা আগেই দেখিয়েছি যে সাম্রাজ্যবাদ দেশীয় পুঁজিবাদের বিকাশকে পঙ্গু ক'রে রেখেছে ব'লেই সামন্ত অবশেষগুলি টিঁকে থাকতে পারছে। অতএব সেদিক থেকে শেষ বিচারে "সাম্রাজ্যবাদই হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলোর মুক্তি ও প্রগতির পথে সবচেয়ে বড় বাধা," কিন্তু তার দরুণ কোনো একটা বিশেষ পর্যায়ে জাতীয় দ্বন্দ্ব ছাড়া আর কিছু প্রধান হতে পারবে না এমন চিন্তা যে কত বড় ডাহা মূর্খতা তা-ও আমরা ইতিপূর্বেই দেখিয়েছি।

কিন্তু⋯ কিন্তু চীন পার্টি যে বলেছে পশ্চাৎপদ দেশগুলির জনগণের "অতি জরুরী দাবী হচ্ছে নিজ নিজ দেশে সাম্রাজ্যবাদ ও তার পদলেহীদের শক্তিসমূহকে নিশ্চিহ্ন করা"? এক্ষেত্রে জনগণের সংগ্রামের রণকৌশলগত লক্ষ্যসমূহের মধ্যে কি সাম্রাজ্যবাদের উপরই প্রধান জোর দেওয়া হচ্ছে না? সামন্তবাদের তো এখানে উল্লেখমাত্রও নেই। এবং তার মানে কি এই নয় যে জাতীয় দ্বন্দ্বটাই বর্তমানে প্রধান?

একটু ভুল করছেন, বন্ধুগণ। 'পদলেহী' নামক ছোট্ট কথাটি দেখতে চাইছেন না ব'লেই সামন্তবাদের উল্লেখকেও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না। 'যুদ্ধ ও রণনীতির সমস্যা'তে মাও ১৯২৭-৩৭এর কৃষি-বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের শত্রুরূপে নির্দেশ করেছেন "সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী কুকুর" জমিদারশ্রেণী ও মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের। অর্থাৎ 'পদলেহী' কথাটির মধ্যেই সামন্তবাদের উল্লেখও নিহিত রয়েছে। তাছাড়া "সাম্রাজ্যবাদ ও তার পদলেহী" কিংবা "সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় প্রতিক্রিয়া"—এইভাবে সাম্রাজ্যবাদকে প্রথমে উল্লেখ ক'রে বিষয়টিকে প্রকাশ করলে যে তার দ্বারা জাতীয় দ্বন্দ্বকেই প্রাধান্য দেওয়া হয় এ কথাও ঠিক নয়[৯]। মাও তাঁর 'লাল

৯ অথচ ২৫ নভেম্বর ১৯৭৪এর 'পূর্বতরঙ্গে' প্রকাশিত প্রবন্ধে কিশলয় মিত্রের অভিমত হল এই

রাজনৈতিক ক্ষমতা' লেখায় বলেছেন যে কমিণ্টার্ন ও কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশানু-সারে চীনের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে "চীনে সাম্রাজ্যবাদ ও তার হাতিয়ার যুদ্ধবাজদের শাসনকে নিপাত করা, জাতীয় বিপ্লবকে সম্পূর্ণ করা, ভূমিবিপ্লবকে কার্যকরী করা", ইত্যাদি। বিষয়টিকে এখানেও একই ভাবে "সাম্রাজ্যবাদ ও তার হাতিয়ার" হিসাবেই প্রকাশ করা হচ্ছে। কিন্তু তার মানে কি এই যে তখন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে দ্বন্দ্বটাই ছিল প্রধান ? মনে রাখবেন সময়টা হল ১৯২৮ সাল — কৃষিবিপ্লবী গৃহযুদ্ধের বয়স তখন এক বৎসর।

চার ॥ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি সম্বন্ধে যে কোনো ঘোষণায় চীন আগাগোড়াই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার উপর, রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করার উপর — অর্থাৎ এক কথায় জাতীয় দ্বন্দ্বের উপর — জোর দিয়ে আসছে। এতে কি এটাই বোঝায় না যে চীনের মতে এইসব দেশে জাতীয় দ্বন্দ্বটাই বর্তমানে প্রধান ?

ইতিপূর্বে বিশ্লেষিত দিকগুলি ছাড়াও প্রশ্নটির আরো একটি দিক রয়েছে যা স্পষ্টভাবে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন।

আমরা দেখেছি যে ১০ এপ্রিল ১৯৭৪ তারিখে জাতিসংঘে প্রদত্ত চীনা প্রতি-নিধির বক্তৃতাটিকে বাংলাদেশের "সাম্যবাদী" তাত্ত্বিকেরা তাঁদের হাতের একটি তুরুপের তাস ব'লেই গণ্য করেন এবং তাঁদের লাইনের সমর্থনে বেশ অকৃপণ-ভাবেই তা ব্যবহার করেন। তাই সেই বক্তৃতাটিকে বিচার করলেই বিষয়টাকে সবচেয়ে পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে।

উক্ত ভাষণটি থেকে "সাম্যবাদী" তাত্ত্বিকেরা এ যাবৎ যেসব মন্তব্য ব্যবহার করেছেন ব'লে আমরা জানি, সেইসবের চেয়েও "জোরালো" একটি উক্তি (যা জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকদের বক্তব্যকেই আপাতদৃষ্টিতে সমর্থন করে) আমরা সেই একই ভাষণ থেকে তুলে দিলাম : "আমরা মনে করি, রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করাই তৃতীয় দুনিয়ার একটি দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের প্রথম পূর্বশর্ত।" এর দ্বারা কি নিঃসন্দেহে জাতীয় দ্বন্দ্বকেই প্রধান ব'লে নির্দেশ করা হয়নি ?

কিন্তু না, এই তীরটাও ফস্কে গেল, বন্ধুগণ ! মার্কসবাদ সবকিছুই মূর্তভাবে বিশ্লেষণ করে। অথচ আপনারা এই ভাষণটিকে নিয়ে আহ্লাদিত হওয়ার সময় খেয়ালই রাখেন না কোন পরিবেশে এবং কাদেরকে চীন এই ধরনের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতায় উৎসাহ দিচ্ছে, কোন দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংরক্ষণকে "প্রথম পূর্বশর্ত" ব'লে চিহ্নিত করছে।

চীনা প্রতিনিধি উক্ত ভাষণটি দিচ্ছিলেন এমন এক বিশেষ অধিবেশনে যার

যে 'সাম্রাজ্যবাদ ও তার দালাল'দের বিরুদ্ধে কিংবা 'সাম্রাজ্যবাদ ও তার সেবাদাস'দের বিরুদ্ধে চীন পার্টি যখন লড়াইয়ের আহ্বান জানায় তখন তার দ্বারা সে আসলে জাতীয় দ্বন্দ্বকেই প্রধান করার ইঙ্গিত দেয়।

উদ্দেশ্যটাই ছিল "বিশেষভাবে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও লুণ্ঠনকে প্রতিহত করা এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কে পরিবর্তন ঘটানোর গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি" আলোচনা করা। অতএব এই ভাষণে যে কেবল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার প্রশ্নটিই থাকবে তাতে অবাক হওয়ার কিছু আছে কি? এর সঙ্গে বর্তমান মুহূর্তে ঐসব দেশের সমাজের প্রধান দ্বন্দ্ব নির্ধারণের কি সম্পর্ক?

কিন্তু শুধু এটা দিয়েই আমরা প্রশ্নটিকে পাশ কাটাতে চাই না। বরং সবচেয়ে বড় কথা হল এই যে চীন যখন এই ধরনের মন্তব্যাদি করে তখন তার সম্বোধনের লক্ষ্য থাকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির শাসকশ্রেণী ও জনগণ উভয়েই। কাজেই শাসকশ্রেণী ও জনগণ উভয়েই বিভিন্ন পরিমাণে যে দ্বন্দ্বটির অংশীদার তাকেই যথাসম্ভব কাজে লাগানো থাকে তার উদ্দেশ্য। সাম্রাজ্যবাদ ও নিপীড়িত জাতির মধ্যে যে দ্বন্দ্বটি থাকে সেটাই হল একমাত্র দ্বন্দ্ব যাতে সেই জাতিগুলির শাসকশ্রেণী ও জনগণ উভয়েই বিভিন্ন মাত্রায় অংশীদার হতে পারে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে যাঁরা ঢালাওভাবে "নয়া-উপনিবেশ" মনে করেন তাঁরা অবশ্য ব্যাখ্যাই করতে পারবেন না এইসব "পুতুল সরকার" ও "পুতুল শ্রেণী" আবার সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে কিভাবে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে পারে, কিভাবে তা তৃতীয় বিশ্বকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টরে পরিণত করতে সাহায্য করতে পারে এবং কেমন ক'রে তা সমাজতান্ত্রিক চীনের বিশ্ব-রণনীতির অন্যতম ভিত্তিও হতে পারে। কিন্তু চীনা প্রতিনিধি এইসব দেশের 'রাষ্ট্র ও সরকারের প্রধানদের" সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্ব (তা যত কম ও মৃদুই হোক) যে স্পষ্টভাবে সেই ভাষণের মধ্যেই স্বীকার করেছিলেন তা প্রমাণ করার জন্য একটি উক্তি আমি এই বইয়ের অন্যত্র উদ্ধৃত করেছি।

সমগ্র জাতির সঙ্গে বাইরের কোনো শক্তির যে দ্বন্দ্ব রয়েছে চীন কেবল তার কথাই বলতে পারে। সেই জাতির অভ্যন্তরে, অর্থাৎ শাসকশ্রেণী ও জনগণের মধ্যে, যেসব দ্বন্দ্ব রয়েছে সেগুলো সম্বন্ধে কোনো কথা বলা হবে সেই দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা—যা সহাবস্থানের পঞ্চশীল নীতির বিরোধী[১০]। এসব দেশের **বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যেই** আরো কিছু অর্থনৈতিক বিকাশ যে একটিমাত্র পন্থায় সম্ভব, এবং এসব দেশের শাসকশ্রেণীগুলি নিজেদের শ্রেণীচরিত্রের সীমার মধ্যেই এজন্য যেটুকু করতে সক্ষম, চীন কেবল তাকেই উৎসাহিত করতে পারে এবং কেবল এই অর্থেই রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংরক্ষণকে অর্থনৈতিক বিকাশের "প্রথম পূর্বশর্ত"

১০ [অবশ্য সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রয়োজনে পঞ্চশীল নীতির এই সীমাকে কতখানি লঙ্ঘন করা উচিত এবং চীন কতটা করছে তা নিয়ে বহু মতপার্থক্য সম্ভব, কিন্তু তা আমাদের এখানকার বক্তব্যের সত্যতাকে আদৌ প্রভাবিত করে না।]

ব'লে চীনা প্রতিনিধি উল্লেখ করেছেন। এসব দেশের শাসকশ্রেণী অর্থাৎ মুৎসুদ্দি-বুর্জোয়া ও সামন্তশ্রেণীর পক্ষে কোনো কোনো অবস্থায় কমবেশী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা তবু সম্ভব, কিন্তু সামন্তবাদ উচ্ছেদ ক'রে সমাজকাঠামো বদলে ফেলার জন্য (অর্থাৎ আত্মহত্যা করার জন্য) এদের কাছে আবেদন জানানো কি আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা ছাড়াও নেহাৎই মূর্খতার পরিচায়ক হত না?

কিন্তু জনসাধারণ নিশ্চয়ই তাঁদের শাসক ও শোষকদের শ্রেণীচরিত্রের সীমার মধ্যে আটকে থাকবেন না। রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে প্রকৃত অর্থে পুরোপুরি সুরক্ষিত করতে গেলে, অর্থনৈতিক বিকাশকে সত্যই উন্মুক্ত করতে হলে, এই শাসকশ্রেণীগুলিকেই উৎখাত করতে হবে, আমূল বিপ্লবায়িত করতে হবে সমাজকাঠামোকে। কিন্তু সেটা সেই দেশের জনগণেরই নিজস্ব কর্তব্য, চীন সে সম্বন্ধে সরকারীভাবে কোনো উপদেশ দেওয়া থেকে বিরত থাকছে। তাই তাৎপর্যপূর্ণ ভাষায় চীনা প্রতিনিধি বলেছেন, "আমরা মনে করি···উন্নয়নশীল দেশগুলির জনগণের এই অধিকার আছে যে তাঁরা নিজেদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বেছে নিতে পারবেন এবং ঠিক করতে পারবেন।"

প্রধান দ্বন্দ্ব নির্ধারণ একটি জাতির আভ্যন্তরীণ রণকৌশলগত সমস্যা। তাই যেসব বিষয়ে চীন সরকারীভাবে তার মতামত প্রকাশ করতে পারে, সেগুলি প্রধান দ্বন্দ্ব নির্ধারণের সমস্যা থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। অথচ জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকরা চীনের সরকারী ঘোষণাবলী থেকেই ছেলে-মানুষের মতো প্রধান দ্বন্দ্ব নির্ধারণের হদিশ পেতে চান। কবে যে এঁরা প্রাপ্তবয়স্ক ভদ্রলোকের মতো নিজে নিজে হাঁটতে শিখবেন! কবে যে এঁরা বুঝবেন মাওয়ের এই শিক্ষা যে একটি দেশের শাসকশ্রেণী যখন কিছু পরিমাণে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করে ও সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হয় তখন সেই দেশের কমিউনিস্ট পার্টির কর্তব্য সেই শাসকশ্রেণীর লেজুড়বৃত্তি করা নয় বরং তাকে উৎখাত করার প্রচেষ্টাকেই অব্যাহত রাখা! কবে যে এঁরা শাসকশ্রেণীর লেজুড়বৃত্তি করার চমৎকার "সাম্যবাদী" অভ্যাসটিকে পরিত্যাগ করবেন!

২. আমাদের মতো পশ্চাৎপদ সমাজগুলিতে প্রধান দ্বন্দ্ব নির্ধারণ সম্বন্ধে মাও সেতুঙ্ চিন্তাধারা

আমরা আগেই দেখেছি যে জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকরা 'উপনিবেশ,' 'আধা-উপনিবেশ,' 'নয়া-উপনিবেশ' প্রভৃতি সবকটি ধারণাকে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। তাঁরা নিজেরাই আমাদের দেশগুলির যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে তাদের চরিত্র অভ্রান্তভাবে আধা-উপনিবেশই দাঁড়ায়। কিন্তু তাঁদের

কেউই সেটা বোঝেননি।

তাই তাঁদের একটি দল অম্লানবদনে ও বিনা-কৈফিয়তে সেগুলোকে এমন নিশ্চিতভাবে নয়া-উপনিবেশ ব'লে দাবী করেন যে মনে হয় জলজ্যান্ত মানুষ কেটে ফেলতেও তাঁদের হাত কাঁপবে না। একবার নয়া-উপনিবেশ বানিয়ে ফেলার পর বাকী কাজ অবশ্য খুবই সহজ: যেহেতু আধা-উপনিবেশকে খতম ক'রে নয়া-উপনিবেশ কায়েম করা গেছে অতএব স্বভাবতই জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান। মানুষটা যখন ম'রেই গেছে তখন কবর তো তাকে দিতেই হবে···

আর অন্য দলটির পদ্ধতি আরো চিত্তাকর্ষক। মুখে তাঁরা এখনও আধা-উপনিবেশ বলেন বটে কিন্তু তাকেই আবার তাঁরা দেখেন "পুতুল সরকারে"র শাসনাধীন নয়া-উপনিবেশ ব'লে। 'আধা-উপনিবেশ' বর্গটার শব্দঝংকারের প্রতি তাঁদের অনুরাগ বড় বেশী, তাই তার অর্থটাকে জবাই না ক'রে তাঁরা পারেন না।

অবশ্য এইসব সূক্ষ্ম খেলার নীট লাভটা খুবই লোভনীয়। আধা-উপনিবেশে প্রধান দ্বন্দ্ব নির্ধারণ সম্বন্ধে মাও নামক একটা লোক যে জটিল কচকচিগুলো করেছে, নয়া-উপনিবেশ ব'লে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেসবই পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায় নির্বিবাদে।

তবে আমরা এই ধরনের সূক্ষ্ম খেলায় ওস্তাদ নই, তাই আধা-উপনিবেশে প্রধান দ্বন্দ্ব নির্ধারণ সম্বন্ধে মাওয়ের সম্পূর্ণ বক্তব্যটি আমাদের স্মরণ করতেই হবে। আমরা দেখতে পাব যে তা এ পর্যন্ত উত্থাপিত আমাদের প্রত্যেকটি মতামতকে শতকরা একশো ভাগ সমর্থন করে। আমরা এ-ও দেখতে পাব যে তাঁর বক্তব্য থেকে কেবল আধা-উপনিবেশের নয়, সব ধরনের পশ্চাৎপদ সমাজেরই প্রধান দ্বন্দ্ব নির্ধারণ সম্বন্ধে একটি সাধারণ পদ্ধতির হদিশ পাওয়া যায়। মার্কসবাদের তত্ত্বশালায় স্বকীয় অবদান সংযোজন করার অধীরতায় জাতীয় দ্বন্দ্বের সম্মানিত প্রাধান্য-ঘোষকরা মাওকে একটু বেশী অসম্মান ক'রে ফেলেছেন এবং তারই ফলে অর্জন করতে পেরেছেন এক ধরনের স্বকীয় জগাখিঁচুড়ির পিতৃত্বের দুর্লভ সম্মান।

আধা-উপনিবেশে জাতীয় দ্বন্দ্ব ও সামন্ত দ্বন্দ্বের কখন কোনটা প্রধান হয়? মাওয়ের 'দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে' প্রবন্ধ থেকে প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি পুরোপুরি উদ্ধৃত করা যাক। উদ্ধৃতিগুলিতে বড় হরফ সব আমাদের।

আধা-উপনিবেশে জাতীয় দ্বন্দ্ব কখন প্রধান হয়? আলোচ্য প্রবন্ধের চতুর্থ অংশের পঞ্চম অনুচ্ছেদে মাও সে পরিস্থিতিকে এইভাবে বিশ্লেষণ করেছেন:

> "সাম্রাজ্যবাদ যখন এমন একটা দেশে **আগ্রাসী যুদ্ধ** চালায়, তখন কয়েকটা বিশ্বাসঘাতককে বাদ দিয়ে তার **সবগুলি শ্রেণী** সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে **জাতীয় যুদ্ধে** সাময়িকভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। এই রকম সময়ে

সাম্রাজ্যবাদ ও সংশ্লিষ্ট দেশটির দ্বন্দ্ব প্রধান দ্বন্দ্বে পরিণত হয় এবং দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব (সামন্তবাদী ব্যবস্থা ও ব্যাপক জনগণের মধ্যেকার যে দ্বন্দ্বটি প্রধান দ্বন্দ্ব ছিল সেটা সহ) সাময়িকভাবে গৌণ ও অধস্তন অবস্থানে পর্যবসিত হয়। তাই হয়েছিল চীনে ১৮৪০এর আফিম যুদ্ধে, ১৮৯৪এর চীন-জাপান যুদ্ধে ও ১৯০০র ই হো তুয়ান যুদ্ধে এবং এখন তাই হয়েছে বর্তমানের চীন-জাপান যুদ্ধে।"

কিন্তু যখন আগ্রাসী যুদ্ধ না থাকে? উক্ত প্রবন্ধের চতুর্থ অংশের ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে মাওয়ের বর্ণিত সেই দ্বিতীয় পরিস্থিতি হল এই রকম:

"যখন সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধের দ্বারা নয় বরং মৃদুতর পন্থায়—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পন্থায়—নিপীড়ন চালায় তখন **আধা-ঔপনিবেশিক দেশসমূহের শাসকশ্রেণীগুলি** সাম্রাজ্যবাদের নিকট **আত্মসমর্পণ** করে এবং জনসাধারণকে যুক্তভাবে নিপীড়ন করার জন্য উভয়ে মৈত্রীবদ্ধ হয়। এই রকম সময়ে জনসাধারণ **প্রায়ই সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তশ্রেণীর মৈত্রীর বিরুদ্ধে** গৃহযুদ্ধের আশ্রয় নেয় আর সাম্রাজ্যবাদ প্রায়ই প্রত্যক্ষ সক্রিয়তার পরিবর্তে পরোক্ষ পদ্ধতি গ্রহণ করে, জনগণকে নিপীড়ন করার জন্য আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলির প্রতিক্রিয়াশীলদেব **সাহায্য** করে এবং এইভাবে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলি বিশেষভাবে তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। চীনে তাই ঘটেছিল ১৯১১র বিপ্লবী যুদ্ধে, ১৯২৪-২৭এর বিপ্লবী যুদ্ধে এবং ১৯২৭এর পর ১০ বৎসরের কৃষিবিপ্লবী যুদ্ধে।"

আধা-উপনিবেশের শাসকশ্রেণীগুলিকে **ক্ষমতাচ্যুত** করার জন্য সাম্রাজ্যবাদ যতক্ষণ সশস্ত্র আগ্রাসনের আশ্রয় না নিচ্ছে ততক্ষণ সে অন্য যে পন্থাই গ্রহণ করুক (দেশীয় শাসকশ্রেণীগুলিকে **সাহায্য** করার জন্য সশস্ত্র হস্তক্ষেপ সহ), দেশটির আভ্যন্তরীণ শ্রেণীশক্তির মেরুবিন্যাসে যত পরিবর্তনই ঘটুক, সামন্ত দ্বন্দ্বের প্রাধান্যের দ্বিতীয় পরিস্থিতিটি মূলগতভাবে অপরিবর্তিতই থেকে যায়। এই হল সপ্তম অনুচ্ছেদের বক্তব্য:

"বিপ্লবী গৃহযুদ্ধ যখন এমন একটা বিন্দুতে বিকশিত হয় যে সাম্রাজ্যবাদ ও তার পদলেহী কুকুর দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের অস্তিত্বটাকেই তা হুমকি দিতে থাকে, সাম্রাজ্যবাদ তখন তার শাসন বজায় রাখার জন্য প্রায়ই **অন্য পদ্ধতি** অবলম্বন করে; হয় তা বিপ্লবী ফ্রন্টকে ভিতর থেকে ভাঙার চেষ্টা করে নতুবা দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রত্যক্ষভাবে **সাহায্য** করার জন্য সশস্ত্র ফৌজ প্রেরণ করে। এই রকম সময়ে **বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় প্রতিক্রিয়া বেশ খোলাখুলি এক মেরুতে দাঁড়ায় আর জনসাধারণ দাঁড়ায় অন্য মেরুতে,** এইভাবে **তারা গ'ড়ে তোলে** প্রধান দ্বন্দ্ব যা অন্যান্য দ্বন্দ্বের বিকাশকে নির্ধারণ ও প্রভাবিত করে। অক্টোবর

বিপ্লবের পরে রুশ প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রতি বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশের দেওয়া সহায়তা হল সশস্ত্র হস্তক্ষেপের দৃষ্টান্ত। ১৯২৭এ চিয়াং কাই-শেকের বেইমানী হল বিপ্লবী ফ্রন্টকে ভাঙার দৃষ্টান্ত।"

১৯২৭ সালের কু দে'তার মধ্য দিয়ে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর দক্ষিণপন্থী অংশটি মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া হিসাবে দলত্যাগ করল। যে প্রধান দ্বন্দ্বের (সামন্ত দ্বন্দ্বের) এক মেরুতে এতদিন ছিল সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তশ্রেণীর জোট এবং অন্য মেরুতে ছিল সমগ্র বুর্জোয়াশ্রেণীসহ জনগণ, এবার সেই একই প্রধান দ্বন্দ্বের দ্বিতীয় মেরু থেকে বুর্জোয়াশ্রেণীর একটি অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যোগ দিল প্রথম মেরুতে। সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তশ্রেণীর জোটের পরিবর্তে একদিকে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের জোট এবং অন্যদিকে বুর্জোয়াশ্রেণীর অবশিষ্টাংশ সহ জনগণ এবার গ'ড়ে তুলল প্রধান দ্বন্দ্ব তথা সামন্ত দ্বন্দ্বকে। ফলে **সামন্ত দ্বন্দ্ব তার প্রাধান্যের অবস্থানে অটুট রইল**, কিন্তু তার মেরুদ্বয়ের গঠনবিন্যাস বদলে যাওয়ার ফলে উদ্ভব হল এক নতুন পর্যায়ের। আর দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের **সাহায্য** করার জন্য সশস্ত্র সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের পরেও রাশিয়ায় **আভ্যন্তরীণ** দ্বন্দ্বই প্রধান ছিল (যেহেতু **গৃহযুদ্ধ** চালিয়ে তার সমাধান করতে হয়েছিল), কিন্তু রাশিয়া পুঁজিবাদী দেশ হওয়ার কারণে সেই আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ছিল সামন্ত দ্বন্দ্ব নয়, বরং বুর্জোয়াশ্রেণী ও সর্বহারাশ্রেণীর দ্বন্দ্ব।

উপরের উদ্ধৃতিগুলি থেকে, বিশেষ ক'রে যেসব শব্দে আমরা বড় হরফ ব্যবহার করেছি সেগুলি থেকে, এবার আমরা একে একে শিক্ষাগুলি টানব।

প্রথম শিক্ষা ॥ মাও আধা-ঔপনিবেশিক দেশসমূহের শাসকশ্রেণীগুলির আত্মসমর্পণের কথা বলছেন। এর অর্থ পরিষ্কার: আধা-উপনিবেশে রাষ্ট্রক্ষমতা নিশ্চয়ই থাকে দেশীয় শ্রেণীগুলিরই হাতে এবং দেশটি এই কারণেই পরাধীন নয়; আবার তা স্বাধীনও নয়, কেননা তার শাসকশ্রেণীগুলি সাম্রাজ্যবাদের পায়ে আত্মসমর্পণ করে। নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার তাগিদ তাদের নিশ্চয়ই আছে কিন্তু সেই শ্রেণীস্বার্থ ও শ্রেণী-অবস্থানটাই এমন যে তার তাগিদেই জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে বেইমানী ক'রে নিজ দেশের জনগণকে শোষণ, শাসন ও নিপীড়ন করার অধিকার তাদেরকে সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে ভাগাভাগি ক'রে নিতে হয়। শাসকশ্রেণীগুলি যে পরিমাণে আত্মসমর্পণ করে তাদের রাষ্ট্রও ঠিক সেই পরিমাণেই সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থেরও সেবা করে। আমরা জানি যে এই শাসকশ্রেণীগুলির আত্মসমর্পণের দিকটাই প্রধান থাকে (আধা-উপনিবেশের নিয়মই তা-ই) কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতা যতদিন দেশীয় কোনো শ্রেণীর হাতে থাকছে ততদিন দেশটিকে উপনিবেশ বা নয়া-উপনিবেশ কোনোমতেই বলা চলে না।

আধা-উপনিবেশের আত্মসমর্পণকারী শাসকশ্রেণীগুলির সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের

একেবারেই কোনো দ্বন্দ্ব থাকে না, এমন ভাবাটা এক ধরনের সরলীকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়, কারণ দেশটির উপর সাম্রাজ্যবাদ যে নিপীড়ন চালায় তার প্রধান চোট জনগণের উপর পড়লেও শাসকশ্রেণীগুলি তা থেকে একেবারে বাদ যায় না। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের এই নিপীড়ন ও শোষণ যতদিন গুণগতভাবে একটা বিশেষ সীমা অতিক্রম না করে ততদিন এই শাসকশ্রেণীগুলি পূর্ণ দৃঢ়তার সঙ্গে তা প্রতিরোধ করার পরিবর্তে বরং একদিকে চালাতে থাকে হীন ও ন্যক্কারজনক দরকষাকষি আর অন্যদিকে ক্রমাগত সুযোগ খুঁজতে থাকে কিভাবে নিজেদের উপব এসে-পড়া এই নিপীড়নের বোঝাটাকে জনগণের ঘাড়ে চালান ক'রে দেওয়া যায়। তার ফলে বাহ্যিক দ্বন্দ্বেব চেয়ে বরং এই শাসকশ্রেণীগুলির সঙ্গে জনগণের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলিই তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়নবৃদ্ধির সঙ্গে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বসমূহের তীব্রতাবৃদ্ধির সম্পর্কটি খুব চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে মাওয়ের 'একটি স্ফুলিঙ্গ' লেখাতে।

দ্বিতীয় শিক্ষা ॥ সাম্রাজ্যবাদের নিপীড়ন যখন গুণগতভাবে একটি বিশেষ সীমা অতিক্রম ক'রে যায় তখন কিন্তু অবস্থাটা যায় উল্টে। এক্ষেত্রে মূল নিরিখটি হল দেশীয় শাসকশ্রেণীগুলিব রাষ্ট্রক্ষমতা। দেশীয় শাসকশ্রেণীগুলিকে রাষ্ট্রক্ষমতায় রেখে সাম্রাজ্যবাদ যতদিন তাব নিপীড়ন চালায় তত্দিন উক্ত শাসকশ্রেণীগুলি তাদের শ্রেণীস্বার্থের তাগিদেই জাতীয় স্বার্থ বিকিয়ে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের পায়ে আত্মসমর্পণ করে বা করতে বাধ্য হয়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ যখন সেই শাসকশ্রেণীগুলিকে রাষ্ট্রক্ষমতায় রাখার পরিবর্তে প্রত্যক্ষ ও সশস্ত্র উপায়ে তাদের উৎখাত কবতে উদ্যত হয়, যখন সেই শাসকশ্রেণীগুলির অস্তিত্ব ও রাষ্ট্রক্ষমতাই সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা বিপন্ন হয়ে পড়ে, যখন আত্মসমর্পণ মারফৎ আর এদুটো মূল বিষয়কে বাঁচানো সম্ভব হয় না—তখন এবং কেবলমাত্র তখনই মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও জমিদারশ্রেণী জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার যুদ্ধে সামিল হতে পারে (যদিও তখনও তারা থাকে জাতীয় যুদ্ধের সবচেয়ে দোদুল্যমান, আপোষমুখী, বিশ্বাসঘাতক ও সাময়িক মিত্র)। তাই যুদ্ধের অবস্থা ছাডা, সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী যুদ্ধ ছাড়া, মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও জমিদারদের বিপ্লবী ফ্রন্টে পাওয়া অসম্ভব। দেশীয় কোনো শ্রেণীর শাসনাধীন দেশে জাতীয় যুদ্ধের অর্থ শাসকশ্রেণী ও জনগণের সহযোগিতা ও যৌথ যুদ্ধ-তৎপরতা এবং রাষ্ট্রক্ষমতা-দখলের কর্মসূচীর সাময়িক স্থগিতকরণ। উপযুক্ত পরিস্থিতি ছাড়া এই পথ অবলম্বন করলে বিপ্লবের কেন্দ্রীয় কর্তব্য জলাঞ্জলি দিয়ে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও জমিদারদের মন পাওয়ার জন্য হন্যে হয়ে ছুটে বেড়ানোটাই সার হয়।

তৃতীয় শিক্ষা ॥ প্রথম ও দ্বিতীয় শিক্ষাকে মেলালে আমরা আরো একটা শিক্ষা পাই যা জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকদের লাইনের প্রকৃত স্বরূপ চমৎকারভাবে উদ্ঘাটন ক'রে দেয়।

রাষ্ট্রক্ষমতা দেশীয় কোনো আত্মসমর্পণকারী শ্রেণীর হাতে নাকি সরাসরি বিদেশী বুর্জোয়াদের হাতে, এটাই যে আধা-উপনিবেশ ও উপনিবেশের (বা নয়া-উপনিবেশের) পার্থক্য নিরূপণের প্রধান নিরিখ সে কথা জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকরা স্পষ্টতই মানেন না, কেননা একটি দেশকে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও জমিদারশ্রেণীর শাসনাধীন ব'লে মেনে নিয়েও তাঁরা তাকে অম্লানবদনে "নয়া-উপনিবেশ" বানিয়ে দেন। মনে হয় তাঁদের যুক্তিটা এই রকম : মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও সামন্তশ্রেণী যে পরিমাণে আত্মসমর্পণ করে তাদের রাষ্ট্র যেহেতু ঠিক সেই পরিমাণেই সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থেরও প্রতিনিধিত্ব করে, অতএব সেই আত্মসমর্পণের দিক যখন প্রধান হয়ে যায়[১১] তখন সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের দিকটাও প্রধান হয়, ফলে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও সামন্তশ্রেণীর শাসনাধীন হওয়া সত্ত্বেও দেশটি তখন নয়া-উপনিবেশই হয়ে যায় এবং জাতীয় দ্বন্দ্বই হয় স্থায়ীভাবে প্রধান।

অথচ একটু পরেই আমরা দেখব যে মাওয়ের মত এর ঠিক উল্টো (লেনিন যে "শতকরা নব্বইভাগ উপনিবেশ"কেও আধা-উপনিবেশ বলেছিলেন সে কথা এখানে আর বিশদভাবে তুললাম না)। মাওয়ের মতে দেশীয় শাসকশ্রেণীগুলি সাম্রাজ্যবাদের পায়ে যত আত্মসমর্পণ করে তত **আভ্যন্তরীণ** দ্বন্দ্বগুলিই তীব্র হতে থাকে, সাম্রাজ্যবাদী কব্জা থেকে মুক্তি পাবার জন্যও **দেশীয়** শাসক-শ্রেণীটাকেই উৎখাত করার প্রযোজন তত জরুরী হয়ে পড়ে, তত বাড়তে থাকে **গৃহযুদ্ধের** প্রয়োজন ও সম্ভাবনা। দেশীয় শাসকশ্রেণীগুলি যখন একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে তার আত্মসমর্পণ বন্ধ করতে উদ্যত হয় (তা যত দোদুল্যমান-ভাবেই হোক), কেবলমাত্র তখনই জাতীয় যুদ্ধ সম্ভব হতে পারে।

কিন্তু জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকরা আমাদের শেখাতে চান যে দেশীয় শাসকশ্রেণীর আত্মসমর্পণ যত বাড়ে তত বাড়তে থাকে জাতীয় যুদ্ধের প্রয়োজন ও সম্ভাবনা!

মাও চিন্তাধারা ও জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকদের চিন্তাধারার মেরুপ্রমাণ বৈপরীত্যকে বোঝার জন্য এর চেয়ে ভালো দৃষ্টান্ত কি আর মিলবে?

অবশ্য তবু প্রশ্ন থাকে : আসল ব্যাপারটাই বা কি? আত্মসমর্পণকারী দেশীয় শ্রেণীগুলির শাসনাধীন একটা দেশ শতকরা নব্বইভাগ সাম্রাজ্যবাদের কাছে বিকিয়ে যাওয়ার পরেও আমরা তাকে আধা-উপনিবেশই বলতে চাইছি। কিন্তু এই একই শ্রেণীগুলি এই দশভাগ কনসেশন কি উপনিবেশেও পায় না? ঔপনিবেশিক ভারতে তো তার চেয়ে বেশীই পেয়েছিল। তা সত্ত্বেও প্রথমটিকে আমরা আধা-উপনিবেশ বলছি অথচ দ্বিতীয়টিকে উপনিবেশ বলছি কেন?

১১ কি নিরিখে বোঝা যাবে তা কখন প্রধান হচ্ছে, কখন-ই বা তা প্রধান দিক থাকে না? তাছাড়া প্রধান-অপ্রধান আবার কি, আপনারা তো এদের কোনো গৌণ ও আপেক্ষিক স্বাধীনতার দিকও স্বীকার করতে চান না।

প্রথমটিতে দেশীয় শ্রেণীগুলির হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা নেই কিন্তু দ্বিতীয়টিতে আছে, এই যুক্তিতে? কিন্তু এই পার্থক্যের বাস্তব ভিত্তিটা কি এবং তা বোঝার নিরিখটাই বা কি?

আমরা আগেই বলেছি যে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও সামন্তশ্রেণীর সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্ব থাকে লুটের বখরা নিয়ে আর রাষ্ট্রক্ষমতা কার হাতে থাকবে এই প্রশ্ন নিয়ে। রাষ্ট্রক্ষমতা যার হাতে থাকবে সে-ই পাবে "জনগণের শ্রমশক্তির সমগ্র সংস্থানের উপর অগ্রিম অধিকার" (ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নামে প্রচারিত প্রথম ইশতেহার, ১৯২৬: মুজফফর আহমেদের 'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' গ্রন্থে উদ্ধৃত)। এই "অগ্রিম অধিকার" একটা ফালতু আনুষ্ঠানিকতা নয়, কেননা উদ্বৃত্ত শ্রম প্রথমে কোন শ্রেণী আদায় করছে সেটাকেই সমাজচরিত্র নির্ধারণের মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অন্যতম নিরিখরূপে মার্কস নির্দেশ করেছিলেন (এই "অগ্রিম অধিকার"এর ফল তারপর বিভিন্ন দাবীদারের মধ্যে কিভাবে ভাগবাঁটোয়ারা হচ্ছে সেটা পরের কথা)।

সর্বোপরি এই "অগ্রিম অধিকার" তথা রাষ্ট্রক্ষমতার বিষয়টি একটা দেশের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ককে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

যে চীন ছিল শতকরা নব্বইভাগ উপনিবেশ সেখানে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও জমিদারশ্রেণীর হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা বজায় থাকার ফলে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বসমূহের সম্পর্ক কেমন দাঁড়িয়েছিল তার বর্ণনা রয়েছে মাওয়ের 'একটি স্ফুলিঙ্গ' লেখায়। ইতিপূর্বে কয়েকবারই আমরা এই লেখাটির উল্লেখ করেছি, তার প্রাসঙ্গিক অংশটি এই রকম:

"যেহেতু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর পরস্পরের মধ্যে, সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশগুলোর মধ্যে, সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের নিজেদের দেশের সর্বহারাশ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব বিকাশ লাভ করেছে, সেহেতু সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে চীনকে কেড়ে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আরো তীব্র হয়ে উঠেছে। সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে চীনকে কেড়ে নেওয়ার প্রয়োজন যখনই তীব্রতর হয়ে ওঠে তখনই সাম্রাজ্যবাদ ও সমগ্র চীনের দ্বন্দ্ব, সাম্রাজ্যবাদীদের পরস্পরের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব চীনের মাটিতে একই সঙ্গে বিকাশলাভ করে, ফলে চীনের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকদের বিভিন্ন চক্রের মধ্যে সৃষ্টি হয় এক জটপাকানো যুদ্ধ··· । সঙ্গে সঙ্গে নেমে আসে আরো করভার – এইভাবে ব্যাপক করদাতা জনগণ ও প্রতিক্রিয়াশীল শাসকদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব দিন দিন বিকাশলাভ করে। সাম্রাজ্যবাদ ও চীনের জাতীয় শিল্পের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেওয়ার ফলে চীনের জাতীয় শিল্প সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে কনসেশন আদায় করতে পারে না এবং এটা চীনের বুর্জোয়াশ্রেণী ও চীনের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেকার দ্বন্দ্বকে তীব্র ক'রে তোলে, চীনা পুঁজিপতিরা

মরীয়া হয়ে বাঁচার পথ খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছে আর শ্রমিকরা তা প্রতিরোধ করছে। সাম্রাজ্যবাদীদের বাণিজ্যিক আক্রমণ, চীনা বণিক-পুঁজিপতির শোষণ, সরকারের মোটা করধার্য ইত্যাদি অবস্থার সঙ্গে সঙ্গেই জমিদারশ্রেণী ও কৃষকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব আরো গভীর হচ্ছে, অর্থাৎ জমির খাজনা ও সুদের মাধ্যমে শোষণ আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বেড়ে উঠছে জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষকদের ঘৃণা। বিদেশী মালের চাপ, ব্যাপক শ্রমিক-কৃষক সাধারণের ক্রয়ক্ষমতার হ্রাস এবং সরকারী করের বৃদ্ধি – এসব কারণে চীনে উৎপাদিত দ্রব্যের ব্যবসায়ী ও স্বাধীন উৎপাদকেরা দিন দিন দেউলিয়ার পথে যাচ্ছে।…স্কুল চালানোর জন্য কোনো টাকা না থাকায় বহু ছাত্র আশঙ্কা করে যে তারা শিক্ষার সুযোগ হারাবে, যেহেতু উৎপাদন পশ্চাৎপদ, সেহেতু বহু স্নাতকের চাকরীর আশা নেই।… সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধবাজ ও জমিদারদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী উত্তাল জোয়ার অনিবার্য এবং তা আসবে অতি শীঘ্রই[১২]।"

তার মানে নিজেদের সংকটের ফলে সাম্রাজ্যবাদীরা চীনের শাসকশ্রেণীগুলির প্রতি কনসেশন যত কমাচ্ছিল, তাদের উপর নিষ্পেষণ যত বাড়াচ্ছিল, শেষোক্তরা ততই তা পুষিয়ে নেওয়ার জন্য বাড়িয়ে তুলছিল জনগণের উপর তাদের শোষণ ও নিপীড়ন। ফলে সংগ্রাম সেই পর্যায়ে তীব্রতর হচ্ছিল জনগণের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে এদেরই। সাম্রাজ্যবাদের কব্জা যতই কঠোর হচ্ছিল ততই সাম্রাজ্যবাদের পরিবর্তে দেশীয় শাসকশ্রেণীগুলিই উত্তরোত্তর সামনে আসছিল জনগণের তাৎক্ষণিক শত্রু হিসাবে। দেশীয় শ্রেণীগুলির হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা থাকার মতো "আনুষ্ঠানিক" একটা ব্যাপারের মজাটাই এই যে সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণ যত বাড়ে জাতীয় দ্বন্দ্ব তত তীব্র হয় বটে কিন্তু তার'চেয়ে বেশী তীব্র হয় আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বসমূহ।

উপনিবেশে কিন্তু প্রক্রিয়াটা হয় ঠিক উল্টো। সেখানে "অগ্রিম অধিকার" তথা রাষ্ট্রক্ষমতা থাকে সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে। দেশের মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও জমিদারশ্রেণীর প্রতি কনসেশন তারা যত বাড়াতে বাধ্য হয় তত তারা সেই ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে জনগণের উপর তাদের শোষণ-নিপীড়নকে তীব্রতর করার মাধ্যমে: "সাম্রাজ্যবাদের বখরা কমিয়ে দেশীয় পুঁজিবাদকে কনসেশন দেওয়া হয় না, হবেও না। প্রথমোক্তটি" (অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ) "শোষণ বাড়িয়ে তুলবে শ্রমজীবী জনতার উপর – তাঁরা সাম্রাজ্যবাদের জন্য যা উৎপাদন করেন তারও অতিরিক্ত মূল্য তাঁরা দেশীয় পুঁজিবাদের জন্য উৎপাদন করতে বাধ্য হবেন" (সি পি আই-এর পূর্বোদ্ধৃত ইশ্‌তেহার)। এখানে জনগণের

১২ মজার ব্যাপার হল এই যে 'পূর্বতবঙ্গে'র পূর্বোল্লেখিত প্রবন্ধে কিশলয় মিত্র মাওয়ের ঠিক এই বক্তব্যটিকেই উদ্ধৃত করেছেন নিজের জাতীয় তথা বাহ্যিক দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষণার তত্ত্বের "সমর্থনে"!

উপর শোষণ-নিপীড়ন প্রত্যক্ষভাবে বাড়িয়ে তুলছে প্রধানত কে? কার "অগ্রিম অধিকার" এজন্য প্রধানত দায়ী?—সাম্রাজ্যবাদের। মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও সামন্তশ্রেণীর চেয়ে সাম্রাজ্যবাদই বেশী বেশী ক'রে জনগণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে থাকে, অতএব সে-ই হয় সংগ্রামের তাৎক্ষণিক লক্ষ্যস্থল।

একটা আধা-উপনিবেশ যদি পরিমাণগতভাবে উপনিবেশের খুব কাছাকাছি হয় তবু কেন তা উপনিবেশ নয়—এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে ইতিপূর্বে আমরা বলেছিলাম যে নিশ্চয় তাদের মধ্যে এমন একটা গুণগত পার্থক্য রয়েছে যা বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণের পরিমাণের উপর মোটেই নির্ভরশীল নয়, বরং দেশীয় শ্রেণী-গুলির হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা থাকা-না-থাকাটাই এই গুণগত পার্থক্যের ভিত্তি। কিন্তু আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দ্বন্দ্বের সম্পর্কের নিরিখে এই রাষ্ট্রক্ষমতা থাকা-না-থাকার বিষয়টির নিষ্পত্তি সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বে এত সবিস্তারে আলোচনা করিনি (সংক্ষিপ্ত উল্লেখের জন্য তৃতীয় অধ্যায়ের ৭নং অংশ দ্রষ্টব্য)। এই নিরিখটি প্রধান দ্বন্দ্ব নির্ধারণের রণকৌশলগত সমস্যার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকার ফলেই আমরা বর্তমান অধ্যায়ে তার বিশদ আলোচনা করলাম।

চতুর্থ শিক্ষা ॥ সাম্রাজ্যবাদের সশস্ত্র উপস্থিতি দেখামাত্র জাতীয় যুদ্ধের কথা তোলা ভুল। এক্ষেত্রেও মূল নিরিখ হল দেশীয় শ্রেণীর রাষ্ট্রক্ষমতা এবং তার সঙ্গে বিদেশী হস্তক্ষেপের সম্পর্ক। সাম্রাজ্যবাদ যে তার সশস্ত্র শক্তি প্রেরণ করছে তা কি দেশীয় কোনো প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীকে ক্ষমতায় বসাতে বা টিঁকিয়ে রাখতে, নাকি তাকে উৎখাত ক'রে নিজে সরাসরি ক্ষমতায় বসতে? প্রথম ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বই প্রধান হবে, যুদ্ধটা হবে জাতীয় যুদ্ধের পরিবর্তে গৃহযুদ্ধই (যেমন হয়েছিল রাশিয়ায়); কেবলমাত্র দ্বিতীয় ক্ষেত্রেই জাতীয় যুদ্ধের অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে।

"আওয়ামী সরকার গঠিত হয় ভারতের বুকে", তাই "এই সরকার রুশ-ভারত শাসকচক্রের হাতে-গড়া একটা পুতুল সরকার" (যদিও এই বাংলাদেশেই আবার একটা দেশীয় শাসকশ্রেণীও আছে যা "মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণীতে উৎক্রমণমুখী"!), "এই সরকারকে বাংলাদেশের ঘাড়ে চাপানো হয়েছে রুশ-ভারত শাসকচক্রের বন্দুকের জোরে" ইত্যাদি যুক্তি (বাংলাদেশের 'গণশক্তি', বিশেষ সংখ্যা, ১৯৭৪ দ্রষ্টব্য) কিংবা "বাংলাদেশের সরকারও ভারতের মাটিতেই গঠিত হয়েছে এবং তাদের প্রত্যক্ষ সামরিক ভূমিকায় 'বাংলাদেশে' বসতে পেরেছে" 'আমার কথা': আলাউদ্দীন আহম্মদ) এই ধরনের যুক্তি যে বাংলাদেশকে নয়া-উপনিবেশ প্রমাণ করা ও বাংলাদেশে জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য প্রমাণ করার পক্ষে কত অসার ও হাস্যকর মাও তা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করেছেন।

সমগ্র বাঙালী জাতির স্পষ্ট-অভিব্যক্ত জাতীয় ইচ্ছাকে সরাসরি পদদলিত ক'রেই কি রুশ-ভারতের বন্দুক আওয়ামী সরকারকে বাংলাদেশে চাপিয়ে দিয়ে-

ছিল ? তা যদি হত তবে জাতীয় যুদ্ধের পর্যায় সম্বন্ধে কারো কোনো সন্দেহ থাকত না। কিন্তু আসলে তেমন ঘটেনি।

রুশ-ভারতের সামরিক হস্তক্ষেপের বহু পূর্বেই আওয়ামী লীগ সমগ্র বাঙালী জাতির বিপুল সমর্থন পেয়ে নির্বাচিত হয়েছিল। পার্লামেন্টারি নির্বাচন সম্বন্ধে আমাদের যত সমালোচনাই থাক, এ কথা তো অস্বীকার করার উপায় নেই যে ঐ নির্বাচনের মাধ্যমে পাকিস্তানী শাসকদেব বিরুদ্ধে বাঙালী জাতীয়তাবাদেরই এক সোচ্চার অভিব্যক্তি ঘটেছিল—প্রতিক্রিয়াশীলেরা সেটাকে কাজে লাগিয়ে-ছিল ব'লে জাতীয়তাবাদের সেই উত্থানমুখী শক্তিটা মিথ্যা হয়ে যায়নি। বাঙালী জাতীয়তাবাদের পিঠে সওয়ার হয়েই বাঙালী মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও সামন্তশ্রেণীর প্রতিনিধি আওয়ামী লীগ বাংলাদেশেব রাজনীতিতে প্রাধান্যলাভ করে। শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধিরা যে এই একই শক্তিকে তাদের নিজেদের কায়দায় ব্যবহার ক'রে প্রাধান্যে আসতে পারল না সেটা তাদের দুর্বলতা।

বাঙালী জাতীযতাবাদেব সংখ্যাগরিষ্ঠ জঙ্গী ধারাটি যখন উত্তরোত্তর পূর্ণ রাষ্ট্রীয় বিচ্ছিন্নতা অর্জনেব আওয়াজের দিকে দ্রুত ধাবমান, আওয়ামী লীগেব গোপন ও স্বার্থপর আপোষপ্রয়াসও যখন সমস্যাব সমাধান করতে পারছে না—এমন একটা সময়ে নেমে এল পাক বাহিনীর হামলা, শুরু হল বাঙালী জাতির বিরুদ্ধে নির্বিচার সর্বাত্মক আক্রমণ এবং তার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষাপ্রয়াসী বাঙালী জাতির স্বতস্ফূর্ত জাতীয় বিদ্রোহ। প্রধান হয়ে উঠল জাতীয় দ্বন্দ্ব, সূচনা হল জাতীয় যুদ্ধের।

কমিউনিস্টরা এই জাতীয় যুদ্ধেব নেতৃত্ব নিতে অস্বীকাব করেছিলেন ব'লেই তার নেতৃত্ব থেকে গিয়েছিল বাঙালী মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও সামন্তশ্রেণীর প্রতিনিধি আওয়ামী লীগের হাতে। এই সরকারকে ক্ষমতায় বসতে সাহায্য করার জন্যই ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশে ঢুকেছিল—আগ্রাসকের পরিচয়ে তাকে ঢুকতে হয়নি। তাই আজ আওয়ামী সরকারের শাসনাধীন দেশে জাতীয় দ্বন্দ্ব নয় আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বই প্রধান। জাতীয় যুদ্ধ নয়, গৃহযুদ্ধই শ্রমিকশ্রেণীর লক্ষ্য।

যখন জাতীয় যুদ্ধের প্রয়োজন ছিল তখন এখানকার কমিউনিস্টদেব অধিকাংশই গৃহযুদ্ধ নিয়ে মেতেছিলেন এবং কার্যত তাঁদের তৎপরতা পাকিস্তানী শাসকশ্রেণীর দালালিতে পর্যবসিত হয়েছিল। আর আজ যখন গৃহযুদ্ধের প্রয়োজন তখন তাঁরা জাতীয় যুদ্ধের আওয়াজ তুলেছেন এবং···এবং কার্যত তাঁদের আওয়াজ আবার বাঙালী শাসকশ্রেণীর দালালিতে পর্যবসিত হচ্ছে। মাও বলেছিলেন যে কমিউনিস্টদের কর্তব্য বিপ্লবী গৃহযুদ্ধ দিয়ে প্রতিবিপ্লবী গৃহযুদ্ধের বিরোধিতা করা এবং বিপ্লবী জাতীয় যুদ্ধ দিয়ে প্রতিবিপ্লবী জাতীয় যুদ্ধের বিরোধিতা করা। এঁরা সেই শিক্ষাকে উল্টে দিতে চাইছেন। প্রতিবিপ্লবী জাতীয় যুদ্ধের সময় এঁরা "বিপ্লবী" গৃহযুদ্ধ দিয়ে তার "বিরোধিতা" করেছেন

আর প্রতিবিপ্লবী গৃহযুদ্ধের সময় এঁরা "বিপ্লবী" জাতীয় যুদ্ধ দিয়ে তার "বিরোধিতা" করতে চাইছেন। বিশ্বাস করা কঠিন, তাই না? কিন্তু একটা দৃষ্টান্ত দেখুন: "এরা" (মার্কিন ও সোভিয়েত) "আমাদের মাতৃভূমিকে গৃহযুদ্ধের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। আজকে আমাদের আওয়াজ হবে, এই গৃহযুদ্ধকে জাতীয় মুক্তির যুদ্ধে পরিণত করুন." ('আত্রাই,' নভেম্বর ১৯৭৪)। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের এহেন সৃজনশীল বিকাশের পর এঁদেরকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ব'লে আর অসম্মান করা আমাদের পক্ষে কি অনুচিত নয়?

পঞ্চম শিক্ষা॥ মাওয়ের উপরোক্ত বক্তব্য থেকে কেবল আধা-উপনিবেশেই নয়, অন্যান্য কয়েকটি অবস্থাতেও জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান হওয়ার মূল নিরিখটি আমরা পেয়ে যাই। আবারও সেই মূল নিরিখটি হল, রাষ্ট্রক্ষমতা দেশীয় কোনো শ্রেণীর হাতে আছে কিনা বা থাকলেও তা বিদেশী কোনো শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে কিনা।

উপনিবেশে জাতীয় দ্বন্দ্ব স্থায়ীভাবে প্রধান থাকে কেন? কারণ সেখানে দেশীয় কোনো শ্রেণীর হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা থাকে না। সেখানে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের একনায়কত্ব কায়েম থাকে এবং তার অর্থই কিন্তু স্থায়ী বৈদেশিক আগ্রাসন।

কিন্তু পূর্ববাংলা কি পাকিস্তানের উপনিবেশ ছিল? না, তার কারণ তাকে পাকিস্তানের শাসকশ্রেণী কখনও সশস্ত্র উপায়ে বলপূর্বক দখল ক'রে নেয়নি। তাহলে সেখানে কোনো এক সময়েই বা জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান হতে পারল কেমন ক'রে? এরই জের টেনে আমরা বাংলাদেশ সম্বন্ধে উপরের আলোচনাটি সম্পূর্ণ করব।

পাকিস্তানের এক অংশ আরেক অংশের উপনিবেশ না হলেও সেই দুই অংশের জাতিসত্তার মধ্যে জাতিগত নিপীড়ন বাস্তব সত্য ছিল এবং এক সময়ে তার তীব্রতম বিন্দুতে পৌঁছে যাওয়াটাও ছিল বাস্তব সত্য। পূর্ববাংলা ইতিপূর্বে পাকিস্তানের উপনিবেশ না হয়ে থাকলেও বাঙালী জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ ও রাষ্ট্রীয় বিচ্ছিন্নতা অর্জনের প্রয়াসকে পাক বাহিনী যখন খোলাখুলি সশস্ত্র উপায়ে দমন করতে শুরু করল তখন থেকে পূর্ববাংলা কার্যত পাকিস্তানের দখলীকৃত উপনিবেশেই পরিণত হল এবং পাক বাহিনীর অবস্থান তখন পর্যবসিত হল দখলদারী ঔপনিবেশিক বাহিনীর অবস্থানেই।

জাতীয় সংগ্রামকে সমর্থন করা বা পরিচালনা করার অর্থই বুঝি শ্রেণী-সংগ্রামকে ঘোলা ক'রে দেওয়া, এমন একটা আবছা ভীতি এখনও আমাদের মধ্যে রয়েছে। নিপীড়িত জাতিগুলির ক্ষেত্রে এটা যে একটা মারাত্মক ভুল তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না, কেননা বহু সময়েই এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে যখন জাতিগত সমস্যাবলীর দ্রুততম সমাধানই হয়ে পড়ে শ্রেণীসংগ্রামের পথকে

ব্যাঘাতমুক্ত করার একমাত্র উপায়।

পাকিস্তানের পূর্বাংশ ও পশ্চিমাংশের মধ্যে জাতিগত নিপীড়ন বাস্তবে বিদ্যমান ছিল ব'লেই সাম্রাজ্যবাদী ও সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদীরা তাকে উসকাতে পেরেছিল এবং নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে পেরেছিল। উল্টোটা ঠিক নয়। অর্থাৎ যেহেতু তারা জাতিগত দ্বন্দ্বকে উসকাচ্ছে অতএব জাতিগত দ্বন্দ্বটাই তাদের "সৃষ্টি" বা এই জাতিগত দ্বন্দ্বটাই একটা প্রতিক্রিয়াশীল ঝামেলা এমন চিন্তা নির্ভেজাল ভাববাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। জাতিগত দ্বন্দ্বকে ঘিরে সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের যে চক্রান্ত ও কারচুপি চলে, এই রকম উটপাখীর পন্থা অবলম্বন করলে তাকে পরাজিত করা তো যায়ই না, বরং তার জয়ের পথই প্রশস্ত ক'রে দেওয়া হয়।

১৯৫২র ভাষা-আন্দোলনের সময় থেকেই পাকিস্তানের পূর্বাংশ ও পশ্চিমাংশের মধ্যে জাতিগত বিরোধ বারবার ফেটে পড়ছিল এবং বিদেশী শোষকরা তাকে ব্যবহার করতে চাইছিল, এই হাতল প্রয়োগ ক'রে তারা আরো বেশী বেশী ক'রে নিজেদের তাঁবে আনতে চাইছিল পাকিস্তানের শাসকশ্রেণীগুলিকে। এই ছিল পাকিস্তানের বাস্তব অবস্থা।

এই পরিস্থিতিতে কমিউনিস্টদের কর্তব্য কি ছিল? প্রথমত জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও রাষ্ট্রীয় বিচ্ছিন্নতা অর্জনের অধিকারকে নীতিগতভাবে বলিষ্ঠতার সঙ্গে স্বীকার করা, দ্বিতীয়ত জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের চাহিদাকে ঘিরে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থোদ্ধারের চক্রান্তকে উন্মোচন করা, তৃতীয়ত পাকিস্তানী জাতিগত প্রভুত্ব এবং বাঙালী সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ উভয়েরই বিরোধিতা করা, কিন্তু বিশেষভাবে প্রথমটির; চতুর্থত যতদূর এবং যতদিন সম্ভব সমগ্র পাকিস্তানে (কেবল তার পূর্বাঞ্চলে নয়) জনগণতন্ত্র কায়েমের প্রচেষ্টা চালানো।

সুতরাং যখন এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে জাতিগত দ্বন্দ্ব ক্রমেই তীব্র হচ্ছে, শ্রেণীসংগ্রামে তা অহেতুক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে এবং তাকে ঘিরে ক্রমেই বাড়ছে বৈদেশিক চক্রান্ত, তখন কি বাঙালী জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীটাকে সরাসরি ও দ্বিধাহীনভাবে মেনে নেওয়া—এমন কি একটা পর্যায়ে প্রয়োজনবোধে সে দাবী সক্রিয়ভাবে তোলাও—শ্রেণীসংগ্রামেরই অবাধ অগ্রগতির পক্ষে সবচেয়ে সহায়ক হত না? নাকি "সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত" নাম দিয়ে জাতিগত দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রটাকে পুরোপুরি সাম্রাজ্যবাদীদের দখলে ছেড়ে রাখার নামই "মার্কসীয় রণকৌশল"? চোরের উপর রাগ ক'রে মাটিতে ভাত খাওয়ার কি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত! সাম্রাজ্যবাদীরা একটা বাস্তব সামাজিক দ্বন্দ্বকে ব্যবহার করছে, অতএব আমরা ওটাকে দৃঢ়ভাবে তাদের হাতেই ছেড়ে রাখব যাতে তারা প্রাণ ভ'রে ওটার সদ্ব্যবহার করতে পারে। হায় রে মার্কসবাদ!

পাকিস্তানের পূর্বাংশে জাতিগত দ্বন্দ্ব যে অমীমাংসেয় ও অপ্রতিরোধ্য হয়ে

উঠেছে তারই প্রতিফলন ঘটেছিল কমিউনিস্টদের অন্তত একটি অংশের "স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ববাংলা" শ্লোগানে। অবশ্য তাঁরা নিজেরাই নিজেদের শ্লোগানকে কতখানি বুঝেছিলেন তা চিন্তার বিষয়। কেননা যখন সেই জাতিগত দ্বন্দ্বই প্রকাশ্যে বিস্ফোরিত হল, পাক বাহিনীর বর্বর জাতিভিত্তিক হত্যাভিযানের মুখে রাষ্ট্রীয় বিচ্ছিন্নতা অর্জনের লড়াই যখন বাস্তব হয়ে উঠল, তখন কমিউনিস্টরা তার নেতৃত্ব ছিনিয়ে নিতে ব্যর্থ হলেন এবং তার নেতৃত্ব পুরোপুরি ছেড়ে দিলেন বাঙালী মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও জমিদারশ্রেণীর প্রতিনিধি আওয়ামী লীগের হাতে।

জাতিগত বিরোধের এই প্রকাশ্য বিস্ফোরণের সুযোগে বিভিন্ন বিদেশী শক্তি স্বার্থোদ্ধারের যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল তাকে নিশ্চয়ই খেয়ালে রাখতে হত, উদ্‌ঘাটন করতে হত এবং পরাজিত করতে হত। কিন্তু তা কি এই বাস্তব সংগ্রামের ধারা থেকে দূরে থেকে, গৃহযুদ্ধের দ্বারা তার "বিরোধিতা" ক'রে এবং সাম্রাজ্যবাদের দালালদের হাতে তার নেতৃত্ব ছেড়ে দিয়ে?

পাকিস্তানী শাসকশ্রেণীর বর্বর গণহত্যা এবং তার বিরুদ্ধে জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার গণসংগ্রাম যখন ইতিমধ্যেই একটি **বাস্তব সত্য** হয়ে উঠেছে তখন কমিউনিস্টদের কর্তব্য ছিল বাঙালী জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রামের বিরোধী হিসাবে না দাঁড়িয়ে তার নেতৃত্বকে সক্রিয়ভাবে নিজেদের হাতে তুলে নেওয়া, যথার্থ আত্মনিয়ন্ত্রণ তথা প্রকৃত স্বাধীনতার প্রবক্তারূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করা; যে আওয়ামী লীগ প্রথম পর্যায়ে পাকিস্তানী শাসকদের সঙ্গে এবং পরবর্তী পর্যায়ে রুশ-ভারতের সঙ্গে বাঙালী জাতির পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার বিরুদ্ধে গোপন আপোষরফার চক্রান্ত আঁটছিল তাকে 'স্বাধীন বাংলা'র প্রবক্তা হতে না দিয়ে যথার্থ স্বাধীনতার শত্রু হিসাবে তার স্বরূপ উন্মোচন করা ও তাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে তার নেতৃত্ব উৎখাত করা (আওয়ামী লীগাররা সব ভারতে চ'লে গিয়েছিল, কমিউনিস্টরা ছিলেন এ দেশে—তাই জাতীয় দ্বন্দ্বকে প্রধান করলে এ কাজ কত সহজে তাঁরা সম্পন্ন করতে পারতেন!); লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধাকে নিজেদের সপক্ষে জয় ক'রে আনা; জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রামের সুযোগে রুশ-ভারতের শাসকশ্রেণীগুলি নিজেরা পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করার যে চক্রান্ত আঁটছিল তার বিরোধিতা করা এবং পূর্ববাংলার যে বিচ্ছিন্নতা অনিবার্য ও অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে তাকে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ার পথে বাস্তবায়িত হতে না দিয়ে জনগণতন্ত্রের পথে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা চালানো। কমিউনিস্টরা যদি এভাবে বাঙালী জাতির ইচ্ছাকে সংগঠিত করতে পারতেন, আওয়ামী লীগকে কোণঠাসা ক'রে বাঙালী জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ-সংগ্রামের নেতারূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন, একমাত্র তাহলেই তাঁরা পারতেন ভারতীয় বাহিনীর প্রবেশের পথে দুরতিক্রম্য বাধা সৃষ্টি করতে। ভারতীয় বাহিনীকে যদি সমগ্র জাতির ইচ্ছা পদদলিত ক'রে সেই জাতির দ্বারা প্রত্যাখ্যাত রাজনীতি-

ব্যবসায়ীদের একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীকে জোর ক'রে ক্ষমতায় বসানোর জন্য ঢুকতে হত, একমাত্র তাহলেই সৃষ্টি হতে পারত তার বিরুদ্ধে জাতীয় যুদ্ধের ডাক দেওয়ার পরিস্থিতি।

কমিউনিস্টরা গতকাল পর্যন্ত ছিলেন বাঙালী জাতির রাষ্ট্রীয় বিচ্ছিন্নতা অর্জনের ঘোর বিরোধী। এরই ফলে তাঁরা ভারতীয় বাহিনীকে আগ্রাসক হিসাবে পরিচিত হতে না দিয়ে বরং জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ আদায়ের হাতিয়ার-রূপেই জনগণের সামনে আবির্ভূত হতে দিয়েছেন, আওয়ামী লীগকে নির্বিবাদে জাতীয় সংগ্রামের নেতা থাকতে দিয়েছেন। আর ভারতীয় বাহিনী ঢোকার পরে এবং আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় বসার পরে তাঁরাই রাতারাতি হয়ে উঠলেন বাঙালী জাতির স্বাধীনতার প্রবক্তা! জনগণকে তাঁরা দুগ্ধপোষ্য শিশু মনে করেন নাকি?

বাঙালী জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বা সে অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে চীন কখনও নিন্দা করেনি। পাকিস্তান দ্বিখণ্ডীকরণের উদ্দেশ্যে রুশ-ভারতের সামরিক হস্তক্ষেপ ও **পাকিস্তানের** উপর ভারতীয় আগ্রাসনেরই সে বিরোধিতা করেছিল এবং বলেছিল যে তার ফলে বাঙালী জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণও রুশ-ভারতের শাসকশ্রেণীর দ্বারা আসলে পদদলিত হয়েছে। বাংলাদেশের কমি-উনিস্টরা এই চমৎকার বিশ্লেষণ থেকে শিক্ষা নিলেন না।

জাতীয় প্রশ্নে লেনিনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশও তাঁরা হৃদয়ঙ্গম করেননি:

(ক) "যে কোনো জাতিগত নিপীড়নই ব্যাপক জনগণের প্রতিরোধ ডেকে আনে এবং জাতিগত নিপীডনে অত্যাচারিত জনতার প্রতিরোধ সর্বক্ষেত্রেই জাতীয় বিদ্রোহের দিকে ঝোঁকে। প্রায়শ নিপীড়িত জাতিসমূহের বুর্জোয়ারা ...শুধু মুখেই বিদ্রোহের কথা বলে কিন্তু বাস্তবে তাদের নিজেদের দেশের জনগণের অগোচরে, এবং তাদের বিরুদ্ধে, জুলুমকারী জাতির বুর্জোয়াদের সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল চুক্তি সম্পাদন করে। জাতীয় আন্দোলন নয়, বরং তার বিকৃতি, অধঃপতন ও তুচ্ছ কলহে রূপান্তরই হবে সর্বক্ষেত্রে বিপ্লবী মার্কস-বাদীদের সমালোচনার লক্ষ্য" ('মার্কসবাদের ব্যঙ্গ ও সাম্রাজ্যবাদী অর্থ-নীতিবাদ')।

(খ) "...শ্রমিকশ্রেণী কখনোই জাতীয় প্রশ্নকে একটা উপাস্যবস্তুতে পরিণত করবে না কেননা পুঁজিবাদের বিকাশ **সব** জাতিকেই আবশ্যিকভাবে স্বাধীন জীবনের জন্য জাগিয়ে তোলে না। কিন্তু একবার শুরু হয়ে যাওয়ার পর গণ জাতীয় আন্দোলনগুলিকে ঠেলে সরিয়ে রাখা, সেগুলোর মধ্যে যা কিছু প্রগতিশীল তাকে সমর্থন করতে অস্বীকার করার অর্থ কার্যত **জাতীয়তাবাদী** সংস্কারেরই দালালি করা, অর্থাৎ 'নিজেদের জাতি'কে স্বীকার করা এক আদর্শ জাতি ব'লে (কিংবা—আমরা যোগ করতে পারি—রাষ্ট্রগঠনের অনন্য

অধিকারসম্পন্ন জাতি ব'লে)" ('জাতি সমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রসঙ্গে')।

পূর্ববাংলার ঘোর "আন্তর্জাতিকতাবাদী"রা বাঙালী জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করতে গিয়ে পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদেরই প্রবক্তা হয়ে উঠলেন, "নিজেদের জাতি" বলতে আঁকড়ে ধরলেন পাকিস্তানকেই!

জাতীয় সংগ্রামের বিরোধিতা করতে গিয়ে পূর্ববাংলার কমিউনিস্টরা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বকে অটুট রাখতেই অচেতনভাবে সহায়তা করেছিলেন। আর "সমাজতান্ত্রিক" বিপ্লবের প্রবক্তারা জাতীয় সংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন বটে কিন্তু আওয়ামী লীগের বেইমান চরিত্রকে তাঁরা সেদিন জনসমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করেননি বরং তার ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বলতর করতেই যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন; প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্ব উৎখাত ক'রে স্বাধীনভাবে জাতীয় সংগ্রামকে সঠিক পথে চালানোর চেষ্টাও তাঁরা করেননি বরং বশংবদের মতো অনুগমন করেছিলেন রুশ-ভারত-মার্কিন-আওয়ামী চক্রান্তকারীদের। আজ তাঁরা খুব নিপুণভাবে কমিউনিস্টদের বিচ্যুতির সমালোচনা করতে পারেন কিন্তু তাঁদের নিজেদের আত্মসমর্পণগুলো নাকি সেদিন ছিল "সঠিক" এবং "বাস্তবানুগ"! আন্তরিক আত্মসমালোচনা যাদের নেই জনগণ বা বিপ্লবীরা তাদের গ্রহণ করবেন কেন?

ষষ্ঠ শিক্ষা॥ মাও বলেছেন যে চীনে যখন জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান হত তখন ইতিপূর্বেকার প্রধান দ্বন্দ্ব অর্থাৎ সামন্ত দ্বন্দ্বটি অপ্রধান অবস্থানে পর্যবসিত হত। তার মানে মাওয়ের মতে আমাদের মতো সমাজগুলিতে হয় জাতীয় দ্বন্দ্ব নাহয় সামন্ত দ্বন্দ্ব এদুটি মৌলিক দ্বন্দ্বেরই কোনো একটিকে প্রধান হতে হবে এবং এগুলি ছাড়া তৃতীয় কোনো দ্বন্দ্ব প্রধান হতে পারে না। সামন্ত দ্বন্দ্ব যখন প্রধান হয় তখন তার দুই মেরুর শ্রেণীসমাবেশে অবশ্য হেরফের হতে পারে এবং সেই অনুযায়ী সামন্ত দ্বন্দ্বের প্রাধান্য অপরিবর্তিত থাকার অবস্থাতেও তারই মধ্যে উদ্ভব হতে পারে বিভিন্ন পর্যায়ের (যথা ১৯২৪-২৭ এবং ১৯২৭-৩৭)[১৩]।

সপ্তম শিক্ষা॥ জাতীয় যুদ্ধের কথা বলার সময় মাও সর্বদাই শত্রু হিসাবে দেখাচ্ছেন কেবলমাত্র বিদেশী বুর্জোয়াদের এবং মুষ্টিমেয় কিছু দেশীয় বিশ্বাসঘাতককে (দেশীয় কোনো পদলেহী **শ্রেণীকে** নয়)। অর্থাৎ সর্বদাই জাতীয় দ্বন্দ্বের এক মেরুতে থাকে সবগুলি শ্রেণীসমবায়ে গঠিত জাতি আর অপর মেরুতে থাকে সাম্রাজ্যবাদ (বা আরো সঠিকভাবে বললে আক্রমণকারী বিশেষ সাম্রাজ্যবাদী দেশটি) ও তার কিছু দেশীয় এজেণ্ট। কিন্তু গৃহযুদ্ধের কথা বলার সময় তিনি সর্বদাই সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীল **শ্রেণী** বা **শ্রেণীসমূহের** উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ সামন্ত দ্বন্দ্বের এক মেরুতে থাকে জনগণ আর অপর

১৩ [মাওয়ের প্রাসঙ্গিক বক্তব্যের এটাই যে একমাত্র সম্ভবপর ব্যাখ্যা সে সম্বন্ধে আরো বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ের ৩নং উপ-পরিচ্ছেদে।]

মেরুতে সর্বদাই সামন্তশ্রেণীর সঙ্গে থাকে সাম্রাজ্যবাদ এবং, আমলা-মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ার উদ্ভব ঘটার পর থেকে, সেই শ্রেণীটিও। এটা সঠিকভাবে না বোঝার ফলে একাধারে দু-ধরনের ভুলের আবির্ভাব ঘটেছে।

বাম-বিচ্যুতিবাদীরা গৃহযুদ্ধের লক্ষ্য হিসাবে কেবল সামন্তশ্রেণীকেই দেখেন এবং মনে করেন যে সামন্ত দ্বন্দ্ব প্রধান হওয়ার অর্থ কেবল সামন্তশ্রেণীকেই আঘাত করা ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লড়াইয়ের ভূমিকা নগণ্য হয়ে যাওয়া। ফলে জাতীয়তাবাদকে ব্যবহার ক'রে গৃহযুদ্ধের কাঠামোর মধ্যেই বিপ্লবী ফ্রন্টকে আরো সম্প্রসারিত করার যে সম্ভাবনা থাকে তাকে তাঁরা অনিবার্যভাবেই অবহেলা করেন, সংকীর্ণতাবাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত করেন বিপ্লবী শক্তি সংগঠিত করার কাজকে। এই উপমহাদেশের মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের মধ্যে বিগত এক দশকে এই বাম বিচ্যুতিরই প্রাবল্য দেখা গেছে।

কিন্তু তার পাল্টা হিসাবে আজ একই ভ্রান্ত ধারণার উৎস থেকে দক্ষিণ বিচ্যুতিরও প্রাদুর্ভাব ঘটছে। দক্ষিণ-বিচ্যুতিবাদীরাও গৃহযুদ্ধের লক্ষ্য হিসাবে কেবল সামন্ত-শ্রেণীকেই দেখেন এবং মনে করেন যে সামন্ত দ্বন্দ্ব প্রধান হওয়ার অর্থ কেবল সামন্তশ্রেণীকেই আঘাত করা ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লড়াইয়ের ভূমিকা নগণ্য হয়ে যাওয়া। অথচ আমাদের সমাজের শ্রেণী-বাস্তবতাটাই এমন যে তা প্রতি-নিয়ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লড়াই ও ব্যাপক ঐক্যের প্রয়োজনকে সামনে আনে। দক্ষিণ-বিচ্যুতিবাদীরা মনে করেন যে সে প্রয়োজন মেটানো যায় কেবল জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান হলেই—গৃহযুদ্ধের কাঠামোর মধ্যে, সামন্ত দ্বন্দ্বের প্রাধান্যের আওতায়, সে প্রয়োজন মেটানোর কোনো সুযোগ নেই। তাঁদের মতে জাতীয় যুদ্ধ ছাড়া জনগণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা ও জাতীয়তাবোধকে ব্যবহার ক'রে বিপ্লবী ফ্রন্টকে অধিকতর সম্প্রসারিত করা সম্ভব নয়। সাম্রাজ্যবাদ ও তার পদলেহীদের বিরুদ্ধে "গৃহযুদ্ধ, এই ধারণাটা তাঁদের কাছে স্ববিরোধী লাগে ব'লেই "সাম্রাজ্যবাদ ও তার পদলেহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ" বলতে তাঁরা কেবল জাতীয় যুদ্ধই বুঝেছেন এবং এক লাফে উপনীত হতে পেরেছেন জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষণার আজগুবি তত্ত্বে।

বিলেতের টমসন সাহেবের মতে বাংলাদেশে বর্তমানে যে যে শ্রেণী প্রধান দ্বন্দ্বটিকে গ'ড়ে তুলেছে তারা হল একদিকে প্রধানত সর্বহারাশ্রেণী ও কৃষক এবং অন্যদিকে সামন্তশ্রেণী ও মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণী। মাও চিন্তাধারা অনুযায়ী এই রকম শ্রেণীবিন্যাসে যে দ্বন্দ্বটি অনিবার্যভাবে প্রধান হয় তা হল সামন্ত দ্বন্দ্ব। মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও সামন্তশ্রেণী নিজেদের অস্তিত্ব ও বিকাশের জন্য সাম্রাজ্য-বাদের উপর নির্ভরশীল, মাওয়ের এই বিশ্লেষণের নজীর দেখিয়ে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে জনগণের (?) দ্বন্দ্বকে প্রধান করার অর্থ লাল পতাকা তুলিয়ে লাল পতাকারই বিরোধিতা করা।

কেরলের অজিতা নারায়ণনও একই রকম শ্রেণীবিন্যাস দেখিয়েছেন তবে খোলাখুলি জাতীয় দ্বন্দ্বকে প্রধান বলতে সাহস পাননি। তিনি কেবল বলেছেন যে সামন্ত দ্বন্দ্ব প্রধান নয়। কিন্তু তাহলে প্রধান হওয়ার মতো আর একটা দ্বন্দ্বই বাকী থাকে, তা হল জাতীয় দ্বন্দ্ব। এটাই তাঁর মনের গোপন চিন্তা, যা মাও চিন্তাধারার বিরোধী। তাঁর ব্রীড়াবনত ভঙ্গীটি কিন্তু ভারী চমৎকার।

শ্রেণীশক্তির মেরুবিন্যাস সম্বন্ধে আমরাও টমসন সাহেব ও অজিতা দেবীর সঙ্গে প্রায় একমত। আমরাও বলি যে আমাদের আলোচ্য সমাজগুলিতে বর্তমানে চারপাহাড় (অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ, আমলা-মুৎসুদ্দি পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদের জোট) এবং জনগণই প্রধান দ্বন্দ্বটিকে গ'ড়ে তুলেছে। কিন্তু আমরা বলি যে ঠিক এই কারণেই এসব সমাজে এখন সামন্ত দ্বন্দ্বই প্রধান, জাতীয় দ্বন্দ্ব নয়।

অষ্টম শিক্ষা ॥ একই প্রক্রিয়ার মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের উদ্ভব প্রধান দ্বন্দ্বের স্থানপরিবর্তনের জন্য হতে পারে, আবার প্রধান দ্বন্দ্ব অপরিবর্তিত থাকলেও তার তীব্রতা ও ব্যাপকতার মাত্রা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক অবস্থার পরিবর্তনের জন্যও হতে পারে। এর একটা মূল তাৎপর্য হল এই যে উভয়ের ফলেই ঐক্য-ফ্রণ্টের পরিধির কম-বেশী হতে পারে। অথচ আমাদের মধ্যে এই ভুল ধারণাটা ব্যাপকভাবে প্রচলিত যে ঐক্য-ফ্রণ্টের পরিধি প্রসারিত হতে পারে কেবল প্রধান দ্বন্দ্বের স্থানপরিবর্তন হলেই। অর্থাৎ আরো স্পষ্ট ক'রে বললে সামন্ত দ্বন্দ্ব প্রধান থাকার সময় বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে, এমন কি সামন্তশ্রেণীর একাংশের সঙ্গেও, সাময়িক ঐক্য কোনো অবস্থাতেই সম্ভব নয়—তা সম্ভব হতে পারে কেবল জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান হলেই। এটাও আবার একাধারে দু-ধরনের ভুলের জন্য দায়ী।

বাম-বিচ্যুতিবাদীরা মনে করেন যে সামন্ত দ্বন্দ্ব প্রধান হলে তার তীব্রতা ও ব্যাপকতার তাৎক্ষণিক মাত্রায় কোথাও কোনো হেরফের হতে পারে না এবং তার ভিত্তিতে বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে, এমন কি সামন্তশ্রেণীর একাংশের সঙ্গেও, সাময়িক ফ্রন্ট নীতিগতভাবেই অসম্ভব। ফলে শোষকশ্রেণীর কোনো অংশবিশেষ ও জনগণের মধ্যেকার বিদ্যমান শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রতা যদি বাস্তবে অপেক্ষাকৃত মৃদু ও গৌণও হয়ে থাকে এবং তার দরুণ যদি তাদের সঙ্গে একটা সাময়িক ঐক্য বাস্তবে সম্ভবপরও হয় তবু তাঁরা তা অনুসন্ধান করতেই অনিচ্ছুক হবেন, বিদ্যমান শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও শ্রেণীসংগ্রামের স্তরকে কল্পনায় বাড়িয়ে দেখবেন এবং ঐক্যের বাস্তব সম্ভাবনাকে বলি দেবেন। চারু মজুমদারের লাইনে আমরা দীর্ঘকাল এই বিচ্যুতির অনুশীলন দেখেছি।

দক্ষিণ-বিচ্যুতিবাদীরাও মনে করেন যে সামন্ত দ্বন্দ্ব প্রধান হলে তার তীব্রতা ও ব্যাপকতার তাৎক্ষণিক মাত্রার কোনো হেরফের হতে পারে না, আনুষঙ্গিক

অবস্থাতেও এমন কোনো হেরফের (যেমন ফ্যাসিবাদ কায়েম হচ্ছে কিনা) হতে পারে না যার ফলে ফ্রন্ট সম্প্রসারিত ক'রে শোষকশ্রেণীর অংশবিশেষকেও তার অন্তর্ভুক্ত করা যায়। একই আদিপ্রতিজ্ঞা থেকে তাঁরা কিন্তু উল্টো সিদ্ধান্তে লাফ দেন। বাস্তবে বিদ্যমান শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রতার প্রকৃত মাত্রার ভিত্তিতে ঐক্যের সন্ধান না ক'রে তাঁরা তাঁদের ঐক্যের আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে প্রধান দ্বন্দ্ব নির্ধারণ করতে চান এবং বাস্তবে সামন্ত দ্বন্দ্ব প্রধান হওয়া সত্ত্বেও তাকে বিসর্জন দিয়ে তাঁরা জাতীয় দ্বন্দ্বকেই প্রধান করেন। ফলে শোষকশ্রেণীর অংশবিশেষ ও জনগণের মধ্যেকার বিদ্যমান শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও শ্রেণীসংগ্রাম যদি বাস্তবে তীব্রও হয়ে থাকে এবং তার দরুণ যদি তার সঙ্গে সাময়িক ঐক্য বাস্তবে সম্ভবপর না-ও হয় তবু তাঁরা সে বিষয়টি অনুসন্ধান করতেই অনিচ্ছুক হবেন, বিদ্যমান শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও শ্রেণীসংগ্রামের স্তরকে কল্পনায় কমিয়ে দেখবেন, তীব্রতম শ্রেণীসংগ্রামের বাস্তব সম্ভাবনাকে জলাঞ্জলি দিয়েই ঐক্য করতে চাইবেন আর এই বিচ্যুতিকে সমর্থনযোগ্য ক'রে তোলার জন্যই আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের স্থলে বসাবেন বাহ্যিক দ্বন্দ্বকে। জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকদের লাইনে এই চিন্তারই প্রতিফলন ঘটেছে।

নবম শিক্ষা॥ সামন্ত দ্বন্দ্ব প্রধান হলেও গৃহযুদ্ধের আশ্রয় নেওয়ার ব্যাপারে মাও কিন্তু "প্রায়ই" কথাটা ব্যবহার করেছেন। সুতরাং 'সামন্ত দ্বন্দ্ব প্রধান' মানেই গৃহযুদ্ধ নয়—সামন্তবাদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব প্রধান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু ক'রে দেওয়ার চিন্তা একটা বাম-হঠকারী প্রবণতা। সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার জন্য নানা অবজেকটিভ ও সাবজেকটিভ শর্তের সতর্ক বিবেচনা প্রয়োজন। এ সত্যও আমরা দীর্ঘদিন বুঝিনি।

দশম শিক্ষা॥ মাওয়ের উপরোক্ত বক্তব্য থেকে আমরা আরো একটি সমস্যার সমাধান পাই। আমরা জানি যে বস্তুর বিকাশে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বই সর্বদা প্রধান ভূমিকা পালন ক'রে থাকে। কিন্তু তাহলে একটা সমাজে জাতীয় দ্বন্দ্বের মতো একটি বাহ্যিক দ্বন্দ্ব কোনো এক বিশেষ পরিস্থিতিতেই বা প্রধান হয় কেমন ক'রে? এই সমস্যার সমাধান কি?

সমাধান একটাই। জাতীয় দ্বন্দ্বের মতো বাহ্যিক একটি দ্বন্দ্ব প্রধান হতে পারে একমাত্র তখনই যখন তা আর বাহ্যিক দ্বন্দ্ব থাকে না, যখন তা পুরোপুরি আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তা হতে পারে একমাত্র যখন সাম্রাজ্যবাদ সমাজের ভিতরে পুরোপুরি একটি প্রত্যক্ষ শাসনক্ষমতায় রূপান্তরিত হয় বা অন্তত সেই উদ্দেশ্যে সরাসরি সমাজের মধ্যে সশস্ত্রভাবে ঢুকে পড়ে। দেশীয় কোনো শ্রেণী যতক্ষণ শাসনক্ষমতায় থাকে ততক্ষণ তার মারফৎ সাম্রাজ্যবাদ যত জাতীয় নিপীড়নই চালাক তা প্রধানত একটি বাহ্যিক দ্বন্দ্ব হয়েই থাকে, যা স্বভাবতই কোনোমতে প্রধান দ্বন্দ্ব হতে পারে না। জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-

ঘোষকরা দ্বন্দ্বতত্ত্বের এই প্রাথমিক শিক্ষাও ভুলে গেছেন।

একটা সমাজের বিকাশের আভ্যন্তরীণ চালিকাশক্তি হল শ্রেণীসংগ্রাম। তাই শ্রেণীসংগ্রামই হল কমিউনিস্টদের সমস্ত চিন্তা ও কাজের প্রারম্ভবিন্দু। বাস্তবে বিদ্যমান শ্রেণীসংগ্রামের মধ্যে সচেতনতা সঞ্চার করা এবং তার ক্রমান্বয়ী বিকাশের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করাই হচ্ছে কমিউনিস্টদের কর্তব্য। শ্রেণীসংগ্রামটাই প্রধান বিষয়, অন্যান্য বিষয় তারই অন্তর্ভুক্ত। তাই মাও শ্রেণীসংগ্রামকে জাতীয় সমস্যার অন্তর্ভুক্ত হিসাবে না দেখে বরং বলেছেন যে "শেষ বিচারে জাতীয় সংগ্রাম হচ্ছে শ্রেণীসংগ্রামের একটি বিষয়।" কিন্তু জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য ঘোষকদের চিন্তা ঠিক এর বিপরীত। তাঁদের প্রারম্ভবিন্দু শ্রেণীসংগ্রাম নয়, বরং জাতীয় সমস্যা; তাঁদের কাছে জাতীয় সংগ্রাম শ্রেণীসংগ্রামের অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয় নয়, বরং শ্রেণীসংগ্রামই জাতীয় সংগ্রামের অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয়, যেমন: "এ লড়াই" (=কৃষিবিপ্লবের লড়াই অর্থাৎ শ্রেণীসংগ্রাম) "যে জাতীয় মুক্তি বিপ্লবেরই করণীয় কাজ তা প্রচার করতে হবে। কারণ জাতীয় বিপ্লব ও গণতান্ত্রিক বিপ্লব এখানে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত (interrelated)" ('ভূমিবিপ্লবের সুর নয় কেন': জহির হোসেন)। কিন্তু কথা হচ্ছে, জাতীয় বিপ্লব ও গণতান্ত্রিক বিপ্লব কোথায় অন্তঃসম্পর্কিত নয়? সর্বত্রই তারা অন্তঃসম্পর্কিত। অতএব জহির সাহেবের মতে সর্বত্রই শ্রেণীসংগ্রাম "জাতীয় মুক্তি বিপ্লবেরই করণীয় কাজ" ('জাতীয় মুক্তি বিপ্লব' কথাটিকে যে তাঁরা জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান হওয়ার অর্থেই ব্যবহার ক'রে থাকেন তা তো পাঠকরা ইতিমধ্যেই জেনেছেন) — উল্টোটা নয়! মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

উৎপাদনশক্তি ও উৎপাদনসম্পর্কের মধ্যে উৎপাদনশক্তিই প্রধান দিক। কিন্তু উৎপাদনসম্পর্কের পরিবর্তন ছাড়া যখন উৎপাদনশক্তি আর বিকশিত হতে পারে না তখন উৎপাদনশক্তির বিকাশের প্রয়োজনেই, ব্যতিক্রম হিসাবে ও সাময়িকভাবে, উৎপাদনসম্পর্ক ও তার পরিবতন আশু-প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ঠিক তেমনি শ্রেণীসংগ্রামই প্রধান; কিন্তু যখন জাতীয় সমস্যা এমন গুরু-তর ও জরুরী হয়ে ওঠে যে তার সমাধান ছাড়া শ্রেণীসংগ্রাম আর বিকশিত হতে পারে না তখন শ্রেণীসংগ্রামের বিকাশের প্রয়োজনেই, ব্যতিক্রম হিসাবে ও সাময়িকভাবে, জাতীয় সমস্যা ও তার সমাধান আশু-প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। সর্বমোট বিচারে শ্রেণীসংগ্রামই প্রধান, শ্রেণীসংগ্রামের প্রয়োজনেই সবকিছু —জাতীয় সমস্যা শ্রেণীসংগ্রামের অধীন একটি বিষয়।...একজন অ-মার্কসবাদী লেখকও দেখুন চীনের জাপবিরোধী প্রতিরোধযুদ্ধের অন্তর্নিহিত এই বিষয়টিকে কত চমৎকারভাবে বুঝেছিলেন: "...জাপানের সঙ্গে বাহ্যিক বৈরিতার সফল সমাধানের মধ্যেই শ্রেণী-বৈরিতাকে উন্নীত করতে হতে পারে এবং তাছাড়া অবশ্যই শ্রেণী-বৈরিতাকে চরিতার্থ করা যেত না" ('রেড স্টার ওভার

চায়না' : এডগার স্নো, বড় হরফ আমাদের)। অর্থাৎ "বাহ্যিক বৈরিতা" যখন এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যে তার সফল সমাধান ছাড়া "শ্রেণী-বৈরিতাকে চরিতার্থ" করা যায় না, একমাত্র যখনই "বাহ্যিক বৈরিতা"র সমাধান প্রধান দ্বন্দ্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকরা বরং সব পাণ্ডিত্যাভিমান ছেড়ে স্নো সাহেবের কাছ থেকেই মার্কসবাদ শেখার চেষ্টা করুন, ভুলের পরিমাণ তবু অনেক কমাতে পারবেন!

৩. মাও সেতুঙ্ বনাম ডিক ওয়েনস্কট[১৭]

আমার পুরো বইটার—বিশেষত বর্তমান অধ্যায়ের—বক্তব্যের একটা মূল ভিত্তি হিসাবে রয়েছে বর্তমান অধ্যায়ের দ্বিতীয় উপ-পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে উদ্ধৃত মাওয়ের 'দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে' প্রবন্ধের তিনটি অনুচ্ছেদের এক বিশেষ ব্যাখ্যা। আমি ধ'রে নিয়েছি যে মাওয়ের মতে : (১) আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্তবাদী সমাজে মৌলিক দ্বন্দ্বদুটির মধ্য থেকেই যে কোনো একটি প্রধান হতে পারে এবং এদের বাইরের তৃতীয় কোনো দ্বন্দ্ব প্রধান হওয়া সম্ভব নয় ; (২) চীনের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিপ্লবের বিজয় পর্যন্ত সমগ্র সময়কালটিতে কেবল ১৯৩৭-৪৫এ জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান ছিল এবং বাকী প্রত্যেকটি পর্যায়ে (১৯২৪-২৭, ১৯২৭-৩৭ ও ১৯৪৫-৪৯এ) চীনে প্রধান ছিল সামন্ত দ্বন্দ্ব।

আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে উদ্ধৃত অনুচ্ছেদ তিনটির এই স্বতঃসিদ্ধপ্রায় ব্যাখ্যাকে কেউ চ্যালেঞ্জ করতে পারে। কিন্তু পরে জানতে পারলাম, এমনও অনেকে আছেন যাঁরা উক্ত অনুচ্ছেদ তিনটির অর্থ এইভাবে ব্যাখ্যা করেন যেন মাওয়ের মতে : (১) আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্তবাদী সমাজে মৌলিক দ্বন্দ্বদুটির বহির্ভূত তৃতীয় কোনো দ্বন্দ্ব—সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় শাসকশ্রেণীগুলির জোটের সঙ্গে ব্যাপক জনগণের দ্বন্দ্ব—প্রধান হতে পারে ; (২) ১৯১১, বিশেষত ১৯১৯ সালের পর থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত সমগ্র সময়কালটিতে কেবলমাত্র ১৯৩৭-৪৫এর পর্যায় বাদ দিলে এই তৃতীয় দ্বন্দ্বটিই চীনে আগাগোড়া প্রাধান্যে থেকেছে।

উদ্ধৃত অনুচ্ছেদ তিনটির এই দু-ধরনের ব্যাখ্যার মধ্যে কোনটা সঠিক? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে আমাদের প্রতিপক্ষের বক্তব্যের যুক্তিগত ভিত্তিটা পরীক্ষা ক'রে দেখা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে আমি এখানে ব্যবহার করব 'ফ্রন্টিয়ার' (৭, ১৪ ও ২১ আগস্ট ১৯৭৫) পত্রিকায় প্রকাশিত ডিক ওয়েন-

১৭ এই উপ-পরিচ্ছেদটি আমার কারামুক্তির পর যোগ করা।

স্কটের 'ডেভেলপমেণ্ট অব কণ্ট্রাডিকশনস ইন মডার্ন চাইনিজ সোসাইটি' প্রবন্ধটিকে। এর কারণ, প্রথমত আমি যতদূর জানি উক্ত প্রবন্ধেই প্রতিপক্ষীয়-দের আলোচ্য বক্তব্যটির সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ ও সুসংবদ্ধ উপস্থাপনা ঘটেছে এবং দ্বিতীয়ত আমাদের মতো দেশগুলিতে সাহেবদের বলা যে কোনো কথাই আজও একটা বিশেষ গুরুত্ব পায় আর তাই উক্ত প্রবন্ধটিও এ অঞ্চলের মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের নিঃসন্দেহে বেশ ভালোভাবে নাড়া দিয়েছে এবং দেবে।

আমরা পাঠককে অনুরোধ করব, তিনি যেন এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় উপ-পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত (পৃঃ ১৪৯-৫১) 'দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে' প্রবন্ধের ৮নং অংশের পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম অনুচ্ছেদের সঙ্গে মিলিয়ে এই উপ-পরিচ্ছেদের বাকীটুকু পড়েন।

ওয়েনস্কটের মূল যুক্তিধারাটি এই :

(১) মাও উক্ত তিনটি অনুচ্ছেদে, দুটি নয়, **তিনটি** পরিস্থিতি বর্ণনা করেছেন—পঞ্চম অনুচ্ছেদেই তিনি দুটি পরিস্থিতির বর্ণনা সেরেছেন আর ষষ্ঠ ও সপ্তম অনুচ্ছেদ জুড়ে করেছেন অন্য একটি পরিস্থিতির বর্ণনা।

পঞ্চম অনুচ্ছেদে মাও দুটো চরম পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেছেন। প্রথম পরি-স্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদ "অপেক্ষাকৃত শান্ত ও অপ্রকট কায়দায়," "প্রধানত ব্যবসায়ী ও শিল্পপতির বেশে" "দেশটির আভ্যন্তরীণ সামন্ত প্রশাসনে উল্লেখযোগ্য হস্তক্ষেপ না ঘটিয়ে" দেশটির অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা চালায় এবং দেশের আধা-সামন্তবাদী সরকার সেটা "সহ্য" করে, যদিও "প্রধানত সাম্রাজ্যবাদের নিকট আত্মসমর্পণ না ক'রে" ; এই পরিস্থিতিতে সামন্ত দ্বন্দ্ব প্রধান হত। কিন্তু ১৯১১, বিশেষত ১৯১৯ সালের পর থেকে চীনে এই দ্বিতীয় ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া আর সম্ভব ছিল না। মাও অবশ্য বলেছেন যে প্রথম পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটার আগে (অর্থাৎ জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান হওয়ার আগে) সামন্ত দ্বন্দ্ব প্রধান থাকে এবং তারপরই অবশ্য প্রথম পরিস্থিতির (জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান হওয়ার) উদাহরণরূপে ১৯৩৭-৪৫এর চীন-জাপান যুদ্ধের উল্লেখ করেছেন, তবু এর দ্বারা যে মাও ১৯৩৭-৪৫এর আগে সামন্ত দ্বন্দ্ব প্রধান থাকার কথা বলতে চেয়েছেন এমন অর্থ করা যায় না[১৫]।

(২) ষষ্ঠ ও সপ্তম অনুচ্ছেদে মাও উপরোক্ত দুটি চরম পরিস্থিতির মধ্যবর্তী **তৃতীয় ধরনের** পরিস্থিতিসমূহ বিশ্লেষণ করেছেন, যেখানে জাতীয় ও সামন্ত দ্বন্দ্বের অতিরিক্ত **তৃতীয় কোনো দ্বন্দ্ব** প্রধান হয়। ১৯১১, বিশেষত ১৯১৯ সালের পর থেকে চীনে কেবল প্রথম ও তৃতীয় পরিস্থিতিই সম্ভব ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় পরি-স্থিতির থেকে তৃতীয় পরিস্থিতির পার্থক্যটা কোথায় যার দরুণ প্রধান দ্বন্দ্বের এই ভিন্নতা ? "পার্থক্যটা এই যে এই তৃতীয় পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক

১৫ !!!!

ও রাজনৈতিক চাপ যে শুধু বেড়েছে তা-ই নয়, তা এমনভাবে বেড়েছে যে তার ফলে 'আধা-ঔপনিবেশিক দেশসমূহের শাসকশ্রেণীগুলি সাম্রাজ্যবাদের নিকট আত্মসমর্পণ করে' (মাও)।…ফলত আত্মসমর্পণই সম্পর্কের প্রধান দিক হয়ে ওঠে…।" "প্রথম পরিস্থিতিতেও কিছু পরিমাণ আত্মসমর্পণ থাকে, কিন্তু তা গৌণ প্রকৃতির।" এই তৃতীয় পরিস্থিতিতে তৃতীয় যে দ্বন্দ্বটা প্রধান হয়ে ওঠে তা হল সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় শাসকশ্রেণীগুলির জোটের সঙ্গে জনগণের দ্বন্দ্ব।

এই যুক্তিধারার বিরুদ্ধে আমাদের জবাব এই :

(১) আলোচ্য তিনটি অনুচ্ছেদে মাও তিনটি কেন, তার চেয়েও বেশী পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়েছেন কিন্তু **প্রধান দ্বন্দ্বের দিক থেকে** বলতে গেলে তিনি আসলে দুটি পরিস্থিতিই বিশ্লেষণ করেছেন—পঞ্চম অনুচ্ছেদে একটি, ষষ্ঠ ও সপ্তম অনুচ্ছেদে আরেকটি।

পঞ্চম অনুচ্ছেদে মাও বর্ণনা দিয়েছেন কেবল প্রথম পরিস্থিতির। দ্বিতীয় পরিস্থিতির কোনো বর্ণনা এমন কি উল্লেখ তাতে নেই। কেবল প্রথম পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটার ফলে তার প্রধান দ্বন্দ্বটি (অর্থাৎ জাতীয় দ্বন্দ্ব) কোন পূর্বতন দ্বন্দ্বকে প্রাধান্য থেকে হটিয়ে দেয় তার একটি গৌণগুরুত্বসম্পন্ন উল্লেখ আছে বন্ধনীর মধ্যে। কিন্তু এটুকুই আবার একটা বিষয় নিঃসংশয়ে পরিষ্কার ক'রে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। মাও যেহেতু বলছেন যে প্রথম পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটার আগে সামন্ত দ্বন্দ্ব প্রধান ছিল এবং তারপর যেহেতু তিনি সেই প্রথম পরিস্থিতির একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে ১৯৩৭-৪৫এর পর্যায়টির উল্লেখ করেছেন, সুতরাং এটার একটিমাত্র ব্যাখ্যাই সম্ভবপর এবং তা হল, ১৯২৪-২৭ ও ১৯২৭-৩৭এ সামন্ত দ্বন্দ্বই প্রধান ছিল। ওয়েনস্কট তো দূরের কথা, স্বয়ং মাও এসেও নিজের লেখার অন্য কোনো অর্থ দাঁড় করাতে পারতেন না। তাই এ সম্বন্ধেও সন্দেহ থাকে না যে পরে যখন মাও ১৯২৭-৩৭এর পর্যায় প্রসঙ্গে "সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তশ্রেণীর মৈত্রীর বিরুদ্ধে জনগণের গৃহযুদ্ধের" কথা ও "আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলি বিশেষভাবে তীক্ষ্ণ" হয়ে ওঠার কথা বলেছেন (ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ) কিংবা সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক বিপ্লবী ফ্রন্টকে ভিতর থেকে ভাঙার এবং এক মেরুতে সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় প্রতিক্রিয়ার জোট আর অন্য মেরুতে জনসাধারণ দ্বারা প্রধান দ্বন্দ্বটি গঠিত হওয়ার দৃষ্টান্তরূপে ১৯২৭-৩৭এর উল্লেখ করেছেন (সপ্তম অনুচ্ছেদ), তখনও ১৯২৭-৩৭এর পর্যায়কালটিতে সামন্ত দ্বন্দ্বেরই প্রাধান্য তিনি বলবৎ রাখছেন—ওয়েনস্কটের উদ্ভাবিত "তৃতীয়" কোনো দ্বন্দ্বের প্রাধান্য নয়।

(২) আসলে প্রধান দ্বন্দ্বের দিক থেকে তৃতীয় কোনো ধরনের পরিস্থিতির সম্ভাবনাটাই ওয়েনস্কটের একটি উদ্ভট কল্পনামাত্র। তৃতীয় কোনো পরিস্থিতি যদি সত্যিই সম্ভবপর হয় তবে তাকে দ্বিতীয় পরিস্থিতি থেকে আলাদা ক'রে চেনার কোনো নিরিখ নিশ্চয়ই থাকতে হবে। ওয়েনস্কট তা দিতে পারছেন না

কেন ? আর দিতে না পারলে তৃতীয় কোনো পরিস্থিতির কথা বলার অধিকার কারো থাকতে পারে কি ? তিনি বলছেন, দ্বিতীয় পরিস্থিতিতে দেশীয় শাসক-শ্রেণীগুলির "কিছু পরিমাণে" আত্মসমর্পণ থাকে কিন্তু তা তখনও "গৌণ" পর্যায়ের, আর তৃতীয় পরিস্থিতিতে সেই আত্মসমর্পণই হয়ে ওঠে "সম্পর্কের প্রধান দিক"। কিন্তু এতে কি দ্বিতীয় ও তৃতীয় পবিস্থিতিকে আলাদা ক'রে চেনার সমস্যার সমাধান হল, নাকি সমস্যাটিকেই ভিন্ন ভাষায় ঘুরিয়ে রাখা হল মাত্র ? কি ক'রে বুঝব আত্মসমর্পণের দিক "গৌণ" রয়েছে না "প্রধান" হয়েছে ? প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় পরিস্থিতি থেকে পৃথকীকরণীয় কোনো তৃতীয় পরিস্থিতির অস্তিত্ব সম্ভব নয় ব'লেই ওয়েনস্কটের পক্ষে তাদের পার্থক্যের কোনো নিরিখ দেওয়াও সম্ভব হচ্ছে না।

(৩) ওয়েনস্কটের বর্ণিত তৃতীয় ধরনের কোনো দ্বন্দ্ব যদি চীনে সত্যিই থাকত এবং বিশেষত তা যদি সত্যিই চীন বিপ্লবের সমগ্র পর্যায়কালটির (১৯২১-১৯৪৯) অধিকাংশ সময় জুড়ে **প্রাধান্যের** অবস্থানে থাকত, তাহলে চীনা সমাজের দ্বন্দ্বগুলি বর্ণনা করার সময় মাও নিশ্চয়ই তার উল্লেখ করতেন। কিন্তু ঐ 'দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে' প্রবন্ধটিরই ৩নং অংশে তিনি বলছেন : "দৃষ্টান্তস্বরূপ, চীনের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের গতিপথে···রয়েছে চীনা সমাজের সবকটি নিপীড়িত শ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, ব্যাপক জনগণ ও সামন্তবাদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, সর্বহারাশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, একদিকে কৃষক ও শহুরে পেটি বুর্জোয়াশ্রেণী এবং অন্যদিকে বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল শাসকচক্রের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, ইত্যাদি।" এতগুলি দ্বন্দ্বের উল্লেখ রয়েছে, নামগন্ধ নেই কেবল ওয়েনস্কটের সেই "তৃতীয়" দ্বন্দ্বটির, সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় শাসক-শ্রেণীগুলির জোটের সঙ্গে জনগণের দ্বন্দ্বটির, যদিও ১৯১৯এর পর থেকে চীন বিপ্লবের অধিকাংশ সময় জুড়ে তা-ই নাকি ছিল **প্রধান দ্বন্দ্ব** !

(৪) এবার যে যুক্তিটি রাখছি তার লঘুত্বের জন্য পাঠকদের কাছে প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। পাঠকরা আশা করি আমাদের নিরুপায় অবস্থাটা দেখে সহৃদয় হবেন এবং বুঝতে পারবেন যে আমাদের খণ্ডনের লঘুত্বটা আসলে ওয়েনস্কটের যুক্তির লঘুত্বেরই এক অতিসংকুচিত প্রতিফলন।

চীনের ইতিহাসের যে পর্যায়টা নিয়ে ওয়েনস্কটের কারবার সেই পর্যায় সম্বন্ধেই মাও বলছেন : "সাম্রাজ্যবাদ ও চীনা জাতির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব এবং সামন্তবাদ ও ব্যাপক জনগণের দ্বন্দ্বই হচ্ছে আধুনিক চীনা সমাজের মৌলিক দ্বন্দ্ব" ('চীন বিপ্লব ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টি')। এই দুটো দ্বন্দ্বের সঙ্গে ওয়েনস্কটের "তৃতীয়" দ্বন্দ্বটি যোগ করলে দাঁড়ায় যে "আধুনিক" চীনা সমাজে অন্তত **তিনটি** দ্বন্দ্ব সক্রিয় ছিল এবং সেগুলি হল : সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে চীনা জাতির দ্বন্দ্ব, সামন্তবাদের সঙ্গে ব্যাপক জনগণের দ্বন্দ্ব এবং **তারপর আবার** সাম্রাজ্যবাদ ও

সামন্তবাদের (ও আমলা-মুৎসুদ্দি পুঁজিবাদের) জোটের সঙ্গে ব্যাপক জনগণের দ্বন্দ্ব! পাঠক, পড়তে পড়তে হয়তো ব্যাপারটা ঠিক খেয়াল করেননি, তাই পূর্ববর্তী বাক্যটা আবার পড়ুন এবং তারপর যদি হাসি সামলাতে পারেন তাহলে আমার বইটা আর আপনার পড়ার দরকার নেই। "তিনটি" দ্বন্দ্বের কথা বলা হচ্ছে: (ক), (খ) – এবং (ক+খ) !…ঘরে কজন লোক? দুজন: রাম আর শ্যাম। কই আমি তো দেখছি তিনজন লোক: রাম, শ্যাম এবং রাম+শ্যাম!!

আসলে আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্তবাদী দেশে প্রধান দ্বন্দ্ব নিরূপণের সমস্যাটি হল মৌলিক দ্বন্দ্বদুটির মধ্য থেকে কখন কোনটা প্রধান হবে তারই শর্তাবলী নিরূপণ করা। এই বিষয়টি নিয়ে তৃতীয় বিশ্বের মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের মধ্যে চলমান বিতর্কটি ওয়েনস্কটের কাছে এত দুর্বোধ্য ও দুঃসহ লেগেছে যে তিনি অতিচালাকের মতো ওই পুরো বিতর্কটাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেছেন এক অভিনব সমাধানের দিকে। মৌলিক দ্বন্দ্বদুটির মধ্যে কখন কোনটা প্রধান হয় সে বিতর্কের মীমাংসা যখন কিছুতেই হচ্ছে না, তখন ওই দুটি মৌলিক দ্বন্দ্বকেই যোগ ক'রে[১৬] ও জগাখিঁচুড়ী পাকিয়ে "তৃতীয়" একটা দ্বন্দ্ব তৈরী কর না কেন, এবং তারপর সেটাকে প্রধান ক'রে দিলেই তো কোনো পক্ষের আর কিছু বলার থাকে না, বাপু! যেন দুই পুত্র এসে বাবাকে জিগ্যেস করল, 'বাবা, আমাদের মধ্যে কে বেশী বুদ্ধিমান?' আর বাপ এই মহাসঙ্কট থেকে পরিত্রাণ পেতে জবাব দিলেন, 'তোমরা দুজনেই বেশী বুদ্ধিমান'! কিন্তু ওয়েনস্কটের এই মহান তাত্ত্বিক সমাধানের তাৎপর্য দুটো। প্রথমত তা একই দেশের মধ্যে দুটো পৃথক দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব স্বীকার করার পরেও আবার তৃতীয় এমন একটি দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব কল্পনা করে যা পূর্বোক্ত দুটি দ্বন্দ্বেরই মোটামুটি যোগফল (অর্থাৎ দেশটির অভ্যন্তরে বিদ্যমান দ্বন্দ্বগুলির তালিকা তখন হয় এই রকম: সামন্ত দ্বন্দ্ব, জাতীয় দ্বন্দ্ব, তদুপরি সামন্ত দ্বন্দ্ব+জাতীয় দ্বন্দ্ব…), এবং এই উদ্ভটত্বের ব্যাপারটাই আমরা পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছি; দ্বিতীয়ত পৃথক পৃথক দুটি মৌলিক দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব স্বীকার করার পরে সে দুটিকেই **একত্রে** তারপর প্রধান দ্বন্দ্বরূপে হাজির ক'রে তা কার্যত মৌলিক ও প্রধান দ্বন্দ্বের পার্থক্যই অস্বীকার করেছে, যা মাও চিন্তার সরাসরি সংশোধন।

(৫) ১৯২৪-২৭এ সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের জোটের বিরুদ্ধে জনগণের

১৬ এখানে অবশ্য কেবল ওয়েনস্কটের মূল মনোভাবটার কথাই বলা হয়েছে, কেননা যোগটা তিনি ঠিক নিঁখুতভাবে করেননি (করা সম্ভবও নয়): একদিকে তিনি সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের সঙ্গে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াকেও জুড়েছেন, অন্যদিকে 'জাতি' ও 'জনগণ' এ দুটোকে মিলিয়ে দিয়েছেন 'জনগণ'এর মধ্যে। একটু পরেই পাঠক দেখতে পাবেন যে এ হেন দেবদুর্লভ 'ওয়েনস্কট চিন্তাধারা' আসলে হল জাতীয় দ্বন্দ্বের স্থায়ী প্রাধান্য-ঘোষণারই এক ঘোমটা-ঢাকা সংস্করণ – নতুন বোতলে পুরোনো মদ।

গৃহযুদ্ধ চললেও প্রধান দ্বন্দ্বটা ছিল সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের জোটের সঙ্গে নয় বরং কেবলমাত্র সামন্তবাদের সঙ্গে, এবং ১৯২৭-৩৭এ একদিকে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তশ্রেণী ও আমলা-মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণীর জোট ও অন্যদিকে ব্যাপক জনগণ প্রধান দ্বন্দ্বটিকে "গ'ড়ে" তুললেও প্রধান দ্বন্দ্ব ছিল ঐ জোটের সঙ্গে নয় বরং কেবলমাত্র সামন্তবাদের সঙ্গে—এই আপাত-অসঙ্গতির সমাধান করতে গেলে প্রধান দ্বন্দ্ব, অর্থাৎ তার সামাজিক বিষয়বস্তু, এবং প্রধান দ্বন্দ্বের মেরুদ্বয়ের শ্রেণীগত গঠন এই দুটোকে পৃথক করতে হবে। পাঠক এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা পাবেন এই বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে 'সম্পাদকের চিঠির জবাবে' লেখাটিতে।

কথাশেষ

এ পর্যন্ত আমরা নানা দিক থেকে দেখাতে চেষ্টা করেছি যে আমাদের দেশগুলির সমাজ-চরিত্রায়ণ ও প্রধান দ্বন্দ্ব নির্ধারণ সম্বন্ধে জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকদের বক্তব্য মার্কসীয় তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

কিন্তু সেই সঙ্গে এ-ও আমরা দেখিয়েছি যে সামন্ত দ্বন্দ্বকে প্রধান ধ'রে এই উপমহাদেশের মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা গত কয়েক বৎসর যাবৎ যে লড়াই চালিয়েছেন তাতে প্রধান দ্বন্দ্ব নির্ধারণ সঠিক থাকলেও তৎসংক্রান্ত উপলব্ধিতে ছিল সংকীর্ণতাবাদ, রুদ্ধদ্বারবাদ ও একপেশেমির গুরুতর ত্রুটি।

সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকরা প্রশ্ন তুলে বসবেন: "তাহলে সংগ্রামের **অন্তর্বস্তুর** দিক থেকে আপনাদের সঙ্গে আমাদের আর তফাৎ রইল কি? একই ফ্রণ্ট, একই যুদ্ধ—আপনারা যাকে বলেছেন 'গৃহযুদ্ধ' আমরা তাকেই বলছি 'জাতীয় যুদ্ধ'। নামের তফাৎ বৈ তো নয়! নিছক একটা নাম নিয়ে এ হেন পণ্ডিতী কূটতর্কের কি অর্থ?"

কিন্তু এ কি সত্যিই একটা "নামের তফাৎ", "পণ্ডিতী কূটতর্ক"? দেশে দেশে যুগে যুগে সুবিধাবাদ অবশ্য এইভাবেই মতপার্থক্যের তীক্ষ্ণ ধারগুলিকে ভোঁতা ক'রে দিতে চায়, মোলায়েম ক'রে দিতে চায় মতাদর্শগত সংগ্রামের তীব্রতাকে। তখন মার্কসবাদীদের কর্তব্য হয় মৌলিক পার্থক্যগুলিকে একেবারে সূচীমুখ তীক্ষ্ণতার সঙ্গে উদ্ঘাটন করা, আবছা "পার্থক্য"কে অমীমাংসেয় বৈপরীত্যের আকারে স্পষ্ট ক'রে তোলা।

নিছক ব্যবহারিক দিক থেকে জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকদের ভ্রান্ত তত্ত্বের বিষময় তাৎপর্যটা কি?

সমাজ-চরিত্রায়ণের ক্ষেত্রে তাঁদের মূল স্ববিরোধ হল এইখানে যে আমাদের দেশগুলিতে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও জমিদারশ্রেণীকে রাষ্ট্রক্ষমতাসীন ব'লে স্বীকার ক'রেও তাঁরা এগুলোকে চরিত্রায়িত করেছেন 'নয়া-উপনিবেশ' ব'লে—মার্কসবাদের মতে যেখানে দেশীয় কোনো শ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকতেই পারে না। ডাইনে-বাঁয়ে যতই তাঁরা মোচড় দিন না কেন, এই ফ্যাসাদটি থেকে তাঁরা কিছুতেই বেরোতে পারেননি। তবু গোঁয়ারের মতো নিজেদের বক্তব্যে অটল থাকতে গেলে তাঁরা দুটো গোঁজামিলের আশ্রয় নিতে পারেন: (১) হয় তাঁরা তাঁদের "সামান্য" ভুলটুকু "শুধরে" নিয়ে বলবেন যে এসব দেশে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও জমিদারশ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতায় নেই, নতুবা (২) মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও জমিদার-

শ্রেণীকে রাষ্ট্রক্ষমতাসীন ব'লে স্বীকার ক'রেও তাদের সরকারকে তাঁরা দেখাবেন সাম্রাজ্যবাদের "পুতুল সরকার" ব'লে। উভয় গোঁজামিলের পরিণতিটা কিন্তু একই দাঁড়াবে: উক্ত শ্রেণীগুলির ঘৃণ্যতম লেজুড়বৃত্তি এবং বিপ্লবের কেন্দ্রীয় কর্তব্য অর্থাৎ রাষ্ট্রক্ষমতা-দখলের প্রশ্নকে নির্বিবাদে বিসর্জনদান।

যেমন প্রথম ধরনের গোঁজামিলের অনিবার্য পরিণতি কি? যেসব শ্রেণী বাস্তবে প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন তারা আমাদের মহামান্য প্রতিপক্ষের ভুল শোধরানোর ঠেলায় রাতারাতি রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে ছিটকে পড়বে না। কিন্তু জাতির সবগুলি শ্রেণীকে না পেলে জাতীয় যুদ্ধ অসম্ভব। অতএব জাতীয় যুদ্ধের লাইন নিলে, কেবল জাতীয় বুর্জোয়া নয় (কেননা তার সঙ্গে মৈত্রী সামন্ত দ্বন্দ্বের প্রাধান্যের সময় অর্থাৎ গৃহযুদ্ধের সময়েও অসম্ভব নয়), **রাষ্ট্রক্ষমতাসীন** মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও জমিদারশ্রেণীর দিকেও "জাতীয় ঐক্যে"র হাত তাঁদের বাড়িয়ে দিতে হবেই। তখন? তখন আর কি, বিপ্লবের কেন্দ্রীয় কর্তব্য স্থায়ী-ভাবে মুলতবী রেখে নাকে তেল দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোনো—আর হ্যাঁ, মধ্যে মধ্যে চোস্ত ভাষায় বিভিন্ন দলের 'রাজনীতির আসল স্বরূপ' আর 'আমার কথা' ছেপে বাজার গরম করা। চমৎকার পেশা!

আর যদি মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও জমিদারশ্রেণীকে রাষ্ট্রক্ষমতাসীন ব'লে মেনে নিয়েও তাদের সরকারকে তাঁরা "পুতুল সরকার" বলেন তাহলে অবস্থাটা হবে আগের চেয়েও ভালো। তাঁরা বলবেন: "বিপ্লবের কেন্দ্রীয় কর্তব্য বানচাল হল কেমন ক'রে? এই সরকারকে পুতুল সরকার ব'লে চিহ্নিত ক'রে আমাদের জাতীয় যুদ্ধ তো আমরা তার বিরুদ্ধেই পরিচালনা করছি।" কিন্তু দুনিয়ায় দুষ্ট লোকের অভাব নেই। তারা ফ্যাচাং তুলবে: এই সরকারকে যদি সাম্রাজ্যবাদের পুতুলই বলা হয় তাহলে আবার মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও জমিদারশ্রেণীর হাতে রাষ্ট্র-ক্ষমতা থাকার কথা বলাটা—কেমন যেন—একটা ইয়ার্কির মতো হয়ে দাঁড়ায় না? নাকি ঐ শ্রেণীগুলোই পুতুল? কিন্তু তাহলে তো ওগুলো আসলে কোনো শ্রেণীই নয়, সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের থেকে তাদের পৃথক কোনো শ্রেণীসত্তাই নেই! কেননা পার্থক্য মানেই যেহেতু দ্বন্দ্ব, অতএব শ্রেণীপার্থক্যের অর্থ শ্রেণী-দ্বন্দ্ব—পুতুলের ক্ষেত্রে যার অস্তিত্বই আদৌ সম্ভব নয়।" .. জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকরা নিপাট ভালোমানুষ। দুষ্ট লোকদের এ হেন অভদ্র তাত্ত্বিক কচকচির সামনে তাঁরা খাবি খেতে থাকবেন। এবং সেই অবসরে আমরা এই বিষয়টারও ব্যবহারিক পরিণতি পরীক্ষা ক'রে দেখব।

মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও জমিদারশ্রেণীর সরকার নাকি "পুতুল সরকার"! ভালো কথা। কিন্তু এই "পুতুল সরকার"এরই নীতি ও আচরণে যখন উক্ত দুটি শ্রেণীর শ্রেণীস্বাতন্ত্র্য ও আপেক্ষিক স্বাধীনতার প্রকাশ ঘটবে (তা যে ঘটে তা তাঁরাও অস্বীকার করতে পারেননি)—যেমন ঘটেছে তৃতীয় বিশ্বের সাম্প্রতিক ভূমিকায়

এবং ভারত, পাকিস্তান, এমন কি বাংলাদেশেরও বৈদেশিক নীতিতে—তখন তাঁরা কি করবেন? জাতীয় দ্বন্দ্ব তথা জাতীয় স্বাধীনতার প্রশ্নই যদি প্রধান হয় তবে তার সামান্যতম সম্প্রসারণকেও স্বাগত জানানো উচিত এবং ক্ষমতাসীন শ্রেণীগুলি যদি অধিকতর স্বাধীন ভূমিকার পথে তিলমাত্রও পা বাড়ায় তবে তাদেরকে শ্রেণীসংগ্রামের দ্বারা এবং ~~উচ্ছেদপ্রচেষ্টার দ্বারা অহেতুক~~ বিব্রত না করাটাই তো শ্রেয়। কেননা এ কথা কে না জানে যে আমাদের মতো দেশ-গুলিতে শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রতাবৃদ্ধি শাসকশ্রেণীকে ভীত করে এবং সাম্রাজ্য-বাদের পায়ে তার অধিকতর আত্মসমর্পণের একটি কারণ হিসাবে কাজ করে (দ্রষ্টব্যঃ 'নয়া-গণতন্ত্র'; চীন পার্টির 'নেহরুর দর্শন সম্বন্ধে আরো বক্তব্য')? শ্রেণীসংগ্রামের স্বভাবটা এমনি বদ ব'লেই তাঁদের লাইনের তাৎপর্য ঘুরেফিরে দাঁড়াচ্ছে একইঃ ক্ষমতাসীন শ্রেণীর সঙ্গে ন্যূনতম সংঘর্ষের নীতি স্থায়ীভাবে অনুসরণ ক'রে চলা।

পক্ষান্তরে আমরা আমাদের সমাজগুলির আধা-ঔপনিবেশিক চরিত্রে বিশ্বাস করি এবং মনে করি যে সেইজন্যই এখানে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব প্রধান থাকাটাই সাধারণ নিয়ম। আমরা জানি যে ক্ষমতাসীন শ্রেণীগুলি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করুক আর আপেক্ষিকভাবে কিছু স্বাধীন ভূমিকাই নিক, উভয় ক্ষেত্রেই এরাই আমাদের সমাজের দুর্দশা ও পশ্চাৎপদতার জন্য (এমন কি সাম্রাজ্যবাদী আধি-পত্যের জন্যও) প্রত্যক্ষ ও প্রধানভাবে দায়ী থেকে যায়। তাই এই শ্রেণীগুলির বিরুদ্ধে তীব্রতম শ্রেণীসংগ্রাম অব্যাহত রাখতে আমাদের কখনোই কোনো অসুবিধা হয় না। কেবলমাত্র একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে (সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের সময়) ও ব্যতিক্রম হিসাবেই আমরা উক্ত শ্রেণীগুলিকে উচ্ছেদের আওয়াজ সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করি এবং তাদের সঙ্গে একযোগে জাতীয় যুদ্ধ চালানোর প্রচেষ্টা নিই।

জাতীয় দ্বন্দ্ব যখন প্রধান হয় তখন সংগ্রামের বর্শাফলক সাধারণত উদ্যত থাকে একটিমাত্র সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে। তাই একটিমাত্র সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দখলাধীন উপনিবেশে এটা বোধগম্য কারণেই বাস্তবসম্মত। কিন্তু আধা-উপনিবেশে একাধিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নিরন্তর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে এবং এক-এক সময় এক-একটা প্রাধান্যে আসে। কাজেই সেখানে জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান হতে পারে একমাত্র তখনই যখন এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে যে কোনো একটি **মোটামুটি স্থায়ীভাবে** দেশটির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। তার আগেই যদি জাতীয় দ্বন্দ্বকে প্রধান করা হয় তবে রণকৌশলের একটা ন্যূনতম ও আপেক্ষিক স্থিতিশীলতাও অসম্ভব হয়ে পড়ে। কেননা বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রাধান্যের স্থানপরিবর্তনই আধা-উপনিবেশের বৈশিষ্ট্য এবং তার দরুণ আজ প্রধান আঘাত কেন্দ্রীভূত করতে হবে একটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে, কাল আরেকটির

বিরুদ্ধে, পরন্তু হয়তো তৃতীয়টির বিরুদ্ধে[১]। এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে আজ মার্কিনের পদলেহীদের ফ্রন্টে আনার জন্য টানাটানি করতে হবে, কাল আবার তাদের ফেলে ছুটতে হবে রাশিয়ার পদলেহীদের পিছনে। অর্থাৎ আবারও দেখা যাচ্ছে যে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও জমিদারশ্রেণীর বিভিন্ন গোষ্ঠীর পিছনে বিভিন্ন সময়ে ছুটে মরাটাই জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকদের বাগাড়ম্বরের সার কথা এবং এত ব্যস্ত ছুটোছুটির মধ্যে যা ফাঁকি প'ড়ে যাবে সেটা তেমন কিছু নয় — কেবলমাত্র শ্রেণীসংগ্রাম আর রাষ্ট্রক্ষমতা-দখল।

জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকদের ভয়াবহ নিয়তির যে চিত্রটি আমরা আঁকলাম তা প'ড়ে তাঁরা নিশ্চয়ই হাঁ-হাঁ ক'রে উঠবেন: "কে বলেছে আমরা অমুকটা করব না? আর তমুকটা তো অবশ্যই করব।"...মাপ করবেন, বন্ধুগণ! আপনারা কি করবেন আর কি করবেন না ব'লে যেসব চোখ-ধাঁধানো পরিকল্পনা করছেন সেগুলো নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই আমাদের। আপনাদের লাইন আপনাদের অনিবার্যভাবে কোথায় টেনে নিয়ে যাবে শুধু সেটুকুই বর্তমানে আমাদের বিবেচ্য বিষয়।

তাছাড়া শ্রেণীসংগ্রাম আর রাষ্ট্রক্ষমতা-দখলের প্রশ্নটা যখন উঠেইছে তখন ও-দুটোর সম্পর্কও আরেকটু পরিষ্কার ক'রে দেখার চেষ্টা করা যাক।

আমাদের দেশগুলির সরকার পুতুল সরকার হোক বা মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও জমিদারশ্রেণীর সরকার হোক, জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকরা তো তার বিরুদ্ধে লড়বেন ব'লেই বলেছেন। তবে আর আমরা তাঁদেরকে রাষ্ট্রক্ষমতা-দখলের দায়িত্ব জলাঞ্জলি দেওয়ার অভিযোগে অনর্থক গালমন্দ পাড়ছি কেন? এই রাষ্ট্রটা উচ্ছেদ হওয়াই তো বিপ্লবের কেন্দ্রীয় কর্তব্য ও মূল কথা। যে রাষ্ট্র উচ্ছেদ হল সেটা কোন শ্রেণীর রাষ্ট্র তা নিয়ে এত কেতাবী কচকচির দরকারটা কি বাপু?

এই আপাত-নিরীহ প্রশ্নটার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে সুবিধাবাদের ভয়ংকর সাপ। কেননা এর দ্বারা রাষ্ট্রকে খুব সূক্ষ্মভাবে তার শ্রেণীচরিত্র থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে একটা বিমূর্ত বস্তু হিসাবে দেখা হচ্ছে, রাষ্ট্রক্ষমতা-দখলের সংগ্রামকেও শ্রেণীসংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেওয়া হচ্ছে, কিংবা শ্রেণীসংগ্রামকে আবদ্ধ করা হচ্ছে কেবল (বা প্রধানত) প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে (অর্থাৎ উপরিকাঠামোর স্তরে)। এই ধরনের মারাত্মক চিন্তা বাস্তবিকই জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকদের মধ্যে বিদ্যমান (দ্রষ্টব্য: 'উপরিকাঠামো সম্পর্কে', জহির হোসেন, বাংলাদেশ)। এমন কি রাষ্ট্রকে একটা স্বতন্ত্র দ্বন্দ্বের একটি দিক ব'লে মনে করা অর্থাৎ "রাষ্ট্রের সঙ্গে জনগণের দ্বন্দ্ব"কে প্রধান ব'লে গণ্য করার একটা

১ বাংলাদেশে জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকদের এই সঙ্কট ইতিমধ্যেই প্রকট হয়ে উঠেছে।

উদ্ভট ও আজগুবি চিন্তাও বাংলাদেশের জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকদের মধ্যে এখনও সূক্ষ্মভাবে চালু আছে। অথচ এঁরাও নাকি মার্কসবাদী!

রাষ্ট্রক্ষমতা-দখলের লড়াই শ্রেণীসংগ্রামের উচ্চতম রূপ, সুতরাং শ্রেণীসংগ্রাম কেবল রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বস্তুত রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য তেমন কোনো স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বয়ম্ভূ লড়াই হতেই পারে না। কারণ রাষ্ট্র হল কোনো এক বা একাধিক শ্রেণীর হাতিয়ার। সেই শ্রেণী বা শ্রেণী-গুলির সঙ্গে কলে-কারখানায় শহরে-গ্রামে মাঠে-খামারে, এক কথায় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে (বিশেষত অর্থনৈতিক সম্পর্কাবলীর মধ্যে), প্রতিনিয়ত আমাদের ইচ্ছা-চেতনা-নিরপেক্ষভাবে যে শ্রেণীসংগ্রামগুলি চলছে, রাষ্ট্রক্ষমতা-দখলের লড়াইকে সেই প্রাথমিক শ্রেণীসংগ্রামগুলিরই ধারাবাহিক বিকাশ হিসাবে গ'ড়ে উঠতে হবে। অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর যেমন উপরিকাঠামো গ'ড়ে ওঠে ঠিক তেমনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শ্রেণীসমূহের যে মুখোমুখি সংগ্রাম ও সংঘর্ষ নিয়ত চলমান একমাত্র তারই মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে উঠতে পারে যথার্থ রাজনৈতিক সংগ্রামের "উপরিকাঠামো"।

এজন্যই চারু মজুমদার অত্যন্ত সঠিকভাবে বলেছিলেন: "বিপ্লব হল শ্রেণী-সংগ্রামের উচ্চতর রূপ।" অজিতা নারায়ণনরা যখন কৃষকদের নিয়ে দলবদ্ধভাবে পুলিশঘাঁটি আক্রমণ করেছিলেন তখন তিনি সেই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামকে অভিনন্দন জানিয়েও এই ব'লে সমালোচনা করেছিলেন যে শ্রেণীসংগ্রামের অবলম্বন না পেলে রাজনৈতিক সংগ্রাম ফাঁপা হয়ে যায়।

শ্রেণীসংগ্রামকে সৃষ্টি করতে হয় না। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত শ্রেণী-সংগ্রাম চলছে, আমরা সে সম্বন্ধে সচেতন হই আর না-ই হই। আমাদের কাজ কেবল শ্রেণীসংগ্রামের সবচেয়ে সম্ভাবনাময়, জনপ্রিয় ও যথাসম্ভব অগ্রসর রূপ-গুলিকে খুঁজে বের করা, বাইরে থেকে চেতনাসঞ্চার ক'রে শ্রেণীসংগ্রামকে উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে দ্রুত উঠতে সাহায্য করা এবং অবশেষে রাষ্ট্রক্ষমতা-দখলের লড়াইয়ের মধ্যে তাকে কেন্দ্রীভূত করা।

বলা বাহুল্য কথাগুলিকে উচ্চারণ করা যত সহজ উপলব্ধি করা তত নয়, সঠিকভাবে প্রয়োগ করা তো আরো কঠিন[২]।

প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে: মানুষ সচেতন জীব, তাহলে তার শ্রেণীসংগ্রাম আবার তার চেতনানিরপেক্ষ হয় কেমন ক'রে? এই অদ্ভুত কথার অর্থ কি?

এর দুটো অর্থ আছে। প্রথমত মানুষ অধিকাংশ কাজই কোনো না-কোনো চেতনা নিয়েই করে, যেমন কোনো তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটাতে বা ব্যক্তিগত

২ তার একটি প্রমাণ: 'নকশালবাড়ি সম্পর্কে আরো বক্তব্য' লেখায় কানু সান্যাল দাবী করেছেন যে তাঁরা নকশালবাড়িতে শ্রেণীসংগ্রামের "গোড়াপত্তন" করেছিলেন।

স্বার্থোদ্ধার করতে। কিন্তু এই ধরনেরই কতগুলি কাজের মধ্য দিয়ে যে সে আসলে 'শ্রেণীসংগ্রাম' নামক একটা প্রক্রিয়ায় অংশ নিচ্ছে এ সম্বন্ধে সে সচেতন না-ও হতে পারে। দ্বিতীয়ত ক্রমে ক্রমে তার সমশ্রেণীর মানুষের সঙ্গে সংহতি-বোধ এবং বৈরী শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও সংগ্রামের তাগিদও বিভিন্ন মাত্রায় তার চেতনায় আপনা থেকেই (অর্থাৎ শ্রেণীসংগ্রাম চালাতে চালাতে স্বতস্ফূর্ত-ভাবে) জেগে উঠতে পারে, এই চেতনা নিয়ে সে সংগ্রামও করতে পারে, কিন্তু শ্রেণীসংগ্রামের মধ্য থেকে এই চেতনা কখনও স্বতস্ফূর্তভাবে শ্রেণীসংগ্রামের বৃহত্তর ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক চেতনায় উত্তীর্ণ হয় না। সেই চেতনাকে বাইরে থেকে সঞ্চারিত করতে হয় এবং তার ফলে শ্রেণীসংগ্রামের বিকাশ এক নবতর গতিবেগ অর্জন করে ও দ্রুত তার উচ্চতম রূপে উপনীত হয়। কিন্তু সেই চেতনা সঞ্চার করার আগেও শ্রেণীসংগ্রাম থাকে। বস্তুত 'শ্রেণীসংগ্রামের মধ্যে চেতনা সঞ্চার করা'র মার্কসীয় ধারণাটিতেই তো নিহিত রয়েছে শ্রেণীসংগ্রামের চেতনানিরপেক্ষ অগ্রিম অস্তিত্বের স্বীকৃতি।

এই বিষয়টি সঠিকভাবে না বোঝার মধ্যেই রয়েছে দক্ষিণ ও বাম উভয় প্রকার বিচ্যুতির উৎস।

দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যদি সত্যই প্রতিনিয়ত শ্রেণীসংগ্রাম চলতে থাকে (সংগ্রামরত মানুষ সে সম্বন্ধে সচেতন হোক আর নাই হোক) তবে সেগুলিকেই অবলম্বন করা, সেগুলিরই মধ্যে চেতনাসঞ্চার করা এবং চারদিক থেকে ধাপে ধাপে সেগুলিরই বিকাশ ঘটিয়ে অবশেষে রাষ্ট্রক্ষমতা-দখলের একক বিন্দুতে তাদের কেন্দ্রীভূত করা—শ্রেণীসংগ্রাম গ'ড়ে তোলার জন্য এটাই হতে পারে মার্কসবাদীদের কর্মপদ্ধতি।

দৈনন্দিন জীবনের বিক্ষিপ্ত শ্রেণীসংগ্রামগুলি জনগণের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিভিন্ন মাত্রার চেতনার স্ফুরণ ঘটায়। তলা থেকে কষ্টসাধ্যভাবে শ্রেণীসংগ্রামের মজবুত ভিত গ'ড়ে তোলার পরিবর্তে মানুষের এইসব মরীয়া বিক্ষোভ ও ধোঁয়াটে চেতনাকে উপর-উপর থেকে কাজে লাগিয়ে দুয়েকটা বন্ধ্-মিছিল এমন কি আকস্মিক বিস্ফোরণ ঘটানো যায় অপেক্ষাকৃত সহজে[৩]। এই উপ-মহাদেশের মার্কসবাদীরা অধিকাংশ রাজনৈতিক লড়াইয়ের বেলাতেই এই পথ নিয়েছেন। অন্যদিকে আবার কল-কারখানা-মাঠ-ময়দানের প্রত্যক্ষ শ্রেণী-সংগ্রামগুলি চালাবার সময় তাঁরা সেগুলোর স্তরেই আবদ্ধ থেকেছেন এবং উপযুক্ত চেতনাসঞ্চার মারফৎ সেগুলিকে রাজনৈতিক সংগ্রামের স্তরে উন্নীত

৩ এগুলোকে একেবারে বাদ দিয়ে কেবলই "তলা থেকে…শ্রেণীসংগ্রামের মজবুত ভিত" গড়ায় আত্মনিয়োগ করতে হবে এমন একপেশে অর্থনীতিবাদী কথা অবশ্য আমরা বলি না। যেটা এতদিন নিদারুণভাবে অবহেলিত হয়েছে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাটাই শুধু এখানে আমাদের লক্ষ্য।

করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নেননি, করেছেন অর্থনীতিবাদের বিচ্যুতি। যা হোক, শ্রেণীসংগ্রামের আলগা ভিতের উপর দাঁড়ানো এই রাজনৈতিক সংগ্রামগুলির স্বভাবতই কোনো লাগাতার অদম্য চরিত্র থাকেনি—ফল হয়েছে সংস্কারবাদ ও লেজুড়বৃত্তি, সংগ্রামের লক্ষ্যহীনতা, নির্বীর্যতা ও অনিশ্চয়তা।

দৃষ্টান্তস্বরূপ আজকের বাংলাদেশের দিকে তাকিয়ে দেখুন। অকল্পনীয় অর্থনৈতিক শোষণ ও অভাবনীয় রাজনৈতিক নিষ্পেষণ চলছে এখানে। তবু যে আজ পর্যন্ত একটি দলও এখানে কোনো কার্যকরী সংগ্রাম গ'ড়ে তুলতে পারল না তার কারণ কি? তার কারণ একটাই। জনগণের দৈনন্দিন জীবনের তীব্রতম প্রাথমিক শ্রেণীসংগ্রামগুলিকে অবলম্বন ক'রে, সেগুলোকে ভিত্তি ক'রে এবং সেগুলোর মধ্যে চেতনা সঞ্চার ক'রে ধাপে ধাপে সেগুলোকে অপরাজেয় রাজনৈতিক সংগ্রামের স্তরে উন্নীত করার দৃষ্টিভঙ্গী, শ্রেণীসংগ্রামের ইমারতকে এই প্রাথমিক শ্রেণীসংগ্রামগুলির ভিত্তিতে তলা থেকে কষ্টসাধ্যভাবে গ'ড়ে তোলার দৃষ্টিভঙ্গী একটি দলেরও নেই এবং সেই কারণেই নেই সে কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সংগঠন। জনসাধারণের মধ্যে তীব্র (কিন্তু বহুলাংশে অনির্দিষ্ট) যে বিক্ষোভ ও অসন্তোষগুলি এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে আছে, প্রাথমিক শ্রেণী-সংগ্রামগুলির ভিত্তিতে একটা শক্ত মেরুদণ্ড তৈরী করতে না পারলে সেগুলো কিছুতেই দানা বাঁধতে পারবে না, বিভিন্ন বুনিয়াদী শ্রেণী পাবে না লাগাতার সংগ্রামের প্রত্যক্ষ প্রণোদনা ও নির্ভরযোগ্য অবলম্বন। অথচ বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এখনও ধারণা যে নিছক উপর থেকে ফতোয়া ঝেড়ে ("ডাক" দিয়ে) মানুষের চেতনার এই বিক্ষিপ্ত ও আকারবিহীন অসন্তোষের বেলে-মাটির উপর আচমকা একটা রাষ্ট্রক্ষমতা-দখলের লড়াই দাঁড় করিয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু তা হওয়ার নয় এবং এখানেই রয়েছে সর্বব্যাপী বন্ধ্যাত্বের কারণ। প্রাথমিক শ্রেণীসংগ্রামগুলিকে বিকশিত করার কষ্টসাধ্য দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার পরে জনতার চেতনার মধ্য থেকে যে অবলম্বনটি প্রথমেই খুঁজে পাওয়া যায় তা হল একটা ব্যাপক (কিন্তু বিক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট) জাতীয়তাবাদী বিক্ষোভ। প্রায় সবকটা দলই রাতারাতি সংগ্রাম গ'ড়ে তোলার চেষ্টায় এই বিক্ষোভকে লক্ষ্য ক'রেই বারে বারে ডাক ছাড়ছেন আর ব্যর্থ হচ্ছেন। এমন কি যে দল (যেমন "সমাজতান্ত্রিক" বিপ্লবের প্রবক্তা 'জাসদ') তত্ত্বগতভাবে জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্যে বিশ্বাসী নয় ব্যবহারিক রাজনীতিতে সে-ও জাতীয় প্রশ্নকেই প্রধান করতে বাধ্য হচ্ছে। শ্রেণীসংগ্রামের ভিত্তি আলগা থাকার এটাই অনিবার্য পরিণতি। এইসব দল ভুলে যায় যে পাকিস্তানী আমলে এখানে প্রত্যক্ষ জাতীয় নিপীড়ন ছিল ব'লে জাতীয়তাবাদী বিক্ষোভের চরিত্রটা ছিল অনেক সুনির্দিষ্ট ও স্পষ্ট-লক্ষ্যাভিমুখী এবং তাকে আশ্রয় ক'রে সমগ্র জনসংখ্যাকে এক ডাকে লড়াইয়ে নামিয়ে দেওয়ার একটা অবস্থা তখনও কিছু পরিমাণে ছিল। (অবশ্য প্রাথমিক

শ্রেণীসংগ্রামগুলির শক্ত ভিত গ'ড়ে তোলার কাজের প্রতি কমিউনিস্টদের অমনোযোগী ক'রে রাখার জন্য আবার এই অপেক্ষাকৃত সহজ আন্দোলনের সুযোগই ছিল অনেকাংশে দায়ী এবং তারই ফলে ১৯৭১ সালের দুর্লভ ঐতিহাসিক সুযোগটিকে কাজে লাগাতে এখানকার কমিউনিস্টরা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিলেন।) কিন্তু আজ পরিস্থিতি বদলে গেছে, জাতীয় নিপীড়ন পরিগ্রহ করেছে পরোক্ষ রূপ, এসেছে তীব্র ও নির্মম শ্রেণীযুদ্ধের পর্যায়। মুখে শ্রেণী-সংগ্রাম আর কাজে জাতীয় সংগ্রাম—এইসব ছু-মন্তরে আজ আর ভবী ভুলবে না। বাংলাদেশের গত চার বৎসরব্যাপী রাজনৈতিক ইতিহাস এই সত্যের অভ্রান্ত সাক্ষ্য বহন করছে।

আবার এই বিষয়কেই পুরোপুরিভাবে বোঝা বা প্রয়োগ করার অক্ষমতা থেকে বাম-হঠকারিতারও জন্ম হয়। চারু মজুমদার শ্রেণীসংগ্রামের এই মৌলিক তত্ত্বটি জানতেন কিন্তু এটা জানতেন না যে তাঁর প্রয়োগপদ্ধতিটা বাস্তবে এই সত্যকে লঙ্ঘন করে। শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বটি তিনি জানতেন ব'লেই তাঁর প্রস্তাবিত খতম-অভিযানের যৌক্তিকতা হিসাবে তাঁকে বলতে হয়েছিল যে "শ্রেণীশত্রু-খতম শ্রেণীসংগ্রামের" (অর্থাৎ আপনা থেকেই বাস্তবে চলমান শ্রেণীসংগ্রামের) "উচ্চতর রূপ"। কিন্তু বাস্তবে বিদ্যমান শ্রেণীসংগ্রামের ধারাবাহিক বিকাশপথে তার যে রূপগুলি আপনা থেকেই আবির্ভূত হতে থাকে কেবলমাত্র সেগুলিই হতে পারে শ্রেণীসংগ্রামের উচ্চতর রূপ। চেতনার কাজ কেবল এই প্রক্রিয়াকে তীব্রতর ও দ্রুততর করা, সবচেয়ে কার্যকরী উচ্চতর রূপটিকে বাছাই করা, সংগঠিত করা ও ছড়িয়ে দেওয়া। আমরা নিজেদের মাথায় কোনো একটা সংগ্রামরূপের পরিকল্পনা ক'রে সেটাকে "উচ্চতর রূপ" ব'লে শ্রেণীসংগ্রামের উপর চাপিয়ে দিতে চাইলেই তা সেই বাস্তবে-বিদ্যমান শ্রেণীসংগ্রামের উচ্চতর রূপ হবে না। "সংগ্রামের রূপের প্রশ্ন পরীক্ষা করতে গিয়ে প্রত্যেকটি মার্কসবাদীর কি কি মৌলিক দাবী তোলা উচিত? প্রথমত সমাজতন্ত্রের সব আদিম রূপের সঙ্গে মার্কসবাদের তফাৎ এইখানে যে তা আন্দোলনকে কোনো একটা বিশেষ রূপের সঙ্গে বেঁধে দেয় না। সংগ্রামের বিচিত্রতম রূপগুলিকে তা স্বীকার করে; এবং সেগুলিকে তা 'উদ্ভাবন' করে না, বরং আন্দোলনের পথে বিপ্লবী শ্রেণীগুলির সংগ্রামের যেসব রূপ **আপনা থেকেই**" (বড় হরফ আমাদের) "আবির্ভূত হয় সেগুলিকেই তা কেবল সাধারণীকরণ করে, সংগঠিত করে, সচেতন অভিব্যক্তি দান করে।··· এইদিক থেকে আমরা বলতে পারি, মার্কসবাদ গণ-অনুশীলন থেকে **শেখে** এবং সংগ্রামের যেসব রূপকে 'ব্যবস্থা-প্রণেতারা' তাঁদের পাঠকক্ষের নিভৃতিতে উদ্ভাবন করেছেন, জনতাকে সেগুলো শেখানোর দাবী তা করে না" ('গেরিলা যুদ্ধ': লেনিন)। খতমের বিরুদ্ধে—বস্তুত [সত্যাগ্রহ থেকে খতম

পর্যন্ত] সংগ্রামের কোনো রূপের বিরুদ্ধেই — আমাদের কোনো শুচিবাই নেই ; কিন্তু চারু মজুমদারের প্রস্তাবিত সেই বিশেষ খতম-লাইনটির বিরুদ্ধে আমাদের আপত্তি শুধুমাত্র এই যে তা সংগ্রামের রূপ সংক্রান্ত বস্তুবাদী শর্তটিকে পূরণ ক'রে উদ্ভূত হয়নি, তা ছিল নেহাৎই মস্তিষ্কপ্রসূত একটি "উচ্চতর রূপ"[৪]। "অতীতে আমাদের সবচেয়ে বড় ভ্রান্তি, সবচেয়ে বড় ত্রুটি ছিল এটাই যে আমরা শ্রেণীসংগ্রামের মৌলিক ও সার্বজনীন নিয়মকে অগ্রাহ্য করেছিলাম, অগ্রাহ্য করেছিলাম এই সত্য যে যে-সংগ্রাম কেবলমাত্র অগ্রসর চেতনাপ্রসূত তথা মস্তিষ্কপ্রসূত না হয়ে বাস্তবে ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে চলমান শ্রেণীসংগ্রামের স্বাভাবিক বিকাশরূপেও গ'ড়ে উঠবে, সেটাই সমাজদেহে টি'কবে ও বিকাশলাভ করবে ; অন্যগুলি সমাজ প্রত্যাখ্যান করবে। 'খতমে'র এটাই ছিল মূলগত গলদ : তা ছিল মুষ্টিমেয় লোকের চেতনা-প্রসূত ; বাস্তবে বিদ্যমান শ্রেণীসংগ্রামের স্বাভাবিক বিকাশ বা উচ্চতর রূপ নয়। তা বাস্তব শ্রেণীসংগ্রামের সারসঙ্কলনের ফল নয়, তা নেহাৎই মস্তিষ্কপ্রসূত ; তা আবিষ্কার নয়, নিছক উদ্ভাবন" (ঐঃ তরুণ নন্দী)।

চারু মজুমদারের বিভিন্ন ব্যর্থতার বিরুদ্ধে, বিশেষত তাঁর খতম-লাইনের বিরুদ্ধে অনেকেই আজ পবিত্র ক্রোধে উদ্দীপ্ত। কিন্তু তাঁর খতম-লাইনের মূল গলদটা কোথায় তা সুস্থির বিশ্লেষণের মাধ্যমে আবিষ্কার করা, তা থেকে ভবিষ্যৎ অগ্রগতির জন্য সুদূরপ্রসারী শিক্ষা আহরণ করা — এইসব গঠনমূলক বৈজ্ঞানিক কাজের সময় তাঁদের কারুরই নেই। আত্মতুষ্টির নেশায় তাঁরা ভুলেই গেছেন যে শ্রেণীসংগ্রাম সম্বন্ধে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী যে মূলত একই বিচ্যুতিতে আক্রান্ত শুধু তাই নয়, শ্রেণীসংগ্রাম বিকশিত করার ক্ষেত্রে চারু মজুমদারের পদ্ধতি যদি ত্রুটি-পূর্ণ হয়ে থাকে তবে শ্রেণীসংগ্রামের মার্কসীয় তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁদের নিজেদের জ্ঞান পড়ে একেবারে শূন্যের কোঠায়। নতুবা চারু মজুমদারের মূল বিচ্যুতিটা কোথায় ছিল তা তাঁরা কেউই আজও বের করতে পারেননি কেন ? শুধু তাই নয়, ভারতের কমিউনিস্টদের অন্তত একটি অংশ এই কাজ সম্পন্ন ক'রে তা থেকে গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ আহরণ করার পরেও ('ঐক্য কমিটি'র মুখপত্র 'কমিউনিস্ট

৪ [এই একটিমাত্র দৃষ্টিকোণ থেকেই চারু মজুমদারের খতম-লাইনের যথার্থ খণ্ডন সম্ভব, অথচ খতম-লাইনের বিরোধীদের অধিকাংশই এখনও কত অসহ্য বাজে কথায় সময় নষ্ট করছেন ! অবশ্য আপত্তি তোলা যেতে পারে : চারু মজুমদারের প্রস্তাবিত শ্রেণীশত্রু-খতম যে বিদ্যমান শ্রেণীসংগ্রামেরই স্বাভাবিক বিকাশ ছিল না তার প্রমাণ কি ? তার প্রমাণ কিন্তু আসলে খুবই সহজ। তাঁর শ্রেণীশত্রু-খতমটি যদি মস্তিষ্কপ্রসূত একটি সংগ্রামরূপই না হবে তাহলে বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যমান শ্রেণী-সংগ্রামের বিভিন্ন স্তর ও রূপের হিসাব না নিয়ে এবং সেগুলিকেই অবলম্বন করার পরামর্শ না দিয়ে সব এলাকার জন্যই ব্যতিক্রমহীনভাবে শ্রেণীসংগ্রামের একই "উচ্চতর রূপ"এর ব্যবস্থাপত্র তিনি দিয়ে দিলেন কেমন ক'রে ?]

রিভিউ', নভেম্বর ১৯৭৫ দ্রষ্টব্য তাঁরা তা থেকে উপযুক্ত শিক্ষা নিতে পারছেন না কেন? কেন কেবল "সন্ত্রাসবাদ", "হঠকারিতা", "মুষ্টিমেয়ের সংগ্রাম" ইত্যাদি আবছা কথার আড়ালে আজও নিজেদের বন্ধ্যাত্ব তাঁদের ঢাকতে হচ্ছে? চারু মজুমদারের কয়েকটি ব্যর্থতা দেখে তাঁরা নাক সিঁটকাচ্ছেন: এমন ভুল যে করতে পারে সে নাকি মার্কসবাদীই নয়। ভালো কথা, ভদ্রমহোদয়গণ; কিন্তু সেই "এমন ভুল"টা ছিল এমনই যে এই কটা বছর পরেও আপনারা তার মূল খুঁজে বের করতে পারলেন না, কেবল ঝোপের চারপাশে এলোমেলো পিটিয়েই দিন কাটিয়ে দিলেন মহানন্দে। আপনাদের সবারি দেখে তাই লেনিনের অনুসরণে বলতে ইচ্ছা করে: হে মুরগীর দল, ঈগল কখনো-সখনো তোমাদের চেয়েও নিচু দিয়ে উড়তে পারে বটে কিন্তু তোমরা কোনোদিনই ঈগলের সমান উঁচুতে উড়তে পারবে না।

জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকদের সম্বন্ধে এতখানি কড়া মন্তব্য করার পরে বাস্তব প্রমাণ আমাদের হাজির করতেই হবে, নতুবা শ্লীলতাহানির দায়ে তাঁরা নিশ্চয়ই আমাদের অভিযুক্ত করবেন।

এই প্রমাণ প্রদর্শনের জন্য বাংলাদেশের জহির হোসেনের 'উপরিকাঠামো সম্পর্কে' নামক প্রবন্ধটির বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক অংশ বিশ্লেষণ করতে পারলেই সবচেয়ে ভালো হত। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রবন্ধটি এই মুহূর্তে আমাদের হাতের কাছে নেই। তবে তাতে খুব একটা ক্ষতি হবে না কারণ 'সংস্কৃতি' (কার্তিক ১৩৮১, ঢাকা) পত্রিকায় প্রকাশিত 'শ্রেণীসংগ্রাম কাকে বলে?' শীর্ষক প্রবন্ধের লেখক কাইয়ুম চৌধুরী এবং 'উপরিকাঠামো সম্পর্কে' শীর্ষক প্রবন্ধের লেখক জহির হোসেনের মতামত অনেক বিষয়েই অবিকল এক। বস্তুত শ্রেণীসংগ্রাম সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীতে তাঁদের মিল এত বেশী যে এই একটিমাত্র লক্ষণ দিয়েই কাইয়ুম চৌধুরীকেও প্রায় নিশ্চিতভাবেই জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকদের দলে ফেলে দেওয়া যায়, যদিও তিনি তাঁর প্রবন্ধে প্রধান দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে কোনো মতামতই প্রকাশ করেননি[৫]।

এই বইয়ের উপসংহারটিকে এহেন বিরক্তিকর একটি ময়নাতদন্ত দ্বারা ভারাক্রান্ত করার জন্য আমরা দুঃখিত। কিন্তু শ্রেণীসংগ্রামের মৌলিক প্রশ্নটিতে জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকদের 'তত্ত্ব' যে মার্কসের তত্ত্বের একেবারে বিপরীত তা দেখানোর এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

৫ [এই ভবিষ্যদ্বাণীটি আশ্চর্য নিখুঁতভাবে সফল হয়েছে। আজ এতদিন পরে একথা প্রকাশ করা বোধহয় আপত্তিজনক হবে না যে পরে শুনতে পেয়েছিলাম জহির হোসেন ও কাইয়ুম চৌধুরী একই লোক! শ্রেণীসংগ্রামের মতো মৌলিক প্রশ্নে মার্কসবাদ-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীই যে জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকদের তত্ত্বের ভিত্তিস্বরূপ এটা তার একটা সুন্দর প্রমাণ।]

আমাদের সামনে মূল প্রশ্ন হল : সচেতনভাবে সংগঠিত ও পরিচালিত হওয়ার আগে শ্রেণীসংগ্রামের অস্তিত্ব থাকে কিনা ? রাষ্ট্রক্ষমতার জন্য সচেতন, সংগঠিত ও চূড়ান্ত সংগ্রাম উপরিকাঠামোর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করার আগে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শ্রেণীসংগ্রাম চলে কিনা ?

কোনো ধানাই-পানাই না ক'রে স্পষ্ট প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব দিতে হবে। এবং আমরা তা দিয়েছি। আমরা বলেছি যে রাষ্ট্রক্ষমতার লক্ষ্যে সচেতন, সংগঠিত ও চূড়ান্ত সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হওয়ার আগেও শ্রেণীবিভক্ত সমাজে অবিরাম শ্রেণীসংগ্রাম চলতে থাকে। তা অনুন্নত ও প্রাথমিক পর্যায়ের বটে কিন্তু তা শ্রেণীসংগ্রামই। এমন কি এই সংগ্রামে অংশগ্রহণকারীরা তাকে শ্রেণীসংগ্রাম ব'লে চেনার আগেও তা শ্রেণীসংগ্রামই থাকে। এর পরিণতি সম্বন্ধে মানুষ অবহিত হওয়ার আগেও তার অবজেকটিভ গতিমুখ থাকে রাজনৈতিক ক্ষমতা-দখলেরই দিকে। স্বতস্ফূর্তভাবে চলমান শ্রেণীসংগ্রামের প্রকৃতি ও পরিণতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক চেতনাটাকে বাইরে থেকে সঞ্চারিত করতে হয়। কোথায় ? না শ্রেণীসংগ্রামের মধ্যে। কিন্তু তার মানেই তো এই যে সেই চেতনা সঞ্চার করার আগেই স্বতস্ফূর্তভাবে শ্রেণীসংগ্রাম বিরাজ করে। সেই স্বতস্ফূর্ত শ্রেণীসংগ্রামের আবশ্যিক পরিণতি সম্বন্ধে উপলব্ধি মানুষকে দেয় সেই শ্রেণীসংগ্রামের অনিবার্য বিকাশকে যথাসম্ভব অল্প সময়ে ও অল্প ক্ষয়ক্ষতিতে সম্পন্ন করার স্বাধীনতা। এই স্বতস্ফূর্তভাবে বিদ্যমান শ্রেণীসংগ্রামকে অবলম্বন ক'রেই, তাকে ভিত্তি ক'রেই, তাকে প্রাথমিক মালমশলা হিসাবে ব্যবহার ক'রেই মানুষ গ'ড়ে তুলতে পারে চূড়ান্ত শ্রেণীযুদ্ধের ইমারত। এটাকে পাশ কাটিয়ে মর্জিমাফিক "রাষ্ট্রক্ষমতার লড়াই" গ'ড়ে তোলার চেষ্টা অবশ্যম্ভাবীরূপে জন্ম দেবে হয় সংস্কারবাদের (যেমন জাতীয় দ্বন্দ্বের অসময়োচিত প্রাধান্য-ঘোষণার) কিংবা হঠকারিতার (যেমন চারু মজুমদার-প্রস্তাবিত 'খতম-অভিযানে'র)। বস্তুত বাস্তবে যদি কেবল শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও শ্রেণী-"বৈপরীত্য" থাকত এবং শ্রেণীসংগ্রাম না থাকত[৬] আর যদি সেই শ্রেণীসংগ্রামের অবজেকটিভ বিকাশ-প্রবণতা স্বতস্ফূর্তভাবেই রাষ্ট্রক্ষমতা-দখল তথা সর্বহারা একনায়কত্বের অভিমুখী না হত

৬ আসলে তা একেবারেই অসম্ভব। প্রকৃতিতেও যেখানেই দ্বন্দ্ব আছে সেখানেই সংগ্রামও আছে। আর চেতনা থেকে স্বাধীনভাবে অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংগ্রাম থাকে ব'লেই তা আমাদের চেতনায় প্রতিফলিত হয় এবং তা থেকে আমরা দ্বন্দ্ব বা বৈপরীত্যের ধারণা গ'ড়ে তুলতে পারি। সংগ্রামবিহীন এক নিষ্ক্রিয় দ্বন্দ্ব বা বৈপরীত্যের অস্তিত্ব কেবল দার্শনিকের বিমূর্ত কল্পনাতেই সম্ভব। সবকিছুই অবিরাম গতিশীল এবং গতি মানেই সংগ্রাম আর অবিরাম গতি মানে অবিরাম সংগ্রাম। ['দ্বন্দ্ব' ও 'সংগ্রাম' পরপর দুটি পর্যায় নয়, একটি থেকে অপরটিতে কোনো "উত্তরণ" ঘটার প্রয়োজন হয় না, আর তাই সে উত্তরণ সম্ভব করার জন্য প্রয়োজন হয় না 'চেতনা' বা বহিঃস্থ অন্য কোনো তৃতীয় কারিকারও।]

তবে কোনো কমিউনিস্ট পার্টিই তার হাজার সচেতন প্রয়াস দিয়েও শ্রেণীদ্বন্দ্ব বা শ্রেণী-"বৈপরীত্য" থেকে শ্রেণীসংগ্রাম সৃষ্টি করতে পারত না, শ্রেণী-সংগ্রামের বিকাশের পরিণতিতে পারত না রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ক'রে সর্বহারা একনায়কত্ব কায়েম করতে।...চেতনা থেকে বস্তুর উদ্ভব নয় বরং বস্তু থেকেই চেতনার উদ্ভব যদিও সেই চেতনা আবার বস্তুর স্বতস্ফূর্ত বিকাশে পাল্টা প্রতি-ক্রিয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম।

মার্কস বলেছেন: "স্বাধীন মানুষ ও দাস, প্যাট্রিশিয়ান ও প্লেবিয়ান, জমিদার ও ভূমিদাস, গিল্ড-কর্তা ও কারিগর, এক কথায় অত্যাচারী ও অত্যাচারিত, একে অন্যের বিরুদ্ধে নিত্য বৈপরীত্যে দাঁড়িয়ে থেকেছে, কখনও আড়ালে কখনও প্রকাশ্যে চালিয়ে গেছে নিরবচ্ছিন্ন লড়াই—যে লড়াই প্রতিবার শেষ হয়েছে গোটা সমাজের বৈপ্লবিক পুনর্গঠনে অথবা দ্বন্দ্বরত শ্রেণীগুলির সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্তিতে" ('কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো')। এখানে লক্ষ্যণীয় যে মার্কস কেবল "বৈপরীত্যে"র কথা ব'লেই ক্ষান্ত হচ্ছেন না, "লড়াই"য়ের কথাও বলছেন এবং সে লড়াই "নিরবচ্ছিন্ন"। তাহলে কেমন ক'রে আমরা বলতে পারি যে চেতনাসঞ্চারের আগে শ্রেণীসংগ্রামের অস্তিত্ব থাকে না? মার্কস বলছেন যে **প্রত্যেকটি বিশেষ** শ্রেণীসংগ্রামের পরিণতি "সমাজের বৈপ্লবিক পুনর্গঠন" না-ও হতে পারে। তাহলে কিভাবে বলা যায় যে যে-সংগ্রাম সুচেতনভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা-দখলের লক্ষ্যে পরিচালিত নয় তা শ্রেণীসংগ্রাম নয়? কাইয়ুম চৌধুরী নিজেই লেনিন থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন: "মার্কসবাদ তখনই কেবল একটি শ্রেণী-সংগ্রামকে পরিপূর্ণ-বিকশিত 'সর্বব্যাপক' (nationwide)" (কথাটার যথার্থ বাংলা হবে 'দেশব্যাপী') "হিসাবে স্বীকৃতি দেয় যখন তা রাজনীতিকে আওতাভুক্ত করে এবং রাজনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রাষ্ট্রক্ষমতার সংগঠনকে আওতাভুক্ত করে।" এর অর্থ কিন্তু একটাই: রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ও রক্ষার স্তরে উঠলে পরেই শ্রেণীসংগ্রাম "পরিপূর্ণ-বিকশিত" ও "দেশব্যাপী" চরিত্র অর্জন করে কিন্তু তার আগে পর্যন্ত যা থাকে তা-ও শ্রেণীসংগ্রামই। প্রাথমিক স্তরের হতে পারে, অনুন্নত পর্যায়ের হতে পারে, কিন্তু তবু তা শ্রেণীসংগ্রাম।

কিন্তু মার্কস তাহলে কেন বলছেন যে "প্রত্যেকটি শ্রেণীসংগ্রামই রাজনৈতিক সংগ্রাম"? এর উত্তরও আমরা ইতিমধ্যেই দিয়েছি। শ্রেণীসংগ্রামের অবজেকটিভ বিকাশমুখ ও অনিবার্য পরিণতি রাজনৈতিক সংগ্রামেরই দিকে—মার্কস এই চেতনাটিকে শ্রেণীসংগ্রামের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চাইছেন এবং তার ইতিহাস-নির্ধারিত পরিণতিকে চাইছেন ত্বরান্বিত করতে। রাজনৈতিক ক্ষমতার লক্ষ্য ও চেতনাকে মানুষ শ্রেণীসংগ্রামের মধ্যে সঞ্চারিত করে ব'লেই যে তার বিকাশ সেইদিকে ধাবিত হয় তা ঠিক নয়, বরং শ্রেণীসংগ্রামের স্বতস্ফূর্ত বিকাশমুখটা সেদিকে ব'লেই মানুষ সে সম্বন্ধে সচেতন হতে পারে এবং সেই চেতনাকে শ্রেণী-

সংগ্রামের মধ্যে সঞ্চারিত ক'রে ত্বরান্বিত করতে পারে তার পূর্বনির্দিষ্ট বিকাশ শ্রেণীসংগ্রামের অনিবার্য পরিণতি সর্বহারা একনায়কত্ব ছিল ব'লেই মার্কস তা আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন ; মার্কস বলেছিলেন ব'লেই যে সর্বহারা একনায়কত্ব শ্রেণীসংগ্রামের অনিবার্য পরিণতি হিসাবে নির্ধারিত হয়েছিল তা ঠিক নয়।

এসব মার্কসবাদের প্রাথমিক পাঠের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু কাইয়ুম চৌধুরী (জহির হোসেনও) তা মানেন না। তিনি বলেছেন : ''যে শ্রেণীসংগ্রাম শোষকশ্রেণীর রাষ্ট্র ভাঙার লক্ষ্যে পরিচালিত হয় না, ব্যাপক ভিত্তি লাভ করে না, বিপ্লবী মার্কসবাদীরা তাকে প্রকৃত শ্রেণীসংগ্রাম বলে না। এমন কি সাধারণ রাজনৈতিক প্রশ্ন এইসব শ্রেণীসংগ্রামের আওতাভুক্ত হলেও তাকে প্রকৃত শ্রেণীসংগ্রাম বলা যায় না।'' রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবী সম্বলিত শান্তিপূর্ণ ও জঙ্গী সংগ্রামগুলি যতক্ষণ রাষ্ট্রক্ষমতা-দখলের লক্ষ্যে পরিচালিত না হয় ততক্ষণ সেগুলিকে তিনি এই অর্থেই ''প্রকৃত'' শ্রেণীসংগ্রাম বলতে গররাজী।

প্রথমত তাঁর যুক্তিধারাটি লক্ষ্য করুন : "যে শ্রেণীসংগ্রাম" অমুক অমুক শর্ত পূরণ করে না তা "প্রকৃত" শ্রেণীসংগ্রাম নয়। কিন্তু যা প্রকৃত শ্রেণীসংগ্রাম নয় তাকে আবার তিনি "শ্রেণীসংগ্রাম" বলছেন কেন ? 'ওগুলো শ্রেণীসংগ্রামই নয়' এ কথা বলতে কি তিনি ভয় পাচ্ছেন, না লজ্জা ? তিনি নিজেই তাঁর প্রবন্ধে এক জায়গায় বলেছেন "সমাজতন্ত্র একটি বিজ্ঞান", কিন্তু বৈজ্ঞানিক যাথার্থ্যের কি আদর্শ একটি দৃষ্টান্ত তিনি আমাদের উপহার দিলেন ! দ্বিতীয়ত শ্রেণীসংগ্রাম স্বতঃস্ফূর্তভাবেই "রাষ্ট্র ভাঙার লক্ষ্যে পরিচালিত"। কিন্তু এই অজুহাতে যে এই সত্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক চেতনা বাইরে থেকে সঞ্চারিত করার দায়িত্ব অবহেলা করে সে আসলে স্বতঃস্ফূর্ততার উপাসক ; বিপরীতক্রমে যে (যেমন কাইয়ুম চৌধুরী) চেতনাসঞ্চারের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে শ্রেণীসংগ্রামের অবজেকটিভ ও স্বতঃস্ফূর্ত অস্তিত্বটাকেই অস্বীকার ক'রে বসে সে হয় 'সচেতনতার উপাসক'—অর্থাৎ সোজা কথায় ভাববাদী। "শ্রেণীসংগ্রাম" আর "প্রকৃত শ্রেণীসংগ্রাম"এর মধ্যে নানা প্রহেলিকাময় পার্থক্য রচনা ক'রেও এই নির্মম সত্যকে ঢাকা যাবে না।

কিন্তু হয়তো শ্রেণীসংগ্রামের চেতনানিরপেক্ষ অস্তিত্ব তিনি সত্যি অস্বীকার করতে চাননি ?.. বেশ। তাঁর এই উক্তিটি দেখুন : "শ্রেণীবিভক্ত সমাজে উৎপাদনব্যবস্থায় বিরোধী স্বার্থসম্পন্ন শক্তির—শোষক ও শোষিতের (অস্তিত্বের) ফলেই সমাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বার্থবিরোধ অর্থাৎ শ্রেণীবৈপরীত্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ঝগড়া, মারামারি, খুন, রাহাজানি, ডাকাতি ইত্যাদি চূড়ান্ত বিশ্লেষণে শ্রেণীবিরোধেরই বহিঃপ্রকাশ। এইগুলোরই মূর্ত রূপ আমরা দেখি সমাজের উপরিকাঠামোর মধ্যে।" এর অর্থ হল : উৎপাদনব্যবস্থায় (অর্থাৎ অর্থনৈতিক ভিত্তিতে) স্বতঃস্ফূর্তভাবে যা থাকে তা শ্রেণীসংগ্রাম বা তার বহিঃপ্রকাশ নয়,

বরং নিছক এক নিষ্ক্রিয় "শ্রেণীবিরোধ" ও "শ্রেণীবৈপরীত্য"। একমাত্র উপরি-কাঠামোর মধ্যে সচেতন রূপ পরিগ্রহ করার পরেই শ্রেণীসংগ্রামের আবির্ভাব ঘটে। অর্থাৎ চেতনাই শ্রেণীসংগ্রাম সৃষ্টি করে এবং শুধুমাত্র উপরিকাঠামোতেই "প্রকৃত শ্রেণীসংগ্রাম"এর দেখা মেলে।…পাঠক, মার্কসবাদ এখান থেকে কত দূরে ?

কাইয়ূম চৌধুরী আবার তাঁর তত্ত্বের সমর্থনে লেনিনের এই উক্তি উদ্ধৃত করেছেন: "মার্কসবাদকে শ্রেণীসংগ্রামের মতবাদে সীমাবদ্ধ রাখার অর্থ তাকে ছেঁটে দেওয়া, বিকৃত করা, বুর্জোয়ার কাছে যা গ্রহণযোগ্য তাতে পর্যবসিত করা। শুধু সে-ই মার্কসবাদী যে শ্রেণীসংগ্রামের স্বীকৃতিকে প্রসারিত করে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের স্বীকৃতিতে" ('রাষ্ট্র ও বিপ্লব')। শ্রেণীসংগ্রামের অনিবার্য পরিণতি যে সর্বহারা একনাযকত্ব স্পষ্টত সে সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার প্রয়োজনের কথাই লেনিন এখানে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই সঠিক চেতনা অর্জনের উপর তিনি কি শ্রেণীসংগ্রামের অবজেকটিভ অস্তিত্বকে নির্ভরশীল করেছেন ?

যা হোক, এহেন তত্ত্বগত হাতিয়ার নিয়ে তিনি চারু মজুমদারকে বিচার করতে গিয়েছেন। মুরগীর চোখ দিয়ে দেখতে চেয়েছেন ঈগলকে।

চারু মজুমদার বলেছিলেন: "শ্রেণীশত্রু-খতম শ্রেণীসংগ্রামের উচ্চতর রূপ।" এ কথা যাঁরা বিশ্বাস করেছিলেন তাঁদেরকে কাইয়ূম চৌধুরী উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে মার্কসবাদী ব'লে গণ্য করেন। (এখানেও কি "মার্কসবাদী" আর "প্রকৃত মার্কসবাদী"র মধ্যে কোনো রহস্যময় পার্থক্যের ব্যাপার আছে নাকি ? খোদা মালুম।) আর চারু মজুমদারের উক্ত সূত্রায়ণকে তিনি মনে করেন "মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাও চিন্তাধারার অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা—অপব্যাখ্যা" ব'লে। কিন্তু কেন ?

তা এই কারণে: "…এই ধরনের পদ্ধতিতে শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী জনগণেরও ব্যাপক অংশ শ্রেণী হিসাবে অংশগ্রহণ করে না। অত্যাচারী ঘৃণিত মানুষ 'খতম' হলে এইসব শ্রেণীর একটা অংশের মধ্যে 'এটা একটা ভালো কাজ' এই ধারণার সৃষ্টি করে। কিন্তু তাতে ক'রেই শ্রমিক-কৃষকের ব্যাপক অংশের শ্রেণীসংগ্রাম হয়ে ওঠে না বা হয়ে যায় না এবং এই কারণেই সামরিক বাহিনীর হামলা হলে ব্যাপক কৃষক জনগণ প্রতিরোধে যায় না, জনযুদ্ধেরও সৃষ্টি হয় না।"

সত্যসন্ধানের কি অপূর্ব পদ্ধতি, যুক্তির কি অপূর্ব বিন্যাস! চারু মজুমদারের 'খতম-অভিযান' রাষ্ট্রক্ষমতা-দখলের লক্ষ্যে পরিচালিত হওয়া সত্ত্বেও কেন তা শ্রেণীসংগ্রাম ছিল না ?—যেহেতু ব্যাপক জনতা তাতে অংশগ্রহণ করেনি। কিন্তু ব্যাপক জনগণ কি কারণে অংশগ্রহণ করল না ?—যেহেতু তা শ্রেণীসংগ্রাম ছিল না! আবার বলছি: কি হলে একটা বিশেষ সংগ্রাম শ্রেণীসংগ্রাম বা তার উচ্চতর

রূপ হয় এটার জবাব দেওয়াই ছিল লেখকের উদ্দেশ্য। তিনি বললেন যে তা হয় ব্যাপক জনতা অংশগ্রহণ করলে। কিন্তু ব্যাপক জনতাকে কিভাবে অংশগ্রহণ করানো যায়? শ্রেণীস গ্রাম চালিয়ে! কিভাবে শ্রেণীসংগ্রামের উচ্চতর রূপ লাভ করা যায়—এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক সমস্যার সমাধান এহেন প্রগাঢ় "মার্কসবাদী" যুক্তিধারা থেকে পাওয়া সম্ভব কিনা তা পাঠকই বিচার ক'রে দেখবেন।

বস্তুত এটা কোনো সমাধানই নয়, নিছক সমস্যাটিরই পুনরাবৃত্তি[৭]। কেননা আমাদের সমস্যা হল: আমাদের এমন একটি নিরিখ চাই যার দ্বারা কোনো একটি সংগ্রামরূপকে প্রয়োগ করার **আগেই** আমরা যথাসম্ভব নিশ্চয়তার সঙ্গে বুঝতে পারব উক্ত সংগ্রামরূপটি শ্রেণীসংগ্রামের উচ্চতর রূপ হিসাবে টিঁকবে কিনা এবং ব্যাপক জনতার অংশগ্রহণ আদায় করতে পারবে কিনা। ব্যাপক জনতা সত্যিই অংশগ্রহণ করল কি করল না তা তো বোঝা যাবে উক্ত সংগ্রাম-রূপটির প্রয়োগ সম্পন্ন হওয়ার পরে। কিন্তু রাম-শ্যাম-যদু-মধু যে যা সংগ্রাম-রূপের প্রস্তাব দেবে সেগুলোর প্রত্যেকটিকে যদি প্রয়োগ করার **পরে** হাজার হাজার কর্মী ও লক্ষ লক্ষ জনগণের জীবন ও সম্পত্তির বিনিময়ে বুঝতে হয় যে তা শ্রেণীসংগ্রাম ছিল না তাহলে আর বিজ্ঞানের দরকার কি, দরকার কি এত গাল-ভরা তত্ত্বালোচনায়? হাতুড়ে ডাক্তারের দোকান খুলে তুকতাকের ব্যবসা চালালেই তো হয়! চারু মজুমদারের খতম-লাইনের পরিণতিতে জনতার অংশ-গ্রহণ যে ক'মে এসেছিল, সর্বজনবিদিত এই বস্তাপচা তথ্যটাকে কাইয়ুম চৌধুরী এমন গুরুগম্ভীর প্রাজ্ঞ ভঙ্গীতে (এমন কি এদিক থেকেও জহির সাহেবের সঙ্গে তাঁর কোনো "বৈপরীত্য" নেই) পরিবেশন করেছেন যে নিজের ভঙ্গীতে মুগ্ধ হয়ে তিনি তাঁর আলোচ্য সমস্যাটিকেই গেছেন ভুলে। এত রক্তের বিনিময়ে অর্জিত এত বড় একটা অভিজ্ঞতা! অথচ তা থেকে সারসংকলন ক'রে তাঁরা ভবিষ্যতের জন্য সেই নিরিখটিকেই বের ক'রে রাখার চেষ্টা করলেন না—যে নিরিখের দ্বারা অনেক কম ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে আগে থাকতেই শ্রেণীসংগ্রামের উচ্চতর রূপ নির্ধারণ করা সম্ভব হতে পারে। হাজার হাজার শহীদের প্রতি এই ধরনের দায়িত্ববোধ, বিপ্লব ও জনগণের প্রতি এই ধরনের আনুগত্যই কাইয়ুম চৌধুরীদের অভিজ্ঞতাবাদের চরিত্রলক্ষণ। চারু মজুমদারের প্রতি ঘৃণায় অন্ধ হওয়ার ফলে তাঁরা যে ইতিহাস ও তার অভিজ্ঞতার প্রতি ঘৃণায় অন্ধ হয়ে গেছেন, এটা উপলব্ধি করার ক্ষমতা তাঁদের আজ আর অবশিষ্ট নেই।

৭ [যুক্তিশাস্ত্রে এই ভ্রান্ত যুক্তিপদ্ধতির এমন কি একটা বাঁধা নামও আছে: arguing in a circle বা 'চক্রতর্ক'। চারু মজুমদারের খতম-লাইনের অধিকাংশ প্রচলিত সমালোচনাই কমবেশি এই দোষে দুষ্ট।]

সৌভাগ্যক্রমে ভারতের কমিউনিস্টরা সবাই এই পথ অনুসরণ করেননি। অন্তত তাঁদের একটি অংশ শ্রেণীসংগ্রামের উচ্চতর রূপ অর্জনের পদ্ধতিটি খতম-অভিযানের অভিজ্ঞতার সারসংকলন ক'রেই বের করেছেন। কিন্তু কাইয়ুম চৌধুরী ও জহির হোসেনরা তা থেকে শিক্ষা নিতেও আজ অক্ষম, কেননা ভারতীয় কমিউনিস্টদের সঙ্গেও তাঁরা আজ সম্ভবত এক প্রকার "জাতীয় দ্বন্দ্বে"র অস্তিত্ব অনুভব ক'রে থাকেন!

স্বতস্ফূর্তভাবে বিদ্যমান শ্রেণীসংগ্রামকে অবলম্বন ও তাতে চেতনাসঞ্চার করার পদ্ধতি বর্জন করা থেকে কিভাবে জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষণার শ্রেণীসমঝোতামূলক তত্ত্বের জন্ম হয়েছে তা আমরা এতক্ষণ বিশ্লেষণ ও উদাহরণ সহকারে দেখানোর চেষ্টা করলাম। বিদ্যমান শ্রেণীসংগ্রামের প্রতি এই অমনোযোগের একটি কারণ নিঃসন্দেহে সাধারণভাবে শ্রেণীসংগ্রাম সম্বন্ধেই মার্কসীয় বস্তুবাদ-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী। কিন্তু আরেকটি কারণও আছে। তা হল সামন্তবাদ সম্বন্ধে স্থূল, অনড়, যান্ত্রিক ও অগভীর ধারণা।

শেষোক্ত কারণটি এইভাবে কাজ করে। কোনো সমাজে সামন্ত দ্বন্দ্ব প্রধান হওয়া সম্ভব একমাত্র যদি সেখানে স্বতস্ফূর্তভাবে বিদ্যমান শ্রেণীসংগ্রামের প্রধান চরিত্রই হয় সামন্তবাদ-বিরোধী। কিন্তু আমরা আগেই বলেছি যে "সমাজতান্ত্রিক" বিপ্লবের ফেরীওয়ালাদের মতোই জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকরাও আমাদের সমাজগুলিতে সামন্ত অবশেষের তেমন জোরালো অবস্থান আসলে খুঁজে পান না, স্বতস্ফূর্তভাবে বিদ্যমান শ্রেণীসংগ্রামকেও চিনতে পারেন না প্রধানত সামন্তবাদ-বিরোধী ব'লে। আসলে সামন্তবাদী শোষণের অন্তর্বস্তুগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেই এঁদের কারো ধারণা স্বচ্ছ নয়। কিসে মূলত সামন্তবাদী শোষণ হয় সেটা আগে ঠিকভাবে বুঝতে হবে, তা না হলে কোনোদিনই যথাযথভাবে নির্ধারণ করা যাবে না তা আমাদের সমাজগুলিতে কোথায় কোথায় কতখানি টিঁকে আছে এবং বিদ্যমান শ্রেণীসংগ্রামের চরিত্র সত্যিই প্রধানত সামন্তবাদ-বিরোধী কিনা। উপরোক্ত দুটি দলই কিন্তু ঠিক এই জায়গাতেই ব্যর্থ হয়েছেন। যেই তাঁরা দেখলেন যে **জমিদারী** শোষণের একটা সামগ্রিক কাঠামো পঞ্চাশের দশক থেকে আমাদের সমাজগুলিতে আর চীনের মতো অতখানি অটুট নেই অমনি তাঁদের কাছে সামন্ত অবশেষ প্রায় হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। সামন্ত অবশেষের **মর্মবস্তুর** অনুসন্ধান না ক'রে তাকে তার একটি **রূপের** সঙ্গে সমার্থক মনে করার এই যে ভ্রান্তি, "সমাজতান্ত্রিক" বিপ্লবের প্রবক্তারা সোজা এগিয়ে গেলেন তার যুক্তিসিদ্ধ পরিণতিতে (অর্থাৎ সমাজগুলির "পুঁজিবাদী" চরিত্রায়ণে); আর অন্য দলটি যেহেতু কিছুতেই "পুঁজিবাদী" চরিত্রায়ণ গ্রহণ করবেন না তাই তাঁরা একদিকে গোঁয়ারের মতো জপতে

লাগলেন 'আমাদের সমাজে সামন্তবাদ চীনের মতোই অটুট আছে' এবং অন্যদিকে এই বাস্তববিমুখতার অস্বস্তি থেকে মুক্তি খুঁজলেন জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষণায়। (জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকদের মধ্যে যাঁরা এই ধরনের গোঁয়ার্তুমি করতে চান না তাঁরা আমাদের সমাজগুলিতে সামন্ত অবশেষের পরিমাণগত গৌণতার যুক্তিকে নিজেদের তত্ত্বের সমর্থনে হাজির ক'রে থাকেন। পরিমাণগত গৌণতার এই যুক্তি যে আলোচ্য প্রসঙ্গে কত অবান্তর তা আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে উদ্‌ঘাটন ক'রে দেখিয়েছি।) এইসব কারণেই সামন্তবাদের অন্তর্বস্তু সম্বন্ধে কিছু আলোচনা এইখানে ক'রে রাখা ভালো।

সব শ্রেণীবিভক্ত সমাজেই উদ্বৃত্ত শ্রম শোষিত হয়। কিন্তু তা কিভাবে শোষিত হচ্ছে তা-ই একটা বিশেষ সমাজব্যবস্থার চরিত্রটিকে নির্ধারণ করে। এইদিক থেকে সামন্তবাদী শোষণের অন্তর্বস্তুগত বৈশিষ্ট্য কি?[৮]

সমাজ-বিবর্তনে সামন্তবাদী সমাজ হল দাস সমাজের পরবর্তী এবং পুঁজিবাদী সমাজের পূর্ববর্তী। দাস সমাজে উৎপাদকের (অর্থাৎ দাসের) শ্রমশক্তির মালিকানা থাকে সম্পূর্ণই অন্যের হাতে, দাস-মালিকের হাতে। এর অর্থ, দাস নিজে নিজের মালিক নয়, তার কোনো ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নেই, সে পুরো-পুরিই অন্যের সম্পত্তি। পক্ষান্তরে পুঁজিবাদী সমাজের ভিত্তি হল সর্বব্যাপী পণ্য-উৎপাদন এবং শ্রমশক্তিও সেখানে একটি পণ্য। পণ্য-উৎপাদন ও পণ্য-বিনিময়ের একটা সামগ্রিক ব্যবস্থা টিঁকে থাকতে পারে একমাত্র যদি পণ্য-উৎপাদক তার পণ্যের পূর্ণ মালিক হয়। এই মালিকানার অধিকার প্রকাশিত হয় পণ্যের গড়পড়তা সমমূল্য বিনিময় (equivalent exchange) মারফৎ। শ্রমিকের একমাত্র বিক্রেয় পণ্য যেহেতু তার শ্রমশক্তি তাই তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে শ্রমিক তার শ্রমশক্তির (সুতরাং তার নিজের) পূর্ণ মালিক এবং শ্রমশক্তি বিক্রয় ক'রে তার পূর্ণ মূল্য লাভ করা সাধারণভাবে তার পক্ষে সম্ভব হতে পারে। উৎপাদক এই প্রথম ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীন ও মুক্ত হল। পুঁজিবাদী শোষণের বৈশিষ্ট্য হল এই যে এতে সমমূল্য বিনিময়ের নিয়মকে লঙ্ঘন না ক'রেই উদ্বৃত্ত শ্রম শোষিত হতে পারে[৯]। পুঁজিবাদী শোষণের ভিত্তি হল শ্রমিকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা—দাস সমাজের মতো ব্যক্তিগত অধীনতা ও বাধ্যবাধকতা নয়।

সামন্তবাদী সমাজের ভূমিদাস দাসের থেকে কিছুটা স্বাধীন—সে তার শ্রম-

৮ [এই প্রশ্নের যে জবাব এখানে দেওয়া হয়েছে তা প্রধানত লেখকের পূর্বোল্লেখিত 'ভারতে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন টিঁকে থাকতে পারে?' (তরুণ নন্দী) ও 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব না সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব?' (ফারুক চৌধুরী) প্রবন্ধ দুটি থেকে নেওয়া।]

৯ [অন্তত এটুকু সত্য: উদ্বৃত্ত শ্রম শোষিত হওয়ার জন্য এবং সে শোষণ ব্যাখ্যা করার জন্য সমমূল্য বিনিময়ের নিয়ম লঙ্ঘন পুঁজিবাদের ক্ষেত্রে আবশ্যিক নয়। সামন্তবাদী শোষণের বেলায় এ কথা খাটে না।]

সময়ের একটা নির্দিষ্ট অংশ গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য নিজের জমিতে নিয়োগ করতে পারে। কিন্তু তার উদ্বৃত্ত শ্রমসময়ের সবটুকুই সে জমিদারের জমিতে লাগাতে বাধ্য। তাই ব্যক্তিগত অধীনতা ও বাধ্যবাধকতা সামন্তবাদী শোষণেরও ভিত্তি—উৎপাদক তার শ্রমশক্তির (অর্থাৎ নিজের) পূর্ণ মালিক নয়। এটাই সামন্তবাদী শোষণের মর্মবস্তু। কালক্রমে সামন্তবাদী সমাজে যতই পণ্য-উৎপাদন ও পণ্য-বিনিময়ের প্রসার ঘটতে থাকে ততই সামন্তবাদী শোষণের অবশেষ (অর্থাৎ উৎপাদিত পণ্য ও শ্রমশক্তির উপর জনসাধারণের পূর্ণ মালিকানার অভাব) প্রচ্ছন্ন [ও বাণিজ্যিক] রূপ নিতে থাকে এবং নিয়মিত ও একতরফা অসম বিনিময়ের মাধ্যমে তা প্রকাশিত হতে থাকে। যে কোনো শোষণের মধ্যে শোষিত মানুষের ব্যক্তিগত অধীনতা ও বাধ্যবাধকতা—তথা অসম বিনিময়ের আবশ্যিকতা—যে পরিমাণে নিহিত থাকে ঠিক সেই পরিমাণেই তার মধ্যে নিহিত থাকে সামন্তবাদী অবশেষ। সুতরাং আমাদের সমাজগুলিতে জোতদারী শোষণ (খাজনা, বর্গা ইত্যাদি) তো বটেই, **মহাজনী ও বণিক পুঁজির (ফড়িয়া, মজুতদার ইত্যাদির) শোষণও প্রধানত আধা-সামন্তবাদী শোষণেরই অন্তর্ভুক্ত।** বিষয়টিকে এভাবে দেখতে শিখলেই আমরা বুঝব আমাদের সমাজে সামন্ত অবশেষের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনগণের (শহর ও গ্রাম উভয় স্থানেরই) প্রচণ্ড সংগ্রামের সম্ভাবনা কত বিপুল এবং কৃষক ছাড়াও অন্যান্য শ্রেণীর স্বার্থও সামন্তবাদ-বিরোধী সংগ্রামে কত **প্রত্যক্ষভাবে** জড়িত। আমাদের চোখের সামনেই সামন্ত অবশেষ ছড়িয়ে রয়েছে কিন্তু সামন্তবাদ সম্বন্ধে আমাদের মনগড়া ও যান্ত্রিক ধারণাটির জন্য আমরা বিশুদ্ধ জমিদারী বা জোতদারী শোষণ ছাড়া আর কোথাও সামন্তবাদ দেখতেই পাই না। তার ফলে জনগণের মধ্যে সামন্তবাদের বিরুদ্ধে যে তীক্ষ্ণ শ্রেণীসংগ্রামগুলির প্রতিনিয়ত জন্ম হচ্ছে (যেমন ধরুন মূল্যবৃদ্ধি-বিরোধী সংগ্রাম বা খাদ্য-আন্দোলন) সঠিক স্লোগান মারফৎ সেগুলোর অধিকাংশকে আমরা মোটে স্পর্শই করতে পারি না কিংবা সেগুলোকে "পুঁজিবাদ-বিরোধী" আন্দোলন ভেবে দ্বিধাগ্রস্তভাবে বড়জোর দিই প্রান্তিক ও দায়সারা গুরুত্ব। যাঁরা সামন্ত দ্বন্দ্বকে প্রধান ধ'রে লড়াই করেছেন তাঁদের বেলাতেও এই কথা সমানভাবে খাটে এবং তাঁদের মধ্যে এই ভ্রান্তি শেষ পর্যন্ত ডেকে আনে সংকীর্ণতাবাদ, হঠকারিতা ও শোচনীয় পরাজয়। তখন স্বাভাবিকভাবেই সামন্তবাদ-বিরোধী গণসংগ্রাম সম্বন্ধে হতাশ হয়ে নিতে হয় "সমাজতান্ত্রিক" বিপ্লব কিংবা "জাতীয় দ্বন্দ্বে"র পথ।

তাছাড়া অধিকতর পুঁজিবাদী বিকাশের দরুণ এখানকার সমাজগুলিতে সামন্ত অবশেষ ঠিক প্রাক-বিপ্লব চীনের মতো নেই। তাই চীনের সামন্তবাদ-বিরোধী সংগ্রামের অন্ধ ও হুবহু অনুকরণ ক'রে এখানে কোনোমতেই সাফল্য-লাভ করা যাবে না, এখানকার সামন্তবাদ-বিরোধী সংগ্রামে বহু মৌলিক ও

গুরুত্বপূর্ণ নতুন বৈশিষ্ট্য থাকবেই। এ সত্য বোঝার জন্যও সামন্তবাদ সম্বন্ধে আমাদের অনড় ও যান্ত্রিক ধারণা পরিত্যাগ ক'রে তার মর্মবস্তুকে উপলব্ধি করা আশু প্রয়োজন।

শ্রেণীসংগ্রাম, বিশেষত সামন্তবাদ-বিরোধী শ্রেণীসংগ্রাম নিয়ে এই দীর্ঘ বাগ্‌-বিস্তারের জন্য পাঠক নিশ্চয় আমাদের ক্ষমা করবেন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ থেকে জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকদের বিচ্যুতির ভয়াবহ স্বরূপ বুঝতে গেলে সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তিতে (কেবল তার উপরিকাঠামোতে নয়) ইচ্ছা-চেতনা-নিরপেক্ষভাবে প্রতিনিয়ত চলমান শ্রেণীসংগ্রামের স্বতস্ফূর্ত অস্তিত্ব, সর্বহারা একনায়কত্বের দিকে তার অবজেকটিভ গতি ও তার সামন্তবাদ-বিরোধী চরিত্রকে বোঝা এবং তারই ভিত্তিতে আমাদের রাজনৈতিক সংগ্রামের সচেতন কর্মকাণ্ড দাঁড় করানোর গুরুত্বকে উপলব্ধি করা একান্ত প্রয়োজন।

আমরা যে রাষ্ট্র উচ্ছেদ করতে চাই তাঁরাও সেই রাষ্ট্রেরই বিরুদ্ধে লড়বেন ব'লে আমাদের স্তোক দিচ্ছেন। কিন্তু সেই রাষ্ট্র দেশের অভ্যন্তরে যেসব শ্রেণীর হাতিয়ার জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষণা হল তাদেরই সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের পথ। দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, বিশেষত অর্থনৈতিক ভিত্তিতে, তাদের সঙ্গে জনগণের যেসব মুখোমুখি প্রাথমিক সংগ্রাম প্রতিনিয়ত চলছে সেগুলিকে বিকশিত করার পরিবর্তে তাঁরা সেগুলিকে বলি দিতে চাইছেন বৈদেশিক শত্রুর বিরুদ্ধে **সরাসরি** "লড়াই" করার জন্য তাঁদের অসমযোচিত তাগিদের বেদীমূলে। অথচ তাঁরা নাকি উপরিকাঠামোতে এদেরই রাষ্ট্র উচ্ছেদ করবেন, কায়েম করবেন জনগণতান্ত্রিক একনায়কত্ব। এ যেন গাছের শিকড় কেটে দিয়ে সেই গাছে ফুল ফোটানোর চেষ্টা! এই ধরনের "চেষ্টা"য় সরকার বদলের বুর্জোয়া ভেলকির পরিবর্তে আর কিছু আশা করা যেতে পারে কি? এই প্রসঙ্গে "প্রাথমিক ধাপের সরকার গঠনের" জন্য আলাউদ্দীন সাহেবের "আওয়াজ" শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

তাঁরা শ্রেণীসংগ্রাম জলাঞ্জলি দিচ্ছেন না ব'লে আমাদের স্তোক দিচ্ছেন। কিন্তু যে পদ্ধতিতে শ্রেণীসংগ্রামের উচ্চতর রূপ অর্জন করা যায় ও ক্রমাগত তাকে এগিয়ে নেওয়া যায় সেই পদ্ধতি নির্ধারণের সঠিক বস্তুবাদী নিরিখটাই তাঁরা দিচ্ছেন গুলিয়ে। কোনটা যথার্থই শ্রেণীসংগ্রামের উচ্চতর রূপ আর কোনটা নয়, কে শ্রেণীসংগ্রামের সুষ্ঠু অগ্রগতির পক্ষপাতী আর কে শ্রেণী-সমঝোতার (এবং কে শ্রেণী-সংকীর্ণতার), তাঁদের নিরিখ একবার গ্রহণ করলে এসবের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের কোনো নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক নিরিখই আর কর্মীসাধারণের হাতে থাকবে না। বিনাবিচারে গ্রহণ করতে হবে রাম, শ্যাম,

মতু, মধু এবং জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকদের যে কোনো ফতোয়া। এমন কি জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকদেরও শ্রেণীসংগ্রামের ধ্বজাধারী ব'লেই বিশ্বাস করতে হবে (অন্তত অবিশ্বাস করার কোনো বৈজ্ঞানিক মাপকাঠি থাকবে না) এবং বিপুল প্রাণ ও রক্তের বিনিময়ে এক্‌সপেরিমেণ্টের পর এক্‌সপেরিমেণ্ট চলবে শ্রেণীসংগ্রামের উচ্চতর রূপ নির্বাচন ক'রে ব্যাপক জনতার অংশগ্রহণ সম্ভব করার জন্য। ইতিমধ্যে কাইয়ুম চৌধুরী, জহির হোসেন আর "সাম্যবাদী" তাত্ত্বিকেরা অবশ্য পুস্তিকার পর পুস্তিকা লিখে যাবেন, আর সেগুলোর প্রত্যেকটাই হবে তার আগেরটার চেয়ে অনেক বেশী জ্ঞানগর্ভ।

প্রধান দ্বন্দ্ব নির্ধারণ একটা রণকৌশলগত সমস্যা হলেও জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রস্তাবিত রণকৌশলের মূলে কাজ করছে শ্রেণীসংগ্রাম ও সর্বহারা একনায়কত্ব সম্বন্ধে মার্কসবাদী তত্ত্বকে নাকচ করার বিষাক্ত সংশোধনবাদী চিন্তাধারা। এই কারণেই তাঁদের লাইনকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করা ও তার স্বরূপ উন্মোচন করার কাজ আজ এত অসাধারণ গুরুত্ব অর্জন করেছে।

এই উপমহাদেশের মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের দ্বারা গত কয়েক বৎসর যাবৎ অনুসৃত কতগুলি বাম-সংকীর্ণতাবাদী হঠকারী নীতি ও তজ্জনিত বিপর্যয়ের কারণেই এবং তার প্রতিক্রিয়া হিসাবেই আজ "জাতীয় ঐক্য"র এই পরাজয়বাদী ও শ্রেণীসংগ্রামবিমুখ দক্ষিণপন্থী জোয়ারটি উঠতে পেরেছে। আমাদের কতগুলি অতীত বিচ্যুতির দোহাই পেড়ে তা ১৯৬৭র পর অর্জিত আমাদের ঐতিহাসিক সাফল্যগুলিকে ছিনিয়ে নিতে চাইছে, বিচ্যুত করতে চাইছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মহান আলোকোজ্জ্বল পথ থেকে। এই জোয়ারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আমাদের আজ উপরোক্ত পর্যায়ের ঐতিহাসিক সুফলগুলিকে প্রাণপণে রক্ষা করতে হবে। কিন্তু তার জন্য সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের বাম বিচ্যুতিগু'লর বিরুদ্ধেও আপোষহীন ও মমতাহীন সমালোচনা চালাতে হবে, যাতে পর্যুদস্ত হয়ে যায় একই বিচ্যুতির সংশোধনবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে করা নানা রকম অপসমালোচনা।

"বিপ্লব শ্রেণীসংগ্রামের উচ্চতর রূপ!"—কমরেড চারু মজুমদারের এই রণধ্বনিই হোক জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকদের বিরুদ্ধে আমাদের রণধ্বনি।

দ্বিতীয় খণ্ড

১

একটি আগ্রহজনক বিতর্ক

এই বইটি লেখার আশু উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকদের ভ্রান্ত তত্ত্বের খণ্ডন। কিন্তু আলোচনাকালে আমাদের মতো দেশগুলিতে সরাসরি "সমাজতান্ত্রিক" বিপ্লব করার লাইনের প্রবক্তাদের বিরুদ্ধেও আমরা প্রচুর মন্তব্য করেছি। আশা করি, তার ফলে তাঁদের ভ্রান্তিও অনেকাংশে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

বইটি [অর্থাৎ বর্তমান সংস্করণের প্রথম খণ্ডটি] লেখা হয়ে যাওয়ার পর 'সন্ধিক্ষণ' (কলকাতা, ২০ অক্টোবর ও ৫ ডিসেম্বর ১৯৭৪) পত্রিকায় ভারতে "সমাজতান্ত্রিক" বিপ্লবের সপক্ষে প্রবীর দত্তের একটি বেশ আগ্রহজনক আলোচনা পড়লাম। দুর্ভাগ্যক্রমে আলোচনাটির মাত্র প্রথম দুটি কিস্তি আমাদের হাতে এসেছে, কিন্তু তার মধ্য দিয়েই আধা-সামন্তবাদী সমাজ (প্রথম খণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়) এবং মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া (প্রথম খণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়, উপ-পরিচ্ছেদ ৬) সম্বন্ধে আমাদের বিশ্লেষণের তাৎপর্য বেশ স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

এর আগে 'লালতারা' (কলকাতা) পত্রিকায় মণি গুহ এক লাফে সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লব করতে চাওয়ার লাইনের বিরুদ্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন—সেটাই প্রবীর দত্তের আলোচ্য লেখাটির উপলক্ষ্য। মণি গুহের লেখাটি আমরা পড়িনি, কিন্তু প্রবীর দত্তের লেখা থেকে তার যে পরিচয়টুকু আমরা পাই তা থেকেই পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে যে মৌলিক ধারণাসমূহের ক্ষেত্রে এঁরা দুজনেই আমাদের উপমহাদেশে প্রচলিত কতগুলি চিরাচরিত ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। আমাদের বিশ্লেষণে আমরা সেই বহুলপ্রচলিত ভ্রান্তিগুলিকেই নিরসন করার চেষ্টা করেছি।

১

এই উপমহাদেশের দেশগুলির বিপ্লবের বর্তমান স্তরকে যাঁরা সমাজতান্ত্রিক মনে করেন, আর যাঁরা তাকে জনগণতান্ত্রিক মনে করেন, তাঁদের উভয়ের মধ্যেই একটা অভিন্ন ভ্রান্তি প্রায় সর্বব্যাপী। তা হল এই যে কোনো একটা সমাজকে নিছক অর্থনৈতিক ভিত্তির বিচারে পুঁজিবাদী প্রমাণ করতে পারলেই যেন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরও সঙ্গে সঙ্গেই প্রমাণিত হয়ে যায় এবং খণ্ডিত হয়

যায় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সপক্ষে সব যুক্তি। পাঠকের নিশ্চয়ই মনে আছে যে আমরা এই ভ্রান্ত যুক্তিধারাকে ইতিপূর্বেই প্রত্যাখান করেছি (প্রথম খণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়, ৫নং পাদটীকা)। সুখের কথা, মণি গুহ ও প্রবীর দত্ত উভয়েই এই ভ্রান্তি থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেছেন এবং অত্যন্ত সঠিকভাবেই বিপ্লবের স্তর-বিচারের জন্য শাসকশ্রেণীর চরিত্রবিচারকে সামনে আনতে চেয়েছেন।

কিন্তু একটা সঠিক ফর্মুলাকেও অত্যন্ত বেঠিক উদ্দেশ্যে আউড়ে চলা সম্ভব। বিপ্লবের স্তরবিচারে শাসকশ্রেণীর চরিত্রবিচারটাই আশু নিরিখ। কিন্তু সমাজ-চরিত্র বিচারের দুরূহ সমস্যাবলী থেকে পলায়নের জন্য কিংবা সেগুলোর ক্ষেত্রে নিজেদের চিন্তার গুরুতর দুর্বলতাসমূহ ঢেকে রাখার জন্যই যদি এই ফর্মুলাটিকে ব্যবহার করা হয় তবে তাকে আর মার্কসবাদ-চর্চা বলা যায় না।

বিপ্লবের স্তরবিচার করতে হবে শাসকশ্রেণীর চরিত্রবিচার ক'রে। ভালো কথা। কিন্তু শাসকশ্রেণীর চরিত্রবিচার করব কি ক'রে? শাসকশ্রেণী তো আর সশরীরে রাষ্ট্রযন্ত্রে সওয়ার হয়ে থাকে না যে চোখে দেখেই ব'লে দেওয়া যাবে 'এটা অমুক শ্রেণীর রাষ্ট্র'। কাজেই সাধারণত শাসকশ্রেণীর চরিত্রবিচারের জন্যই আবার সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তির চরিত্রবিচারও অপরিহার্য হয়ে পড়ে এবং তারই দরুণ বিপ্লবের স্তরবিচারকে শেষ পর্যন্ত সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তির চরিত্রবিচার থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। সাধারণভাবে বলা যায় যে একটা রাষ্ট্রের আওতাধীনে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যে শ্রেণী বা শ্রেণীগুলির স্বার্থ সবচেয়ে অবাধে উত্তরোত্তর সেবিত হয়, রাষ্ট্রটা হয় তাদেরই।

অবশ্য কোনো কোনো বিশেষ মুহূর্তে ও ক্ষেত্রে এই নিরিখকে কড়াকড়িভাবে প্রয়োগ করাটা দুরূহ, এমনকি অবাস্তব হয়ে পড়তে পারে (যেমন রাষ্ট্রক্ষমতায় আসার ঠিক আগে বুর্জোয়াশ্রেণী অর্থনৈতিক প্রাধান্যের অধিকারী হয় কিন্তু রাষ্ট্র-ক্ষমতা তখনও থেকে যায় সামন্তশ্রেণীর হাতে; সে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসার পরেও অল্প কিছুদিনের জন্য শক্তিশালী সামন্ত-স্বার্থ টিঁকে থাকতে পারে; আধা-ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকেও অর্থনৈতিকভাবে আলাদা করা বেশ কঠিন)। কিন্তু প্রথমত সেই বিশেষ মুহূর্তে ও ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র নির্ধারণের জন্য অন্য কোনো উপযুক্ত নিরিখ (যেমন ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সমূহের পরস্পরসম্পর্ক, ইত্যাদি) নির্বাচন করতে হয়; দ্বিতীয়ত মোটামুটি একটা সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরে অর্থনৈতিক ভিত্তির গতি-প্রকৃতিরও একটা গড়পড়তা হিসাব নিতেই হবে এবং ভিন্নতর নিরিখ দ্বারা আমরা সাময়িকভাবে ও অগত্যা শাসকশ্রেণীর যে চরিত্র নির্ধারণ করেছিলাম তাকে তখন এই অর্থনৈতিক ভিত্তিবিচারের মৌলিক কষ্টিপাথরটিতেও অবশ্যই উত্তীর্ণ হতে হবে।

সুতরাং বিপ্লবের স্তরবিচারে সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তির চরিত্রবিচারটাঃ

একমাত্র নিরিখ নয় ঠিকই, কিন্তু তাকে আবার একেবারে বাদও দেওয়া যায় না। সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তির চরিত্রবিচারের নানা দুরূহতাকে এড়িয়ে যেতে পারার যত মোহই থাক, বিপ্লবের স্তরবিচারে তা এসে পড়বেই, এসে পড়তে বাধ্য। মাঝখান থেকে ওই মোহটুকুর কারণে এই অনিবার্যতার জন্য আমরা প্রস্তুত থাকব না, ফলে অর্থনৈতিক ভিত্তিবিচারের এই আবশ্যিকতা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে "ধ্বংসাত্মক" রূপে, নানা স্ববিরোধিতার আকারে। প্রবীর দত্ত ও মণি গুহ উভয়ের বেলাতেই ঠিক এই ব্যাপারটা ঘটেছে। মণি গুহ সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তির চরিত্রবিচারে শেষ পর্যন্ত প্রবেশ করতে বাধ্য হয়েছেন (কিন্তু স্বভাবতই প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক প্রস্তুতি ছাড়া) আর অনিবার্যভাবে অসঙ্গতি ও স্ববিরোধিতার জালে জড়িয়েছেন। যতদূর মনে হয়, প্রবন্ধের শেষাংশে প্রবীর দত্তও সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তির চরিত্রবিচারকে শেষ পর্যন্ত এড়াতে পারবেন না।

"অর্থনীতি ও রাজনীতির পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝতে না পারা," "রাজনীতি যে অর্থনীতিরই সংহত প্রকাশ (ঘনীভূত রূপ) এটাই ··ভুলে মেরে" দেওয়া, ইত্যাদি নানা অভিযোগ মণি গুহের বিরুদ্ধে প্রবীর দত্ত তুলেছেন। কিন্তু প্রবীর দত্তের নিজের চিন্তা কি এ বিষয়ে পরিষ্কার? ১৯৭৫ সালেও ভারতের সমাজে—বিশেষত গ্রামাঞ্চলে—শক্তিশালী আধা-সামন্তবাদী সম্পর্কের অস্তিত্বের কথা প্রবীর দত্ত তাঁর সততা ও বাস্তবনিষ্ঠার কারণেই অস্বীকার করতে পারেননি (এবং "সমাজতান্ত্রিক" বিপ্লবের অন্যান্য গোঁড়া প্রবক্তাদের সঙ্গে, যেমন বাংলাদেশের জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ও ভারতের এস ইউ সি-র সঙ্গে, এখানেই তাঁর স্বাস্থ্যকর পার্থক্য)। এই 'সন্ধিক্ষণ'এই তাঁর অপর এক সহযোগী লেখক "সমাজতান্ত্রিক" বিপ্লবের স্তরে কৃষিবিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে ভারতীয় সমাজের অধিকাংশ মানুষ (বিশেষত সমগ্র গ্রামীণ জনগণ) আজও আধা-সামন্তবাদী শোষণের শিকার এবং মোট আবাদী জমির ৪০.৫% আজও আধা-সামন্তবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের আয়ত্তাধীন[১]। ১৯৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ার—অর্থাৎ প্রবীর দত্তদের মত অনুযায়ী বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব মারফৎ বুর্জোয়াশ্রেণী এককভাবে ক্ষমতাসীন হওয়ার—আঠাশ বৎসর পরেও এহেন আধা-সামন্তবাদী সম্পর্কের অস্তিত্ব কি অকাট্যভাবে প্রমাণ করে না যে জমিদারশ্রেণীকে এখানে স্পষ্টতই পুষে রাখা হচ্ছে এবং তারাও রাষ্ট্র-ক্ষমতার অংশীদার? বুর্জোয়াশ্রেণী ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই সব সামন্ত অবশেষকে এক ধাক্কায় মুছে যেতে হবে, এমন দাবী কেউ করে না। কিন্তু তাই ব'লে সমগ্র বুর্জোয়াশ্রেণী একচ্ছত্র ক্ষমতা কায়েমের পরেও এত শক্তিশালী আধা-

১ [তাঁদের এই পরিসংখ্যানকে আমরা অবশ্য অনুমোদন বা বিরোধিতা কোনোটাই করছি না।]

সামন্তবাদী সম্পর্ক এত দীর্ঘদিন ধ'রে কি টি কে থাকতে পারে? দু বৎসর নয়, পাঁচ বৎসর নয়, দশ বৎসরও নয়—আঠাশ বৎসর! "রাজনীতি যদি অর্থনীতিরই সংহত প্রকাশ (ঘনীভূত রূপ)" হয়ে থাকে, তবে জমিদারশ্রেণীকেও এখানে রাষ্ট্রক্ষমতার শরিক ব'লে মানতেই হবে। তাছাড়া সামন্ত অবশেষের এত দীর্ঘকাল টি'কে-থাকা অন্তত এই সম্ভাবনাটুকুর জন্ম নিশ্চয়ই দেয় যে বর্তমান সমাজকাঠামোর মধ্যে পুঁজিবাদের বিকাশ দ্বারা সামন্ত অবশেষের পূর্ণ বিলুপ্তি হয়তো সম্ভবই নয়; আর এই একটিমাত্র আদিপ্রতিজ্ঞা যদি সত্য হয় তবে তা যে কেমন অনিবার্যভাবে যে কোনো সমাজকে 'আধা-সামন্তবাদী' (এবং 'ঔপনিবেশিক' বা 'আধা-ঔপনিবেশিক') ব'লে চিহ্নিত করতে সক্ষম, প্রথম খণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ের বিশ্লেষণ অকাট্য যুক্তিশৃঙ্খলের সাহায্যেই তা প্রতিপন্ন করেছে ব'লে আমাদের বিশ্বাস।

সে যাক। প্রবীর দত্ত হয়তো বলবেন: "কিন্তু এই জমিদাররা বিশুদ্ধ সামন্তবাদী নয়, বরং বহুলাংশে বুর্জোয়া, এবং সেই অর্থে তারা বুর্জোয়াশ্রেণীরই অংশ; অতএব এইদিক থেকে বলা যায় যে ভারতে বুর্জোয়াশ্রেণীই এককভাবে ক্ষমতায় এসেছে এবং রাষ্ট্রক্ষমতায় সামন্তবাদের কোনো অংশীদারি নেই।"

আমরাও বলি যে এই জমিদাররা বিশুদ্ধ সামন্তবাদী নয়। কিন্তু তাতে কি? আমাদের উল্লেখিত বিশ্লেষণ থেকে পাঠক সহজেই বুঝতে পারবেন যে কেবলমাত্র একটা বিকাশমান পুঁজিবাদী সমাজেই (যেখানে সামন্ত অবশেষ চলেছে অনিবার্য ও পূর্ণ বিলোপের দিকে ও এই মিশ্র চরিত্রসম্পন্ন জমিদারশ্রেণী চলেছে বিশুদ্ধ বুর্জোয়ায় পরিণত হওয়ার দিকে) এই জমিদারদের মোটামুটিভাবে বুর্জোয়াশ্রেণীর অংশ ব'লে ধ'রে নিতে বাধা থাকে না এবং "তাদের ক্ষেত্রে এই ধরনের এগিয়ে যাওয়াতে ভুল নেই"; কিন্তু যদি কোনো সমাজে পুঁজিবাদের বিকাশ দ্বারা সামন্ত অবশেষের পূর্ণ বিলুপ্তি অসম্ভব হয়ে থাকে (যেটা সত্য হওয়ার জোরালো সম্ভাবনা আমাদের মতো অধোনত সমাজগুলিতে বিদ্যমান) তাহলে সেখানে নিছক আপেক্ষিক পরিমাণের যুক্তিতে (যে যুক্তি আবার বাস্তবে প্রতিপাদনযোগ্যও নয়) "এই ধরনের এগিয়ে যাওয়া"টা অচল। এক্ষেত্রে এদের রাষ্ট্রক্ষমতায় শরিক হওয়ার অর্থ হবে রাষ্ট্রক্ষমতায় সামন্তবাদী শক্তিরই অংশীদারি।

এইবার মণিবাবুর বক্তব্য বিচার করা যাক।

তিনি স্বীকার করেছেন যে "শক্তিশালী প্রাক-পুঁজিবাদী অবশেষের অস্তিত্ব সত্ত্বেও রাশিয়া পুঁজিতান্ত্রিক দেশে পরিণত হয়েছিল।" কেন? তাঁর গতানুগতিক চিন্তাধারা অনুযায়ী নিশ্চয়ই তার কারণ এই যে সেখানে প্রাক-পুঁজিবাদী অবশেষ শক্তিশালী হলেও পরিমাণগতভাবে প্রধান ছিল পুঁজিবাদী সম্পর্কটাই। শক্তিশালী প্রাক-পুঁজিবাদী অবশেষের অস্তিত্বের কারণ হিসাবে তিনি সঠিকভাবেই নির্দেশ করেছেন আমাদের বর্ণিত (প্রথম খণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়, উপ-

পরিচ্ছেদ ৭) পুঁজিবাদী বিকাশের 'প্রথম পথ'কে। কিন্তু তারপরেই তিনি একটা মারাত্মক কথা বলেছেন। পুঁজিবাদী বিকাশের এই 'প্রথম পথ'এর জন্যই নাকি রাশিয়ার "কৃষিব্যবস্থা আধা-সামন্ততান্ত্রিক…সম্পর্কের পরিধির মধ্যে আটকে ছিল"! কিন্তু কৃষিপ্রধান রাশিয়ার কৃষিব্যবস্থাটাই যদি আধা-সামন্তবাদী হয়, তাহলে রাশিয়ার গোটা সমাজটা কি ছিল—পুঁজিবাদী না আধা-সামন্তবাদী? তারপর তিনি আরেকটু এগোলেন: এই "আধা-সামন্ততান্ত্রিক পরিধির মধ্যে আটকে" থাকার দিক থেকে "রাশিয়া, পূর্ব ইউরোপ" এবং "এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার মতো জায়গাগুলি"কে তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবেই এক কাতারে ফেলে দিলেন। এর অর্থ খুবই পরিষ্কার: রাশিয়া এবং "এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার মতো জায়গাগুলি" সবই আধা-সামন্তবাদী এবং তাদের মধ্যে গুণগত কোনো পার্থক্য নেই!

কিন্তু অন্যদিকে তিনিই আবার ভারতের অর্থনীতিতে পুঁজিবাদের প্রাধান্যের কথা বলেছেন এবং স্বীকার করেছেন যে গ্রামাঞ্চলেও পুঁজিবাদ "প্রধান ও নিয়ন্ত্রক উপাদানে পরিণত হয়েছে"। এবারও রাশিয়া এবং এশিয়ার একটি দেশের (ভারতের) সমাজের মধ্যেকার গুণগত পার্থক্য তিনি অস্বীকার করলেন, তবে উল্টো দিক থেকে। দুটোকেই তিনি প্রকৃতপক্ষে পুঁজিবাদী ব'লে চিহ্নিত করলেন!

তাঁর আসল সমস্যাটা হল, তিনি বুঝতে পারছেন না যে তাঁর তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য হল রাশিয়ার মতো একটা অনগ্রসর পুঁজিবাদী দেশ ও ভারতের মতো একটা অগ্রসর অধোনত দেশের মধ্যে একটা গুণগত পার্থক্য টানা। এই গুণগত পার্থক্যটি পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদের কোনো তথাকথিত আপেক্ষিক "পরিমাণ"এর উপর নির্ভরশীল হবে না—বরং উভয় সমাজে সামন্ত অবশেষের "পরিমাণ" যদি এমন কি সমানও হয় তবু তা অটুট থাকবে। এই রকম একটি গুণগত পার্থক্য টানার কোনো দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদী ভিত্তি নির্দেশ করতে না পারার ফলেই তিনি পড়েছেন মহা বিপদে। রাশিয়ার সমাজকে পুঁজিবাদী ব'লে মানলে ভারতীয় সমাজকেও পুঁজিবাদী বলতে হয়। অথচ ভারতীয় সমাজকে যেন তেন প্রকারেণ আধা-সামন্তবাদী বলবেন ব'লে তিনি আগে থেকে ঠিক ক'রে রেখেছেন, কিন্তু তাহলে আবার রাশিয়ার সমাজকে "আধা-সামন্ততান্ত্রিক… সম্পর্কের পরিধির মধ্যে আটকে" থাকার দায়ে অভিযুক্ত করতে হয়, ঘুরিয়ে বলতে হয় যে রাশিয়ার সমাজও আধা-সামন্তবাদীই ছিল!

মণিবাবুর এই শোচনীয় স্ববিরোধের সুযোগ প্রবীরবাবু দক্ষভাবেই গ্রহণ করেছেন। তিনি প্রশ্ন করেছেন: তাহলে মণিবাবুর মতে রাশিয়া কি আধা-সামন্তবাদী ছিল, না পুঁজিবাদী? তিনি সঙ্গতভাবেই বলেছেন যে পুঁজিবাদী

বিকাশের 'প্রথম পথ'এর প্রাধান্যের জন্য "যদি পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনপদ্ধতি ব্যাপক, মুক্ত ও দ্রুত বিকাশের…সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত হয়েই থাকে, তাহলেও তো তার…বিকাশের সুযোগ থেকেই যায়। সেক্ষেত্রে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির 'আধা-সামন্ততান্ত্রিক সীমার মধ্যে' আটকে থাকার কথা ওঠে কি ক'রে?" তাছাড়া মণিবাবু নিজেও তো স্বীকার করেছেন যে "রাশিয়ার বিকাশ 'আধা-সামন্ততান্ত্রিক সীমার মধ্যে' আটকে থাকেনি।" উপরন্তু ভারতের প্রসঙ্গে মণিবাবু "স্বীকার করেছেন যে গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদ 'প্রধান ও নিয়ন্ত্রক উপাদানে পরিণত হয়েছে' এবং তা 'সামগ্রিক প্রভাব' (অবশ্যই জাতীয় অর্থনীতিতে) ফেলেছে; এর দ্বারা মণিবাবু ভারতকে কি পুঁজিবাদী দেশ ব'লেই মেনে নিচ্ছেন না?"

খুবই চমৎকারভাবে ধরেছেন প্রবীরবাবু। কিন্তু যে তীক্ষ্ণতার সঙ্গে তিনি অন্যকে সমালোচনা করছেন, সেই একই তীক্ষ্ণতার সঙ্গে যদি তিনি নিজেকেও সমালোচনা করতে পারতেন তবে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক সত্যও তাঁর নাগালে এসে যেত। মণিবাবুর চিন্তার গলদ যেখানে তাঁর চিন্তারও গলদ আসলে সেইখানেই। তিনিও পুঁজিবাদী ও আধা-সামন্তবাদী সমাজের পার্থক্যনির্দেশক কোনো নিরিখ নির্ণয় করতে পারেননি, কারণ তাঁর ধারণা সে পার্থক্য নিহিত রয়েছে পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদের আপেক্ষিক "পরিমাণ"এর মধ্যে: "সমাজ-বিজ্ঞানের আলোচনায় কখনোই 'আধা' শব্দটি অর্ধেক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। অর্থাৎ 'আধা-সামন্ততান্ত্রিক' মানে অর্ধেক সামন্ততান্ত্রিক আর অর্ধেক পুঁজি-তান্ত্রিক নয়—'আধা-সামন্ততান্ত্রিক' সমাজব্যবস্থা বলতে বোঝা যায় মূলত বা প্রধানত সামন্ততান্ত্রিক…।" "আমরা কোনো দেশকে তখনই পুঁজিতান্ত্রিক বলতে পারি যখন পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনপদ্ধতি দেশটির জাতীয় অর্থনীতির উপর আধিপত্য বিস্তার করে—আর যখন কোনো দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে পুঁজি-তান্ত্রিক উৎপাদনপদ্ধতি অধস্তন ভূমিকায় থাকে তখন সেই দেশকে পুঁজিতান্ত্রিক ব'লে চিহ্নিত করা যায় না। বলতে হয় দেশটি আধা-সামন্ততান্ত্রিক অর্থাৎ মূলত সামন্ততান্ত্রিক।" কিন্তু যে সমাজে সামন্তবাদ প্রধান তা সেই একই যুক্তিতে সামন্তবাদী হবে না কেন? মাঝখান থেকে চীনের মতো একটা আধা-সামন্তবাদী সমাজ আসে কোন যুক্তিতে? ··হায়, এই সামান্য প্রশ্নটা আমরা কেউ এত বৎসর ধ'রে উত্থাপনই করতে পারলাম না—না "সমাজতন্ত্রবাদী"রা, না "জনগণ-তন্ত্রবাদী"রা। উভয়পক্ষই বিতর্কটা চালান যে মূল ধারণাগত কাঠামোর মধ্যে তা যেহেতু-ভুল ও অর্থহীন, তাই এই সম্পূর্ণ বিতর্কটা এবং সেই সূত্রে অদ্যাবধি জমিয়ে তোলা পর্বতপ্রমাণ তথ্য ও পরিসংখ্যান সবই এই বিতর্ক নিষ্পত্তির দিক থেকে পুরোপুরি পণ্ডশ্রমে পর্যবসিত হয়েছে। এই উপলব্ধিই ছিল প্রথম খণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ের বিশ্লেষণটির প্রেরণাস্থল।

এখানে আরেকটা বিষয় সম্বন্ধে পরিষ্কার হওয়া দরকার। মার্কসীয় সাহিত্যে 'পুঁজিবাদী' চরিত্রায়ণটি দুই অর্থে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে :

(১) বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব মারফৎ বুর্জোয়াশ্রেণী ক্ষমতায় আসার পূর্বে যদি কোনো সমাজকে পুঁজিবাদী বলা হয় তবে তার মানে এই যে তার অর্থ-নৈতিক ভিত্তিটা পুঁজিবাদী হয়ে গেছে—যদিও তখনও শক্তিশালী সামন্ত অবশেষ বর্তমান এবং উপরিকাঠামোটা তখনও সামন্তবাদী, আর তারই দরুণ বিপ্লবের স্তর তখনও গণতান্ত্রিক এবং প্রধান ও মৌলিক দুটো দ্বন্দ্বই তখনও সামন্তবাদের সঙ্গে ব্যাপক জনগণের। ১৯১৭র ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের আগে পর্যন্ত রাশিয়ার সমাজ এই অর্থেই পুঁজিবাদী ছিল।

(২) একটা সমাজ সবদিক থেকে পূর্ণাঙ্গভাবে পুঁজিবাদী হয়ে ওঠে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব মারফৎ বুর্জোয়াশ্রেণী ক্ষমতায় আসার পরে ; সামন্ত অবশেষ তখনও যদি বজায় থাকেও তবু যেহেতু অর্থনৈতিক ভিত্তির সঙ্গে সঙ্গে উপরিকাঠামোটাও পুঁজিবাদী হয়ে গেছে তাই মৌলিক ও প্রধান দুটো দ্বন্দ্বই তখন হয়েছে বুর্জোয়া-সর্বহারা দ্বন্দ্বটি এবং বিপ্লবের স্তর তখন সমাজতান্ত্রিক। রাশিয়ার সমাজ এই অর্থে পুঁজিবাদী ছিল ১৯১৭র ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর থেকে ১৯১৭র নভেম্বর বিপ্লবের আগে পর্যন্ত।

মার্কসীয় তত্ত্বে হাতে-খড়ি হওয়ার সময় আমরা শিখি যে সমাজটা পুঁজিবাদী হয়ে যাওয়ার পরেই তাতে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব (পুরোনো ধরনের) ঘটে। কিন্তু তার মানে সে বিপ্লবের আগে পর্যন্ত ওই সমাজে—অর্থাৎ একটা **পুঁজি-বাদী** সমাজে—সামন্ত দ্বন্দ্বটাই প্রধান ও মৌলিক দ্বন্দ্ব থাকে। আবার মাওয়ের 'দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে' পড়তে গিয়ে আমরা দেখি যে পুঁজিবাদী সমাজে বুর্জোয়া-সর্বহারা দ্বন্দ্বটাই প্রধান ও মৌলিক দ্বন্দ্ব ; সামন্ত দ্বন্দ্ব যদি তাতে বিদ্যমান থাকেও তা কখনও প্রধান হতে পারে না। এই আপাত-অসামঞ্জস্যের কারণ হচ্ছে এই যে দুই ক্ষেত্রে 'পুঁজিবাদী' কথাটা দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

যা হোক, কোনো সমাজ যদি প্রথম অর্থে পুঁজিবাদী না হয় তাহলে তা দ্বিতীয় অর্থেও কখনও পুঁজিবাদী হতে পারবে না এবং নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে ছাড়া বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে এখানে কোনোমতেই সম্পূর্ণ করা যাবে না। এখানেই রয়েছে পুঁজিবাদী (প্রথম অর্থে) সমাজে পুরোনো ধরনের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব আর আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্তবাদী সমাজে নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যেকার পার্থক্য।

প্রবীর দত্ত এটা বোঝেননি ব'লেই বলেছেন : "আসলে বিশ্ব ধনবাদ সাম্রাজ্য-বাদের স্তরে উন্নীত হওয়ার পর কোন শ্রেণীর নেতৃত্বে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব

সম্পন্ন হবে—এই প্রশ্নে যান্ত্রিক চিন্তাধারার দরুণই তাঁরা যে ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয়নি সে ক্ষেত্রে বুর্জোয়ারা শাসক-শ্রেণীতে পরিণত হলেও মানতে পারছেন না যে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর সম্পূর্ণ হয়েছে। …সুতরাং বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব মূলত সম্পূর্ণ হতে হলে সর্বহারা-কৃষক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতেই হবে এই ধারণা ঠিক নয়।" না, প্রবীর-বাবু! সাম্রাজ্যবাদের যুগে আমাদের মতো পশ্চাৎপদ সমাজগুলিতে বুর্জোয়াদের দ্বারা বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ হতে আদৌ **পারে** কিনা, সমগ্র বুর্জোয়া-শ্রেণী শাসকশ্রেণীতে পরিণত হতে আদৌ **পারে** কিনা, সর্বহারা-কৃষক (-শহুরে পেটি বুর্জোয়া-জাতীয় বুর্জোয়া) প্রজাতন্ত্র (পুরোনো বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নয়, নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের) ছাড়া বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ হতে আদৌ **পারে** কিনা—এটাই তো প্রশ্ন। চীনের মতো পশ্চাৎপদ সমাজের ক্ষেত্রে মাও স্পষ্ট জবাব দিয়েছিলেন যে তা সম্ভব নয়। আপনি কি তাঁর এই বক্তব্য ভুল মনে করেন? করলে বলুন, যুক্তি ও তথ্য দিন। আপনি অভিযোগ করেছেন যে মণিবাবু বিভিন্ন 'প্রতিষ্ঠিত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সূত্রায়ণকে গ্রহণ বা বর্জন কোনোটাই না ক'রে নীরবে পাশ কাটিয়ে গেছেন। তা, আপনি মাওয়ের এই সুপরিচিত সূত্রায়ণটি সম্বন্ধে এমন আশ্চর্যজনকভাবে নীরব কেন?

আমরা আগেই দেখেছি যে জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকদের মধ্যে বাংলা-দেশের আলাউদ্দীন সাহেব একটা জাতীয়-বুর্জোয়া সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার, এমন কি তার দ্বারা ভূমিসংস্কার সম্পন্ন হওয়ার, আশা প্রকাশ করেছেন। আমাদের মতো সমাজে নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে ছাড়াও বুর্জোয়াদের দ্বারা বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ হতেও পারে, বুর্জোয়ারা ক্ষমতায় হয়তো আসতেও পারে—নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের লাইনের সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও তিনি এমন একটি চিন্তা পোষণ করেন এবং তা থেকেই তাঁর এই লেজুড়বৃত্তির উদ্ভব। তিনিও মাওয়ের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যটি সম্বন্ধে আশ্চর্যজনকভাবে নীরব।

৩.

মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া সম্বন্ধে জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকদের ভ্রান্তি আমরা আগেই নির্দেশ করেছি। "সমাজতান্ত্রিক" বিপ্লবের প্রবক্তা প্রবীর দত্তও এ ব্যাপারে অনেকাংশে একই ভ্রান্তির শিকার অর্থাৎ তাঁরও ধারণা অনুযায়ী মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদীদের কোনো দ্বন্দ্বই থাকে না; কিন্তু যেহেতু ভারতের শাসকশ্রেণীর সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদীদের কিছু কিছু দ্বন্দ্ব কখনও কখনও প্রকাশ পায়, অতএব তারা মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া নয়।

মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া সম্বন্ধে প্রবীর দত্তের সম্পূর্ণ বক্তব্য হল: (১) মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ারা শিল্পীয় বুর্জোয়া নয়, ব্যবসায়ী ও মহাজনী বুর্জোয়া; (২) এই ব্যবসায়ী ও মহাজনী বুর্জোয়ারা "প্রকৃত" বুর্জোয়া নয়, যেহেতু তারা প্রাক-পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের প্রতিনিধি; (৩) অতএব মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ারাও "প্রকৃত" বুর্জোয়া নয়, তারাও প্রাক-পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের প্রতিনিধি; (৪) মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদীদের কোনো বিরোধই কখনও থাকতে পারে না।

এক্ষেত্রে মূল প্রশ্ন হল: মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ারা পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের প্রতিনিধিত্ব করে কিনা?

প্রবীর দত্ত এ প্রশ্নের না-সূচক জবাব দিতে পেরেছেন, কারণ অন্য সকলের মতোই তিনিও মুৎসুদ্দি ও মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াকে গুলিয়ে ফেলেছেন। 'চীনা সমাজের শ্রেণীবিশ্লেষণ' লেখায় মাও "জমিদার ও মুৎসুদ্দিশ্রেণী"কে সবচেয়ে পশ্চাৎপদ উৎপাদন-সম্পর্কের প্রতিনিধি ব'লে আখ্যায়িত করেছেন। প্রবীরবাবু মাওয়ের এই উক্তিটিকে তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু খেয়াল করেননি যে মাও সেখানে 'মুৎসুদ্দি'র কথা বলেছেন, 'মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া'র কথা নয়। ঐ লেখাতে মাও মাঝারি তথা জাতীয় বুর্জোয়াকে পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের প্রতিনিধি বলেছেন এবং সেই লেখা থেকেই আমরা ইতিপূর্বে প্রমাণ করেছি যে এই জাতীয় বুর্জোয়ার মধ্য থেকেই একটি অংশ ১৯২৭ সালে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া হিসাবে দলত্যাগ করে। অতএব 'মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া'রা পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কেরই প্রতিনিধিত্বকারী, অর্থাৎ "প্রকৃত বুর্জোয়া"ই; আর 'মুৎসুদ্দি'রা ছিল সামন্তবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের প্রতিনিধিত্বকারী, অর্থাৎ সামন্তশ্রেণীরই অংশ ও উপাঙ্গ। এইজন্যই ১৯২৬ সালে মাও মুৎসুদ্দিশ্রেণীকে জমিদারশ্রেণীর সঙ্গে একত্রে উল্লেখ করলেও ১৯৪০ সালে 'চীন বিপ্লব ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টি' লেখায় মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের উল্লেখ করেছেন বুর্জোশ্রেণীরই অংশ হিসাবে; ১৯২৭ সাল নাগাদ সামন্তবাদের দালাল তথা মুৎসুদ্দিরা আসতে পারল বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্য থেকে। 'মুৎসুদ্দি' ও 'মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া' তাই দুই ভিন্ন ঐতিহাসিক পর্যায় ও দুই ভিন্ন উৎপাদন-সম্পর্কের প্রতিনিধি। পূর্বধারণায় অন্ধ হওয়ার ফলে প্রবীর দত্ত এসব লক্ষ্য করতে পারেননি।

চীনের জাতীয় বুর্জোয়ারা পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের প্রতিনিধি হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে ব্যবসায়ী অংশ নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু তাই ব'লে সে অংশটি "প্রকৃত বুর্জোয়া" ছিল না এমন নয়। অতএব তাদের মধ্য থেকে যে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া অংশটি বেরিয়ে এসেছিল তাদের মধ্যেও ব্যবসায়ী অংশের অস্তিত্ব নিশ্চয়ই ছিল। এমন কি এই ব্যবসায়ী অংশের নিজস্ব শিল্পভিত্তি না থাকার ফলে মুৎসুদ্দি হওয়ার প্রবণতাটা এদের মধ্যেই বেশী জোরালো থাকা স্বাভাবিক

এবং সে কারণে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের মধ্যে ব্যবসায়ী অংশের অনুপাত যদি জাতীয় বুর্জোয়ার মধ্যে ব্যবসায়ী অংশের অনুপাতের চেয়ে বেশীও হয় তবে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু তাই ব'লে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের "প্রকৃত বুর্জোয়া" অর্থাৎ পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের প্রতিনিধি না ভাবার কোনো কারণ থাকতে পারে না।

তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন উঠবে: ব্যবসায়ীদের কি আমরা পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের প্রতিনিধি ব'লে ধরব, নাকি প্রাক-পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের?

আসলে এক কথায় এ প্রশ্নের কোনো জবাব হয় না। যেমন প্রাক-পুঁজিবাদী সমাজে ঠিক তেমনি পুঁজিবাদী সমাজেও বণিক পুঁজির অস্তিত্ব থাকে। প্রাক-পুঁজিবাদী সমাজে বণিক পুঁজি পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের প্রতিনিধি নয়; কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজে বণিক পুঁজি শিল্পপুঁজির নেতৃত্বাধীন হয়ে যায় ও তার সেবা করে এবং সেইজন্যই তা-ও পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কেরই প্রতিনিধিত্ব করে। বস্তুত বণিক পুঁজির চরিত্র নির্ধারিত হয় তার চারপাশের সামাজিক পরিবেশ দ্বারা।

আমাদের মতো পশ্চাৎপদ সমাজগুলিতে যেমন একদিকে এমন বণিক পুঁজির দেখা মেলে যা প্রধানত প্রাক-পুঁজিবাদী শোষণ চালায় (যেমন গ্রামাঞ্চলের মহাজন, ফড়িয়া, এমন কি শহরেরও মজুতদার) এবং সেই হিসাবে আধা-সামন্তবাদী শক্তির অংশ, ঠিক তেমনি এমন বণিক পুঁজিও আছে যা প্রধানত শিল্পপুঁজির সঙ্গে সংশিষ্ট এবং সেই হিসাবে পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের প্রতি-নিধিত্বকারী। একটি বিশেষ বণিক পুঁজি প্রধানত প্রাক পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের প্রতিনিধি নাকি পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের, এ কথা নির্ণয় করা কোনো কোনো ক্ষেত্রে কঠিন হলেও সাধারণভাবে এই পার্থক্য বিরাজমান এবং তাকে দেখতেই হবে। তা না হলে প্রবীরবাবুর বিভ্রান্তি আমাদেরও আক্রমণ ক'রে বসতে পারে।

প্রবীরবাবুরা মনে করেন যে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের কোনো বিরোধই কখনও দেখা দিতে পারে না। এই অনুমানের ভ্রান্তি আমরা ইতিপূর্বে উদ্ঘাটন করেছি এবং দেখিয়েছি যে রাষ্ট্রক্ষমতা তথা শোষণ ও শাসনের "অগ্রিম অধিকার" কার হাতে থাকবে এই নিয়ে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের সঙ্গে বিরোধ সর্বদাই থাকে, তবে তারই পাশাপাশি প্রধান থাকে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের আত্মসমর্পণের দিক।

প্রবীরবাবুরা এটা বোঝেননি ব'লেই ঔপনিবেশিক আমলে বৃটিশের সঙ্গে কংগ্রেসী নেতৃত্বের আপোষপ্রবণ বিরোধগুলিকে মনে করেছেন জাতীয় বুর্জোয়ার চরিত্রনির্দেশক ব'লে এবং আজও তাঁদের মতে ভারতে সমগ্র বুর্জোয়াশ্রেণী—

প্রধানত জাতীয় বুর্জোয়ারাই – এককভাবে ক্ষমতাসীন[২]।

কিন্তু ভারতীয় সমাজের অগুনতি পরিসংখ্যান প্রমাণ করে যে বর্তমান কাঠামোতে ফুলে-ফেঁপে উঠছে বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজিপতিরাই – সমগ্র জনগণ, এমন কি মাঝারি বুর্জোয়াদেরও ধ্বংস ক'রে। সুতরাং রাষ্ট্রক্ষমতায় রয়েছে এরাই, মাঝারি বুর্জোয়ারা নয়। অবশ্য উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতেও বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজিপতিরা রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন। কিন্তু তাদের সঙ্গে কোনো সামন্তশ্রেণীর অংশীদারি নেই এবং তাদের ক্ষমতায় থাকাটা হল সমাজের সম্পূর্ণ পুঁজিবাদী রূপান্তরেরই এক অতি উন্নত পর্যায়ের ফলশ্রুতি। পক্ষান্তরে আমাদের মতো দেশগুলিতে বুর্জোয়াশ্রেণীর বৃহৎ একচেটিয়া অংশ ক্ষমতায় আসে বুর্জোয়াশ্রেণীর ঐতিহাসিক ব্রত (mission) জলাঞ্জলি দিয়ে – নিজের পুঁজিবাদী ভিত্তি ও চরিত্র সত্ত্বেও তার অবজেকটিভ অবস্থান (বিশেষত রাষ্ট্রক্ষমতা) হয়ে দাঁড়ায়

২ [জেল থেকে বেরিয়ে আসার পরে এই সেদিন 'ঐক্য ও সংগ্রাম' (কলকাতা, ১ নভেম্বর ১৯৭৮) পত্রিকায় 'ভারতবর্ষের বুর্জোয়াশ্রেণী কি মুৎসুদ্দি ?' নামে এক দীর্ঘ ও উচ্চাশাপূর্ণ প্রবন্ধ পড়লাম। লেখক তাতে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে ভারতবর্ষের ক্ষমতাসীন বুর্জোয়ারা মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া নয়, বরং জাতীয় বুর্জোয়া। কিভাবে তিনি তাঁর "প্রমাণ"টা হাসিল করেছেন ? তাঁর চিন্তার কাঠামোটা এই রকম : প্রচুর তথ্য ও পরিসংখ্যান সাক্ষ্য দেয় যে ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণীর শিল্প-পুঁজিবাদী ভিত্তি রয়েছে এবং তার সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদীদের আপোষ ও বিরোধ দুই-ই বর্তমান. অতএব (এই "অতএব"টাই সবচেয়ে চমৎকার।) ভারতের ক্ষমতাসীন বুর্জোয়ারা মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া হতে পারে না, বরং তারা জাতীয় বুর্জোয়া। কিন্তু ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণীর পুঁজিবাদী ভিত্তি এবং সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তার আপোষ ও বিরোধ যদি মেনেও নেওয়া হয় (এবং না মানার কোনো কারণ আমাদের নেই) তবে তা থেকে তাঁর সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হয় কোন যুক্তিতে ? স্পষ্টতই প্রবীর দত্তের মতো তিনিও মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও জাতীয় বুর্জোয়াকে আলাদা করার জন্য দুটি নিরিখ ব্যবহার করেছেন : (১) মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের কোনো পুঁজিবাদী ভিত্তি থাকে না, কিন্তু জাতীয় বুর্জোয়াদের থাকে ; এবং (২) মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের কোনো বিরোধ থাকে না, কেবল আপোষ থাকে, কিন্তু জাতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের আপোষ ও বিরোধ দুই-ই থাকে। এখন, নিজের প্রতিপাদ্যের "সমর্থনে" লেখক যে ভয়ংকর পরিমাণ তথ্য-পরিসংখ্যান হাজির করেছেন, আলোচ্য প্রসঙ্গে সেগুলোর কোনো তাৎপর্য থাকতে পারে কেবলমাত্র উপরোক্ত নিরিখদুটো তত্ত্বগতভাবে সঠিক হলে পরেই, নইলে নয়। আমরা জানি তাঁর ব্যবহৃত নিরিখদুটো পুরোপুরিই ভুল, কেননা পুঁজিবাদী ভিত্তি এবং সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ ও বিরোধ, এই দুটোই মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও জাতীয় বুর্জোয়া উভয়েরই অভিন্ন বৈশিষ্ট্য ; কাজেই ওগুলোর দ্বারা তাদের পৃথক ক'রে চেনা কিছুতেই সম্ভব নয়। এই কারণেই লেখকের তথ্য, পরিসংখ্যান ও উদ্ধৃতির পাশুপতগুলো সবই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে এবং এই কারণেই তাঁর এত পরিশ্রমের এত দীর্ঘ প্রবন্ধটিকে একটি সংক্ষিপ্ত পাদটীকার অতিরিক্ত মনোযোগ দিতে আমরা কিছুতেই পারলাম না (প্রবন্ধটিকে 'শ্রমিক পাঠ-চক্রে'র নামে ছাপানো সত্ত্বেও)। আমাদের দেশের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিতর্কের একটি সাধারণ ব্যাধি হল কাঁচা তাত্ত্বিক দখল সত্ত্বেও তথ্য ও পরিসংখ্যানের সাহায্যে মেকী সম্ভ্রান্ততা অর্জনের বুর্জোয়া-বুদ্ধিজীবীসুলভ অধীরতা।]

সমাজের সম্পূর্ণ পুঁজিবাদী রূপান্তরের অন্তরায়। এটাই এদের মুৎসুদ্দি চরিত্রের অন্তর্বস্তু ও সংজ্ঞা।

৪.

আমরা দেখেছি যে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া, আধা-উপনিবেশ, আধা-সামন্তবাদ ইত্যাদি বিষয়ে "সমাজতান্ত্রিক" বিপ্লবের প্রবক্তারা এবং জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকরা উভয়েই কতগুলি একপেশে ও ভ্রান্ত ধারণা পোষণ ক'রে থাকেন। মজার কথা এই যে তাঁদের এইসব ধারণার "সমর্থনে" তাঁরা মাও সেতুঙের নানা উক্তি ও চীন পার্টির নানা বক্তব্য উদ্ধৃত ক'রে কর্মীসাধারণের পক্ষে এক বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন। অথচ চীন পার্টির এক অতি গুরুত্বপূর্ণ দলিল সম্বন্ধে তাঁরা উভয়পক্ষই লক্ষ্যণীয়ভাবে নীরব। দলিলটি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে এটার বিরোধিতা করার মধ্য দিয়েই সি পি এম-মার্কা সংশোধনবাদের মুখোশ খুলে পড়েছিল, শুরু হয়েছিল সি পি এম নেতৃত্বের প্রকাশ্য চীন-বিরোধিতা, আরো একধাপ এগিয়ে গিয়েছিল আমাদের সংশোধনবাদ-বিরোধী সংগ্রাম।

দলিলটার নাম 'নেহরুর দর্শন সম্বন্ধে আরো কথা' (১৯৬২)। ১৯৭৪এর অক্টোবর-সংখ্যা 'অনীক'এ প্রকাশিত এই দলিলের একটি তর্জমা থেকে কয়েকটি প্রয়োজনীয় অংশ আমরা বিনা মন্তব্যে নিচে তুলে দিলাম। যে কোনো পাঠক একনজরেই বুঝতে পারবেন যে আলোচ্য সবগুলি প্রশ্নে চীন পার্টির বক্তব্য আমাদের বক্তব্যকে পুরোপুরি সমর্থন করে এবং আমাদের উভয় প্রতি-পক্ষের বক্তব্যেরই তা সরাসরি বিরোধী। চীন পার্টির বিরুদ্ধে কোনোপ্রকার উচ্চবাচ্য না ক'রে (বরং তার প্রতি যথাসম্ভব সাধুবাদ জানিয়ে) আমাদের বক্তব্যের বিরোধিতা করার যে ভদ্রজনোচিত রণকৌশলটি তাঁরা প্রায়ই অবলম্বন ক'রে থাকেন, নিচের উদ্ধৃতিগুলি তার স্বরূপ উন্মোচনে সাহায্য করবে। উদ্ধৃতিগুলিতে সব বড় হরফ আমাদের।

"আধুনিককালে ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলির জাতীয় বুর্জোয়ারা সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্তবাদী শক্তিগুলির সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্বের কারণে কিছু পরিমাণে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্তবাদ-বিরোধী সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং এভাবে ইতিহাসে একটি প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করতে পারে।"—"অন্যদিকে আবার ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলির বুর্জোয়ারা তাদের শ্রেণী-অবস্থানের জন্যই সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের সঙ্গে আপোষের প্রবণতা দেখায় এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্তবাদ-বিরোধী

বিপ্লবে দোদুল্যমানতার পরিচয় দেয়। এদের **এক অংশ** বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থ সাম্রাজ্যবাদের ও দেশীয় সামন্তবাদের স্বার্থের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, এবং তারাই হচ্ছে বুর্জোয়াদের মধ্যে **প্রতিক্রিয়াশীল**। কোনো কোনো অবস্থায় তারাও জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনে অংশ নিতে পারে, কিন্তু যখন ব্যাপক জনতা প্রকৃতই উঠে দাঁড়ান, শ্রেণীসংগ্রাম যখন তীব্র হয়ে ওঠে, এবং সাম্রাজ্যবাদীরা যখন তাদের ঘুষ দেয়, তখনই তারা বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, দেশের ভেতরে জনগণ, কমিউনিস্ট পার্টি ও প্রগতিশীল শক্তিগুলিকে দমন করে এবং দেশের বাইরে সাম্রাজ্যবাদের কাছে নিজেদের বিকিয়ে দেয় ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধাচরণ করে।"

"ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণী বৃটিশ বুর্জোয়াশ্রেণী ও ভারতের জমিদারশ্রেণীর সঙ্গে রক্তের সম্পর্কে আবদ্ধ। নিজেদের শ্রেণীস্বার্থেই তারা বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন মাত্রায় ভারতীয় জনগণের বৃটিশবিরোধী সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছে। কিন্তু নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থানের জন্যই প্রথম থেকেই বৃটিশবিরোধী সংগ্রামে তাদের মনোভাব ছিল আপোষের। জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী একদিকে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার আন্দোলন চালিয়েছে, অন্যদিকে তারা জনগণের সংগ্রামকে স্তব্ধ ক'রে দেওয়ার জন্য এবং তাদের বিপ্লবী আন্দোলনকে সীমিত ক'রে রাখার জন্য 'অহিংসা'র স্লোগানটিকে ব্যবহার করেছে।" — "জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ভারতীয় জনগণের আন্দোলনের প্রক্রিয়ায় বৃটিশ উপনিবেশবাদীরা ভারতের **বৃহৎ** বুর্জোয়াশ্রেণী ও **বৃহৎ** জমিদারশ্রেণীর সঙ্গে একটি আপোষ করে এবং ভারতে বৃটিশ উপনিবেশবাদীদের অর্থনৈতিক স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার শর্তে **তাদের হাতে শাসনভার অর্পণ করে**। এভাবে জনগণের বৃটিশবিরোধী সংগ্রামের ফল ভারতের বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী ও বৃহৎ জমিদারশ্রেণীর করায়ত্ত হয়।" — "অবশ্যই ভারতের বৃহৎ বুর্জোয়া ও বৃহৎ জমিদারশ্রেণীর সঙ্গে বিদেশী একচেটিয়া পুঁজির **কিছু দ্বন্দ্ব** রয়েছে এবং তাদের স্বার্থসমূহ পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সেজন্যই সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় জাতির মধ্যেকার দ্বন্দ্বের তীব্রতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় জনগণের চাপে নেহরু সরকার সাম্রাজ্যবাদের থেকে কিছুটা পার্থক্য দেখিয়েছিল। কিন্তু ভারতীয় বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী ও বৃহৎ জমিদারশ্রেণীর শ্রেণীচরিত্র ও অর্থনৈতিক অবস্থানই এটা নির্ধারিত ক'রে দিচ্ছে যে নেহরু সরকারকে সাম্রাজ্যবাদের উপর ক্রমশই বেশী বেশী নির্ভরশীল হতে হবে এবং তার সেবা করতে হবে।" — "ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণার পরেও তা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেনি।" — "নেহরু সরকার ভারতে বেশ কিছু রাষ্ট্রীয় শিল্পসংস্থা স্থাপন করেছে। সেগুলি **বৃহৎ** বুর্জোয়া ও **বৃহৎ** জমিদারশ্রেণীর নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রীয়-পুঁজিবাদী সংস্থা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং আসলে বিদেশী একচেটিয়া পুঁজির উপর **নির্ভরশীল**। মর্মবস্তুর বিচারে

সেগুলি হচ্ছে **ভারতীয় আমলাতান্ত্রিক-একচেটিয়া পুঁজি**। এই আমলা-তান্ত্রিক-একচেটিয়া পুঁজি **ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে** এবং তা বাড়ছে ভারতের মেহনতী জনতার, এমন কি **ছোটো ও মাঝারি** আয়তনের শিল্পসংস্থাগুলির **পুঁজিবাদী মালিকদেরও বিরুদ্ধে**।"

"ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পর প্রথম দিকে বৃহৎ বুর্জোয়া ও বৃহৎ জমিদারদের নিজেদের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার স্বার্থে নেহরু সরকার কিছু স্থানীয় সামন্ত রাজন্যবর্গের সুযোগসুবিধা এবং কিছু জমিদারদের জমিদারির সুবিধা কেড়ে নিয়েছিল, কিন্তু সামগ্রিকভাবে ভারতের **সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থা অক্ষুণ্ণই ছিল**।"—"ভারতের **মৌলিক** আভ্যন্তরীণ সমস্যা **হচ্ছে কৃষক** সমস্যা।"

২

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ও কমিউনিস্ট রণকৌশলের সমস্যা

১৫ আগস্টের কু দে'তা[১] বাংলাদেশের মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের মধ্যে দুটি বিপরীত ধরনের মূল্যায়নের জন্ম দিয়েছে।

প্রথম ধরনের মূল্যায়নটি জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্যের তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত ও তারই উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ধরনের মূল্যায়ন বাংলাদেশকে অমুক বা তমুক শক্তির উপনিবেশ বা নয়া-উপনিবেশ ব'লে মনে করত **এবং এখনও তা-ই করে।** কিন্তু তা সত্ত্বেও মূল্যায়নের মতে কু-র ফলে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা নাকি এমনই "মৌলিক" চরিত্রের যে তা ক্ষমতায় অনধিষ্ঠিত সব কমিউনিস্ট পার্টিরই যে সাধারণ মতাবস্থান—অর্থাৎ সব ধরনের ক্ষমতাসীন শাসকশক্তির **বিপ্লবী** বিরুদ্ধাচরণ—সেই সাধারণ মতাবস্থানকে, কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সেই স্থায়ী বৈশিষ্ট্য ও গর্বকে, সাময়িকভাবে পরিত্যাগ করার দাবী করে। তা সরকারের প্রতি সমর্থনের (যতই "শর্তাধীন" বা "সমালোচনামূলক" হোক) বা অন্তত তার সঙ্গে যুক্তফ্রণ্টের পলিসির ওকালতি করে। সাধারণভাবে প্রগতিশীলদের মধ্যে, এবং বিশেষভাবে মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের মধ্যে, এটাই হচ্ছে বর্তমানের সবচেয়ে জোরদার ও প্রভাবশালী ঝোঁক। এর সমর্থকদের মধ্যে আছেন তোয়াহা (বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল), হক (পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি এম-এল), আলাউদ্দীন আহম্মদ (পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি এম-এল), মাহবুবুল্লা, বদরুদ্দীন উমর, এনায়েতুল্লা খান (বিখ্যাত প্রগতিশীল সাপ্তাহিক 'হলিডে'র ভূতপূর্ব সম্পাদক এবং বর্তমান মোশতাক আমলের সরকারী দৈনিক 'বাংলাদেশ টাইমস'এর সম্পাদক), ইত্যাদি।

অপর মূল্যায়নটি পাওয়া যায়, যাঁরা আভ্যন্তরীণ অর্থাৎ সামন্ত দ্বন্দ্বের প্রাধান্যে

১ [১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সোভিয়েত ও ভারতের বশংবদ মুজিব সরকার উৎখাত হয়ে মোশতাক আহমেদের সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। বর্তমান প্রবন্ধটি লেখার মাঝপথে মুজিববাদী সামরিক অফিসার খালেদ মোশারফের নেতৃত্বে আরেকটি সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয় এবং পুনরায় সোভিয়েত ও ভারতের বশংবদ একটি সরকার ক্ষমতা দখল করে। মাত্র কয়েকদিন পরেই সেই সরকার আরেকটি সামরিক অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হয় ও কালক্রমে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হন জেনারেল জিয়াউর রহমান।]

বিশ্বাসী, তাঁদের কারো কারো মধ্যে। এটা বাংলাদেশকে আধা-উপনিবেশ মনে করত **এবং এখনও তা-ই করে**। কিন্তু তা সত্ত্বেও তা মনে করে যে এমন কি একটা কু দে'তাও এমন কোনো তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন কিছুতেই আনতে পারে না যা কমিউনিস্টদের রণকৌশলে কোনো পরিবর্তন দাবী করতে পারে। অথচ প্রত্যেকেই কিন্তু এটুকু জানেন যে উপনিবেশের চেয়ে আধা-উপনিবেশে অবস্থাপরিবর্তনের সম্ভাবনা অনেক বেশী আর তাই তা আরো ঘন-ঘন ও আচমকা রণকৌশলগত মোড়-ফেরারই দাবী করে। বস্তুত, রণকৌশলগত সঙ্কলন-সাবলীলতার যে কোনো চিন্তাই এই মূল্যায়নের প্রকৃতিবিরুদ্ধ এবং তা **অবিলম্বে** সরকার-উচ্ছেদের স্লোগান বজায় রাখার ও তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার পন্থার ওকালতি করে। এটা একটা ক্ষয়িষ্ণু ঝোঁক—চারু মজুমদারের অন্ধ উপাসকরাই এখনও এতে একগুঁয়েভাবে লেগে আছেন।

আমরা অবশ্য এই উভয় ঝোঁকেরই বিরোধিতা করি—প্রথমটির দক্ষিণ বিচ্যুতি হিসাবে এবং দ্বিতীয়টির বাম বিচ্যুতি হিসাবে। আমাদের মতে কু দে'তার দ্বারা সাধিত পরিবর্তন মোটেই এমন চরিত্রের নয় যা শাসকশ্রেণীগুলির সঙ্গে যুক্তফ্রণ্টের পলিসিকে যুক্তিযুক্ত ক'রে তুলতে পারে, তাদের সমর্থন করার পলিসিকে তো নয়ই (আমরা একটু পরেই দেখাব যে তা আমাদের কাছে **কখনোই** গ্রহণযোগ্য হতে পারে না); কিন্তু তা অবশ্যই এমন চরিত্রের যা রণকৌশলগত প্রশ্নাবলীর অতিসতর্ক পুনর্ভাবনা দাবী করে। আমরা প্রমাণ করব যে উপনিবেশ বা নয়া-উপনিবেশের পরিবর্তে আধা-উপনিবেশ হিসাবে বাংলাদেশের চরিত্রায়ণ এবং বর্তমান সময়ে আভ্যন্তরীণ তথা সামন্ত দ্বন্দ্বের প্রাধান্যের লাইন মোটেই অনিবার্যভাবে রণকৌশলগত অনড়তার বাম-হঠকারী সিদ্ধান্তে **নিয়ে যায় না**। বরং উল্টো: একমাত্র এটাই বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসের **সবগুলি** দিক ব্যাখ্যা করতে পারে ও সঠিক রণকৌশলগত সিদ্ধান্তগ্রহণের তাত্ত্বিক ভিত্তি জোগাতে পারে।

বাম-গোঁড়ামিবাদের বিরুদ্ধে এত কিছু এত জায়গায় আমরা বলেছি ও বলছি যে এখানে তার কোনো বিশেষ খণ্ডনে অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন আছে ব'লে মনে হয় না। কিন্তু মোশতাক সরকারের প্রতি রণকৌশলের প্রশ্নে দক্ষিণ বিচ্যুতিটি এই মুহূর্তের একটি বিশেষ বিপদ, তাই এটা কিছুটা মনোযোগ দাবী করে।

১.

বাংলাদেশের মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের মধ্যে কেউই এ সত্য অস্বীকার করেন না যে বাংলাদেশের শাসকশ্রেণীগুলি হচ্ছে মুৎসুদ্দি-আমলাতান্ত্রিক

পুঁজিপতি ও জমিদাররা। এখন, একদিকে একটা দেশকে দেশীয় শাসকশ্রেণীগুলির একনায়কত্বাধীন ব'লে স্বীকার করা এবং অন্যদিকে তাকে আবার উপনিবেশ বা নয়া-উপনিবেশ ব'লে দাবী করাটা যে কত বড় তাত্ত্বিক জগাখিঁচুড়ি তা আমি এই বইয়ের প্রথম খণ্ডেই দেখিয়েছি। এখানে দেখানো দরকার যে বাংলাদেশকে যে লাইনটি রাশিয়ার বা রুশ-ভারত জোটের উপনিবেশ বা নয়া-উপনিবেশ ব'লে চরিত্রায়িত করত এবং এখনও তাকে মার্কিনের নয়া-উপনিবেশ ব'লে চরিত্রায়িত করে, তা বাংলাদেশের উদ্ভব ও অস্তিত্বের সমগ্র সময়কালটির সবগুলি ঘটনা কিছুতেই ব্যাখ্যা করতে পারে না। বিষয়টার কয়েকটি মাত্র দিক উল্লেখ করা যাক।

উক্ত লাইন মুজিব সরকারের আচরণ পুরোপুরি ব্যাখ্যা করতে অক্ষম – যে সরকার এ লাইনের মতে ছিল একটি ঔপনিবেশিক বা নয়া-ঔপনিবেশিক সরকার, একটি **পুতুল** সরকার, অর্থাৎ **বিদেশী** (রাশিয়ার বা ভারতের বা উভয়েরই) শাসকশ্রেণীর সরকার, অথচ যে সরকারের ক্ষমতা ছিল ঠিক ঐ শাসকশ্রেণীগুলিকেই অমান্য করার, হোক না তা দুর্বলভাবে, আংশিকভাবে ও কদাচিৎ। যেমন ধরুন, ইসলামিক সম্মেলনে যোগদান, পাকিস্তানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন, চীনের সঙ্গে সুসম্পর্ক সন্ধান, ইত্যাদি।

তাছাড়া, কু দে'তাটিকে তার সামরিক শক্তির দিক থেকেই বিচার করা হোক, কিংবা তার নেতৃত্বদায়ী রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের দিক থেকে, এটা সন্দেহাতীত যে তা ঘটেছিল পূর্বতন শাসনক্ষমতার **ভিতর থেকে**, রাষ্ট্রযন্ত্রের **ভিতর থেকে**। এখন, একটা দুর্বল অধোনত দেশের শাসনক্ষমতার ভিতর থেকে কিছু ভাড়া করা লোক নিশ্চয়ই এমন কু দে'তা ঘটাতে পারে যার স্পষ্ট উদ্দেশ্যই হল দেশটিকে কোনো সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সম্পূর্ণ উপনিবেশ বা নয়া-উপনিবেশে পরিণত করা। কিন্তু নিছক কু দে'তার মাধ্যমে কোনো উপনিবেশ বা নয়া-উপনিবেশ এক অতিশক্তির কাছ থেকে আরেক অতিশক্তির নিকট হস্তান্তরিত হয়েছে এমন কথা কেউ কি কখনও শুনেছে? মার্কিন উপনিবেশে (বা নয়া-উপনিবেশে) – যেমন দক্ষিণ ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ কোরিয়াতে – কত কু-ই তো ঘটল, কিন্তু তার ফলে সেগুলি কি কখনও অন্য কোনো সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উপনিবেশে বা নয়া-উপনিবেশে পরিণত হয়েছে, না হতে পারত? এমন উদ্ভট প্রচেষ্টা যদি কেউ কখনও করেও (তর্কের খাতিরে একটা অসম্ভব ব্যাপার ধ'রে নিচ্ছি), তবে তা সঙ্গে সঙ্গেই অবধারিতভাবে শাসক সাম্রাজ্যবাদী শক্তিটির নির্মম সশস্ত্র দমন ডেকে আনবে এবং তার পেছন পেছন নির্ঘাত আসবে দুটি শক্তির মধ্যে সর্বাত্মক যুদ্ধ! এ কথা যে কতটা যুক্তিযুক্ত তা একটু ভাবলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে: মনে রাখবেন, উপনিবেশ ও বিদেশী বাজার দখলে রাখার প্রশ্নই মানবজাতিকে দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে টেনে নিয়ে গেছে।

কিন্তু সেক্ষেত্রে আমাদের যে মত—অর্থাৎ বাংলাদেশ বরাবরই আমলা-মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও জমিদারদের শাসনাধীন আধা-উপনিবেশ ছিল এবং এখনও তা-ই আছে, তা কখনও উপনিবেশ বা নয়া-উপনিবেশ বা স্বাধীন হয়নি—আমাদের এই মত কি সবকিছু ব্যাখ্যা করতে পারে? যেমন ধরুন, তা কি এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারে যে, যদিও বাংলাদেশের রাষ্ট্রচরিত্র ও শাসকশ্রেণীগুলির কোনো পরিবর্তন হয়নি, তবু কেন একটা কু দে'তার প্রয়োজন হল এবং কিভাবেই বা এই কু দে'তা আমাদের রণকৌশলের উপর এত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলছে? নিশ্চয়ই পারে।

বিষয়টা বুঝতে গেলে আমাদের মধ্যে বহুলপ্রচলিত দুটি ভুল ধারণার মূলোচ্ছেদ করতে হবে।

প্রথমত "সমাজতান্ত্রিক" বিপ্লবের ফেরীওয়ালাদের বিরুদ্ধে আমরা সঠিক-ভাবেই ব'লে থাকি যে এইসব আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন আধোনত দেশে যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনকে বুঝতে গেলে অবশ্যই হিসাবে রাখতে হবে সাম্রাজ্যবাদী লিপ্ততার অনিবার্য উপাদানটিকে—যা অনেক সময়েই এমন কি নির্ধারক ভূমিকাও পালন করে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমরা এর বিপরীত বিচ্যুতিটিকে আস্কারা দিতে পারি। এই বিচ্যুতিটি এসব দেশে জাতীয় দ্বন্দ্বের স্থায়ী প্রাধান্য-ঘোষকদের চরিত্রবৈশিষ্ট্য। এর মূল লক্ষণ হল, এসব দেশের প্রত্যেকটি পরিবর্তনকে শুধুমাত্র সাম্রাজ্যবাদী কারসাজির দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা। যতক্ষণ আমরা স্বীকার করছি যে কোনো একটি বিশেষ দেশে দেশীয় শাসকশ্রেণীগুলিই রাষ্ট্রক্ষমতাসীন (আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন অধিকাংশ অধোনত দেশের বেলাতেই এ কথা "জাতীয়তাবাদী" মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরাও মেনে নেন) ততক্ষণ তাকে আমরা উপনিবেশ বা নয়া-উপনিবেশ বলতে পারি না, উপরন্তু, ভিন্ন সময়ে অন্যান্য দেশে এই একই শ্রেণীগুলির স্বাভাবিক আচরণের তুলনায় এই দেশটির শাসকশ্রেণীগুলি যতই বশংবদ হোক না কেন, সাম্রাজ্যবাদের থেকে তাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ স্বাধীনতার উপাদান আমাদের স্বীকার করতেই হবে। অতএব দেশের নানা পরিবর্তন বিশ্লেষণ করতে গেলে আভ্যন্তরীণ শ্রেণীশক্তিসমূহের ফ্যাক্টরটিতেও আমাদের পর্যাপ্ত মনোযোগ দিতে হবে; এবং এই প্রসঙ্গে দেশীয় শাসকশ্রেণীগুলির ভূমিকা স্বভাবতই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয়ত বুর্জোয়াদের দ্বারা নিরন্তর-প্রচারিত রাষ্ট্র-সম্পর্কিত নানা শ্রেণী-বর্জিত, শ্রেণী-বহির্ভূত ও শ্রেণী-উত্তীর্ণ আজগুবি তত্ত্বের বিরুদ্ধে আমাদের অবশ্যই এ তত্ত্ব তুলে ধরতে হবে যে: সাধারণভাবে বলতে গেলে রাষ্ট্র একটি বিশেষ

শ্রেণীর মালিকানাধীন, তা ঐ শ্রেণীরই প্রতিনিধিত্ব করে এবং তার স্বার্থেরই সেবা করে। কিন্তু একই সঙ্গে এ কথা অস্বীকার করাও অবাস্তব ও অমার্কসীয় হবে যে নিজ নিজ বিশেষ ক্ষেত্রে আপেক্ষিক স্বাধীনতার একটি দিকেরও উদ্ভব হয়: যে শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব তাকে করতে হবে তা থেকে রাষ্ট্রের আপেক্ষিক স্বাধীনতা এবং এমন কি রাষ্ট্রযন্ত্র থেকে তার পরিচালনাকারী সরকারী চক্রটির আপেক্ষিক স্বাধীনতা। রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্রের তত্ত্ব এই জেদ ধরে না যে কোনো বিশেষ মুহূর্তে সামগ্রিকভাবে শাসকশ্রেণীর স্বার্থের থেকে রাষ্ট্রযন্ত্রের (যা প্রধানত স্থায়ী আমলাতন্ত্র ও নিয়মিত বাহিনীর দ্বারা গঠিত) স্বার্থের, বা রাষ্ট্রযন্ত্রের স্বার্থের থেকে সরকারী চক্রের (যা সময়ে সময়ে বদলায় এবং যা পেশাদার রাজনীতিবিদদের দ্বারা গঠিত) স্বার্থের তিলমাত্র হেরফেরও সম্ভব নয়। রাষ্ট্রের মার্কসীয় তত্ত্ব শুধু দাবী করে যে **মোটের উপর ও চূড়ান্ত বিশ্লেষণে** এই সাময়িক বিচ্যুতিগুলি যেভাবে সংশোধিত হবে তা প্রাধান্যভোগী শ্রেণীর স্বার্থের দ্বারাই নির্ধারিত; আর এই আবশ্যিকতা এমন কি রাষ্ট্রযন্ত্রের বলপূর্বক সংস্কার বা সেই মুহূর্তে শাসনরত সরকারটির বলপূর্বক উচ্ছেদের বিনিময়েও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে। অতএব এ রকম সাময়িক বিচ্যুতির দৃষ্টান্তগুলি মোটেও রাষ্ট্র-সম্পর্কিত শ্রেণী-তত্ত্বের বিরুদ্ধে, বা বিশেষ কোনো রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট শ্রেণীচরিত্রের বিরুদ্ধে, কোনো যুক্তি নয়। বরং উল্টো: সেগুলিই অনবরত সংশোধিত হওয়ার মাধ্যমে হয়ে ওঠে একটি রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্রের আমোঘতার নিশ্চিততম প্রমাণ। মূল্যের নিয়মের মতোই রাষ্ট্র ও সরকারের শ্রেণীচরিত্রও অবিরাম বিচ্যুতিসমূহের গড় হিসাবেই নিজের পথ ক'রে নেয়। অধোনত দেশগুলিতে—যেখানে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ারা শাসকজোটের নেতা—শ্রেণী থেকে রাষ্ট্রযন্ত্রের এবং রাষ্ট্রযন্ত্র থেকে সরকারী চক্রের আপেক্ষিক স্বাধীনতা ও তজ্জনিত বিচ্যুতি আবশ্যিকভাবেই বেশী। এর কারণ "রাজনৈতিক অধোনতি"[২] ও সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশ (প্রথম খণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়, ৭নং অংশ। কোনো

২। কথাটি জাগুয়ারবের। অধোনত দেশগুলিতে শহরের আধুনিক বৃহৎ শিল্প যেমন অনেকাংশে আরোপিত এবং বাকী সমাজের সঙ্গে তার যেমন দুস্তর ফারাক—যে ফারাক পেরিয়ে তা সমাজের সামগ্রিক পুঁজিবাদী রূপান্তরকে প্রত্যাশিত মাত্রায় ত্বরান্বিত করতে তো পারেই না, বরং কখনও কখনও এমন কি মন্থর ক'রে দেয়—এখানকার শহরের আধুনিক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির চরিত্র, এবং বাকী সমাজজীবন ও তার যথার্থ গণতন্ত্রীকরণের সঙ্গে তার সম্পর্কটাও, ঠিক তেমনি। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ও বাকী সমাজের মধ্যে "রাজনৈতিক মধ্যস্থতা" করার মতো ট্রেড ইউনিয়ন, ক্লাব, সমিতি ইত্যাদি অন্তর্বর্তী চরিত্রের সংগঠন অধোনত দেশগুলিতে অপ্রচুর ও দুর্বল। ফলে সর্বোচ্চ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর সমাজের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ থাকে অনেক কম: তাদের নিজস্ব স্বার্থ অনেক বেশী আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য অর্জন করতে পারে। অধোনত দেশসমূহে শ্রেণী থেকে রাষ্ট্রযন্ত্রের এবং রাষ্ট্রযন্ত্র থেকে সরকারী চক্রের অধিকতর আপেক্ষিক স্বাধীনতার আভ্যন্তরীণ ভিত্তির এটা এক মোটামুটি সঠিক বিশ্লেষণ। এর সঙ্গে যুক্ত হয় সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশের বাহ্যিক ফ্যাক্টর।]

কোনো সংক্ষিপ্ত পর্যায় জুড়ে এমন একটি দেশের রাষ্ট্র বা কোনো বিশেষ সরকার সাম্রাজ্যবাদের পরিপ্রেক্ষিতে অস্বাভাবিক রকম স্বাধীন বা অস্বাভাবিক রকম বশংবদ ভূমিকা নিতে পারে—অস্বাভাবিক এই অর্থে যে তা শ্রেণীটির প্রকৃত অবস্থান থেকে বিচ্যুত—কিন্তু বিপরীত প্রবণতার এই পর্যায়ক্রমিক সময়গুলিতে এটা বোঝাবে না যে দেশটি একবার স্বাধীন আর একবার উপনিবেশ (বা নয়া-উপনিবেশ) হয়ে যাচ্ছে। বরং যতক্ষণ দেশীয় কিন্তু আত্মসমর্পণকারী শাসকশ্রেণীগুলি ক্ষমতায় থাকছে ততক্ষণ একটা পর্যাপ্ত দৈর্ঘ্যের সময় জুড়ে বিচার করলে এই বিপরীত বিচ্যুতিগুলি পরস্পর কাটাকাটি হয়ে গড় রেখাটি নির্ভুলতম যাথার্থ্যের সঙ্গে ওই শ্রেণীগুলির অবস্থান ও স্বার্থের গতিপথকেই চিত্রিত করবে। অনেক হিংসাত্মক কাজ, এমন কি কু দে'তাও, এই বিচ্যুতি-কাটাকাটির প্রক্রিয়ারই কিছু ঘটনামাত্র হতে পারে—এগুলিতে এটা আবশ্যিকভাবে নির্দেশিত হবে না যে রাষ্ট্রের মূল শ্রেণীচরিত্রে কোনো পরিবর্তন ঘ'টে গেছে। বিশেষত, সাধারণগ্রাহ্য অর্থে, অর্থাৎ **প্রাসাদ-চক্রান্ত** ও **উপদলীয়** হিংসার অর্থে কু দে'তা কখনও কখনও দেশীয় শাসক-শ্রেণীর ক্ষমতাহরণ ক'রে ঔপনিবেশিক বা নয়া-ঔপনিবেশিক পুতুল শাসনে উত্তরণ ঘটানোর হাতিয়ার হতে পারে কিন্তু তা কখনোই উল্টোটা ঘটাতে পারে না—অর্থাৎ একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী পুতুল শাসন থেকে একটি দেশীয় শ্রেণীর শাসনে উত্তরণ ঘটাতে পারে না, উপরন্তু তা কখনও এক অতিশক্তির ঔপনিবেশিক বা নয়া-ঔপনিবেশিক শাসন থেকে অন্য অতিশক্তির অনুরূপ শাসনেও উত্তরণ ঘটাতে পারে না।

৩.

এবার বাংলাদেশের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রটিতে আসা যাক।

নিছক একটা কু দে'তাই (প্রাসাদচক্রান্ত ও উপদলীয় হিংসার সাধারণগ্রাহ্য অর্থে) যদি দেশটিকে প্রবল সোভিয়েত প্রাধান্যের অবস্থা থেকে একটি **আপেক্ষিকভাবে** স্বাধীনতর অবস্থানে, এবং শেষ বিশ্লেষণে মার্কিন কক্ষপথে (সব মার্কসবাদী-লেনিনবাদীই যা স্বীকার করছেন), নিয়ে আসার জন্য যথেষ্ট হয়ে থাকে, তবে এই ঘটনাই তর্কাতীতভাবে প্রমাণ ক'রে দেয় যে মুজিব আমলে সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের পুতুল সরকার মারফৎ শাসন **করছিল না**। কারণ সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের কিংবা রুশ-ভারত জোটের একচেটিয়া একনায়কত্বের **ভিতর থেকে** কিভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের একনায়কত্বের জন্ম ও বিকাশ হতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত তা

প্রাধান্যেও আসতে পারে[৩] ? এই একটি বিবেচনাই তো এটা প্রমাণ করার পক্ষে যথেষ্ট যে এমন কি মুজিব আমলেও বাংলাদেশ যে দেশীয় (কিন্তু আত্মসমর্পণ-কারী) শ্রেণীরই শাসনাধীন ছিল শুধু তা-ই নয়, ওই শ্রেণীগুলির আপেক্ষিক স্বাধীনতার একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদানও ছিল। নতুবা, বিদেশী শাসকশ্রেণীগুলি থেকে **শ্রেণী হিসাবে** নিজেদের পৃথক করার মতো কোনো স্বাধীনতা যদি এদের **একেবারেই** না থেকে থাকে, তবে তারা সহসা নিজেদের ভিতর থেকে এমন শক্তি কেমন ক'রে উৎপাদন করতে পারল যাতে দেশটি প্রবল সোভিয়েত প্রাধান্য থেকে একটি আপেক্ষিকভাবে স্বাধীনতর অবস্থানে, এবং শেষ বিশ্লেষণে মার্কিন কক্ষপথে উপনীত হতে পারল ? ভারতের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সুযোগে প্রযুক্ত মার্কিন প্ররোচনার প্রতি অস্পষ্ট ইঙ্গিত ক'রে কেউ কেউ এর ব্যাখ্যা করতে চান। কিন্তু যে "শাসকশ্রেণী" সোভিয়েত শাসকদের পুরোপুরি বশংবদ, শেষোক্তদের থেকে পৃথক কোনো শ্রেণীসত্তাই যার নেই (আর তাই 'শাসকশ্রেণী' কথাটাই যার ক্ষেত্রে স্ববিরোধী), তার উপর মার্কিন প্ররোচনা কাজ করার ভিত্তিটা এল কোত্থেকে ? আর বাংলাদেশের শাসকশ্রেণী-গুলির আপেক্ষিক স্বাধীনতার এই দিকটি—যার প্রবণতা হল বাংলাদেশকে তৃতীয় বিশ্বের ক্রমবর্ধমান প্রতিরোধের অংশীদার ক'রে তোলার দিকে—এই দিকটিকে ছাড়া চীন আর কোনটাকে জোরদার ক'রে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছে[৪] ? সুতরাং বাংলাদেশ তখন সোভিয়েতের একচেটিয়া নয়া উপনিবেশ ছিল না,

৩ [মনে রাখবেন, ভারতেও তখনও কোনো মার্কিনপন্থী সরকার ক্ষমতায় আসেনি।]

৪ কোনো কোনো "চীনপন্থী" (যেমন 'হলিডে'র ভূতপূর্ব ও 'বাংলাদেশ টাইমস'এর বর্তমান সম্পাদক এনায়েতুল্লা খান) নিজেদের ও অন্যান্যদের বোঝাতে চান যে "পুতুল" মুজিব সরকারের উচ্ছেদই বাংলাদেশের প্রতি চীনা স্বীকৃতি ডেকে এনেছে। চীনা স্বীকৃতি থেকে এঁরা এই অসাধারণ তাৎপর্য উপপাদন করেন যে কু-পরবর্তী "নয়া রাষ্ট্রে"র চরিত্র স্বাধীন ও প্রগতিশীল। এর দ্বারা নিজেদের জাতীয়তাবাদী লেজুড়বৃত্তিকে এঁরা সমর্থনযোগ্য ক'রে তোলার চেষ্টা করেন। কু চীনা স্বীকৃতিকে কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহ ত্বরান্বিত ক'রে থাকতে পারে, কিন্তু উপরের বক্তব্যটি আমার কাছে স্থূল ও প্রচণ্ড অতিরঞ্জন ব'লেই মনে হয়। মুজিব আমলের সব তথ্য প্রমাণ করবে যে চীন-বাংলাদেশ সম্পর্ক ইতিপূর্বেই সহজ হয়ে আসছিল এবং ঘটনাস্রোত শেষ পর্যন্ত চীনা স্বীকৃতির দিকেই অনিবার্যভাবে এগোচ্ছিল। তাই স্বীকৃতির পিছনে চীনের যে হিসাবনিকাশ তাতে কু কোনো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়ার পরিবর্তে আমার মনে হয় ব্যাপারটা ছিল ঠিক তার বিপরীত : আসন্ন চীনা স্বীকৃতি সম্ভবত কু-সংঘটকদেরই হিসাবনিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এবং তারা খুব বিচক্ষণভাবে কু-র সময়টা এমনভাবে ঠিক করেছিল যাতে, অন্যান্য সুবিধা ছাড়াও, চীনা স্বীকৃতি "জয় ক'রে আনা"র বিপুল জনপ্রিয়তার পুঁজিকে নতুন সরকার কায়েমের পরে-পরেই কাজে লাগানো যায়। চীনা স্বীকৃতির সম্ভাব্য সময় হিসাব করার জন্য স্বয়ং মোশতাকের চেয়ে সুবিধাজনক অবস্থায় আর কে ছিল ? মুজিব সরকার তো তাকেই বাণিজ্যসংক্রান্ত বিষয়ে চীনাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে পাঠিয়েছিল।

আর এখনও তা একচেটিয়া মার্কিন নয়া-উপনিবেশ নয়। বাংলাদেশ বরাবরই এমন দেশীয় শাসকশ্রেণীগুলির শাসনাধীন ছিল এবং এখনও আছে যারা প্রকৃতিগতভাবেই আত্মসমর্পণকারী কিন্তু যাদের বিভিন্ন মাত্রার আপেক্ষিক স্বাধীনতা থাকতে পারে এবং যারা বিভিন্ন সময়ে নিজেদের মধ্যে সোভিয়েতপন্থী ও মার্কিনপন্থী উপাদানদের বিভিন্ন মাত্রার প্রাধান্য ধারণ করতে পারে। আর একথা বলার অর্থই হল, বাংলাদেশ বরাবরই একাধিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রাধান্যাধীন একটি আধা-উপনিবেশ ছিল এবং এখনও তা-ই আছে।

৪.

তবু কু-র প্রয়োজনটাকে ঠিকমতো বোঝার জন্য আরো অনেক কিছু বলা দরকার। আর এখানেই শ্রেণী থেকে রাষ্ট্রযন্ত্রের ও রাষ্ট্রযন্ত্র থেকে সরকারী চক্রের আপেক্ষিক স্বাধীনতার তাৎপর্য পর্যাপ্তভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

নানা ঐতিহাসিক কারণে, বিশেষত ১৯৭১এর সংগ্রামের অবস্থাগুলির দরুণ, সদ্যপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রযন্ত্রটি এক জোরালো সোভিয়েতমুখী ও ভারতমুখী রাজনৈতিক ঝোঁক অর্জন করে—বিশেষত নতুন সামাজিক উপাদান আত্মস্থ করার ফলে। কিন্তু স্বাধীনতার পরবর্তী বছরগুলোতে মার্কিনের **অর্থনৈতিক** প্রাধান্য দ্রুত পুনর্জাহির হল। ফলে দেশীয় শাসকশ্রেণীগুলি বেশী বেশী মার্কিনমুখী হয়ে উঠল, কিন্তু তাদের রাষ্ট্রযন্ত্রটি হয়ে রইল বহু দিক থেকে কালের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। দেশের অর্থনৈতিক ও শ্রেণীবাস্তবতার সঙ্গে রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গতিবিধানের জন্য তার সংস্কারসাধন জরুরী হয়ে উঠল। এই সংস্কার মসৃণ, শান্তিপূর্ণ পথে সম্ভব না হলে হিংসাত্মক পদ্ধতিতেই করতে হয়। এক্ষেত্রে কু দে'তার মারফৎ তা নিষ্পন্ন হল।

উপরন্তু সরকারী মুজিব চক্রটি যে শ্রেণীগুলির প্রতিনিধিত্বের দাবী করত তাদের প্রয়োজনসমূহের পর্যাপ্ত অভিব্যক্তি ঘটাতে তা-ও ক্রমেই বেশী বেশী ক'রে অক্ষম হয়ে উঠল। ইতিপূর্বে বাঙালীদের মধ্য থেকে যথেষ্ট শক্তিশালী ও সংখ্যাবহুল বৃহৎ বুর্জোয়ার উদ্ভব হয়নি। কিন্তু বাংলাদেশ সৃষ্টির পর পাকিস্তানী পুঁজিপতিদের পরিত্যক্ত শূন্যতাকে বাঙালীদের দ্বারা পূরণ করার প্রয়োজন দেখা দিল। এল চুরি, দুর্নীতি ও ডাহা লুণ্ঠন মারফৎ আত্মসম্পদবৃদ্ধির প্রতিযোগিতার পর্যায়। প্রক্রিয়াটিতে সুশৃঙ্খলতার প্রলেপ দেওয়ার সহজতম পন্থা ছিল সম্ভাব্য সবকিছু রাষ্ট্রীয় মালিকানায় স্থানান্তরিত করা এবং তারপর, সংগ্রামের সময় যে পাঁচমিশেলী স্তরটি রাজনৈতিক প্রাধান্যে এসেছিল, তার সামনে লুণ্ঠনের দরজা খুলে দেওয়া। তাই দেখা গেল হতবুদ্ধিকর পাল্লার জাতীয়করণ, প্রগতিশীলেরা সঠিকভাবেই যার নাম দিলেন "আওয়ামীকরণ"। সোভিয়েত সাম্রাজ্যবাদকেও

আবশ্যিকভাবেই পাব্লিক সেক্টরের উপর এমন অস্বাভাবিক জোর-দেওয়াকে উৎসাহদান ও লালন করতে হয়। কারণ সাম্রাজ্যবাদের পরিবর্তে সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ হওয়ার ফলে তার অনুপ্রবেশের বিশিষ্ট ক্ষেত্রটাই হল সদ্য-স্বাধীন দেশগুলির জাতীয় রাষ্ট্র-পরিচালিত "প্রগতিশীল" পাব্লিক সেক্টর। এইভাবে যতক্ষণ সব স্বার্থ মিলে যাচ্ছিল ততক্ষণ সবকিছু ভালোই চলছিল। কিন্তু লাগামছেঁড়া লুণ্ঠনের পর নব্য ধনিকরা ক্রমেই নগ্ন তছরুপকারী ও রাহাজানদের পন্থা পরিত্যাগ ক'রে "নিয়মিত" বুর্জোয়া ব্যবসার অধিকতর ভদ্রোচিত ভিত্তিটার উপর সুস্থিত হতে উৎসুক হয়ে উঠতে লাগল। তিন বছরের "অব্যাহতি-কাল"[৫] যতই ফুরিয়ে আসতে লাগল ততই তীব্র হয়ে উঠতে লাগল এই প্রবণতাটি। কিন্তু ততদিনে মুজিব ও তার সাঙ্গোপাঙ্গোরা তাদের আরামের অবস্থানে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে: তিলমাত্র প্রয়াস ছাড়াই যা থেকে অর্থ ও ক্ষমতা ঝ'রে পড়ে তা কি সহজে ছাড়া যায়? মুজিবের পক্ষে অবস্থা কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠতে লাগল। তা আরো এই কারণে যে এই বল্গাহীন বোম্বেটেপনা আভ্যন্তরীণ শ্রেণী-বিরোধকে তীব্র ক'রে তুলল এক অশ্রুতপূর্ব মাত্রায়। কিছুকাল সে পুরোনো "নিয়মিত" বুর্জোয়া ও নব্য ধনিকদেরকে (যারা তখন "নিয়মিত" বুর্জোয়ার মর্যাদায় স্থিত হতে উৎসুক) পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে অবস্থা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু এই পদ্ধতির কার্যকারিতাও দ্রুত নিঃশেষিত হয়ে গেল, বিশেষত যেহেতু গণবিক্ষোভের বিপজ্জনক মাত্রা পুরোনো বুর্জোয়া ও নব্য ধনিকদের উভয়কেই সন্ত্রস্ত ক'রে তুলেছিল এবং বেশী বেশী ক'রে পরস্পরমিলনের কাছাকাছি নিয়ে এসেছিল। মুজিব ও তার দলবল সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। তারা এতকাল জনগণের উপর যে উন্মাদ নির্যাতন চালাচ্ছিল সেটাকে এবার ক্ষমতা ধ'রে রাখার মরীয়া চেষ্টায় তারা ঘুরিয়ে দিল ঠিক সেই শ্রেণীটিরই বিরুদ্ধে, যার প্রতিনিধিত্ব

৫ মুজিব প্রকাশ্যে এই তিন বছরের অব্যাহতি-কাল চেয়ে বলেছিল যে এই সময়ের মধ্যে সে জনগণকে কিছুই দিতে পারবে না। শোনা যায় যে গোপনে সে আসলে তার পার্টির সাগরেদদেরই এই তিন বছরের অব্যাহতি-কাল মঞ্জুর করেছিল। তাদের ঢালাও অনুমতি দেওয়া হয়েছিল যাতে তারা রাষ্ট্রের দেওয়া নানা সুযোগসুবিধা (লাইসেন্স, কন্ট্রাক্ট, প্রভৃতি) বিবেকহীনভাবে ব্যবহার ক'রে নিরাপদে নিজেদের ঐশ্বর্যবৃদ্ধি করতে পারে। তাই মনে হয় যে এই তিন বছরের অব্যাহতি-কালটা নিছক বক্তৃতাবাজির কৌশলমাত্র ছিল না। লক্ষণীয় ব্যাপার হল, এই তিন বছর শেষ হওয়ার কয়েক মাস পরেই কু-টা ঘটল।

ঐশ্বর্য আহরণের পদ্ধতির দিক থেকে এই উন্মত্ত লুণ্ঠন ইউরোপে পুঁজির "আদি সঞ্চয়"এর সঙ্গে কিছুটা মেলে। কিন্তু তুলনাটি এর চেয়ে বেশীদূর টানা ভুল হবে। কেননা "আদি সঞ্চয়" ছিল প্রবল ও যথার্থ পুঁজিবাদী বিকাশেরই ভূমিকা, কিন্তু বাংলাদেশের মতো দেশগুলি সেই ভবিষ্যৎ থেকে বঞ্চিত। আর ঠিক এই জায়গাতেই নিহিত রয়েছে মোশতাক সরকারের জাতীয়-গণতান্ত্রিক ভান-গুলির স্বল্পায়ু চরিত্রের কারণ।

করার দাবী তারা করত এবং যা এই সর্বপ্রথম তার পরিপূর্ণ আকার পরিগ্রহের একেবারে দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছিল। বলপূর্বক এই লুম্পেন দলটিকে উচ্ছেদ করার অবস্থা পরিপক্ক হয়ে উঠল এবং বলপূর্বকই তা উচ্ছেদ হল।

মুজিব চক্র উচ্ছেদ হতই, কেননা তিনটি কারণে তা আর কোন সুসংবদ্ধ শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করতে পারছিল না। প্রথমত নিজের সংকীর্ণ স্বার্থে চালিত হয়ে তা সাধারণভাবে বিদেশী শক্তির নিকট, এবং বিশেষভাবে রাশিয়ার নিকট, যে পরিমাণ অধীনতার নীতি অনুসরণ করছিল তা, যে শ্রেণীটির প্রতিনিধিত্ব করার দাবী তারা করত, সেই শ্রেণীটি কোনো বিদেশী শক্তির নিকটই মেনে নিতে রাজী ছিল না। দ্বিতীয়ত, একই সংকীর্ণ স্বার্থের তাড়নায় চক্রটি সম্পদ-গ্রাসের বর্বর পদ্ধতি চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল, অথচ যে শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব তারা করত তা তখন সভ্য ও নিয়মিত বুর্জোয়া পদ্ধতি গ্রহণে উৎসুক হয়ে উঠেছে। তৃতীয়ত, লাগামহীন শ্বেতসন্ত্রাসের পলিসি চালিয়ে চক্রটি এক বিশাল গণবিস্ফোরণকে বিপজ্জনক রকম আসন্ন ক'রে তুলেছিল এবং যে শ্রেণীর প্রতি-নিধিত্ব করার দাবী তারা করত তারও অধিকারসমূহ দমন ক'রে তারা সেই শ্রেণী থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল।

আরো আছে। যে রাষ্ট্রযন্ত্রকে তার পরিচালনা করার কথা, মুজিব সরকার এমন কি তার সঙ্গেও সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তে লাগল। শাসকশ্রেণীর পরিবর্তিত প্রয়োজনের পাশাপাশি রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যেও সেইসব শক্তি প্রাধান্য অর্জন করল যারা একটা লুম্পেন সর্দারের স্বেচ্ছাচারী খামখেয়ালের পরিবর্তে একটা "নিয়মিত" প্রশাসন চাইত (ইতিমধ্যে পুরোনো সামরিক বাহিনীর লোকেরাও পাকিস্তান থেকে ফিরে এসে পুনর্নিযুক্ত হয়েছে)। মুজিব সরকারের উচ্ছেদে এটাও খুব জোরালো অবদান রাখল—বিশেষত ক্ষমতাবদল কার্যকরী করার আমলাতান্ত্রিক ও সামরিক শক্তিগুলির জোগান দিয়ে।...

(এই পর্যন্ত লিখেছি, এমন সময় একসারি নাটকীয় ঘটনা আমার লেখায় ছেদ ঘটাল। ৩ নভেম্বর একটা মুজিবাদী পাল্টা-কু হয়। মাত্র চারদিন টিঁকে থেকে সেটা আবার এক পাল্টা-পাল্টা-কু দ্বারা উৎখাত হয় এবং দেশটি আবার মুজিবোত্তর লাইনে ফিরে আসে। পরিস্থিতি সম্বন্ধে এখনও খুব অল্পই জানা গেছে, তবে মনে হয় আমি এ পর্যন্ত যে বিশ্লেষণ রেখেছি তা-ই ঘটনাবলী দ্বারা সমর্থিত হচ্ছে। নতুন ঘটনাবলী সম্বন্ধে আমার মন্তব্য আমি একেবারে শেষে দেব। ঘটনাবলীর **আগে** আমার চিন্তাগুলিকে যেভাবে সাজিয়েছিলাম, আপাতত বিভিন্ন চিঠিপত্র ও নোটের উপর নির্ভর ক'রে বিশ্বস্ততার সঙ্গে সেভাবেই আমি লেখা চালিয়ে যাচ্ছি।)

... সবশেষে এটাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে মুজিব চক্র মার্কিন ও রাশিয়া উভয়েরই **সম্পূর্ণ** আস্থা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছিল। ঐতিহ্যগতভাবে আওয়ামী

লীগের গাঁটছড়া বাঁধা ছিল মার্কিনীদের সঙ্গে—যারা পাকিস্তানী শাসকশ্রেণী-গুলিকে "লাইনে রাখার" হাতিয়াররূপে পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয়তাবাদী বিক্ষোভকে ব্যবহার করত কিন্তু সে বিক্ষোভকে পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত করার সীমা পর্যন্ত নিয়ে যেতে প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু ১৯৭১এর তুমুল দিনগুলিতে বাঙালী-দের গণ-জাতীয়তাবাদী আন্দোলন—যাকে আওয়ামী লীগ আধাখেঁচড়াভাবে "নেতৃত্ব" দিয়েছিল, যার সঙ্গে অধিকাংশ বামপন্থী শক্তিই ঘৃণাভরে বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছিল এবং পাক বাহিনী যার মোকাবিলা করেছিল চরমতম গণ-হত্যা দিয়ে—আতঙ্কিত ও নোংরা সমঝোতার জন্য উৎসুক আওয়ামী লীগের বেঁধে-দেওয়া সংস্কারবাদী গণ্ডীকে স্বতস্ফূর্তভাবে অতিক্রম ক'রে সেই আন্দোলন অপ্রতিহতভাবে বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতার সংগ্রামে বিকশিত হয়ে উঠল। আওয়ামী লীগ দেখল যে তাকে যদি নেতৃত্ব বজায় রেখে ক্ষমতায় আসতে হয় তাহলে একদিকে যেমন পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্য হাসিল করতে হবে অন্যদিকে তেমনি রোধ করতে হবে গণসংগ্রামের বিপজ্জনক প্রসার। তৎকালীন পরিস্থিতিতে এই দ্বৈত উদ্দেশ্য পূরণ করা সম্ভব ছিল কেবল রুশ-ভারত জোটের কবলিত হয়ে। কিন্তু মুজিবের ট্র্যাজেডি ছিল এই যে তার মার্কিনঘেঁষা অতীত তাকে রুশদের চোখে স্থায়ী সন্দেহভাজন ক'রে রেখেছিল, আবার পরবর্তী পর্যায়ে রুশদের দিকে তার দলত্যাগের ফলে মার্কিনীদের চোখে সে চিহ্নিত হয়েছিল বিশ্বাসঘাতক হিসাবে। উপরন্তু তার বিপজ্জনক দুঃশাসন এবং শোষণের সর্ব-প্রকার বুর্জোয়া ভব্যতার প্রতি তার সম্পূর্ণ উদাসীনতা তাকে উভয় অতিশক্তির কাছেই বিপ্লবভীতির একটা স্থায়ী উৎসে পরিণত করেছিল। তফাৎ ছিল শুধু এই যে অন্য কোনো উপযুক্ত রুশপন্থী বিকল্পের অভাবে রাশিয়া বাধ্য হয়ে তাকে সহ্য করত, আর আমেরিকা বদ্ধপরিকর ছিল তাকে হঠাতে। এবং শেষ পর্যন্ত হঠতে তাকে হলই।

শুধুমাত্র রুশ-মার্কিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার দৃষ্টিকোণ থেকে মুজিবের উৎখাত ব্যাখ্যার চেষ্টাটা যে কতখানি সরলীকরণ তা-ই আমি এতক্ষণের বিশ্লেষণে দেখানোর চেষ্টা করেছি। **সমস্ত** সম্ভাব্য দিক থেকেই সে একটা অপ্রয়োজনীয় পদার্থ ও ইতিহাসের যাত্রাপথের বাধা হয়ে উঠেছিল। নিয়মতান্ত্রিক অপসারণকে সে নিজেই অসম্ভব ক'রে দিয়েছিল[৬]—যেমন মোশতাক বলেছে তার প্রথম প্রেসিডেন্টীয় ভাষণে। তাছাড়া সে নিজেই তার ও তার সরকারী চক্রটির **রাজনৈতিক** অস্তিত্বকে তার **ব্যক্তিগত** ভাবমূর্তির উপর এমন সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ক'রে তুলেছিল ('বঙ্গবন্ধু', 'জাতির পিতা', ইত্যাদি সেজে) যে তার ও তার সরকারী চক্রটির রাজনৈতিক অপসারণও একইভাবে নির্ভরশীল হয়ে

৬ ['বাকশাল' নামে একটি দল খাড়া ক'রে সে অন্য সব দলকে নিষিদ্ধ ক'রে দিয়েছিল

পড়েছিল তার ব্যক্তিগত অপসারণের উপর। এইজন্যই নৃশংস হত্যাকাণ্ডগুলি যেমন ছিল স্বাভাবিক তেমনি যুক্তিযুক্ত।

এবার আসা যাক মোশতাক সরকারের প্রসঙ্গে।

এটাও যে একটা **আধা-ঔপনিবেশিক** রাষ্ট্রকেই পরিচালনা করছে, এটা যে জাতীয়-বুর্জোয়া সরকার নয় আবার নয়া-ঔপনিবেশিক পুতুল সরকারও নয়, তা ইতিপূর্বের বিশ্লেষণের আলোকে তার কয়েকটি কার্যকলাপ বিচার করলেই ধরা পড়বে।

প্রথম নীতি-নির্ধারণী ঘোষণায় মোশতাক মূলত দুটিমাত্র স্লোগান তুলেছে: একটি ভূতপূর্ব সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে এবং অপরটি সমাজে "মানবিক" মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠার পক্ষে। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদের চারটি মৌলিক রাষ্ট্রীয় নীতির মুজিববাদী জগাখিঁচুড়িকে সে বজায় রেখেছে। সে "চীনাপন্থী" রাজনীতিবিদ মশিউর রহমান (ভাসানী-ন্যাপ) ও মার্কিনপন্থী বদমাশ অলি আহাদকে জেল থেকে মুক্তি দিয়েছে, কিন্তু আরো হাজার হাজার দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক বন্দীর ব্যাপারে সে নিশ্চুপ। তার সর্বশেষ ঈদ-ভাষণে সে গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে এবং শুরু করার নিদর্শনরূপে এক হাজার রাজনৈতিক বন্দীকে নাকি অবিলম্বে মুক্তিদানের নির্দেশ দিয়েছে, কিন্তু কার্যত প্রায় কোনো কোনো রাজনৈতিক বন্দীই ছাড়া পায়নি। মার্কিনপন্থী পত্রিকা 'ইত্তেফাক'কে সে তার পূর্বের মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছে, "চীনপন্থী" এনায়েতুল্লা খানকে সরকারী পত্রিকা 'বাংলাদেশ টাইম্স'এর সম্পাদকরূপে নিয়োগ করেছে, আবার একই সঙ্গে মস্কোপন্থী পত্রিকা 'সংবাদ'এর উপর থেকেও নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে। রুশ-ভারতের অনুচর মুজিববাদী ডাকাতগুলোর বিরুদ্ধে সে প্রায় কিছুই করল না, অথচ আমাদের মামলাটাকে বিশেষ সামরিক আদালতে তুলে দিল এবং সংক্ষিপ্ত বিচারে আমাদের "দৃষ্টান্তমূলক" সাজা দেওয়াল[৭]। সে ভারতীয় হাই কমিশনার সমর সেনের কার্যকলাপ অব্যাহত রাখতে দিয়েছে, নিজের ব্যক্তিগত দূত হিসাবে মস্কো পাঠিয়েছে সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের কুখ্যাত এজেন্ট মহীউদ্দীন আহমেদকে। ইত্যাদি, ইত্যাদি, আরো কত কি।

৭ [মোশতাক ক্ষমতায় এসেই যে সামরিক আদালত গঠন করে তার প্রথম দুটি মামলাই ছিল বামপন্থী রাজনৈতিক বন্দীদের বিরুদ্ধে এবং সে দুটোর একটা ছিল আমাদের মামলা। এই মামলায় আমাকে এবং আরেকজন ভারতীয় কমরেডকে বাংলাদেশের কিছু বিপ্লবী কর্মীর সঙ্গে একত্রে ১৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।]

এসবই দুটো বিষয়ের দিকে অঙ্গুলীনির্দেশ করে।

প্রথমত মোশতাক সরকার কোনো স্বাধীন, জাতীয়-বুর্জোয়া সরকার নয়। বাংলাদেশের "জাতীয়তাবাদী" মার্কসবাদীরা যদিও মুখে আমাদের চেয়েও এক ধাপ এগিয়ে মোশতাক সরকারকে নয়া-ঔপনিবেশিক ব'লে চিহ্নিত করেন তবু মূলগতভাবে এবং ব্যবহারিক পলিসির দিক থেকে তার প্রতি তাঁরা বিশুদ্ধ সি পি আই-কায়দাতেই আচরণ করেন – যেন তা সাম্রাজ্যবাদী হুমকির সম্মুখীন কোনো জাতীয়-বুর্জোয়া সরকার। জনগণ ও জাতির মূল বিপদ হিসাবে তাঁরা দেখান এই সাম্রাজ্যবাদী হুমকিগুলিকেই এবং কমিউনিস্টদের আশু প্রধান দায়িত্ব হিসাবে রাখেন – সরকারকে সমর্থনদান।

দ্বিতীয়ত মোশতাক সরকার কোনোদিনই মস্কো-দিল্লী জোটের কবল থেকে সম্পূর্ণভাবে ভেঙে বেরিয়ে আসেনি এবং মুজিববাদী শক্তিগুলিকে ধ্বংস করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেয়নি।

উপরের বিশ্লেষণটিই "জাতীয়তাবাদী"দের সরকার তোষণের পলিসির বিপক্ষে আমাদের রণকৌশলগত সিদ্ধান্তগুলির তত্ত্বগত ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে।

৫.

আমার একটি চিঠি উদ্ধৃত করার মাধ্যমে আমার প্রস্তাবিত রণকৌশল আমি এখানে হাজির করব। এ চিঠিটি লিখেছিলাম তোয়াহা-গ্রুপের একজন সহ-বন্দীর নিকট এবং এর প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল "জাতীয়তাবাদী" মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের দুটি দলিল ও আমার কাছে লেখা উক্ত সহবন্দীর একটি চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে।

দলিলদুটির মধ্যে প্রথমটি হল একটা ইশতেহার, যার শিরোনামা: "রুশ-ভারত শাসকচক্রের হস্তক্ষেপ ও সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে সকল দেশপ্রেমিক শক্তিবর্গ ঐক্যবদ্ধ হউন।" আলাউদ্দীন সাহেবদের গ্রুপ 'পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল),' তোয়াহা সাহেবদের গ্রুপ 'পূর্ববাংলার সাম্যবাদী দল (এম-এল)' এবং বদরুদ্দীন উমর প্রভৃতিদের গ্রুপ 'কমিউনিস্ট কর্মীসঙ্ঘ' যুক্তভাবে এই ইশতেহারটি প্রকাশ করেছিলেন মোশতাক সরকার ক্ষমতায় আসার পরে-পরেই। উচ্ছেদিত মুজিব সরকারকে তা "রুশ-ভারত শাসকচক্রের নিয়ন্ত্রিত" ব'লে বর্ণনা করেছে এবং বাংলাদেশের মাটিতে "রুশ-ভারতের শাসক-শোষক-চক্রে"র অস্তিত্বের কথা বলেছে। তা রুশ-ভারত জোটের "নগ্ন হস্তক্ষেপ" ও চক্রান্তের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, মনোযোগ আকর্ষণ করেছে সাদা-পোষাকে ভারতীয় সৈন্যদের অনুপ্রবেশ ও পাল্টা-কু ঘটানোর প্রচেষ্টার খবরের

প্রতি। ইশতেহারটি আরো আলোকদান ক'রে বলেছে যে এরা যদি পাল্টা-ক্যু ঘটাতে সফল হয় তবে "পুনরায়" দেশ "রুশ-ভারত শাসকচক্রের পদানত" হবে, কিন্তু মোশতাক সরকারের অধীনে দেশটা কি হয়েছে (স্বাধীন দেশ? নাকি মার্কিন নয়া-উপনিবেশ?) সে বিষয়ে তা কূটনৈতিক নীরবতা ভঙ্গ করেনি। ইশতেহারটি হুঙ্কার ছেড়েছে (বড় হরফে):

"দেশবাসী তথা জাতির সামনে এই হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিপদ। দেশের মুক্তি, বিকাশ ও শান্তির পথে বর্তমানে রুশ-ভারত শাসকচক্র ও তাদের দালালরাই সবচেয়ে বড় বাধা; এরাই আজ দেশের ও জনগণের সবচেয়ে বড় দুশমন।

"তাই দল, মত, শ্রেণী, ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের আজ সবচেয়ে জরুরী ও প্রাথমিক কর্তব্য হচ্ছে: রুশ-ভারত শাসকচক্রের সকল প্রকার হস্তক্ষেপ, ষড়যন্ত্র ও সম্ভাব্য আক্রমণকে প্রতিরোধের জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং এই জঘন্য জাতীয় দুশমনদের ও তাদের দালাল জাতীয় বিশ্বাসঘাতকদের সম্পূর্ণ উৎখাত না করা পর্যন্ত তাদের ধাওয়া করা।"

এর পর কিঞ্চিৎ হিতোপদেশ:

"জনগণের উপর নির্ভর না ক'রে, রাশিয়ার স্থলে অপর কোনো সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তথা মার্কিনের উপর নির্ভর ক'রে এবং রুশ-ভারত শাসকচক্র ও তাদের দালালদের সাথে আপোষের পন্থা নিয়ে এবং মুজিবের ন্যায় স্বৈরাচারী গণবিরোধী নীতি অনুসরণ ক'রে এই কাজ কখনও সম্পন্ন করা যাবে না।"

ইশতেহারের দাবী: রাজবন্দীদের মুক্তি, গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা, "রুশ-ভারত শাসকচক্র ও তার দালালদের" বিরুদ্ধে "দেশপ্রেমিক" কার্যকলাপ ও সংগঠনের স্বাধীনতা এবং "আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক প্রগতি", সব রুশপন্থী-ভারতপন্থী মুজিববাদীদের দমন ও নির্মূলীকরণ এবং জাতীয় প্রতিরক্ষা সুদৃঢ়করণ, ভারতের সঙ্গে এবং রাশিয়া ও অন্য সব সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে সমস্ত অধীনতামূলক অসম চুক্তি নাকচ, ভূমিসংস্কারের জন্য (!), "শিল্প ও ব্যবসায়ে উন্নতি"র জন্য এবং একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত কর্মনীতি ঘোষণা, সরকার কর্তৃক সব রুশবিরোধী, ভারতবিরোধী গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের একটি "জাতীয় মহাসম্মেলন" আহ্বান, একটি "জাতীয় সংগ্রাম কাউন্সিল" গঠন এবং "তার অধীনে দেশের সর্বত্র জাতীয় ঐক্যজোট কমিটি ও সংগ্রাম কমিটি গঠন"। ইশতেহার সরকারকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছে যে এইসব দাবী পূরণ না ক'রে মোশতাকের প্রতিশ্রুতিগুলি কার্যকর করা যাবে না, তার সরকার জনগণের আস্থা অর্জন করতে পারবে না এবং রুশ-ভারতপন্থী পাল্টা-ক্যু দ'তায় উৎখাত হয়ে যাবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ইশতেহারটি প্রকাশিত হওয়ার কিছুকাল পরে, অক্টোবরের প্রথমে, এল মোশতাকের ঈদ-ভাষণ। এই ভাষণে সে রাজবন্দীদের মুক্তির প্রতিশ্রুতি দিল। এহেন পরিস্থিতিতে নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে পূর্বোক্ত সহবন্দীর কাছ থেকে পেলাম তোয়াহা সাহেবদের গ্রুপের একটি সার্কুলারের (তারিখ : ১৬ অক্টোবর) সারাংশ। তাতে রাজবন্দীদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে তাঁরা যেন তাঁদের মুক্তির জন্য সরকারের কাছে অবিলম্বে দরখাস্ত পাঠান। বক্তব্যটা এই :

"এখনও দেশের ও জনগণের সামনে সবচেয়ে বড় বিপদ রুশ-ভারত শাসকচক্রের হস্তক্ষেপ, ষড়যন্ত্র ও সম্ভাব্য আক্রমণ এবং তাদের দালাল বাকশাল, মণি সিং, মোজাফ্ফর" (এই দুজন যথাক্রমে মস্কোপন্থী "কমিউনিস্ট" পার্টি ও মস্কোপন্থী ন্যাপের নেতা) "ও জাসদের" (অর্থাৎ 'জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল'-এর, যে দল বাংলাদেশে বিপ্লবের বর্তমান স্তরকে সমাজতান্ত্রিক মনে করে) "ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ। তাকে প্রতিরোধ করাই এখন প্রধান কাজ।

"মোশতাক সরকার দেশের ভিতরের সামন্তশ্রেণীর ও ঐ শ্রেণী থেকে আগত মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধি এবং মার্কিনের উপর নির্ভরশীল। সামরিক অভ্যুত্থানের পিছনে মার্কিনের যোগসূত্র ছিল। বর্তমান সরকার ও প্রশাসনযন্ত্রের নতুন চাঁইরা ও মোশতাক মার্কিনের বিশ্বস্ত। অপর দিকে, এই সরকার এবং সেনাবাহিনী ও প্রশাসনযন্ত্রের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ভারত-রাশিয়ার বিরোধী। এই পরিস্থিতিতে প্রধান দুশমন ও তাদের দালালদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বিকাশের জন্য আমরা এই মুহূর্তে সরকারের ভালো কাজকে সমর্থন করব এবং খারাপ কাজের বিরোধিতা করব[৮]. তবে এখনই সরকারকে

৮ [যে দেশে মার্কিনঘেঁষা সরকার ক্ষমতাসীন সেখানে রাশিয়াকে আশু প্রধান লক্ষ্যরূপে চিহ্নিত করলে তার অনিবার্য যুক্তিসঙ্গত পরিণতিই হচ্ছে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ : ক্ষমতাসীন সরকারের বিরোধিতা করার সাধারণ মতাবস্থান বর্জন এবং এক অতিশক্তির বিরোধিতার নামে অপর অতিশক্তির লেজুড়বৃত্তি। দুঃখের বিষয়, আজ ভারতের মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের এক ক্রমবর্ধমান অংশের মধ্যে 'তিন বিশ্বে'র তত্ত্বের নামে এই লজ্জাকর লাইনেরই প্রসার ঘটছে। তাঁরা মনে করেন যে ভারতে মার্কিনঘেঁষা জনতা সরকার ক্ষমতাসীন তবু এখানে সংগ্রামের আশু প্রধান লক্ষ্যস্থল হচ্ছে রাশিয়া। বাংলাদেশের মতোই এখানেও এর আবশ্যিক ফল হয়েছে এক জঘন্য সংশোধনবাদী রণকৌশল—যার নাম দেওয়া হয়েছে সরকারের প্রতি "সমালোচনামূলক সমর্থন" এবং যার মূল কথা হল সরকারের "ভালো" কাজ সমর্থন করা ও খারাপ কাজের সমালোচনা করা। কর্মীদের চাপে অনেক নেতা আজকাল "সমালোচনামূলক সমর্থন" কথাটা প্রত্যাহার করেছেন, কিন্তু তাঁদের লাইনের অনিবার্য পরিণতি যে আত্মসমর্পণবাদী রণকৌশল তাকে কি নিছক নামবদলের দ্বারা এড়ানো যাবে? আসল কথা, বিশ্বপরিসরে সাম্রাজ্যবাদ (এবং এক-একটি পর্যায়ে কোনো এক বিশেষ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি) বিশ্বজনগণের প্রধান লক্ষ্যবস্তু হলেও তা থেকে যান্ত্রিকভাবে সাম্রাজ্যবাদকে (এবং উক্ত বিশেষ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে) প্রত্যেকটি বিশেষ দেশের প্রধান দ্বন্দ্বের লক্ষ্যবস্তুরূপে উপপাদন করা চলে না।

উৎখাতের আওয়াজ তুলব না এবং কোনো সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হব না।...

"দরখাস্তের মূল পয়েন্ট হবে : আমরা রুশ-ভারত শাসকচক্রের আধিপত্য, নিয়ন্ত্রণ, হস্তক্ষেপ ও লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে এবং তাদের দালাল মুজিব সরকারের অত্যাচার, গোলামী, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার 'অপরাধে' নির্যাতিত হয়েছি এবং বছরের পর বছর জেল খাটছি। এই 'অপরাধে' মুজিব সরকার আমাদের বিরুদ্ধে খুন, ডাকাতি, অস্ত্র-প্রাপ্তি প্রভৃতি বিভিন্ন মিথ্যা মামলা সাজিয়েছে। বর্তমান সরকার সামরিক আদালতে ঐসব মামলা বিচার করছে ও কঠোর শাস্তি দিচ্ছে দেখে আমরা বিস্মিত।

"ইশতেহার থেকে" (সম্ভবত তিনটি সংগঠনের পূর্বোদ্ধৃত যুক্ত ইশতেহার থেকে) "দেশের বিপদের কথা উল্লেখ ক'রে বলতে হবে : আমরা এই বিপদের দিনে জাতীয় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, অর্থনৈতিক মুক্তি, গণতন্ত্রের সংগ্রামে অংশ নিতে চাই, জনগণকে সমাবেশ ক'রে রুশ-ভারত ও তাদের দালালদের সকল চক্রান্তকে ব্যর্থ ক'রে দিতে চাই ; আমাদের সে সুযোগ দেওয়া হোক ও মুক্তি দেওয়া হোক।"

তোয়াহা সাহেবদের গ্রুপের যে সহবন্দীটি আমাকে এই সার্কুলারের বক্তব্য পাঠিয়েছিলেন তিনি সমস্ত মূল পয়েন্টে এর সঙ্গে একমত ছিলেন, তাঁর ভীরু সমালোচনা শুধু ছিল একটিমাত্র বাক্যে : "বক্তব্যকে শুধু আবেদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাই না, ইহাকে দাবী হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার পদক্ষেপ নিতে চাই।" জবাবে আমি যে চিঠি পাঠাই তা এখানে উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি :

"এ সম্বন্ধে আমি আপনার সঙ্গে একমত যে 'আবেদন' করার পরিবর্তে আমাদের জোরালো 'দাবী' তোলা উচিত। কিন্তু আমাদের দরখাস্তটা একটা 'আবেদনপত্র' হবে নাকি 'দাবীপত্র' হবে তা দরখাস্তের ভাষা ও সুর দিয়ে নির্ধারিত হবে না, হবে তার রাজনৈতিক মর্মবস্তু দিয়ে। আমি মনে করি, বর্তমান মুহূর্তে জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্যের তত্ত্ব সর্বহারাশ্রেণীকে অনিবার্যভাবে মোশতাক সরকারের লেজুড়ে পরিণত করতে চাইবে। সাম্যবাদী দল, আলাউদ্দীন

পঞ্চাশের দশকে সর্বাগ্রগণ্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নিশ্চয়ই ছিল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, অথচ মালয়ের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। অনুরূপভাবে, 'তিন বিশ্বে'র তত্ত্ব অনুযায়ী যদিও বর্তমানে বিশ্বপরিসরে সোভিয়েতই বৃহত্তর বিপদ, তবু বিশ্বপরিস্থিতি ও একটি বিশেষ দেশের পরিস্থিতির মধ্যেকার এই পার্থক্যের স্বীকৃতি উক্ত তত্ত্বের যথার্থ মার্কসীয় ব্যাখ্যার মধ্যে থাকতেই হবে। চীন পার্টি নিজেও সোভিয়েতকে "অধিকতর বিপজ্জনক" ব'লে চিহ্নিত করার পরেই বলেছে : "নিঃসন্দেহে প্রতিটি বিশেষ অঞ্চলের জনগণ তাঁদের নির্দিষ্ট অবস্থানুযায়ী নির্ধারণ করতে পারেন কোন অতিশক্তি বা সাম্রাজ্যবাদী দেশ তাঁদের জন্য অধিকতর আশু হুমকি সৃষ্টি করছে। কিন্তু আমরা এখানে কোনো বিশেষ অঞ্চল-সংক্রান্ত কোনো বিশেষ প্রশ্নের চেয়ে বরং সমগ্র বিশ্বপরিস্থিতি-সংক্রান্ত একটি প্রশ্ন আলোচনা করছি" ('চেয়ারম্যান মাওয়ের তিন বিশ্ব বিভাজনের তত্ত্ব মার্কসবাদ-লেনিনবাদে একটি বিরাট অবদান', পিকিং ১৯৭৭)।

সাহেবদের গ্রুপ ও কমিউনিস্ট কর্মীসঙ্ঘের যে মিলিত ইশতেহার বেরিয়েছে এবং আপনাদের সাম্যবাদী দলের সার্কুলারের যে বক্তব্য আপনি পাঠিয়েছেন, সেগুলোর মধ্যেই এই প্রবণতা সুস্পষ্ট।

"মোশতাক সরকার যেহেতু আমলা-মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও সামন্তশ্রেণীর প্রতিনিধি, তাই বাংলাদেশ উপনিবেশ বা নয়া-উপনিবেশ হতে পারে না (হলে জাতীয় দ্বন্দ্ব অবশ্যই স্থায়ীভাবে প্রধান হত)। বাংলাদেশ একটি আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্তবাদী দেশ যা কোনো বহিঃশক্তির দ্বারা আক্রান্ত নয়। অতএব বর্তমান পর্যায়ে ওই দুটি ক্ষমতাসীন শ্রেণী ও তাদের রাষ্ট্রযন্ত্রকে উৎখাত করার কাজই কমিউনিস্টদের মৌলিক দায়িত্ব হিসাবে থেকে যাচ্ছে। আর তাই এখানে জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান নয়, আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বই প্রধান। কিন্তু আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব প্রধান হওয়ার মানেই এই মুহূর্তে গৃহযুদ্ধ শুরু ক'রে দেওয়া কিংবা এই মুহূর্তে সরকার উৎখাতের ডাক দেওয়া নয় – কারণ এই ধরনের তাৎক্ষণিক স্লোগান পরিস্থিতির পরিপক্কতার উপর নির্ভরশীল এবং তা এখন বাংলাদেশে উপস্থিত নেই।

"কিন্তু এই মুহূর্তে সরকার উৎখাতের ডাক দেব না এ কথার অর্থ কি এই যে আমরা সরকারকে কোনো একটি ব্যাপারেও 'সমর্থন' করতে পারি[৯] ? কোনো-মতেই না। সাধারণভাবেই একথা বলা যায় যে সর্বহারাশ্রেণী কখনও কোনো অবস্থাতেই ক্ষমতাসীন অন্য কোনো শ্রেণীকে এইভাবে সমর্থন দিতে পারে না – ভিন্ন শ্রেণীর সরকারের প্রতি সে সর্বদাই অসন্তুষ্ট থাকবে এবং পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সে ক্রমাগতই তার উপর একের পর এক দাবী চাপিয়ে তাকে কোণঠাসা করতে থাকবে, যতক্ষণ না তাকে উৎখাত করার মতো পরিস্থিতি বাস্তবে আবির্ভূত হয়। সরকার যদি কখনও এমন কোনো পদক্ষেপও নিতে বাধ্য হয় যা কিছু পরিমাণে আমাদের লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, তখনও কমিউনিস্ট পার্টি সে পদক্ষেপকে সমর্থন করে না বরং সে পদক্ষেপের কপটতা, অসম্পূর্ণতা ও সীমাবদ্ধতার স্বরূপ উন্মোচন করে এবং আরো ভালো পদক্ষেপের জন্য দাবী তুলতে থাকে। এমন কি যে ব্যতিক্রমমূলক পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতাসীন শ্রেণীর সঙ্গে যুক্তফ্রন্টের কর্মসূচী গ্রহণ করে তখনও সে ক্ষমতাসীন শ্রেণীকে একটি বিষয়েও 'সমর্থন' করে না বরং একের পর এক উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণে বাধ্য করে[১০]।

৯ তোয়াহা-গ্রুপের এই সহবন্দীটি আমাকে আগেই জানিয়েছিলেন যে তাঁর দল মোশতাক সরকারকে "শর্তযুক্ত সমর্থন" দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

১০ [লক্ষ্য ক'রে দেখুন, আজকে ভারতের মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের মধ্যে চাগিয়ে-ওঠা "সমালোচনামূলক সমর্থনে"র রণকৌশল এই জঙ্গী মার্কসীয় রণকৌশল থেকে কত দূরে অবস্থিত। যতদিন কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে বিপ্লবী শক্তি ক্ষমতাদখল করতে না পারছে, ততদিন কংগ্রেসের

"মোশতাক সরকার আমলা-মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও সামন্তশ্রেণীর প্রতিনিধি হওয়া সত্ত্বেও দেশের আপামর জনসাধারণের বিপুল দেশপ্রেমিক ও গণতান্ত্রিক অনুভূতিকে আশ্রয় ক'রে তাকে ক্ষমতায় আসতে হয়েছে। তাই অবস্থার ফেরে আজ তাকে সাময়িকভাবে কিছু পরিমাণে জাতীয়-গণতান্ত্রিক স্বার্থ প্রতিফলিত করতে হচ্ছে বা তার প্রতিশ্রুতি দিতে হচ্ছে। কিন্তু এ অবস্থা অবশ্যম্ভাবীরূপে নিতান্ত সাময়িক ও আন্তরিকতাবিহীন। আজ তাই তাকে সমর্থন করার সময় নয় বরং তার নাজুক (delicate) অবস্থার পূর্ণ সদ্ব্যবহার ক'রে, তারই প্রতিশ্রুতির প্যাঁচে তাকে চেপে ধ'রে, এবং তাকে কালহরণের বিন্দুমাত্র সুযোগ না দিয়ে তার কাছ থেকে আমাদের দাবীগুলো আদায় ক'রে নেওয়ার সময়। আজ তাই আমাদের প্রধান কর্তব্য যতবেশী-সম্ভব গণতন্ত্র প্রবর্তনের লক্ষ্য হাসিল করা, রুশ-ভারত শাসকচক্রের কল্পিত আগ্রাসনের[১১] বিরুদ্ধে সরকারের রিক্রুটিং অফিসারের কাজ করা নয়। সরকারের কাছে 'ভালো ছেলে' সেজে, তাকে ন্যূনতম মাত্রায় 'বিব্রত' করার মনোভাব নিয়ে কোনোমতে তার কাছ থেকে দু-চারটে সুবিধা হাতিয়ে নেওয়ার ন্যক্কারজনক ভূমিকা কমিউনিস্টদের নয়—এমন কি সুবিধা আদায়েরও সেটা কোনো নির্ভরযোগ্য পথ নয়। আগাগোড়াই তার সঙ্গে আমাদের সংগ্রামের সম্পর্ক। তাই আমাদের প্রধান দাবী আজ 'জাতীয় প্রতিরক্ষা' নয়, বরং গণতন্ত্র (এবং তার পূর্বশর্ত হিসাবে রাজবন্দীদের মুক্তি), কেননা সর্বাধিক-সম্ভব মাত্রায় গণতন্ত্রই সরকারের বিরুদ্ধে (তথা সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ, মুজিববাদী প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী, ইত্যাদির বিরুদ্ধে) আমাদের সংগ্রামের সর্বোত্তম-সম্ভব শর্তাবলী জোগাতে

বিরুদ্ধে জনতা সরকারকে এবং যেখানে সম্ভব জনতা পার্টির বিরুদ্ধে তথাকথিত বামফ্রন্টকে ক্ষমতায় থাকতে সাহায্য করাটা নিশ্চয় বিচক্ষণ রণকৌশল, কিন্তু তার সঙ্গে জনতা বা "বামফ্রন্ট" সরকারের "ভালো" কাজের প্রশংসা করা ও খারাপ কাজের নিন্দা করার পলিসি যুক্ত করাটা নির্জলা আত্মসমর্পণবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। জনতা পার্টিরই এক নেতা এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে সঠিকভাবেই বলেছিলেন যে এই ধরনের "সমালোচনামূলক সমর্থন" শাসকদলই প্রয়োগ করে তার নিজেরই গঠিত সরকারের প্রতি। অথচ বহু নেতা আজ ব্যাপক মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের সংক্রামিত ক'রে তুলতে চাইছেন এই বিষাক্ত শ্রেণীসমঝোতার তত্ত্বের দ্বারা—কখনও "সমালোচনামূলক সমর্থন" কথাগুলি ব্যবহার ক'রে, কখনও না ক'রে।]

১১ প্যান্টা-প্যান্টা-কু'র মাধ্যমে জেনারেল জিয়া ক্ষমতায় আসার পরে এমন কি জাতীয় দ্বন্দ্বের সেই পরাক্রান্ত প্রবক্তা ও মোশতাকের "মার্কসবাদী" সমর্থক এনায়েতুল্লা খান (পেটি বুর্জোয়া হিসাবে তিনি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত প্রশংসনীয় ভূমিকা নিয়েছেন কিন্তু একজন হবোহবো-মার্কসবাদী হিসাবে তাঁর ভূমিকা অবশ্যই নিন্দার্হ) বলেছেন যে "খোলাখুলি" বলতে গেলে তিনি কোনো বৈদেশিক আগ্রাসনের আশঙ্কা করছেন না। সুতরাং বাকি থাকে কেবল অন্তর্ঘাত ও হস্তক্ষেপ। অথচ আমি প্রথম খণ্ডে দেখিয়েছি যে শুধুমাত্র এগুলিই জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়

পারে। আমরা সরকারকে সমর্থন করব না,সরকারকেই বরং আমাদের বিভিন্ন স্বাধীন ও জনপ্রিয় পদক্ষেপগুলিকে 'সমর্থন' ক'রে নিজের আন্তরিকতা প্রমাণ করার চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড় করাব।

"কিন্তু এর মানে কি এই যে আমি বাংলাদেশে বৈদেশিক প্রভুত্বের বিপদকে দেখছি না? মোটেই নয়। আমলা-মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও সামন্তশ্রেণী যতদিন ক্ষমতায় থাকবে ততদিন তারা তাদের শ্রেণীচরিত্র অনুযায়ীই বৈদেশিক প্রভুত্বের বাহন হিসাবে কাজ করবে; সেইসঙ্গে বিদেশী প্রভুদের সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্বেরও একটা অপ্রধান দিক থাকবে এবং তাদের রাষ্ট্র অনবরত অপেক্ষাকৃত স্বাধীন ও অপেক্ষাকৃত পরাধীন অবস্থার মধ্যে, এবং এই প্রভু ও ওই প্রভুর মধ্যে, দুলতে থাকবে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই বৈদেশিক অনুপ্রবেশের জন্য দায়ী হবে এই **দেশীয় শ্রেণীদ্বয়েরই সরকার** এবং তারই অবলম্বিত নীতি। তাই, এমন কি নিছক বৈদেশিক আধিপত্য উচ্ছেদ করার দৃষ্টিকোণ থেকেও, এই দেশীয় শ্রেণীদ্বয় ও তাদের রাষ্ট্রযন্ত্র উচ্ছেদ করার কাজকেই 'বিপ্লবের কেন্দ্রীয় কর্তব্য' হিসাবে কমিউনিস্ট পার্টির গ্রহণ করা উচিত। এবং সে কর্তব্য পালনের জন্য সবচেয়ে দ্রুত ও সবচেয়ে সহজে ব্যাপকতম শক্তিসঞ্চয় করা যেতে পারে কেবলমাত্র সর্বাধিক-সম্ভব গণতান্ত্রিক পরিবেশে এবং সামন্ত দ্বন্দ্বকে প্রধান ক'রে। আর এ কর্তব্য বিসর্জন দিয়ে, আমলা-মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও সামন্তশ্রেণীর রাষ্ট্র বহাল থাকার অবস্থাতে যদি আমরা বহিঃশক্তি তথা সাম্রাজ্যবাদকেই 'প্রধান বিপদ' ব'লে ধ'রে ব'সে থাকি, তাহলে তার অর্থ দাঁড়াবে ওই রাষ্ট্রকেই চিরস্থায়ী করার জন্য আমাদের সকল শক্তি নিয়োজিত করা, ওই রাষ্ট্রের নীতির প্রতিটি সামান্যতম দিকপরিবর্তনের উপর (যা সর্বদাই ঘ'টে থাকে) সর্বহারাশ্রেণীর প্রোগ্রামকে নির্ভরশীল ক'রে তোলা, এমন কি ওই সরকারের প্রতিটি তাৎক্ষণিক স্বার্থগত প্রয়োজনের সঙ্গে জনতার সংগ্রামকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা, এবং এক অতিশক্তির বিরুদ্ধে অপর অতিশক্তির পক্ষাবলম্বন করা[১২]।

"বস্তুত মোশতাক সরকার যদি সত্যিই মার্কিনপন্থী হয়ে থাকে, তবে এমনিতেই সে নিজের অস্তিত্ব বাঁচানোর জন্য রুশ-ভারত শাসকচক্রের 'হস্তক্ষেপ ও সম্ভাব্য আক্রমণ' সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন থাকবে। অপরদিকে এটাও ঠিক যে তার গণবিরোধী মুৎসুদ্দি চরিত্রের জন্য এ ব্যাপারে তার পদক্ষেপগুলি কখনোই

১২ [ভারতে একদল মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হঠাৎ আবিষ্কার করেছেন যে চার পাহাড়ের জোটের সঙ্গে জনগণের দ্বন্দ্বই প্রধান, সেই জোটের প্রধান দিক আবার সাম্রাজ্যবাদ এবং তার মধ্যে আবার সংগ্রামের প্রধান লক্ষ্যস্থল হল সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ। কথার নানা হেরফের সত্ত্বেও দেশে-দেশে সুবিধাবাদের অন্তর্বস্তুতে কি আশ্চর্য মিল!]

যথেষ্ট দৃঢ় ও আপোষহীন হতে পারবে না, কেননা সর্বদাই সে যথাসম্ভব তোয়াজ ও আপোষের মাধ্যমে এইসব বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেতে চাইবে। এই ঝোঁক তার মৌলিক শ্রেণীচরিত্রের অন্তর্গত – আমাদের হাজার দাবীও এ ঝোঁককে স্থায়ীভাবে উৎপাটন করতে পারবে না। তার চরিত্রের এই স্বরূপ নিশ্চয়ই উদ্‌ঘাটন করতে হবে এবং দৃঢ়তর পদক্ষেপের জন্য দাবীও অবশ্যই রাখা যেতে পারে। কিন্তু এই ধরনের দাবী তোলাকেই আমাদের 'প্রধান কাজ' হিসাবে গ্রহণ করলে তার অর্থ দাঁড়াবে : সর্বপ্রকার বিদেশী আধিপত্যকে স্থায়ীভাবে উৎখাত করার লক্ষ্যে **নিজেদের** প্রস্তুত করার কাজে আত্মনিয়োগ না ক'রে, এবং সেই উদ্দেশ্যে এই রাষ্ট্রকে শেষ পর্যন্ত উচ্ছেদ করার কাজকে আমাদের মৌলিক কর্তব্য হিসাবে না নিয়ে, এই রাষ্ট্রই কেমন ক'রে আরো ভালোভাবে টিঁকে থাকতে পারে তার পথ বাতলানোটাই আমরা আমাদের প্রধান কর্তব্য ব'লে গ্রহণ করেছি। কমিউনিস্টদের জন্য সম্মানজনক পেশাই বটে! এই কাজের সঙ্গে ডাঙ্গে ও মণি সিংদের কাজের তফাৎ কোথায়?

"যদি ধ'রে নিই যে বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্র নিরঙ্কুশভাবে ও স্থায়ীভাবে মার্কিনের বশংবদ (যদিও কোনো সামন্ত-মুৎসুদ্দি রাষ্ট্রের উপরেই কোনো একক শক্তির নিরঙ্কুশ ও স্থায়ী আধিপত্য বজায় থাকার গ্যারান্টি নেই), যদি ধ'রে নিই যে বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্র চিরকালের মতো রাশিয়ার সঙ্গে সব আপোষ ও অধীনতামূলক সম্পর্ক ছেদ করেছে বা করতে চলেছে (বাস্তবে অবশ্য তা ঘটেনি, ঘটতেও পারে না),কেবলমাত্র তাহলেই একথা বলা যায় যে রাশিয়া তার আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারে **একমাত্র** প্রত্যক্ষ হামলার পথে। কিন্তু যদি তা-ও ধ'রে নিই তবু তো আমেরিকারও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার আশঙ্কা থাকে – হোক না তা পরোক্ষ কারসাজির পথে। অতএব, ভিন্ন পথে হলেও, দুই অতিশক্তিরই আধিপত্য বিস্তারের 'বিপদ' ও 'আশঙ্কা' সর্বদা বিদ্যমান থাকছে। সেক্ষেত্রে কোনো একটা 'বিপদ' ও 'আশঙ্কা'কে প্রধান ধরার যুক্তি কি? কোন মন্ত্রবলে নির্ধারণ করা যাবে কার আধিপত্যের 'বিপদ' ও 'আশঙ্কা' বেশী – রাশিয়ার না আমেরিকার?

"কোনো এক বিশেষ মুহূর্তে কার আধিপত্যের মাত্রা অন্যের তুলনায় **ইতিমধ্যেই** প্রাধান্য অর্জন **ক'রে ফেলেছে** তা একটা ন্যূনতম স্থিতিশীলতার সঙ্গে মোটামুটি হিসাব করা সম্ভব হতেও পারে। কিন্তু বাংলাদেশের উপর আধিপত্য বিস্তারের **ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা** কখন কার দিক থেকে প্রধান হয়ে দেখা দিচ্ছে তার চুলচেরা তুলনামূলক পরিমাপের কোনো ফর্মুলাই দুনিয়ায় কারো জানা নেই। একমাত্র একটা বৈদেশিক **আগ্রাসন** বাস্তব হয়ে উঠলে পরেই একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ের জন্য নিশ্চয়তার সঙ্গে বলা যায়

যে আগ্রাসী শক্তিটির আধিপত্য কায়েমের আশু সম্ভাবনা এখন প্রধান বিপদ হয়ে দেখা দিয়েছে। কাজেই আগ্রাসনের পরিস্থিতি ছাড়া আমাদের কখনও 'কোন সম্ভাবনাটা প্রধান—আমেরিকার আধিপত্য না রাশিয়ার?' এই অনিশ্চিত চুলচেরা প্রশ্নের আওতায় বন্দী হওয়া উচিত নয়, বরং এই **উভয় হুমকিরই** অভিন্ন বাহন যে দুটি দেশীয় শ্রেণী ও তাদের রাষ্ট্র, তাদের উৎখাত করার চূড়ান্ত লক্ষ্যে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বভিত্তিক, অর্থাৎ সামন্ত দ্বন্দ্বভিত্তিক, কাজেই আমাদের আত্মনিয়োগ করা উচিত[১৩]। এই আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম কখন দাবীদাওয়ার রূপ নেবে, কখন নেবে সরাসরি উৎখাতপ্রচেষ্টা তথা গৃহযুদ্ধের রূপ, তা নির্ভর করবে নির্দিষ্ট সময়ের নির্দিষ্ট পরিস্থিতির উপর। বাংলাদেশে বর্তমান মুহূর্তে একমাত্র সর্বাধিক-সম্ভব গণতন্ত্রের দাবীই সর্ব-প্রকার প্রতিক্রিয়া ও সম্ভাব্য হুমকির যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে পারে—গণতন্ত্রের দাবীই হচ্ছে সেই কেন্দ্রীয় গ্রন্থি যাকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরলে আমরা সমগ্র পরিস্থিতির নিয়ামক ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারব। নতুবা আমরা যদি রাশিয়া বা আমেরিকার বিপদকে প্রধান করি, এবং গণতন্ত্রের দাবী যদি উত্থাপন করি নিছক তার গৌণ পরিপূরক হিসাবে, তবে এ সব-কিছুরই পরিণাম হবে আমলা-মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও সামন্তশ্রেণীর লেজুড়বৃত্তি এবং দুই অতিশক্তির বিরোধিতা করার পরিবর্তে এক অতিশক্তির বিরুদ্ধে অপর অতিশক্তিকে মদত জোগানো।

"আপনারা ও আমরা দু-পক্ষই বৈদেশিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলছি এবং গণতন্ত্রের দাবী রাখছি। কিন্তু আপনারা বৈদেশিক আধিপত্য প্রতিরোধের দায়িত্বকে প্রধান ব'লে গ্রহণ ক'রে গণতন্ত্রকে চাইছেন এই 'ভালো কাজে'র বখশিস হিসাবে। আর আমরা গণতন্ত্র আদায় ক'রে বৈদেশিক আধিপত্য-প্রতিরোধকেও আরো কার্যকরীরূপে পেতে চাইছি গণতান্ত্রিক পরিবেশে বাধামুক্ত গণসক্রিয়তার স্বাভাবিক ফল হিসাবে। এই পার্থক্যের অন্তরালে মৌলিক মনোভাব ও কর্মপদ্ধতির যে মেরুপ্রমাণ বৈপরীত্য

১৩ [এর মানে নিশ্চয়ই এই নয় যে আমাদের সামগ্রিক লড়াইয়ের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দিকটিতে আমরা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে, বিশেষত দুই অতিশক্তির মধ্যে, তাৎক্ষণিক গুরুত্বের কোনো হেরফের করব না। তা নিশ্চয়ই করব: রাষ্ট্রক্ষমতার উপর যে অতিশক্তির প্রাধান্য, আশু লক্ষ্যবস্তু হিসাবে তা-ই হবে অপরটির তুলনায় প্রধান। কিন্তু পুরো লড়াইটা যেহেতু উভয় অতিশক্তির আধিপত্যের বাহন দেশীয় রাষ্ট্রশক্তি উচ্ছেদের লক্ষ্যেই পরিচালিত হচ্ছে তাই তা আমাদের ক্ষমতাসীন শ্রেণীগুলির সঙ্গে, এবং এক অতিশক্তির বিরুদ্ধে অপর অতিশক্তির সঙ্গে, নীতিহীন আপোষের পথে নিয়ে যাবে না। পক্ষান্তরে জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান করলে দেশীয় রাষ্ট্রশক্তি উচ্ছেদের লক্ষ্য মুলতবী থাকে—উপযুক্ত পরিস্থিতিতে তা সঠিক, নতুবা তা অবশ্য সংশোধনবাদ।]

বিদ্যমান, তা আশা করি আপনার চোখ এড়াবে না।"

আমি একে ভারতীয়, তায় আবার এই ধরনের মতামত পোষণ করি। অতএব খুব সহজেই দুয়ে দুয়ে চার হয়ে গেল: ঢাকা জেলের ভিতর ও বাইরের মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের একাংশের মধ্যে আমার নাম প্রচারিত হয়ে গেল রুশ-ভারত জোটের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মহান জাতীয় ঐক্যের অন্তর্ঘাতক হিসাবে, এমন কি "সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণ-বাদের এজেন্ট" হিসাবে।

৬.

মোশতাক সরকারের বিরুদ্ধে খালেদ মোশারফের স্বল্পায়ু পাল্টা-কু আমাদের বিশ্লেষণকেই সমর্থন করল। এর অতি স্বল্প আয়ু প্রমাণ করল যে এটা ঘটিয়েছিল রুশ-ভারত জোটের মদতপুষ্ট মুষ্টিমেয় রাজনৈতিক অ্যাডভেঞ্চারকারী ও ভাগ্যান্বেষীরা এবং মুজিববাদ ইতিমধ্যে তার শ্রেণীভিত্তি হারিয়ে ফেলেছিল এই অর্থে যে তা আর আমলা-মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও সামন্তশ্রেণীর বিকাশের বর্তমান পর্যায়ে তাদের প্রধান স্বার্থগুলির প্রতিনিধিত্ব করছিল না।

উপরন্তু যে পরিস্থিতিতে এই শোচনীয় রকম আগাম-বিনষ্ট মুজিববাদী ক্ষমতাপ্রয়াসটি ঘটতে পারল তা মোশতাক সরকারের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধেও আমাদের মূল্যায়নকে চমৎকারভাবে সমর্থন করেছে। জনসাধারণের শক্তিশালী জাতীয়-গণতান্ত্রিক অনুভূতির উপর নির্ভর ক'রেই তা ক্ষমতায় এসেছিল। কিন্তু তা কখনও মুজিববাদী শক্তিগুলিকে নির্ধারকভাবে চূর্ণ করার পর্যাপ্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেনি, কারণ জনগণের জাতীয়-গণতান্ত্রিক শক্তি যাতে খুব বেশী প্রাধান্য বিস্তার ক'রে ফেলতে না পারে সেজন্য তার বিরুদ্ধে পাল্টা-চাপান হিসাবে তাদের তা জীইয়ে রাখতে চেয়েছিল। এক শক্তির বিরুদ্ধে অপর শক্তিকে খেলানোর বিপজ্জনক বদমায়েসিতে লিপ্ত হল মোশতাক সরকার। প্রকৃতি-গতভাবেই তা নিজেকে জাতীয়-গণতান্ত্রিক দাবীসমূহের সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম করতে পারেনি; অন্যদিকে মার্কিন বা রুশ-ভারত জোট কারো কাছেই সে পারেনি প্রিয় হতে। নিজের সংকীর্ণ আত্মসর্বস্ব শ্রেণীস্বার্থের গণ্ডীতে বন্দী হয়ে থেকে নিজেকে তা মুজিববাদী, রুশ-ভারতপন্থী প্রতিশোধকামী আক্রমণের জন্য উন্মুক্ত ক'রেই রেখেছিল। স্থানীয় মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের মধ্যে আমাদের জাতীয়তাবাদী বন্ধুরা মোশতাক সরকারের উপর ঝলমলে প্রশংসা (ও কিছু মৃদু অনুযোগ) বর্ষণ ক'রে ঠিক এই তিক্ত সত্যগুলিকেই ধামাচাপা দেওয়ার জন্য আপ্রাণ পরিশ্রম করেছেন।

মুজিববাদী পাল্টা-কু'র পরাজয়ের পরেই এসেছে গণ-আবেগের এক প্রবল

উচ্ছ্বাস। মোশতাক হয়ে উঠেছে "মার্কসবাদী" এনায়েতুল্লার দ্বারা সোৎসাহে অভিনন্দিত এক জাতীয় বীর আর বুর্জোয়া সেনাবাহিনীর পাণ্ডা জিয়াউর রহমান আবির্ভূত হয়েছে জাতির "পরিত্রাতা"রূপে। চতুর্দিকে কেবল প্রেম ও বন্ধুত্বের জোয়ার—তাতে সাময়িকভাবে ডুবে যাচ্ছে সব অপ্রিয় শ্রেণী-বাস্তবতা। কিন্তু এখনই তো সেই মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের দরকার, যাঁরা জোয়ারের বিরুদ্ধে যাওয়ার হিম্মত রাখবেন, জনগণকে বারংবার মনে করিয়ে দেবেন শ্রেণী-বৈরিতার আপোষাতীত চরিত্রের কথা. সর্বহারাশ্রেণী ও জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবেন শ্রেণীগত অবিশ্বাস। আমার পুরো বিশ্লেষণটা এই উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত এবং মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নামধারী জাতীয়তাবাদীরা ঠিক এই কর্তব্যের সঙ্গেই নির্লজ্জভাবে বেইমানী করছেন।

প্রধান দ্বন্দ্ব নিরূপণের অদ্ভুত তত্ত্বটি ছাড়াও এইসব ভুয়ো মার্কসবাদী-লেনিনবাদীর আত্মসমর্পণবাদের উৎস রয়েছে মাওয়ের নয়া-গণতন্ত্রের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বকে একগুঁয়েভাবে কিন্তু গোপনে বর্জন করার মধ্যে। সংক্ষেপে বলতে গেলে নয়া-গণতন্ত্রের তত্ত্ব হল সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের প্রাধান্য-কবলিত আধা-ঔপনিবেশিক (বা ঔপনিবেশিক) ও আধা-সামন্তবাদী দেশে পূর্ণ পুঁজিবাদী সমাজ ও পূর্ণ বুর্জোয়া গণতন্ত্রের উদ্ভবের **অসম্ভবতার** তত্ত্ব।

মেসার্স বদরুদ্দীন উমর, এনায়েতুল্লা, মাহববুল্লা এণ্ড কোং ঠিক এই কঠিন সত্যটিকেই গ্রহণ করতে চান না, অথচ নিজেদের সাজাতে চান মাওয়ের অনুসারী ব'লে। তাঁরা সবাই কল্পনা করেন যে আজকের বাংলাদেশে শক্তিশালী পুঁজিবাদী বিকাশ একটি বাস্তবায়নযোগ্য ও "প্রগতিশীল" দায়িত্ব। তাঁরা ভাবলেন, মোশতাকের কু সেই বহুপ্রতীক্ষিত সুযোগ এনে দিয়েছে। এনায়েতুল্লা-সম্পাদিত সরকারী কাগজ 'বাংলাদেশ টাইম্স'এ এক অপাঠ্য পণ্ডিতী কসরতে মাহববুল্লা ঘোষণা করলেন যে বাংলাদেশ নাকি এতদিনে এক তেজীয়ান পুঁজিবাদী বিকাশ শুরু করার শর্তাবলী পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে। একবার ভাবুন, এর অর্থ কি! এর অর্থ: বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাপ্ত হয়েছে, আর তা হয়েছে অধোনত একটি দেশের বুর্জোয়াশ্রেণীর দ্বারা। এবার শুরু হয়েছে মোটামুটি শান্ত পুঁজিবাদী বিকাশের পর্যায়। কিন্তু বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব যদি শেষ হয়ে গিয়ে থাকে তবে তো বিপ্লবের বর্তমান স্তর সমাজতান্ত্রিক (অথচ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে বিশ্বাসী বাংলাদেশের 'জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল'এর সঙ্গে তাঁদের নাকি বেজায় বিরোধ!)। সুতরাং এক ধরনের (অর্থাৎ বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের) বিপ্লবী পরিস্থিতি পার হয়ে গেছে, আর অন্য ধরনের (অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের) বিপ্লবী পরিস্থিতি আজও আসেনি কারণ তা আসতে পারে কেবলমাত্র "যথেষ্ট" পুঁজিবাদী

বিকাশের পরেই। অতএব সর্বহারাশ্রেণীর সামনে কোনো আশু বৈপ্লবিক সমস্যা নেই। কেননা, এই সমগ্র পর্যায় জুড়ে একটি প্রগতিশীল সরকার (যেমন মোশতাক সরকার) পুঁজিবাদী বিকাশ লালন করার মহান কর্মে ব্যাপৃত থাকবে এবং তার সামনে যদি কোনো রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সংকট ইতিমধ্যে দেখা দেয় তবে তা কমিউনিস্টদের ব্যবহার্য কোনো বিপ্লবী পরিস্থিতির লক্ষণ হতে পারে না, তা হবে বিদেশী শোষকদের প্রতিক্রিয়াশীল ষড়যন্ত্রমাত্র[১৪]। মোশতাক সরকার জিন্দাবাদ! তার উপর সব সাম্রাজ্যবাদী চাপপ্রয়োগ প্রতিহত কর!!

পক্ষান্তরে একজন প্রকৃত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী কখনোই এ মোহ পোষণ করবেন না যে কোনো সরকার বাংলাদেশের মতো দেশে পুঁজিবাদী বিকাশের যুগ উদ্বোধিত করতে পারবে, কায়েম করতে পারবে যথার্থ বুর্জোয়া গণতন্ত্র। তিনি নিঃসংশয়ে জানেন যে মোশতাক সরকারের জাতীয়-গণতান্ত্রিক ভাবভঙ্গীগুলির আয়ু আবশ্যিকভাবেই স্বল্প। তাই এ সরকারের মধুমাখা কথাবার্তায়

১৪ [অথ বদরুদ্দীন উমর কথা।: মুজিব আমলে বাংলাদেশে চরমতম সামাজিক সংকটের মধ্যে উমর সাহেব তাঁর 'সংস্কৃতি' পত্রিকায় হঠাৎ এক প্রবন্ধ লিখে ঘোষণা ক'রে বসলেন যে বাংলাদেশে চমৎকার বিপ্লবী পরিস্থিতি নেই কারণ বিপ্লবের আত্মগত শক্তি খুবই দুর্বল। এরই কাছাকাছি সময়ে 'হলিডে' পত্রিকায় অন্য একটি প্রবন্ধে তিনি বললেন যে মুজিব সরকারের ছত্রছায়ায় উৎপাদনবিমুখ লুম্পেন কালো পুঁজির দৌরাত্ম্য একদিকে যেমন জনগণের দুর্দশাকে গভীর করেছে, অন্যদিকে তা আওয়ামী লীগের ভিতরে ও বাইরে উৎপাদন ও ব্যবসায়ে আগ্রহী বুর্জোয়াদেরও ক্ষোভ জাগিয়ে তুলছে, আর তাই এ অবস্থায় কমিউনিস্টদের কর্তব্য হল লুম্পেন পুঁজির বিরোধিতা ক'রে যথার্থ পুঁজিবাদী উৎপাদনের পথ বাধামুক্ত করা। তাঁর এ দুটি প্রবন্ধকে কেন্দ্র ক'রে তাঁর সঙ্গে আমার কিছু পত্র-বিনিময় হয়। আমি তাঁকে জানাই: (১) বিপ্লবী পরিস্থিতির অস্তিত্ব নির্ভর করে অবজেকটিভ ফ্যাক্টরসমূহের উপর, তাই আত্মগত শক্তির অপরিপক্কতার যুক্তিতে বিপ্লবী পরিস্থিতির অস্তিত্ব নাকচ করার অর্থ নির্জলা সংস্কারবাদ। (২) তিনি আসলে বিপ্লবী পরিস্থিতি অস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন আত্মগত শক্তির অপরিপক্কতার কারণেও নয়, বরং যেহেতু তিনি বাংলাদেশে বিরাট পুঁজিবাদী বিকাশের অলীক স্বপ্ন দেখছেন (কেননা 'হলিডে'তে প্রকাশিত তাঁর বক্তব্যের অন্তর্নিহিত অনুমিতিটা স্পষ্টতই এই যে বাংলাদেশে তাৎপর্যপূর্ণ পুঁজিবাদী বিকাশের অবকাশ আছে)। আমার এ সমালোচনায় সবিশেষ কুপিত হয়ে তিনি আমাকে 'ট্রটস্কিপন্থী' এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে বিশ্বাসী 'জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল'এর কাতারভুক্ত করেন। আমি তখন তাঁকে জানিয়েছিলাম যে কথাগুলো আসলে তাঁর নিজের প্রতিই প্রযোজ্য, কারণ বাংলাদেশের সমাজকে তিনি তখনও "আধা-সামন্ত-বাদী" বলছেন বটে, কিন্তু তা তাঁর "বিরাট পুঁজিবাদী বিকাশের খোয়াবে"র সঙ্গে খাপ খায় না এবং তিনি আসলে ভিতরে ভিতরে বাংলাদেশের সমাজকে "পুঁজিবাদী" ব'লেই মনে করেন। তিনি আরো ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন বাংলাদেশের মতো দেশে পুঁজিবাদের বিকাশ হতে পারে ঠিকই, শুধু তা সাম্রাজ্যবাদের স্তর পর্যন্ত উপনীত হতে পারে না। আমার সন্দেহ আরো গভীর হল যে বাংলাদেশের পুঁজিবাদী স্তরে (যা সাম্রাজ্যবাদের পূর্ববর্তী) উত্তরণ ঘ'টে গেছে ব'লেই তিনি মনে করেন। তখন তিনি সজোরে সে কথা অস্বীকার করলেও জেল থেকে বেরিয়েই (২৬ মার্চ ১৯৭৮) খবর পেলাম যে বাংলাদেশের সমাজকে এতদিন পরে তিনি "পুঁজিবাদী" ব'লেই চরিত্রায়িত করেছেন!]

বুদ্ধিভ্রষ্ট না হয়ে তিনি অবিলম্বে ব্যস্ত হবেন জনগণের স্বার্থে তার প্রতিশ্রুতি ও হাবভাবকে যথাসম্ভব কাজে লাগিয়ে নিতে। তিনি তাঁর প্রত্যয়কে দাঁড় করাবেন কোনো ইচ্ছাপূরক চিন্তা বা শ্রেণী-অতিক্রান্ত মোহের উপর নয়, বরং কঠোর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের উপর। তাই সরকার তার নিজের অঙ্গীকারগুলির সঙ্গে সর্বদাই যে বেইমানী করার চেষ্টা করছে এবং কোনো না কোনোদিন যে বেইমানী সে অনিবার্যভাবেই করবে তা তাঁর চোখ কিছুতেই এড়িয়ে যেতে পারে না। আর সে বেইমানীর দিন খুব দূরে হতেই পারে না।

৩

সম্পাদকের চিঠির জবাবে

ভারতীয় জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। এই অবস্থার মধ্যেই আমাকে বইখানি লিখতে হয়েছিল। তাই ভয় ছিল, ভারতের শ্রেণীসংগ্রামের ব্যবহারিক বাস্তবতার সঙ্গে বইটির বিস্তারিত ও জটিল তত্ত্বালোচনার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কটি হয়তো আমি কোনো কোনো ক্ষেত্রে যথেষ্ট স্পষ্ট ক'রে দেখাতে পারিনি। তাই আমি একজন সম্পাদকের প্রয়োজন অনুভব করেছিলাম, যিনি আমার মূল বক্তব্য সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রেখেই দুয়েকটি জায়গায় প্রয়োজনীয় রদবদল ও টীকা সংযোজন করার দায়িত্বটুকু পালন করতে পারবেন।

যে কমরেডের উপর এই সম্পাদনার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল তিনি আমার [প্রথম খণ্ডের] পাণ্ডুলিপিটি পড়ার পর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ক'রে পাঠিয়েছেন। এখানে আমি সাধ্যমতো সেগুলোর জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব।

১.

সম্পাদক প্রথমেই সমালোচনা করেছেন আমার বিতর্কের "আক্রমণাত্মক" ভঙ্গীকে। তাঁর মতে এই ধরনের বিতর্ক পাঠককে তৎক্ষণাৎ বিরক্ত ক'রে তোলে এবং তাঁর বিচারবুদ্ধিকে ঘোলা ক'রে দেয়। যদিও তিনি স্বীকার করেন যে অবজেকটিভভাবে বলতে গেলে জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্যের তত্ত্বটি বর্তমানে আমাদের উপমহাদেশে একটি "প্রতিক্রিয়াশীল" লাইন, তবু এই তত্ত্বের প্রবক্তাদের ভুলগুলি এখনও ("অন্তত ভারতবর্ষে") রয়েছে মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের আংশিক বিচ্যুতির স্তরে। আমার বইয়ের [অর্থাৎ তার প্রথম খণ্ডের] বক্তব্যে এমন আভাস দেওয়া হয়েছে যে জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রবক্তারা বুঝি ইচ্ছাকৃতভাবেই গোলমেলে প্রশ্নগুলো এড়িয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু তা নাকি ঠিক নয়। রোগ সারিয়ে রোগীকে বাঁচানোর মনোভাব আমার লেখায় "সম্পূর্ণভাবে" অনুপস্থিত এবং তার সুর কর্মীসাধারণের মেজাজকে প্রতিফলিত করে না। একজন সুপরিচিত মার্কস-বাদী-লেনিনবাদী নেতার নাম উল্লেখ ক'রে তিনি আমাকে আরো স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে "অনেক বিষয়ে মোটামুটি সঠিক অবস্থান গ্রহণ করা সত্ত্বেও" তিনি

যে কর্মীসাধারণের নিকট এত অপ্রিয় তার কারণ তাঁর বিতর্কের ঝাঁঝাল ভঙ্গী। অবশ্য সম্পাদক এই আশ্বাসও দিয়েছেন যে তিনি এর বিপরীত বিপদ সম্বন্ধেও সচেতন: আজ যেহেতু কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবীটাই প্রাধান্যে রয়েছে, তাই তার অন্তরালে মতপার্থক্যগুলি তীক্ষ্ণ ক'রে না তোলার একটা মনোভাবও উত্তরোত্তর প্রশ্রয় পাচ্ছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তাঁর মত হচ্ছে, আমার বইয়ের তীক্ষ্ণ সুরটাই তার "অন্যতম প্রধান" ত্রুটি।

প্রথমেই আমার জবাব হচ্ছে এই যে বইটা লেখা প্রধানত বাংলাদেশের পটভূমিতে। সেখানকার মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মহলে জাতীয় দ্বন্দ্বের যে রকম সর্বব্যাপী প্রাধান্য, তাতে আমি স্থিরনিশ্চিত যে আমার বিতর্কের তীক্ষ্ণ সুর ও তীব্র মেজাজ একেবারে পুরোপুরি যুক্তিযুক্ত। ভারতের ক্ষেত্রে অতটা তীব্রতা যদি অপরিহার্য না-ও হয়ে থাকে[১] তবু, যে পাঠক এই বইয়ের মর্মগ্রহণ করতে পারবেন, তাঁর পক্ষে বইটার বাংলাদেশী পটভূমিও ধরতে না পারার কোনো কারণ থাকতে পারে না। তবু সম্পাদক যদি আরো নিশ্চিন্ত হতে চান তাহলে আমার বিতর্কের তীব্রতার সঙ্গে বাংলাদেশী পটভূমির সম্পর্ক নির্দেশ ক'রে একটা সম্পাদকীয় টীকা তিনি অনায়াসেই যোগ ক'রে দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে বইটির মূল পাঠে আর কোনো পরিবর্তন করার প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকে ব'লে তো আমার মনে হয় না।

তাছাড়া সত্য কথা বলতে কি কারো বিতর্কের নিছক ভঙ্গী বা সুরের বিরুদ্ধে যে কোনো অজুহাতে এবং যত রকম সাফাইসহ (যেমন সম্পাদক আশ্বাস দিচ্ছেন যে তিনি "বিপরীত বিপদ" সম্বন্ধেও পূর্ণমাত্রায় সচেতন আছেন) যে ওজর-আপত্তিই হাজির করা হোক না কেন, আমি তৎক্ষণাৎ তার প্রতি বেশ কিছুটা সন্দিগ্ধ মনোভাব পোষণ না ক'রে পারি না। কেননা এখানে আমরা কোনো কর্মীর ব্যক্তিগত ভুলভ্রান্তি সংশোধনে ব্যস্ত নই। আমরা নেমেছি একটা শক্তিশালী **আন্তর্জাতিক ঝোঁকের** মূল উৎপাটনে, একটা সম্পূর্ণ তত্ত্বগত **লাইনের** খণ্ডনে। এখানে গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে কথা বলার কোনো অবকাশ নেই। বিতর্ক যত তীক্ষ্ণ হবে, আক্রমণ যত তীব্র (কিন্তু অবশ্যই বিজ্ঞানভিত্তিক) হবে, বিবাদিত বিষয়গুলি ততই স্পষ্ট আকারে সামনে আসতে বাধ্য হবে। তা সত্ত্বেও যদি কারো মন বিরক্ত হয়ে ওঠে এবং কারো বিচারবুদ্ধি ঘোলা হয়ে যায়, তবে দোষটা প্রধানত দিতে হবে তার মন এবং বিচারবুদ্ধিকেই, বিতর্কের তীব্রতাকে নয়। এমন কি যদি আমাদের কর্মীসাধারণের মধ্যে এই ধরনের মন ও বিচারবুদ্ধিরই প্রাধান্য থেকে থাকে তবু এ কথা সত্য। কারো

১ [ভারতের মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের মধ্যেও অবশেষে জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্যের বিষাক্ত তত্ত্ব খোলাখুলি বা ছদ্মবেশে যে পরিমাণ প্রসারলাভ করেছে তাতে এ কথাটা আজ আর খাটে না।]

মোটামুটি সঠিক অবস্থান থাকা সত্ত্বেও নিছক তাঁর বিতর্কের ঝাঁঝাল ভঙ্গীর জন্যই যদি তাঁর বক্তব্যগুলি কর্মীদের কাছে অপ্রিয় ও অগ্রহণীয় হয়ে থাকে তবে সেটা আমাদের কর্মীসাধারণের শোচনীয় পশ্চাৎপদতারই অভ্রান্ত নিদর্শন। আমাদের কর্তব্য এই পশ্চাৎপদতার তোয়াজ করা নয়, বরং জোয়ারের বিরুদ্ধে যাওয়া এবং এই ধরনের "মন ও বিচারবুদ্ধি"কে যথাসম্ভব বিতর্কের ঝড়ঝাপটার সামনে ফেলা। এর মধ্য থেকে যাঁদের মন ও বিচারবুদ্ধি মজবুত হয়ে বেরিয়ে আসবে তাঁরাই হবেন বিপ্লবের অগ্রনায়ক, বাকীরা নন। এক্ষেত্রে কর্মীদের মেজাজ প্রতিফলিত করার দাবী তোলার অর্থ সবচেয়ে পশ্চাৎপদ চেতনার লেজুড়বৃত্তি করা। কর্মীদের মধ্যেকার পশ্চাৎপদ চেতনাকে আমাদের তত্ত্বগত রচনায় প্রতিফলিত না ক'রে আমাদের তত্ত্বগত রচনার অগ্রসর চেতনাকেই বরং কর্মীদের মধ্যে "প্রতিফলিত" করার জন্য আমাদের সচেষ্ট হতে হবে।

ভুল লাইনের অনুশীলনকারীদের মধ্যে চিরকালই দুটো ভাগ থাকে। একদিকে থাকে মুষ্টিমেয় সচেতন প্রবক্তারা, আরেকদিকে থাকে বিভ্রান্ত ব্যাপক অনুসারীরা। কিন্তু ভুল লাইনের বিরুদ্ধে আমাদের আক্রমণের ধার ভোঁতা ক'রে দেওয়ার সপক্ষে এই সর্বজনবিদিত সত্যটা কখনও একটা যুক্তি হিসাবে গ্রাহ্য হতে পারে কি? বিভ্রান্ত কর্মীসাধারণের প্রতি যে যত মমতাবান, তাদের "রোগ"এর ব্যাপারে যে যত উৎকণ্ঠিত, ভুল লাইনের উপর আক্রমণে সে হবে তত তীব্র ও তত নির্মম, এই রোগের বাহক যে মুষ্টিমেয় মূল প্রবক্তারা তাদের প্রতি সে হবে তত প্রচণ্ড। একটা ভুল লাইনের উপর যখন আক্রমণ হানা হয় তখন তার লক্ষ্যবস্তু সব সময়েই হয় সে লাইনের মূল পাণ্ডারাই। তবু এটাকে কেন্দ্র ক'রে বিভ্রান্ত কর্মীদের মধ্যে নানা ধরনের 'সেন্টিমেন্ট' প্রসারলাভ করতে পারে। কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে এসব সেন্টিমেন্টের মোকাবেলা ক'রেই আমাদের এগোতে হবে, তার কাছে নতিস্বীকার ক'রে নয়—এমন কি সাময়িকভাবেও নয়। আমাদের উপমহাদেশে আগাগোড়া কখনোই মার্কসবাদী বিতর্কের যথাযথ বিকাশ ঘটেনি, বিতর্কের ক্ষেত্রে "মৃদুতা"র ওকালতি ক'রেই চিরটাকাল মতাদর্শগত সংগ্রামের সর্বনাশ করা হয়েছে [ফলত এর পরিপূরক "তীব্র" উপাদান হিসাবে যা দেখা যায় তা নির্ভেজাল চরিত্রহনন ও লিখিত কোন্দল মাত্র]। পার্টিগঠন ও সংগ্রাম গ'ড়ে তোলার ব্যাপারে আমাদের অনেক দীর্ঘস্থায়ী ব্যর্থতার মূল নিহিত রয়েছে এইখানে। তাত্ত্বিক সংগ্রামে এই ধরনের পেটি-বুর্জোয়া ভদ্রতার [ও ইতরতার] চক্রান্তজালকে সরাসরি ছিন্ন ক'রে যদি আমরা আজ অগ্রসর হতে না পারি তবে সর্বহারার প্রকৃত পার্টি গড়া ও বিপ্লব সফল করার সব আশা এখনই জলাঞ্জলি দিয়ে দেওয়া ভালো।

জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্যের মূল প্রবক্তারা যে অস্বস্তিকর প্রশ্নগুলি এড়িয়ে যাচ্ছেন এবং এই ধরনের এড়িয়ে যাওয়া যে কোনোমতেই অনিচ্ছাকৃত হতে

পারে না তা আমার বইয়ে মোটেই আভাসিত নয়, বরং প্রমাণিত। উপরন্তু তাতে এটাও প্রমাণিত যে বিভিন্ন দেশের জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকদের মধ্যে যুক্তিসঙ্গতি ও বৈজ্ঞানিক সততার অভাবের এক আশ্চর্য মিল বর্তমান। বদ্ধ উন্মাদও এই মিলকে নিছক আকস্মিক ব'লে স্বীকার করতে রাজী হবে না।

জাতীয় দ্বন্দ্বের ব্যাপক সাধারণ অনুসারীরা যে জেনেশুনে অসততা করছেন না এটা মোটেও কোনো নতুন কথা নয়। কিন্তু এই বিশেষ ভুল লাইনটির বৈশিষ্ট্য হল এই যে এর মূল প্রবক্তাদের চিন্তা ও বক্তব্য এক অস্বাভাবিক ধরনের অসততায় কলঙ্কিত। বুর্জোয়া পণ্ডিত ও গবেষকদের মধ্যেও যে ন্যূনতম অ্যাকাডেমিক সততা আজও দেখা যায়, এই মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের মধ্যে তারও শোচনীয় অভাব। আর সবচেয়ে ভয়ংকর কথা হচ্ছে এই যে তাঁরা তাঁদের অনভিজ্ঞ ও আন্তরিক (কিন্তু বিভ্রান্ত) অনুসারীদের এই অসততায় অভ্যস্ত ও সংক্রামিত ক'রে তুলছেন। এই বৈশিষ্ট্যটার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ না ক'রে এবং তার প্রতি "মারমুখী" না হয়ে জাতীয় দ্বন্দ্বের ভ্রান্ত তত্ত্বের কোনো খণ্ডনই সঠিক ও সম্পূর্ণ হতে পারে না ব'লে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

তবু সম্পাদকের বক্তব্য আমি বিবেচনা করতে পারতাম যদি তিনি অভিযোগ করতেন যে আমার আক্রমণের তীব্রতাটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিকে আশ্রয় ক'রে দাঁড়ায়নি এবং তার ফলে তা হয়ে দাঁড়িয়েছে নিছক ঝগড়ার খাতিরে ঝগড়া। কিন্তু তা-ও তিনি বলেননি।

এইসব কারণেই সম্পাদকের সমালোচনা আমি গ্রহণ করতে পারছি না। আক্রমণের তীব্রতা কমানোর উদ্দেশ্যে তিনি বইটির [প্রথম খণ্ডের] পাঠে যে ধরনের পরিবর্তন করেছেন ব'লে জানিয়েছেন তা যদিও খুবই সামান্য এবং নিঃসন্দেহে তাঁর অধিকারভুক্ত, তবু সেটুকু পরিবর্তনের যৌক্তিকতাকেও আমি স্বীকার ক'রে নিতে পারলাম না। [আর তাই বর্তমান সংস্করণটি তৈরী করার সময় আমি আমার প্রেরিত মূল পাণ্ডুলিপির উপরেই নির্ভর করেছি।]

২.

সম্পাদক লিখছেন:

"আপনি আমাদের প্রতিপক্ষীয়দের **সবচেয়ে শক্তিশালী** যুক্তিটি অনুমান করতে পারেননি। উপমহাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী (ভারতে জরুরী অবস্থা ঘোষণা, বাংলাদেশে ১৫ আগস্টের কু দে'তা, ইত্যাদি) যুক্তিটাকে যথেষ্ট বিশ্বাস্য ক'রে তুলেছে। যুক্তিটা হল এই যে আধা-উপনিবেশে রাষ্ট্রক্ষমতা থাকে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ এবং আমলা-মুৎসুদ্দি পুঁজিবাদের এক **জোটের** দখলে। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদীরা (তাদের পুতুলদের মাধ্যমে) এবং দেশীয় প্রতি-

ক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলি **উভয়েই** এইসব দেশে ক্ষমতাসীন। এই চিন্তাধারা ভারতে ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে। যে অবস্থার মধ্যে আপনাকে বইটা লিখতে হয়েছে, হয়তো তারই দরুণ এই যুক্তিটা আপনি অনুমান করতে পারেননি। তবু আপনাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে জিজ্ঞাসা করতে চাই, এ যুক্তিটা অ ন্দাজ করতে আপনি ব্যর্থই বা হলেন কেমন ক'রে?"

তারপর তিনি জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকদের এই যুক্তিটার বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন:

"সাম্রাজ্যবাদ তার পুতুলদের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতার একাংশ অধিকার ক'রে আছে। একদিকে আছে সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের পুতুল সি পি আই নেতৃত্ব (কেরলে অচ্যুত মেনন মন্ত্রীসভা), অন্যদিকে আছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পুতুল সংগঠন-কংগ্রেস ও বি কে ডি নেতৃত্ব (গুজরাট ইত্যাদির মন্ত্রীসভা)। অসংখ্য ঘটনা প্রমাণ করে যে ১৯৪৭ সালের পর সাম্রাজ্যবাদ তার রাজনৈতিক ক্ষমতার একাংশমাত্র দেশীয় শ্রেণীগুলির নিকট হস্তান্তরিত করেছে, সবটুকু নয়। তার মানে দেশীয় শ্রেণীগুলি সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে (অর্থাৎ তার পুতুলদের সঙ্গে) ক্ষমতা ভাগাভাগি ক'রে রয়েছে। বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির (বিশেষত দুই অতিশক্তির) পুতুলরা রাষ্ট্রক্ষমতার আরো বেশী বেশী অংশের জন্য নিজেদের মধ্যে লড়াই করে, এবং কখনও এই পুতুলগোষ্ঠী কখনও ঐ পুতুলগোষ্ঠী দেশীয় শাসকশ্রেণীগুলিকে নিজেদের দিকে জয় ক'রে আনে ও তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীকে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে হঠিয়ে দেয়। '৭১ সালে পাকিস্তানের উপর আগ্রাসন এবং সাম্প্রতিক জরুরী ব্যবস্থাবলীর দ্বারা ভারতে তা পর্যাপ্তরূপে প্রমাণিত হয়েছে: সোভিয়েতের পুতুলরা দেশীয় মুৎসুদ্দিদের নিজেদের পক্ষে জমায়েত ক'রে প্রাধান্যে এসেছে এবং সাময়িকভাবে মার্কিনের পুতুলদের উৎখাত করেছে। আজ তাই প্রধান দ্বন্দ্ব সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ (অর্থাৎ তার পুতুলগোষ্ঠী) ও দেশীয় শাসকশ্রেণীগুলির **ফ্যাসীবাদী অংশের** (অর্থাৎ ইন্দিরা চক্রের) জোটের সঙ্গে[২]। মার্কিনের পুতুলগোষ্ঠী এবং দেশীয় শাসকশ্রেণীগুলির ফ্যাসীবিরোধী অংশ বর্তমানে আমাদের সম্ভাব্য মিত্র এবং মার্কিন-বিরোধী স্লোগান আমাদের আপাতত মুলতবী রাখাই উচিত। যেসব দেশী ও বিদেশী শক্তি ভারতীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের সমর্থক এবং সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের কাছে দেশকে বিকিয়ে দেওয়ার বিরোধী, তাদের সকলের সমর্থন আমাদের অন্বেষণ করা উচিত। দূরতম গ্রামা-

২ [এই অদ্ভুত প্রধান দ্বন্দ্বের প্রবক্তারা যে আসলে জাতীয় দ্বন্দ্বেরই ছদ্মবেশী প্রাধান্য-ঘোষক তা একটু পরেই পরিষ্কার হবে। প্রথমে এঁরা ভীরুভাবে এহেন প্রধান দ্বন্দ্বকে এই ভারতেরই নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ব'লে শুরু করেছিলেন, কিন্তু বর্তমানে এটাকে তাঁরা সব আধা-উপনিবেশের জন্যই সাধারণ নিয়মরূপে বেঁধে দিয়েছেন।]

ঞ্চলের ন্যূনতম রাজনীতি-সচেতন ব্যক্তিটিও আজ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ভারতের উপর রাশিয়ার কব্জার বিষয় বুঝতে পারে। তাই আমাদের দুটো বড় স্লোগান থাকতে হবে : 'লাঙল যার জমি তার' এবং 'সোভিয়েত (কিংবা, অন্য সময়, মার্কিন) আধিপত্যের শৃঙ্খল ঝেড়ে ফেল'। আমাদের বিপ্লবের নাম 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব'এর পরিবর্তে হওয়া উচিত 'জাতীয় জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব'। জাতীয় কর্তব্যাবলী এবং সামন্তবাদবিরোধী কর্তব্যাবলী সর্বদাই অন্তঃসম্পর্কিত (মাও দ্রষ্টব্য), কিন্তু ভারতের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে এখানে ঐ দুই সারি কর্তব্য চীনের চেয়েও আরো বেশী ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অতএব সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লব এবং সামন্তবাদবিরোধী বিপ্লবের মধ্যে কোনো অলঙ্ঘনীয় সীমারেখা নেই, দুটোকেই যুগপৎ একত্রে চলতে হবে। বিভিন্ন পর্যায়ে একটি বড় স্লোগানের গুরুত্ব অবশ্যই অন্যটির চেয়ে বেশী হতে পারে (যেমন এখন 'সাম্রাজ্য-বাদী শৃঙ্খল ঝেড়ে ফেল' স্লোগানের চেয়ে 'লাঙল যার জমি তার' স্লোগানটিই বেশী গুরুত্বপূর্ণ), কিন্তু গৃহযুদ্ধের কাঠামোর মধ্যেই এমন একটা পর্যায় দেখা দিতে পারে যখন 'লাঙল যার জমি তার'এর চেয়ে 'সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খল ঝেড়ে ফেল' বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।"

সম্পাদকের চিঠির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই অংশটির আলোচনাই আমি প্রথমে করব।

৩.

বইটা লেখার সময় জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকদের দলিলপত্র আমি প্রয়োজনীয় পরিমাণে পাইনি। তাই অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের বিভিন্ন যুক্তি আমাকে নানা সূত্র ও ইঙ্গিত অবলম্বন ক'রে **নিজে তৈরী ক'রে নিয়ে** তারপর সেগুলো খণ্ডন করতে হয়েছে। যে সামান্য পরিমাণ রাজনৈতিক দলিলপত্র পেয়েছিলাম তাতে তাঁদের এই "সবচেয়ে শক্তিশালী" যুক্তিটার নাম-গন্ধও পাইনি। অবশ্য তা সত্ত্বেও এর একটা অস্পষ্ট ছায়াপাত যে আমার মনে হয়নি তা নয়। কিন্তু প্রত্যক্ষ দলিলগত প্রমাণ ছাড়া এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ যুক্তির দায়িত্ব প্রতিপক্ষের উপর চাপিয়ে দেওয়ার ঝুঁকি আমি তখন নিতে চাইনি। কেননা আমি জানতাম যে, যে সীমাবদ্ধ সুযোগসুবিধার মধ্যে আমাকে কাজ করতে হচ্ছিল তাতে প্রতিপক্ষের সব যুক্তি নিঃশেষিত করার আশা আমি করতে পারি না; কিছু না কিছু যুক্তি বাদ পড়বেই এবং সেগুলোর খণ্ডন ভবিষ্যতের জন্য মুলতবী রাখা ছাড়া আপাতত কোনো উপায় নেই। অবশ্য এ আশাও ছিল যে আমার চেয়ে অনুকূলতর অবস্থায় কর্মরত কোনো মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হয়তো তার আগেই সে অসম্পূর্ণ কাজটা সম্পন্ন করতে পারবেন।

যা হোক, সম্পাদকের চিঠিতে অন্তত এ আশ্বাসটুকু পেয়েছি যে আমার অবস্থার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রবক্তাদের প্রধান যুক্তিগুলির মধ্যে খুব বেশী আমার বিবেচনা থেকে বাদ পড়েনি এবং এখানে আলোচ্য যুক্তিটিকে খণ্ডন করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের ভ্রান্ত তত্ত্বের সবকটি মূল স্তম্ভই সম্ভবত ধ্ব'সে পড়বে।

মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে একটা বিষয় তুলে ধরতে চাই। জাতীয় দ্বন্দ্বের পুরোহিতদের আমি যে তত্ত্বগত অসততার দায়ে বারংবার অভিযুক্ত করেছি সেই একই পাপে তাঁদের আলোচ্য যুক্তিটিও কলঙ্কিত। তাঁদের বর্তমান তত্ত্বের মূল ভিত্তি হল এই আদিপ্রতিজ্ঞা যে আধা-উপনিবেশে রাষ্ট্রক্ষমতা থাকে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ এবং আমলা-মুৎসুদ্দি পুঁজিবাদের এক জোটের দখলে। কিন্তু লক্ষ্য ক'রে দেখুন, তাঁরা তাঁদের এই আদিপ্রতিজ্ঞার সমর্থনে তেমন কোনো যুক্তি বা তথ্যই হাজির করছেন না। সেক্ষেত্রে আমরা (বা অন্য যে কেউ) তাঁদের এই আদিপ্রতিজ্ঞাটিকে স্বীকার করব কেন[৩]? ওটা কি স্বতঃ-প্রমাণিত বা স্বতঃসিদ্ধ সত্য নাকি? আশা করি তাঁরা নিজেরাও তেমন আবদার করার মতো মূর্খতা দেখাবেন না। তাহলে এমন নিশ্চিন্ত, গম্ভীর ও নির্বিকারভাবে বিনা প্রমাণে তাঁরা তাঁদের বক্তব্য হাজির করছেন কোন সাহসে? আসলে কর্মীসাধারণের বৈজ্ঞানিক সজাগতার অভাবের উপর ভরসাটা তাঁদের এত বেশী যে তাঁদের স্থির বিশ্বাস ছিল তাঁরা এর সুযোগ নিতে পারবেন এবং এই ব্যাপারে কোনো দিক থেকে কোনো চ্যালেঞ্জেই তাঁদের বিব্রত হতে হবে না। এই তো তাঁদের বক্তব্য উত্থাপনের পদ্ধতি।

কিন্তু তাঁদের তত্ত্বগত অসততার এখানেই শেষ নয়। আধা-উপনিবেশের রাষ্ট্রক্ষমতা-সংক্রান্ত তাঁদের প্রতিজ্ঞাটিকে তাঁরা এমনভাবে হাজির করেছেন যে তাতে যে কোনো অনভিজ্ঞ পাঠকের ধারণা হবে: হয় মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তত্ত্বভাণ্ডারে ইতিপূর্বে এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তই হয়নি এবং এ বিষয়ে তাঁরাই প্রথম বিশ্লেষণে নামছেন, আর নাহয় তাঁদের এই প্রতিজ্ঞা এ বিষয়ে চিরাচরিত ও গতানুগতিক মার্কসীয় সিদ্ধান্তেরই অনুরূপ। কিন্তু আমরা জানি যে দুটোর কোনোটাই ঠিক নয়। মাও একাধিকবার বলেছেন যে আধা-উপনিবেশে রাষ্ট্র-ক্ষমতা থাকে কেবল আমলা-মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও জমিদারশ্রেণীর যৌথ দখলে। মাওয়ের যে কোনো কথাকে গুরুবাক্যের মতো নিঃশর্তভাবে আঁকড়ে থাকার

৩ [তারা হয়তো জবাব দেবেন যে আদিপ্রতিজ্ঞাটি একটি অনুমিতি (assumption) বা প্রকল্প (hypothesis) মাত্র—যা ছাড়া কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বই গঠিত হতে পারে না। কিন্তু একটা প্রকল্প গ্রাহ্য হতে পারে তখনই যখন ঐ প্রকল্প থেকে উপপাদিত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তব জগতের ঘটনাবলীর সঙ্গে সবচেয়ে ভালোভাবে মিলে যায়। আমরা একটু পরেই দেখাব যে আলোচ্য প্রকল্পটি ঠিক এই দাবী মেটাতেই অক্ষম।]

গোঁড়ামিবাদী ইচ্ছা আমাদের বিন্দুমাত্রও নেই। কিন্তু তাঁর এই মূল্যায়ন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মহলে একটা প্রতিষ্ঠিত বক্তব্য এবং অন্তত আপাত-দৃষ্টিতে একটা সফল বিপ্লবের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কাজেই কেউ যদি একই বিষয়ে এর থেকে ভিন্ন কোনো বক্তব্য হাজির করতে চান, এবং দৈবদুর্ঘটনাক্রমে সে ব্যক্তি যদি ঈষৎ সৎ হন, তাহলে তিনি কি করবেন? এ বিষয়ে মাওয়ের যে একটি বক্তব্য আছে এবং তাকে যে আজ পর্যন্ত কোনো মহল থেকে কেউ চ্যালেঞ্জ করেনি সে সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্য না ক'রেই কি তিনি নিজের বক্তব্যটাকে অম্লানবদনে হাজির ক'রে বসবেন, এবং তা-ও বিনা প্রমাণে? কদাপি নয়। তিনি অবশ্যই অসংকোচে ও নির্ভয়ে মাওয়ের তত্ত্বটির উল্লেখ করবেন, পূর্ণ সততা ও স্পষ্টতার সঙ্গে তার ভুল, অসম্পূর্ণতা বা অন্তত বর্তমান যুগে তার অনুপযোগিতা বিশ্লেষণ করবেন এবং একই সঙ্গে তাঁর নিজের ধারণাটিরও যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত করবেন। জাতীয় দ্বন্দ্বের মূল প্রবক্তারা ঐ পথে পা-ই বাড়াননি। সত্যসন্ধানের প্রতি, বিজ্ঞানের প্রতি, মার্কসবাদের প্রতি, বিপ্লবের প্রতি এবং সাধারণভাবে বিপ্লবী কর্মীদের প্রতি তাঁদের দায়িত্ব-বোধ যে কত দুর্বল, কত কপট, তা কি এতেই প্রমাণিত হয়ে যায় না? এমন কি নিজের ও নিজের বিশ্বাসটুকুর প্রতিও যদি সামান্যতম শ্রদ্ধা থাকে তাহলেও তো মানুষ এমন চোরাপথে নিজের পছন্দসই বক্তব্য চালান করতে ঘৃণাবোধ না ক'রে পারে না [প্রথম খণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়, ১নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য]।

জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষণার প্রধান পুরোহিতদের দ্বারা যে ব্যাপক সৎ কর্মীসাধারণ বিভ্রান্ত হচ্ছেন, তাঁদের প্রতি আমার আরেকবার আবেদন: আপনাদের শ্রদ্ধেয় নেতৃবৃন্দের এই ন্যক্কারজনক অসততার স্বরূপ উপলব্ধি করুন। মানুষমাত্রেরই ভুল হয়, তাই কারো পক্ষে হঠাৎ কোনো ভুল লাইনের জন্ম দেওয়া বা তার অনুসারী হয়ে পড়া খুব অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু যে নেতাদের ভ্রান্ত চিন্তার ভিত্তিই হচ্ছে দুর্নিবার অসততা তারা কি কখনোই আমাদের আনুগত্যলাভের যোগ্য হতে পারে?

আর জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রধান প্রবক্তাদের অসৎ ব'লে আখ্যায়িত করতে যাঁরা কুণ্ঠিত হচ্ছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে আমার বক্তব্য একটাই। যদি ধরা হয় যে আধা-উপনিবেশের রাষ্ট্রক্ষমতা সম্বন্ধে মাওয়ের তত্ত্বটিকে আমাদের প্রতিপক্ষ জেনেশুনে চেপে গেছেন তাহলে তাঁদের অসৎ ব'লে চিহ্নিত না করার কোনো উপায় থাকে না; আর যদি তাঁদের যে কোনো উপায়ে সৎ প্রতিপন্ন করতেই হয় তাহলে ধ'রে নিতে হয় যে আধা-উপনিবেশের রাষ্ট্রক্ষমতা সম্বন্ধে নিতান্ত প্রাথমিক মার্কসীয় সিদ্ধান্তটুকুও তাঁরা জানেন না। অর্থাৎ অসততার অভিযোগ থেকে তাঁদের বাঁচানোর একমাত্র উপায় তাঁদের উপর মূর্খতার অপবাদ চাপিয়ে দেওয়া। কিন্তু তা আমরা চাইনি, কারণ সেক্ষেত্রে তাঁদের বক্তব্য তো কোনো

গুরুতর আলোচনারই দাবী রাখতে পারে না ; তাছাড়া যাঁরা এমন গুরুগম্ভীর তত্ত্বগর্ভ বক্তব্য রাখতে পারছেন তাঁদের সম্বন্ধে এমন নিরেট মূর্খতার অপবাদ ভিত্তিহীন ও মনগড়া হতে বাধ্য।

৪.

এবার তাঁদের যুক্তির বিষয়বস্তুর পরীক্ষায় মনোনিবেশ করতে হয়। আগেই বলেছি যে তাঁরা তাঁদের আদিপ্রতিজ্ঞাটির সমর্থনে তেমন কোনো যুক্তি বা তথ্যই হাজির করতে পারেননি। কিন্তু তাই ব'লে অতীব খোঁড়া একটি যুক্তির আভাসমাত্রও নেই, তা নয়। আধা-ঔপনিবেশিক ভারতের রাষ্ট্রক্ষমতায় সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের শরিকানার প্রমাণ হিসাবে তাঁরা দুয়েকটি প্রদেশে সোভিয়েতের দালাল সি পি আই মন্ত্রীসভা এবং মার্কিনের দালাল সংগঠন-কংগ্রেস ও বি কে ডি মন্ত্রীসভার দৃষ্টান্ত হাজির করেছেন। [তাঁদের বক্তব্যের অন্তর্নিহিত যুক্তি-কাঠামোটা নিশ্চয় এই : উক্ত প্রদেশগুলির মন্ত্রীসভা পুরোপুরি মার্কিন ও সোভিয়েতের এজেন্টদের দ্বারা গঠিত ; তাই ঐ প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাগুলি "পুতুল মন্ত্রীসভা" ; তাই ঐ প্রাদেশিক সরকারগুলি "পুতুল সরকার", এবং কোনো প্রদেশে মার্কিন ও কোনো প্রদেশে সোভিয়েত "নয়া-ঔপনিবেশিক" রাষ্ট্রক্ষমতা বিদ্যমান, যেহেতু প্রদেশগুলি ভারতবর্ষের অংশ তাই এর অর্থ, ভারতের রাষ্ট্রক্ষমতাতেও মার্কিন ও সোভিয়েতের অংশীদারি রয়েছে।]

কিন্তু তাঁদের এই অভিনব আবিষ্কারটিকে কোনো মার্কসবাদীই মেনে নিতে পারবেন না তিনটি অত্যন্ত সহজ কারণে :

(ক) একটা মন্ত্রীসভা যদি পুরোপুরিই সাম্রাজ্যবাদের ভাড়াটে এজেন্টদের দ্বারা গঠিত হয় তবু সেই মন্ত্রীসভাটা "পুতুল মন্ত্রীসভা" না-ও হতে পারে! সাম্রাজ্যবাদের টাকা-খাওয়া পেশাদার রাজনীতিবিদদের সঙ্গে রাষ্ট্রক্ষমতার সম্পর্কটা যখন একটু পরেই আমরা বিচার করতে বসব তখনই এই আপাত-অদ্ভুত কথাটির সত্যতা প্রমাণিত হয়ে যাবে।

(খ) পুরোপুরিভাবে সাম্রাজ্যবাদের এজেন্টদের দ্বারা গঠিত একটা মন্ত্রীসভাকে যদি তর্কের খাতিরে "পুতুল মন্ত্রীসভা" ব'লে মেনেও নিই তবু রাষ্ট্রটা সঙ্গে সঙ্গেই নয়া-ঔপনিবেশিক হয়ে যায় না। এটার কারণ এখানেই ব'লে দেওয়া যায়। মন্ত্রীসভা মোটেই রাষ্ট্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান নয়—রাষ্ট্রের প্রধান উপাদান হচ্ছে তার সশস্ত্র শক্তি ও আমলাতন্ত্র। অতএব রাষ্ট্রক্ষমতাটার অন্তর্বস্তু যখন হয় ঔপনিবেশিক, অর্থাৎ বিদেশী বুর্জোয়ার একনায়কত্ব, তখন তাকে আড়াল করার জন্য কিছু ভাড়া-করা দেশী এজেন্টদের দ্বারা

সরকার গঠন করলে সে সরকারকে বলা হয় 'পুতুল সরকার'; আর রাষ্ট্র-ক্ষমতার অন্তর্বস্তু যখন হয় আধা-ঔপনিবেশিক, অর্থাৎ আমলা-মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও জমিদারশ্রেণীর একনায়কত্ব, তখন সাম্রাজ্যবাদ সে রাষ্ট্রকে যথাসম্ভব নিজের অনুকূলে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে যদি নিজের এজেণ্টদের অনুপ্রবেশ করায়, এমন কি পুরোপুরিভাবে নিজের এজেণ্টদের দিয়ে মন্ত্রীসভা গঠন করাতেও সমর্থ হয়, তবু সে সরকার 'পুতুল সরকার' হবে না, হবে আধা-ঔপনিবেশিক সরকার—রাষ্ট্রক্ষমতাও নয়া-ঔপনিবেশিক হয়ে যাবে না, আধা-ঔপনিবেশিকই থাকবে। মোট কথা, রাষ্ট্রের চরিত্রই সরকারের চরিত্র নির্ধারণ করে, উল্টোটা নয়।

(গ) এমন কি সাম্রাজ্যবাদের এজেণ্টদের দ্বারা কোনো প্রদেশে মন্ত্রীসভা গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যদি সেই প্রাদেশিক পর্যায়ের "রাষ্ট্রক্ষমতা"কে তৎক্ষণাৎ সাম্রাজ্যবাদের কুক্ষিগত ব'লে ধ'রেও নিই, তবু মনে রাখতে হবে যে একটা দেশের **সামগ্রিক, সর্বোচ্চ** ও **কেন্দ্রীয়** ক্ষমতার চরিত্র দিয়েই আমরা সেই দেশের রাষ্ট্রচরিত্র নির্ধারণ করি—তার একটা-দুটো ক্ষুদ্র অংশ বা প্রদেশে কি হল, কিংবা রাজনৈতিক ক্ষমতার নিম্নতর স্তরগুলিতে কি হল, তা দিয়ে নয়। আধা-ঔপনিবেশিক চীনে সাম্রাজ্যবাদীরা বিভিন্ন বন্দরে ঔপনিবেশিক শাসন চালাত, কিন্তু তা সত্ত্বেও মাও চীনের সামগ্রিক রাষ্ট্রকাঠামোতে সাম্রাজ্যবাদীদের অংশীদারি মেনে নেননি। আবার ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের সাতটি প্রদেশে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে ১৯৩৫ সালের সংবিধান অনুযায়ী কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছিল। যদিও এটা ছিল ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক অবস্থা থেকে আধা-ঔপনিবেশিক অবস্থার দিকে ক্রমবিবর্তনেরই একটা পর্যায়, তবু আজ পর্যন্ত কেউ এমন দাবী তোলেননি যে তার ফলে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের একনায়কত্বের স্থলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় শ্রেণীসমূহের মিলিত একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আজ যদি আমাদের প্রতিপক্ষ তেমন দাবী তুলে বসেন তাহলে তাঁদের নিজেদেরই সংজ্ঞা অনুযায়ী তাঁদের বলতে হবে যে ১৯৪৭ সালের বহু পূর্বেই ঔপনিবেশিক ভারত আধা-ঔপনিবেশিক ভারতে রূপান্তরিত হয়েছিল! এই উদ্ভট কথাটি আগে তাঁরা উচ্চারণ করুন, তারপর দেখা যাবে তাঁরা কোথায় দাঁড়ান।

এবার হয়তো আমাদের প্রতিপক্ষীয়রা গুজরাট-কেরলের যুক্তিটাকে প্রত্যাহার ক'রে নিয়ে বলবেন যে তাঁরা যখন দাবী করেন ১৯৪৭ সালের পর থেকে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতা সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় শাসকশ্রেণীগুলির যৌথ অধিকারে তখন তাঁরা ভারতবর্ষের "সামগ্রিক, সর্বোচ্চ ও কেন্দ্রীয়" ক্ষমতার কথাই বোঝাতে চান (এবং গুজরাট-কেরলের ঘটনাগুলিকে দেখান এই দেশ-ব্যাপী ক্ষমতা ভাগাভাগিরই একটা স্থানীয় অভিব্যক্তি হিসাবে)।

ভালো কথা। এবার তাহলে আমাদের প্রথম বিচার্য বিষয় হচ্ছে : কোন্ অবস্থায় আমরা বলতে পারি যে একটা দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক ক্ষমতা **একাধিক** শ্রেণীর যৌথ অধিকারে রয়েছে? প্রশ্নটাকে একটা মূর্ত দৃষ্টান্ত থেকে বিচার করতে শুরু করলে সুবিধা হবে। কোন যুক্তিতে আমরা বলি যে আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্তবাদী দেশে আমলা-মুৎসুদ্দি বৃহৎ বুর্জোয়া ও সামন্তশ্রেণী **উভয়েই** রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদার?

সাধারণভাবে বলা যায় যে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে প্রভুত্বকারী শ্রেণী সমাজের অপর সকল ক্ষেত্রেও অনিবার্যভাবে প্রভুত্ব অর্জন করে এবং রাষ্ট্রক্ষমতাটাও থাকে তারই হাতে। সাদামাটা কথায় বলা চলে যে একটা নির্দিষ্ট সমাজে যে শ্রেণীর স্বার্থ উত্তরোত্তর সেবিত হতে থাকে, রাষ্ট্রক্ষমতাটাও থাকে তারই হাতে। কিন্তু আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্তবাদী সমাজের অর্থনৈতিক জীবনে পুঁজিবাদী ও আধা-সামন্তবাদী এই দু-ধরনের উৎপাদনসম্পর্কেরই উপাদান বিদ্যমান এবং এই দ্বিত্ব বর্তমান প্রক্রিয়ার মধ্যে কোনোদিনই বিলুপ্ত হবে না। পুঁজিবাদী উপাদানটির ক্ষেত্রে প্রভুত্ব করছে বুর্জোয়াশ্রেণীর মাত্র একটি অংশ, তার বৃহৎ আমলা-মুৎসুদ্দি অংশ। এরাই ক্রমাগত ফুলে-ফেঁপে লাল হচ্ছে, আর জনগণের অন্যান্য অংশ তো বটেই, এমন কি বুর্জোয়াশ্রেণীর মাঝারি "জাতীয়" অংশটাও অবিরাম তলিয়ে যাচ্ছে। কাজেই রাজনৈতিক ক্ষমতায় রয়েছে বুর্জোয়াশ্রেণীর এই বৃহৎ আমলা-মুৎসুদ্দি অংশটাই—জাতীয় বুর্জোয়ারা নয়, জনগণের অন্যান্য অংশের তো কথাই ওঠে না। আর সামন্তবাদী উপাদানটির ক্ষেত্রে স্পষ্টই প্রভুত্ব করছে জমিদারশ্রেণী। আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্তবাদী সমাজে পুঁজিবাদের বিকাশপ্রক্রিয়াটাই এমন যে তার দ্বারা এই সামন্তবাদী উপাদানটির পূর্ণ বিলোপ-সাধন অসম্ভব, কিন্তু বিশ্ব-পুঁজিবাদের এই অতিবিকশিত ও মরণোন্মুখ স্তরেও এটা সত্য হওয়ার অর্থ হল, এই সমাজে সামন্তবাদ তথা তার প্রতিভূ জমিদার-শ্রেণীও রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদার[৪]। এই উপমহাদেশের দেশগুলির জন্য অন্তত এটুকু সত্য যে সামন্তবাদী অবশেষ সেগুলিতে টিঁকে রয়েছে এক অস্বাভাবিক দীর্ঘ সময় জুড়ে, আর বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকেও এইরকম **টিঁকে-থাকার** মানেই হল বর্তমান সমাজকাঠামোর মধ্যে সামন্তশ্রেণীর স্বার্থও উত্তরোত্তর সেবিত হচ্ছে—অতএব রাষ্ট্রক্ষমতায় এই শ্রেণীরও অংশ রয়েছে। লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে এ দুটো শ্রেণীর একটারও প্রভুত্ব দেশের ভূখণ্ড বা সমাজজীবনের

৪ [আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্তবাদী দেশে কেন দুটো শ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী তার ব্যাখ্যা নিশ্চয় এভাবে করা যায় না যে অর্থনীতির ক্ষেত্রে তারা উভয়েই ঠিক সমপরিমাণ প্রাধান্য ভোগ করছে তার সুন্দর ব্যাখ্যা পাওয়া যায় প্রথম খণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ের বিশ্লেষণটি থেকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে উক্ত বিশ্লেষণটি আরো একটি সুপরিচিত মার্কসীয় সূত্রায়ণের সঙ্গেও সুন্দর-ভাবে খাপ খায়।]

একটা-ছুটোমাত্র অংশে সীমাবদ্ধ নয়—সমগ্র সমাজজীবনের উপরেই এদের নিয়ন্ত্রণ, প্রভুত্ব ও প্রভাব কার্যকরী রয়েছে, সেগুলো কার্যকরী রাখার জন্য তারা একে অপরের উপর নির্ভর করছে, একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করছে, এবং তা সাময়িক নয় বরং একটা স্থায়ী ভিত্তিতে।

সাম্রাজ্যবাদ কিন্তু আমাদের সমাজের অভ্যন্তরে পুঁজিবাদী উৎপাদনসম্পর্কের থেকে ভিন্ন কোনো উৎপাদনসম্পর্কের প্রতিনিধিত্ব করে না। তবে এই একটিমাত্র বিষয় বাদ দিলে উপরে বর্ণিত বাকী সব শর্তই সাম্রাজ্যবাদের বেলাতেও এত চমৎকারভাবে খাটে যে দেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় তার অংশীদারির দাবীকে প্রত্যাখ্যান করা আপাতদৃষ্টিতে সত্যই কঠিন। অন্য যে কোনো শ্রেণীর ক্ষেত্রে অবস্থাটা এই রকম দাঁড়ালে আমরাও হয়তো তাকে রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদার ব'লেই মেনে নিতাম। কিন্তু তাহলে সাম্রাজ্যবাদের বেলায় আমরা তা মানছি না কেন? তার কারণ, আমাদের মতে সাম্রাজ্যবাদের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এই প্রকল্প একেবারেই অচল [যেহেতু তা আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্তবাদী সমাজের বিভিন্ন বাস্তব বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পুরোপুরি অসংগতিপূর্ণ]। সেটা দেখানোর আগে সমস্যাটাকেই আরেকটি দিক থেকে বিচার করা যাক।

৫.

আধা-উপনিবেশের বিভিন্ন সমস্যা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মাও একাধিক বার বলেছেন যে এখানে সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় শাসকশ্রেণীগুলি জনগণকে "যৌথভাবে" শোষণ ও নিপীড়ন করে এবং যতক্ষণ আভ্যন্তরীণ তথা সামন্ত দ্বন্দ্ব প্রধান থাকে ততক্ষণ জনগণও তাদের সংগ্রাম চালায় সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় শাসকশ্রেণীগুলির জোটের বিরুদ্ধে। সবচেয়ে বড় কথা, তিনি বহুবার আধা-উপনিবেশে সাম্রাজ্যবাদের "শাসন" এবং "সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ, ও আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের শাসন"এর উল্লেখ করেছেন। এতে তো স্বাভাবিকভাবেই আশা হয় যে মাওই বুঝি সর্বাগ্রে আধা-উপনিবেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় সাম্রাজ্যবাদের অংশীদারি মেনে নেবেন। কিন্তু না! যতবারই সুনির্দিষ্টভাবে আধা-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রক্ষমতার শ্রেণী-চরিত্র বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়েছে ততবারই তিনি ব্যতিক্রমহীন ও সুস্পষ্টভাবে কেবল দেশীয় শ্রেণীদুটির উল্লেখ করেছেন এবং রাষ্ট্রক্ষমতায় সাম্রাজ্যবাদের অংশীদারি স্বীকার করেননি।

জাতীয় দ্বন্দ্বের সুপণ্ডিত ও সৎ প্রবক্তারা অত্যন্ত বোধগম্য কারণেই তাঁদের সমগ্র চোখধাঁধানো তত্ত্বটার পক্ষে অতি মারাত্মক এই ছোট্ট বিষয়টা লক্ষ্য করেননি এবং আন্তরিকতার সঙ্গে মাওয়ের এই আপাত-অসামঞ্জস্যের কারণ অনুসন্ধান করেননি; বরং নীরবে এটাকে পাশ কাটিয়ে নিজেদের পছন্দসই

একটা বক্তব্য আমাদের গছিয়ে দিতে চেয়েছেন। কিন্তু আমরা নিশ্চয়ই আধা-উপনিবেশ সম্বন্ধে মাওয়ের তত্ত্বের এই অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি এবং বলতে পারি : আধা-ঔপনিবেশিক দেশে সাম্রাজ্যবাদের বিপুল প্রভাব, প্রভুত্ব ও নিয়ন্ত্রণের কারণে মাও যখন তার উপর সাম্রাজ্যবাদের "শাসন" মেনে নিয়েও রাষ্ট্রক্ষমতায় তার অংশ স্বীকার করেননি এবং তাঁর এই সিদ্ধান্ত যেহেতু একটা বিরাট দেশের সফল বিপ্লবের তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছে তখন আমরাই বা কেন একই কারণে আমাদের দেশে সাম্রাজ্যবাদের "শাসন" মেনে নিয়েও রাষ্ট্রক্ষমতায় তার অংশীদারি অস্বীকার করতে পারব না? "নতুন যুগ," "নয়া-উপনিবেশবাদের যুগ," "ভারত আগে উপনিবেশ ছিল" ইত্যাদি কোনো অজুহাতই তো এক্ষেত্রে খাটবে না। কারণ **সেসব যা-ই হোক না কেন,** এখানে মূল বিচার্য বিষয় হল সমাজে সাম্রাজ্যবাদের **বর্তমানে-বিদ্যমান** আধিপত্যের মাত্রা; এবং এই মাত্রাটুকু দেশের বর্তমান রাষ্ট্রক্ষমতায় সাম্রাজ্যবাদের কোনো নির্দিষ্ট অংশের প্রমাণ বহন করে কিনা সেটাই প্রশ্ন। যেহেতু যে কোনো শ্রেণীর রাষ্ট্রক্ষমতাই সেই শ্রেণীর "ভাড়াটে এজেণ্ট"দের মারফৎ বাস্তবায়িত হয়ে থাকে তাই সাম্রাজ্যবাদের এই "আংশিক রাষ্ট্রক্ষমতা" তার নিজের দেশের "ভাড়াটে এজেণ্ট"দের মারফৎ কার্যকরী হবে নাকি আধা-উপনিবেশটি থেকেই সংগ্রহ করা "ভাড়াটে এজেণ্ট"দের মারফৎ, আধা-উপনিবেশটি গতকাল স্বাধীন ছিল নাকি উপনিবেশ, ইত্যাদি প্রশ্ন এক্ষেত্রে নিতান্তই অবান্তর।

কিন্তু আসলেই বা ব্যাপারটা কি? কি কারণে মাও আধা-উপনিবেশে সাম্রাজ্যবাদের "শাসন" মানছেন কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতায় তার অংশীদারি মানছেন না? "শাসন" আছে কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতা নেই এ কেমন অদ্ভুত কথা! আমরাই বা এই অদ্ভুত কথার সঙ্গে একমত হচ্ছি কেন?

বলা বাহুল্য এই প্রশ্নের সঠিক জবাবের মধ্যেই আমাদের সঙ্গে (**এবং মাওয়ের সঙ্গে**) জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রবক্তাদের মতপার্থক্যের হদিশ নিহিত রয়েছে। আমাদের সঙ্গে তাঁদের মতপার্থক্যটা তাঁরা বীরবিক্রমে দুনিয়াময় গেয়ে বেড়াতে পারেন কিন্তু মাওয়ের সঙ্গেও যে তাঁদের **একই বিষয়ে** মতবিরোধ রয়েছে সেটা তাঁরা ঠিক ঐভাবে সামনে আনতে চান না (বা চাইলেও হয়তো ঠিক এই মুহূর্তে নয়—তাঁরা যে অতি বিচক্ষণ লোক, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রণকৌশলে সুনিপুণ!)। তাই এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার প্রাথমিক দায়িত্বটা যদিও তাঁদেরই ছিল (কারণ তাঁরাই প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তের থেকে ভিন্ন এক সিদ্ধান্ত হাজির করছেন) তবু সে দায়িত্বের প্রতি পর্বতপ্রমাণ অবজ্ঞা পোষণ করার অধিকারও তাঁদের নিশ্চয়ই আছে। 'সততা', 'দায়িত্ববোধ' ইত্যাদির প্রতি দাসসুলভ মনোভাব নিয়ে দুনিয়ায় কে কবে ক'রে খেতে পেরেছে বলুন? কিন্তু আমরা যারা আজও অতটা

করিৎকর্মা হতে পারিনি (বেচারীরা "আধা-ঔপনিবেশিক সমাজের বুদ্ধিজীবী" তো, তাই নতুন তত্ত্বকে বড় ভয় পাই, কেবলই তথ্য আর প্রমাণের জন্য ঘ্যান ঘ্যান করি।), সেই আমাদেরই অগত্যা এগিয়ে যেতে হবে প্রতিপক্ষের দায়িত্বের বোঝাটা বোকার মতো হালকা ক'রে দেওয়ার জন্য। কারণ আমাদের যে একটা দায় রয়েছে। 'অমুকটা এই হবে' এমন ফতোয়া ঝেড়ে আমরা যেমন নিশ্চিন্ত হতে পারি না, ঠিক তেমনি 'মাও অমুকটা বলেছেন' এমন কথা ব'লেও পারি না খালাস হতে। মাওয়ের একটা আপাত-অসামঞ্জস্য যে আমাদের কাছে আসলে অসামঞ্জস্য ব'লে মনে হয় না, তারও একটা কারণ নির্দেশের আস্পর্ধা আমাদের মনের মধ্যে কেবলই চাগিয়ে উঠতে চায়।

আধা-উপনিবেশে সাম্রাজ্যবাদের শাসন রয়েছে কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতা নেই — মাওয়ের এই অদ্ভুত সিদ্ধান্ত যে আমাদের কাছে যুক্তির দিক থেকে অসঙ্গতিপূর্ণ ব'লে মনে হয় না তার কারণ খুবই সরল। তার কারণ মাওয়েরই একটি ছোট্ট কথা। যখনই তিনি আধা-উপনিবেশে সাম্রাজ্যবাদের শাসনের উল্লেখ করেন তখনই তিনি তার সঙ্গে "পরোক্ষ" কথাটি যোগ ক'রে দেন নতুবা সেটা উহ্য থাকে। আধা-উপনিবেশে সাম্রাজ্যবাদের শাসনটা তিনি পরোক্ষ মনে করেন ব'লেই একই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের শাসন স্বীকার করা এবং রাষ্ট্রক্ষমতায় তার অংশীদারি অস্বীকার করাটা তাঁর দিক থেকে আদৌ পরস্পরবিরোধী নয়। এইখানেই আমাদের প্রতিপক্ষ নিশ্চয় চেঁচিয়ে উঠবেন : "কিন্তু নয়া-উপনিবেশেও তো সাম্রাজ্যবাদের শাসন পরোক্ষ ; অতএব আপনাদের যুক্তি অনুযায়ী তো সেখানেও সাম্রাজ্যবাদের রাষ্ট্রক্ষমতা অস্বীকার করতে হয়।" ধীরে, বন্ধু, ধীরে ! দেশী বা বিদেশী প্রত্যেকটা শ্রেণীর শাসনই সেই শ্রেণীর ভাড়াটে এজেন্টদের মারফৎ কায়েম হয়। এটুকু "পরোক্ষতা" ব্যতিক্রমহীনভাবে সব শ্রেণীশাসনের ক্ষেত্রেই অপরিহার্য, 'শাসন' কথাটি উচ্চারণ করার মধ্যেই এটুকু পরোক্ষতা স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ক্ষেত্রে এই ভাড়াটে এজেন্টরা সাদা চামড়ার না কালো চামড়ার — অর্থাৎ সরকারটা ঔপনিবেশিক সরকার নাকি একটা নয়া-ঔপনিবেশিক পুতুল সরকাব — তাতে এই পরোক্ষতাব কোনো হেরফের হয় না। সুতরাং **উপনিবেশ বা নয়া-উপনিবেশ কোনোটাতেই সাম্রাজ্যবাদের শাসন মোটেও পরোক্ষ নয় বরং প্রত্যক্ষ**, এবং তার ফলে উভয়ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রক্ষমতাটা সাম্রাজ্যবাদের হাতেই থাকে। সব ধরনের শ্রেণীশাসনেই যেহেতু রাজনৈতিক এজেন্ট মারফৎ শাসন চালানোর অনিবার্য পরোক্ষতাটুকু অন্তর্নিহিত তাই কোনো এক বিশেষ ক্ষেত্রে (যেমন আধা-উপনিবেশে সাম্রাজ্যবাদের শাসনের বেলায়) যখন কোনো শ্রেণীর শাসনকে সুনির্দিষ্টভাবে 'পরোক্ষ' ব'লে বিশেষিত করা হয় (উপনিবেশের 'প্রত্যক্ষ' সাম্রাজ্যবাদী শাসনের পাল্টা হিসাবে) তখন তার দ্বারা নিশ্চয়ই এর **অতিরিক্ত** কোনো পরোক্ষতাকে বোঝানো হয়ে থাকে।

সেটা কি হতে পারে? এক শ্রেণীর শাসন যখন অন্য কোনো শ্রেণীর রাষ্ট্রক্ষমতা ও প্রত্যক্ষ শাসন মারফৎ, তার রাষ্ট্রীয়-আর্থিক নীতির মধ্য দিয়ে, কার্যকরী হয় কেবলমাত্র তখনই প্রথমোক্ত শ্রেণীর শাসনকে ' পরোক্ষ" বলার একটা যৌক্তিকতা থাকতে পারে, নতুবা নয়। সুতরাং আধা-উপনিবেশে সাম্রাজ্যবাদের পরোক্ষ শাসনের অর্থ এই যে তার প্রভাব, প্রভুত্ব ও নিয়ন্ত্রণ—এক কথায় তার "শাসন"—কায়েম ও কার্যকরী হচ্ছে নিছক তার **ভাড়াটে এজেন্টদের** মারফৎ নয় বরং অপর কোনো **শ্রেণী বা শ্রেণীসমূহের** শাসন মারফৎ। আধা-উপনিবেশে দেশীয় শাসকশ্রেণীগুলি যে পরিমাণে নিজেদের শ্রেণীস্বার্থে দেশের জনসাধারণকে লুণ্ঠন ও উৎপীড়ন করার জন্য সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আঁতাতবদ্ধ হয় ও সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশ ডেকে আনে, যে পরিমাণে তারা সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণকে সমূলে উচ্ছেদ না ক'রে তার সঙ্গে ন্যক্কারজনক দরকষাকষিতে লিপ্ত হয় ও শেষ পর্যন্ত উত্তরোত্তর সেই নিয়ন্ত্রণের নিকট আত্মসমর্পণ করে, ঠিক সেই পরিমাণে আধা-উপনিবেশে সাম্রাজ্যবাদের শাসন কার্যকরী হয়। কিন্তু এই কারণেই সে শাসনের চরিত্র পরোক্ষ ছাড়া আর কিছুই নয় এবং ঠিক এই কারণেই আবার আধা-উপনিবেশে সাম্রাজ্যবাদ রাষ্ট্রক্ষমতাতেও থাকে না, থাকে কেবল দেশীয় কতগুলি শ্রেণী (যাদের চরিত্র আত্মসমর্পণপ্রধান)।

তবে এই আলোচনায় শুধু এটুকু বোঝা গেল যে আমাদের প্রতিপক্ষ আসলে তলে তলে মাও চিন্তাধারার বিরোধী এবং পক্ষান্তরে আমাদের বক্তব্যই (যে আধা-উপনিবেশে সাম্রাজ্যবাদ রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকে না) মাও চিন্তাধারার অনুসারী; উপরন্তু এটাও পরিষ্কার হয়েছে যে সাম্রাজ্যবাদের শাসনকে **পরোক্ষ** ব'লে মেনে নিলে তার সঙ্গে রাষ্ট্রক্ষমতায় সাম্রাজ্যবাদের অংশ না থাকাটা আদৌ অসংগতিপূর্ণ হয় না। কিন্তু আমাদের (তথা মাওয়ের) বক্তব্য এবং আমাদের প্রতিপক্ষীয়দের বক্তব্য এই দুইয়ের মধ্যে কোনটা **সত্য** সে প্রশ্নের কোনো মীমাংসা কিন্তু এখনও হয়নি, কেননা নিছক মাওয়ের কর্তৃত্বের দোহাই দিয়ে সত্যতা-অসত্যতার প্রশ্নের যথার্থ ফয়সালা সম্ভব নয়। তার জন্য দুটি চিন্তাধারাকেই আধা-উপনিবেশের বিভিন্ন বাস্তব তথ্য ব্যাখ্যায় প্রয়োগ ক'রে দেখতে হবে।

৬.

আধা-উপনিবেশে সাম্রাজ্যবাদের বিপুল প্রভাব, প্রভুত্ব ও নিয়ন্ত্রণ, এক কথায় তার শক্তিশালী শাসনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা উভয়পক্ষই একমত। কিন্তু এই একই উপলব্ধিকে আমরা দুই পক্ষ দুই ভিন্ন তাত্ত্বিক ধারণার (theoretical

concept-এর) মাধ্যমে প্রকাশ করতে চাইছি। আমাদের বক্তব্য : "আধা-উপনিবেশে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অস্তিত্ব থাকলেও তা পরোক্ষ, অর্থাৎ দেশীয় শাসকশ্রেণীগুলির প্রত্যক্ষ শাসনের মধ্য দিয়ে পরোক্ষভাবে ক্রিয়াশীল ; সুতরাং সাম্রাজ্যবাদ রাষ্ট্রক্ষমতার শরিক নয়, সে কেবল রাষ্ট্রক্ষমতাসীন দেশীয় শ্রেণীগুলির সঙ্গে আঁতাতবদ্ধ।" আর তাঁরা বলছেন (অথবা তাঁরা যা বলছেন তাতে দাঁড়াচ্ছে এই যে) : "আধা-উপনিবেশে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অস্তিত্ব আছে মানেই রাষ্ট্রক্ষমতাতেও তার শরিকানা রয়েছে। এই সিদ্ধান্তটাই তো সবচেয়ে সরল ও স্বাভাবিক।" আমরা যতবারই বলব যে আধা-উপনিবেশে সাম্রাজ্যবাদী শাসন পরোক্ষ, সুতরাং রাষ্ট্রক্ষমতায় তার অংশীদারি নেই, ততবারই তাঁরা জবাব দেবেন : "সাম্রাজ্যবাদের শাসনকে একবার পরোক্ষ ব'লে ধ'রে নিলে যে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে তাকে বাদ দিতে হয় তা তো বোঝাই গেল। কিন্তু শুধু শুধু আমরা অত ঝামেলায় যাব কেন, কেন তার শাসনকে পরোক্ষ ব'লে কল্পনা করব ? সাম্রাজ্যবাদের শাসন আছে, সুতরাং তার রাষ্ট্রক্ষমতাও আছে, —ব্যস্, ল্যাঠা চুকে গেল !"

পাঠক লক্ষ্য করবেন, দুটো প্রকল্পের কোনোটার মধ্যেই কোনো যুক্তিগত অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হচ্ছে না। তাহলে কি দুটোকেই পরস্পরের বিকল্প হিসাবে রাখা ? কিন্তু যে কোনো বিজ্ঞানের পক্ষেই সেটা অতি অস্বস্তিকর এক অবস্থা। তাছাড়া মন যেন আমাদের প্রতিপক্ষীয়দের প্রকল্পটার দিকেই বেশী ঝুঁকতে চায় ; তার কারণ তাঁদের তাত্ত্বিক ধারণাটির সারল্য—সাম্রাজ্যবাদী শাসনের "পরোক্ষ-তা"র এক অতিরিক্ত অনুমিতি (assumption) ছাড়াই তাঁদের ধারণাটিকে গ্রহণ করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে কোন যুক্তিতে আমরা দুটো ধারণার একটিকে বর্জন করছি এবং তা-ও আবার তাঁদেরটিকেই ?

দুটো প্রকল্পের মধ্যে দুটোকেই যখন নিছক যুক্তিগত বিচারে সমান সম্ভবপর ব'লে মনে হয় তখন তাদের গ্রহণযোগ্যতার পরস্পরবিরোধী দাবীকে ফয়সালা করার জন্য প্রতিটি বিজ্ঞানেই একটি অতি সাধারণ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়ে থাকে। অভিজ্ঞতালব্ধ বিভিন্ন বাস্তব ঘটনা ও সমস্যা ব্যাখ্যা করার জন্য দুটো প্রকল্পকেই প্রয়োগ করা হয় ; কোনো একটি বিশেষ ক্ষেত্রে এসে যদি দেখা যায় যে একটি প্রকল্প তার প্রত্যাশিত ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হচ্ছে, অথচ অন্যটিকে দিয়ে কাজ চলছে সুন্দরভাবে, তাহলে প্রথম প্রকল্পটিকে বর্জন ক'রে দ্বিতীয়টিকে রক্ষা করা হয়। [যুক্তিশাস্ত্রের ভাষায় সেই 'বিশেষ ক্ষেত্র'টি হল crucial instance বা 'মোক্ষম দৃষ্টান্ত'।] আমরা দেখাব যে আমাদের প্রতিপক্ষীয়দের প্রকল্পটিকে আপাতদৃষ্টিতে এত স্বাভাবিক ও আকর্ষণীয় ব'লে মনে হলেও যে মুহূর্তে সেটিকে কোনো কাজে লাগানোর চেষ্টা করা হয় তৎক্ষণাৎ তা একেবারেই নিষ্ফল ও অব্যবহার্য ব'লে প্রমাণিত হয় এবং আমাদের (সত্য কথা বলতে কি,

মাওয়ের) প্রস্তাবিত ধারণাটিকেই অবলম্বন করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

তাঁদের প্রকল্প অনুযায়ী সাম্রাজ্যবাদ রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদার। কথাটার মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে সত্যই তেমন আপত্তিকর কিছু ধরা পড়ে না। কিন্তু যথাযথভাবে বলতে গেলে কোনো 'বাদ'ই তো কখনও রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকে না, রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকে সুনির্দিষ্ট কতগুলি শ্রেণী। সাম্রাজ্যবাদের রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকার ধারণাটিকে এই যথাযথ শ্রেণীগত ভাষায় অনুবাদ করতে চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গেই দেখুন অবস্থাটা কি দাঁড়ায়।

এই দুনিয়ায় 'সাম্রাজ্যবাদ' বা 'সাম্রাজ্যবাদী' ব'লে কোনো একক ও অবিভাজ্য শ্রেণী নেই। বাস্তবে যা আছে তা হল বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশের একাধিক সাম্রাজ্যবাদী শাসকশ্রেণী—যারা পরস্পরের সঙ্গে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত। এখন, উপনিবেশের তুলনায় আধা-উপনিবেশের বৈশিষ্ট্য হল এই যে এখানে একক কোনো সাম্রাজ্যবাদী শ্রেণীর পরিবর্তে তাদের সকলেরই (বা অন্তত অনেকেরই) কিছু না কিছু "শাসন" রয়েছে। প্রতিপক্ষের যুক্তি অনুযায়ী এদের সবাইকেই রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদার ব'লে মানতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অবস্থাটা হয়ে দাঁড়ায় উদ্ভট রকম জটিল। যতক্ষণ এই সমস্যাটা 'সাম্রাজ্যবাদ' নামক একটা অনির্দিষ্ট ও অস্পষ্ট (বর্তমান আলোচনার বিশেষ বিষয়বস্তুর প্রসঙ্গে অনির্দিষ্ট ও অস্পষ্ট) ধারণার আড়ালে ঢাকা প'ড়ে ছিল ততক্ষণ আধা-উপনিবেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় অংশীদারের সংখ্যা ছিল মোটামুটি সহনীয়, মাত্র তিন: আমলা-মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণী, জমিদারশ্রেণী এবং "সাম্রাজ্যবাদ"। কিন্তু এখন "সাম্রাজ্যবাদ"এর অংশীদারিকে যথাযথ শ্রেণীগত ভাষায় অনুবাদ করতে যেতেই রাষ্ট্রক্ষমতায় অংশীদারের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়ে যাচ্ছে অন্তত আট-দশটি! পক্ষান্তরে আমাদের প্রকল্পটিতে এই জাতীয় অসুবিধা নেই, কেননা রাষ্ট্রক্ষমতাসীন দুটিমাত্র দেশীয় শ্রেণীর পক্ষে, আট-দশটা কেন, তার চেয়েও বেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হতে কোনো বাধা থাকে না।

আমাদের প্রতিপক্ষ এইখানে ব'লে উঠবেন: "আট-দশটা শ্রেণীর যৌথ রাষ্ট্রক্ষমতার ধারণাটা অবশ্যই অত্যন্ত বেখাপ্পা এবং এই ধরনের বেখাপ্পা ধারণা আমরা মোটেও পোষণ করি না। আধা-উপনিবেশে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যে একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে যে কোনো একটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি প্রাধান্যবিস্তার করে[৫] এবং আমাদের মতে সেই পর্যায়ের জন্য সেই একটিমাত্র সাম্রাজ্য-

৫ আসলেও তা-ই সত্য।

বাদী শক্তিই রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকে, বাকীগুলি নয়। রাষ্ট্রের মার্কসীয় তত্ত্বের সঙ্গেও এ ধারণাটাই বেশী সঙ্গতিপূর্ণ ব'লে মনে হয়, কেননা মার্কসবাদের মতে সবচেয়ে প্রাধান্যবিস্তারকারী শ্রেণী বা শ্রেণীগুলিই রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকে, বাকীগুলি নয়।" কিন্তু ওঁদের এই দাবীর মধ্যে বিশেষ সত্যতা নেই, কেননা তাঁরা বলছেন: "বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির (বিশেষত দুই অতিশক্তির) পুতুলরা রাষ্ট্রক্ষমতার আরো বেশী বেশী অংশের জন্য নিজেদের মধ্যে লড়াই করে, এবং কখনও এই পুতুলগোষ্ঠী কখনও ঐ পুতুলগোষ্ঠী দেশীয় শাসকশ্রেণীগুলিকে নিজেদের দিকে জয় ক'রে আনে ও তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীকে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে হঠিয়ে দেয়।" এই বাক্যটাই কিন্তু স্ববিরোধী। বাক্যের প্রথম অংশে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাদের পুতুলদের মারফৎ রাষ্ট্রক্ষমতার "আরো বেশী বেশী অংশের জন্য" লড়াই করছে এবং তার অর্থ সবগুলি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিই রাষ্ট্রক্ষমতার কোনো-না-কোনো অংশ অধিকার ক'রে বিরাজমান। আবার বাক্যের দ্বিতীয় অংশে বলা হচ্ছে যে এক-একবারে একটা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিই রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকতে পারে, তার বেশী নয়। যাহোক, **আমরা ধ'রে নিচ্ছি যে তাঁরা আসলে এক-একবারে একটা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকেই রাষ্ট্রক্ষমতাসীন ব'লে বোঝাতে চেয়েছেন**। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এত কিছুর পরেও তাঁদের প্রকল্পটির দ্বারা আধা-উপনিবেশের সবগুলি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় না।

কেননা আধা-উপনিবেশের একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে এখানে কোনো একটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি স্থায়ীভাবে প্রাধান্যে থাকে না। আমাদের উপমহাদেশে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের পর্যায়ক্রমিক প্রাধান্য-অর্জনের ইতিহাসই একথা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট। বিগত অনুচ্ছেদে আমাদের প্রতিপক্ষের যে বাক্যটি আমরা উদ্ধৃত করেছি তার মধ্যেও একথার স্বীকৃতি রয়েছে।

বেশ। এবার মনে করুন কোনো একটা আধা-উপনিবেশে মার্কিন সাম্রাজ্য-বাদ তার পুতুলদের মারফৎ রাষ্ট্রক্ষমতার একাংশ অধিকার ক'রে রয়েছে। এই অবস্থায় কোনো যুদ্ধবিগ্রহ বা সশস্ত্র সংঘাত ছাড়াই সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ তার পুতুলদের মারফৎ কেমন ক'রে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে রাষ্ট্র-ক্ষমতা থেকে উৎখাত ক'রে নিজে তার স্থান অধিকার করতে পারে? পাঠককে মনে রাখতে হবে যে এখানে নিহিত রয়েছে দুটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির তীব্রতম প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং বিশেষ ক'রে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে এক সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা আরেক সাম্রাজ্যবাদের উৎখাতের বিষয়। নিছক এক "পুতুলগোষ্ঠী"র দ্বারা আরেক "পুতুলগোষ্ঠী"র মসৃণ অপসারণের এক নিরীহ চিত্র তুলে ধ'রে আমাদের প্রতিপক্ষ দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যেকার সংঘাতের প্রচণ্ডতাকেই আড়াল করতে চেয়েছেন এবং এর দ্বারা তাঁদের তত্ত্বকে বিশ্বাসযোগ্য ক'রে তুলতে

চেয়েছেন। অথচ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সঙ্গে ন্যূনতম পরিচয়সম্পন্ন ব্যক্তিও বুঝবেন যে কোনো একটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি একবার কোথাও রাষ্ট্রক্ষমতাসীন হয়ে গেলে আরেকটি প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি কর্তৃক তার উৎখাতের কাজটি কখনও এত মসৃণভাবে নিষ্পন্ন হতে পারে না। যেসব জায়গায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সর্বসম্মতভাবেই রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন সেইসব উপনিবেশ বা নয়া-উপনিবেশে (যেমন দক্ষিণ কোরিয়া, ইতিপূর্বেকার দক্ষিণ ভিয়েতনাম, ইত্যাদিতে) কি সোভিয়েতের দ্বারা এত মোলায়েমভাবে তার উৎখাত কল্পনা করা সম্ভব? এক-মাত্র পাগল ছাড়া কারো পক্ষে নয়। কিন্তু আধা-উপনিবেশে বিভিন্ন সাম্রাজ্য-বাদী শক্তির প্রাধান্যের পরিবর্তন যে মোটামুটি মসৃণভাবেই নিষ্পন্ন হতে পারে ইতিহাসে তা প্রমাণিত এবং আমাদের প্রতিপক্ষের দ্বারাও তা স্বীকৃত। এক-মাত্র আমাদের প্রকল্পটিতেই এই ব্যাপারটার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা মেলে: রাষ্ট্র-ক্ষমতার ক্ষেত্রে এই ধরনের মসৃণ পরিবর্তন সত্যই অসম্ভব, কিন্তু বিভিন্ন সাম্রাজ্য-বাদী শক্তি যদি নিজেরা রাষ্ট্রক্ষমতাসীন না হয়ে দেশীয় শাসকশ্রেণীগুলির সঙ্গে নিছক আঁতাতবদ্ধ হয় তাহলে এই ধরনের আঁতাতের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি-গুলির আপেক্ষিক প্রাধান্যের পরিবর্তন নিশ্চয়ই অপেক্ষাকৃত মসৃণভাবে সম্পন্ন হতে পারে (যদিও সর্বদা ও সর্বত্র তা যে পুরোপুরি মসৃণভাবে হতেই হবে তা ঠিক নয়), কারণ এক্ষেত্রে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে উৎখাতের প্রশ্ন জড়িত নয়, রাষ্ট্রক্ষমতাসীন দেশীয় শ্রেণীগুলির জোটবিন্যাস ও পলিসি-পরিবর্তনের প্রশ্নটুকুই কেবল জড়িত।

শুধু তা-ই নয়। যে প্রক্রিয়ার দ্বারা কোনো এক বিশেষ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তার ভাড়াটে এজেন্টদের মারফৎ আধা-উপনিবেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় আসে ব'লে আমাদের প্রতিপক্ষীয়রা মনে করেন সে প্রক্রিয়ার একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনাও তাঁরা দিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের নিজেদের সে বর্ণনাই প্রমাণ করে যে ঐ প্রক্রিয়ায় মোটেই কোনো সাম্রাজ্যবাদী শক্তি রাষ্ট্রক্ষমতায় আসে না বা আসতে পারে না।

সি পি আই, সংগঠন-কংগ্রেস, বি কে ডি প্রভৃতি রাজনৈতিক দলের নেতা ও মন্ত্রীদের সবাইকেই তাঁরা সাম্রাজ্যবাদ বা সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট ("পুতুল") ব'লে চিহ্নিত করেছেন। তা যদি আমরা সত্য ব'লেও ধ'রে নিই এবং সেইসঙ্গে যদি এটাও কল্পনা ক'রে নিই যে তারা একটা-দুটো প্রদেশের বদলে কেন্দ্রীয় স্তরেই সরকার গঠন করেছে তবু কিন্তু তার দ্বারা সাম্রাজ্যবাদ বা সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের রাষ্ট্রক্ষমতায় আরোহণ বোঝাবে না। কারণ সাম্রাজ্য-বাদ ও সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের ভাড়াটে এজেন্ট এইসব পেশাদার রাজনীতি-বিদের মধ্যেকার কোন বিশেষ গোষ্ঠীটি সরকার গঠন করতে পারবে তথা "ক্ষমতা"য় আসতে পারবে তা আমাদের প্রতিপক্ষীয়দের স্বীকৃতি অনুযায়ীই

নির্ভর করে, রাষ্ট্রক্ষমতাসীন দেশীয় শাসকশ্রেণীগুলিকে কারা নিজেদের দিকে "জয়" ক'রে নিতে পারবে, তার উপর। কিন্তু এই মুহূর্তে কোন গোষ্ঠীটি দেশীয় শাসকশ্রেণীগুলিকে নিজেদের দিকে জয় ক'রে নিতে পারবে তা কিসের দ্বারা নির্ধারিত হয়? আমাদের বিরোধীপক্ষ স্বভাবতই এ প্রশ্ন উত্থাপন করেননি বা তার জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেননি। কিন্তু মার্কসবাদীমাত্রই এর জবাব দিতে সক্ষম। একটা বিশেষ পর্যায়ে পেশাদার রাজনীতিবিদদের সেই গোষ্ঠীটাই শাসকশ্রেণীগুলিকে নিজেদের দিকে "জয়" ক'রে আনতে পারে যার মাধ্যমে সেই শাসকশ্রেণীগুলির তাৎক্ষণিক স্বার্থের সর্বোত্তম প্রতিফলন ও সংরক্ষণ সম্ভব হয়। আধা-ঔপনিবেশিক ভারতের আলোচ্য রাজনীতিবিদেরা সাম্রাজ্যবাদের ভাড়াটে এজেন্ট হোক আর না-ই হোক, ক্ষমতায় আসতে গেলে যে তাদের দেশীয় শাসকশ্রেণীগুলিকে আগে স্বপক্ষে জয় ক'রে আনতে হচ্ছে এতেই প্রমাণিত হয় যে তাদের ক্ষমতায় আসতে হচ্ছে দেশীয় শাসকশ্রেণীগুলিরই রাজনৈতিক প্রতিনিধি হিসাবে, সাম্রাজ্যবাদের "পুতুল" হিসাবে নয়। এই অবস্থা যতদিন বলবৎ থাকছে ততদিন দেশীয় শাসকশ্রেণীগুলিকেই রাষ্ট্রক্ষমতাসীন ব'লে ধরতে হবে এবং দেশটির উপর সাম্রাজ্যবাদী শক্তির যত কব্জাই থাক তাকে রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদার ব'লে ধরা চলবে না। পেশাদার রাজনীতিবিদদের মার্কিনপন্থী গোষ্ঠীটার পরিবর্তে সোভিয়েতপন্থী গোষ্ঠীটা ক্ষমতায় আসতে পারে তখনই যখন দেশের শাসকশ্রেণীগুলির স্বার্থটাই ইতিপূর্বে মার্কিনের পরিবর্তে সোভিয়েতের সঙ্গে মিলে গেছে।

আমাদের প্রতিপক্ষই স্বীকার করছেন যে আধা-উপনিবেশে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির প্রাধান্যের পরিবর্তন বাস্তবায়িত হয় দেশীয় শাসকশ্রেণীগুলিকেই আশ্রয় ও অবলম্বন ক'রে। সুতরাং রাষ্ট্রক্ষমতাসীন দেশীয় শ্রেণীগুলির চরিত্র ও ভূমিকাই এক্ষেত্রে নির্ধারক। আধা-ঔপনিবেশিক ভারতে এই ব্যাপার যে মসৃণভাবে সম্পন্ন হতে পারে তা'তে প্রমাণ হয় এখানে দেশীয় শ্রেণীগুলি রাষ্ট্রক্ষমতায় রয়েছে, কিন্তু কোনো সাম্রাজ্যবাদী শক্তি রাষ্ট্রক্ষমতায় নেই। আর নয়া-ঔপনিবেশিক দক্ষিণ কোরিয়া বা দক্ষিণ ভিয়েতনামে (মুক্তির পূর্বেকার দক্ষিণ ভিয়েনামে) এই ব্যাপার যে সেভাবে সম্পন্ন হওয়া অকল্পনীয় এতেই প্রমাণ হয় যে সেখানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ রাষ্ট্রক্ষমতায় রয়েছে, কিন্তু দেশীয় কোনো শ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতায় নেই। ইতিহাসের সাক্ষ্য এখন পর্যন্ত এই যে সাম্রাজ্যবাদ যেখানে রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকে সেখানে দেশীয় কোনো শ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকে না, আর দেশীয় কোনো শ্রেণী যেখানে রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকে সেখানে সাম্রাজ্যবাদ রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকে না।

কিন্তু আধা-উপনিবেশে সাম্রাজ্যবাদের ভাড়াটে এজেন্টরাও যদি ক্ষমতায় আসতে পারে কেবলমাত্র দেশীয় শাসকশ্রেণীগুলির রাজনৈতিক প্রতিনিধি হিসাবেই

তাহলে আর এদের পেছনে টাকা ঢেলে সাম্রাজ্যবাদের লাভ কি হয়? লাভ আর কিছুই নয়ঃ দেশীয় শাসকশ্রেণীগুলির শাসনের মধ্য দিয়েই যথাসম্ভব নিজের স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা করা, অর্থাৎ নিজের পরোক্ষ শাসনকে আরো জোরদার করা। আধা-উপনিবেশের শাসকশ্রেণীগুলির চরিত্রই এমন যে তারা নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ হাসিলের তাগিদেই আবশ্যিকভাবে সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশ ডেকে আনবে। আধা-উপনিবেশের উপর সাম্রাজ্যবাদের পরোক্ষ শাসন কায়েম হওয়ার এই হল একটি পথ। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ তার অনুপ্রবেশ তথা পরোক্ষ শাসনকে জোরদার করার জন্য কেবল দেশীয় শাসকশ্রেণীগুলির স্বতঃপ্রণোদিত মৈত্রীপ্রচেষ্টার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে না; এই উদ্দেশ্যে সে নিজেও উদ্যোগী হয়ে নানা **সক্রিয়** ব্যবস্থা নেয়। এইসব সক্রিয় ব্যবস্থার অন্যতম হল দেশীয় শাসকশ্রেণীগুলির রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের ঘুষ দিয়ে (এবং অন্য নানা উপায়ে) তাদের রাষ্ট্র-যন্ত্রটাকে যথাসম্ভব নিজের অনুকূলে **নিয়ন্ত্রণ** করা। এই 'নিয়ন্ত্রণ' হল নিজের পরোক্ষ শাসনকে জোরদার করার জন্য সাম্রাজ্যবাদের একটা সক্রিয় পদক্ষেপ এবং দেশীয় শাসকশ্রেণীগুলির নিছক স্বতঃপ্রণোদিত মৈত্রীপ্রচেষ্টার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদের যে পরোক্ষ শাসন কায়েম হয় সেটা থেকে তা আলাদা। তবু 'নিয়ন্ত্রণ' যেহেতু পরোক্ষ শাসনেরই একটা পদ্ধতি তাই তারও অর্থ রাষ্ট্রক্ষমতায় সাম্রাজ্যবাদের অংশীদারি নয়। আর যদি কোনো সাম্রাজ্যবাদী শক্তি রাষ্ট্র-ক্ষমতায় আসতে চায় (অর্থাৎ তার পরোক্ষ শাসনের পরিবর্তে সে যদি প্রত্যক্ষ শাসন কায়েম করতে চায়) তাহলে তাকে আধা-উপনিবেশের শাসকশ্রেণীগুলিকে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে হঠিয়ে দিতে হবে (অর্থাৎ আধা-উপনিবেশকে তার উপনিবেশে পরিণত করতে হবে)। এই কাজ হাসিল করার দুটো পথ আছেঃ (১) সাম্রাজ্যবাদী শক্তিটি সরাসরি আগ্রাসন চালাবে এবং তার ভাড়াটে এজেন্টরা ভিতর থেকে তাকে যথাসম্ভব সহায়তা করবে (যেমন চীনে জাপ আগ্রাসন), অথবা (২) সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ভাড়াটে এজেন্টরা আধা-উপনিবেশের শাসকশ্রেণীগুলির বিরুদ্ধে তাদের হাত থেকে রাষ্ট্রক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার জন্য বিদ্রোহ করবে; অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের বেতনভোগী হওয়া সত্ত্বেও দেশীয় শাসকশ্রেণীগুলিরই রাজনৈতিক মুখপাত্র হিসাবে তাদের যে এতদিন ক্ষমতায় থাকতে হচ্ছিল, নিজেদের সে ভূমিকা তারা এবার বলপূর্বক ঝেড়ে ফেলবে এবং তার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিটিও বাইরে থেকে তাদের যথাসম্ভব সাহায্য করবে (যেমন কাম্বোডিয়ায় সিহানুকের ক্ষমতাচ্যুতি ও লন নলের ক্ষমতাদখল)। এই দুটো পথের যেটাই অবলম্বিত হোক না কেন তৎক্ষণাৎ জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান হওয়ার [আবশ্যিক] শর্তটি পূরণ হয়ে যাবে।

এ থেকে দুটো বিষয় আমরা দেখতে পাই। প্রথমত সাম্রাজ্যবাদ এবং দেশীয় শ্রেণীগুলি কখনও মিলিতভাবে রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকছে নাঃ সাম্রাজ্যবাদ যখন

রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকছে তখন দেশীয় কোনো কোনো শ্রেণী তার সঙ্গে আঁতাতবদ্ধ হতে পারে কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদার হচ্ছে না, এবং দেশটা তখন হচ্ছে উপনিবেশ বা নয়া-উপনিবেশ ; আর দেশীয় শ্রেণীগুলি যখন রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকছে তখন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি তাদের সঙ্গে আঁতাতবদ্ধ হতে পারে কিন্তু রাষ্ট্র-ক্ষমতার অংশীদার হচ্ছে না, এবং দেশটা তখন হচ্ছে স্বাধীন বা আধা-উপনিবেশ। দ্বিতীয়ত কোনো দেশে সাম্রাজ্যবাদের রাষ্ট্রক্ষমতায় আরোহণ ও তার সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের প্রাধান্য থেকে জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্যে উত্তরণ একটা সুস্পষ্ট গুণগত পরিবর্তন—যা একটা আকস্মিক ছেদ ছাড়া, সহিংস উল্লম্ফন ছাড়া, কখনও নিছক মসৃণভাবে সাধিত হতে পারে না ; কিন্তু আমাদের প্রতিপক্ষের তত্ত্ব এই সত্যকে লঙ্ঘন করে।

আধা-উপনিবেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় সাম্রাজ্যবাদের অংশীদারি-সংক্রান্ত প্রকল্পটির অকর্মণ্যতা ও অব্যবহার্যতা আমরা আরো দুটো দিক থেকে উদ্‌ঘাটন ক'রে দেখাব। এবার পাঠক দেখতে পাবেন যে আমাদের প্রতিপক্ষের উক্ত ধারণাটি গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে উপনিবেশ (বা নয়া-উপনিবেশ), আধা-উপনিবেশ এবং স্বাধীন দেশের মধ্যেকার সব গুণগত পার্থক্য মুছে যায় এবং প্রধান দ্বন্দ্ব ও তার পরিবর্তন নির্ণয় করার মতো কোনো অবজেকটিভ মাপকাঠিও আর আমাদের হাতে থাকে না।

আমাদের প্রতিপক্ষ যে যুক্তিতে আধা-উপনিবেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় দেশীয় শ্রেণী-গুলির পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদেরও অংশীদারি দাবী করছেন সেই একই যুক্তিতে উপনিবেশে (যেমন ১৯৪৭-এর পূর্বেকার ভারতে) বা নয়া-উপনিবেশে (যেমন কিছুদিন আগের দক্ষিণ ভিয়েতনামে) সাম্রাজ্যবাদের পাশাপাশি দেশীয় মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও জমিদারশ্রেণীকেও রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদার ব'লে মানতে হয়। উপরন্তু বৃটেনের মতো যেসব দেশ স্বাধীন ব'লেই স্বীকৃত, কিন্তু যাদের উপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য ও কর্তৃত্ব নেহাৎ উপেক্ষণীয় নয়, সেগুলোতেও দেশীয় শাসকশ্রেণীর পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদকে রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদার ব'লে স্বীকার করতে হয়। অর্থাৎ আমাদের প্রতিপক্ষের যুক্তি মানলে উপনিবেশ (বা নয়া-উপনিবেশ), আধা-উপনিবেশ এবং স্বাধীন দেশ—এই তিনটাতেই সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় শ্রেণীসমূহ উভয়েই যৌথভাবে রাষ্ট্রক্ষমতায় সমাসীন ব'লে প্রতিভাত হয়। সেক্ষেত্রে এই তিনটাকে পৃথক করার কোনো নিরিখ আর অবশিষ্ট থাকে কি ? থাকে না। এবং এই বইয়ের প্রথম খণ্ডটি যাঁরা কিছুমাত্র মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন যে জাতীয় দ্বন্দ্বের সব প্রাধান্য-ঘোষক-দেরই একটি অভিন্ন ঝোঁক (প্রায় বলা চলে, লক্ষ্য) হল ঠিক এই পার্থক্যগুলি-

কেই যথাসম্ভব গুলিয়ে দেওয়া—বিশেষ ক'রে আধা-উপনিবেশ ও উপনিবেশের অন্তর্বস্তুর পার্থক্যকে "নয়া-উপনিবেশ" নামক নিজেদের খুশীমতো-ব্যাখ্যাত এমন একটি বর্গের মধ্যে ডুবিয়ে দেওয়া যার অর্থটাকে তাঁরা আগাগোড়াই বেশ সুবিধাজনকভাবে অনির্দিষ্ট ও অস্পষ্ট ক'রে রেখে দিয়েছেন। এটা তাঁদের প্রয়োজন, কেননা কোনো দেশকে আধা-উপনিবেশ ব'লে মানলেই তার প্রধান দ্বন্দ্ব নির্ধারণ সঙ্গে সঙ্গে মাও-বর্ণিত সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলীর অধীন হয়ে পড়ে এবং সেই নিয়মাবলী অনুযায়ী এই উপমহাদেশের সবকটি দেশে বর্তমানে আভ্যন্তরীণ তথা সামন্ত দ্বন্দ্বের প্রাধান্যই তর্কাতীতরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই উপমহাদেশের সবকটি দেশে তাঁরা জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য প্রতিপন্ন করবেন ব'লে আগে থেকে ঠিক ক'রে রেখেছেন। সে কাজ করতে গেলে আগে প্রধান দ্বন্দ্ব নির্ধারণের মাও-বর্ণিত নিয়মাবলীর কড়াকড়ি থেকে মুক্ত হতে হয় এবং তার জন্য প্রয়োজন এমন একটি বর্গ বের করা যার অর্থটা অনির্দিষ্ট রাখা হবে, যার অন্তর্বস্তুটাকে তার ফলে 'উপনিবেশ', 'আধা-উপনিবেশ' ও 'স্বাধীন দেশ' এই তিনটারই অন্তর্বস্তু থেকে পৃথক ব'লে মনে হবে, যা থাকবে এই তিনটার "কড়াকড়ি ও যান্ত্রিক" পার্থক্য (ভাববাদ ও বস্তুবাদের পার্থক্যটাকেও অনেকের কাছেই এইরকম "কড়াকড়ি ও যান্ত্রিক" ব'লে মনে হয়, বন্ধুগণ!) থেকে—বিশেষ ক'রে 'উপনিবেশ' ও 'আধা-উপনিবেশ' এই দুটোর "কড়াকড়ি ও যান্ত্রিক" পার্থক্য থেকে—মুক্ত ও তার ঊর্ধ্বে বিরাজমান, অথচ যা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে 'উপনিবেশ'এর একটা আবছা অনুভূতি ও জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্যের একটা সূক্ষ্ম আভাস প্রায় অজ্ঞাতসারেই মনকে অধিকার ক'রে নেবে। 'নয়া-উপনিবেশ'ই হচ্ছে তাঁদের সেই অঘটন-ঘটনপটু পরশপাথর!

প্রতিপক্ষীয়রা এখানে আপত্তি তুলতে পারেন যে সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় শ্রেণী-সমূহের যৌথ রাষ্ট্রক্ষমতার ধারণায় উপরোক্ত তিন ধরনের দেশের গুণগত পার্থক্য মোটেই নাকচ হয়ে যায় না—কেননা রাষ্ট্রক্ষমতায় সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় শ্রেণী-গুলির অংশের আপেক্ষিক পরিমাণের ভিত্তিতেই সেই গুণগত পার্থক্যরেখাগুলি টানা যেতে পারে। কিন্তু তাঁদের এ যুক্তিও দুটি কারণে অচল। প্রথমত রাষ্ট্র-ক্ষমতায় সাম্রাজ্যবাদের অংশের পরিমাণ বেশী, নাকি দেশীয় শাসকশ্রেণীগুলির, এবং সেটা কোন নিরিখের দ্বারা নির্ণয়যোগ্য হবে, তার হদিশ তাঁরা দিতে পারছেন না [পারা সম্ভবও নয়]; ফলে ব্যক্তিগত পছন্দ ও খেয়াল ছাড়া তা নির্ণয়ের আর কোনো পথ আমাদের সামনে খোলা থাকছে না। দ্বিতীয়ত রাষ্ট্র-ক্ষমতায় সাম্রাজ্যবাদের অংশ প্রধান হলে একটা দেশকে যদি আমরা 'উপনিবেশ' বলি, আর দেশীয় শাসকশ্রেণীগুলির অংশ প্রধান হলে যদি বলি 'স্বাধীন দেশ,' তাহলে এই পদ্ধতিতে 'আধা-উপনিবেশ' চেনার কোনো নিরিখ আর থাকে না; বস্তুত 'আধা-উপনিবেশ' বর্গটাই যেন উবে যেতে চায়, আর এই উবে যাওয়াটাই

যে আমাদের প্রতিপক্ষীয়দের জন্য অতিশয় সুবিধাজনক তা তো আমরা আগেই দেখেছি।

আমাদের প্রতিপক্ষীয়দের চিন্তাপদ্ধতি যে আলোচ্য বর্গ তিনটির মধ্যে কোনো-প্রকার গুণগত পার্থক্য টানতে অক্ষম, এটাকে একটা নিছক কেতাবী-ধরনের আনুষ্ঠানিক ও সৌষ্ঠবগত ত্রুটি ব'লে মনে করলে কিন্তু বিরাট ভুল করা হবে। কেননা ধারণার জগতের এই গুণগত পার্থক্যগুলি বাস্তব জগতের ঐতিহাসিক বিকাশপ্রক্রিয়ারই কতগুলি সুস্পষ্ট ও নির্ণয়যোগ্য আকস্মিক উল্লম্ফন ও আপেক্ষিক ছেদেরই মানসিক অনুমুদ্রণ এবং স্বীকৃতিমাত্র। বাস্তবে উপনিবেশ, আধা-উপনিবেশ ও স্বাধীন দেশ পরস্পর পরস্পরে রূপান্তরিত হয় এবং এই একটি রূপান্তরও কখনও নিছক মসৃণভাবে সম্ভবপর হয় না, বরং সর্বদাই তা সামাজিক বিকাশের এক সুস্পষ্ট ও গুরুতর মোড়-ফেরার সঙ্গেই সম্পর্কিত থাকে (যেমন: ১৯৩৭-৩৫এ আধা-ঔপনিবেশিক চীনের এক বিরাট অংশ যখন জাপানী উপনিবেশে পরিণত হল, ১৯৪৯এ আধা-ঔপনিবেশিক চীন যখন স্বাধীন হল, ১৯৪৭এ যখন ঔপনিবেশিক ভারত আধা-উপনিবেশে পরিণত হল, ইত্যাদি)। কাজেই কারো চিন্তাধারায় এই তিনটি বর্গের গুণগত পার্থক্যের স্বীকৃতির অবকাশ না থাকার অর্থ হল, তাঁর চিন্তাধারা সামাজিক-ঐতিহাসিক বিকাশপ্রক্রিয়ার এইসব ছেদ ও উল্লম্ফনকে স্বীকার ও ব্যাখ্যা করতে অক্ষম এবং তার ফলে তা বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিহীন।

পক্ষান্তরে আমাদের (তথা মাওয়ের) তাত্ত্বিক লাইনের মধ্যে যেহেতু রাষ্ট্র-ক্ষমতায় সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় শ্রেণীগুলির অংশীদারির ধারণাটাই অনুপস্থিত তাই আমাদের চিন্তাধারায় ঐ ধরনের অসুবিধা অন্তর্নিহিত নয়। আমাদের চিন্তা অনুযায়ী বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় শাসকশ্রেণীগুলি একত্রে রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত নয়: যখন সাম্রাজ্যবাদ (বা, আরো যথাযথভাবে বলতে গেলে, কোনো বিশেষ সাম্রাজ্যবাদী শ্রেণী) রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকে তখন দেশীয় কোনো শ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকে না এবং দেশটা তখন হয় উপনিবেশ বা নয়া-উপনিবেশ; আর দেশীয় কোনো শ্রেণী বা শ্রেণীসমূহ যখন রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকে তখন সাম্রাজ্য-বাদ পরোক্ষ উপায়ে তার শাসন যতই কার্যকরী করতে পারুক সে রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকে না এবং দেশটা তখন হয় আধা-উপনিবেশ বা স্বাধীন (যে দুটোর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের পদ্ধতি আমি অন্যত্র আলোচনা করেছি)। অতএব আমাদের চিন্তাপদ্ধতিতে বর্গ তিনটির গুণগত পার্থক্যের অবকাশ সুস্পষ্ট এবং এই গুণগত পার্থক্যগুলি—বিশেষত উপনিবেশ (বা নয়া-উপনিবেশ) ও আধা-উপনিবেশের গুণগত পার্থক্যটা—যেহেতু সাম্রাজ্যবাদ ও নির্দিষ্ট কতগুলি দেশীয় শাসকশ্রেণীর রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকা বা উৎখাত হওয়ার মতো মৌলিক বিষয়ের উপর নির্ভরশীল তাই এই তিনটি বর্গের পারস্পরিক রূপান্তরের সঙ্গে জড়িত

ঐতিহাসিক বিকাশপ্রক্রিয়ার ছেদ ও উল্লম্ফনগুলি আমাদের কাছে নিতান্তই প্রত্যাশিত এবং তাদের তাৎপর্যও সহজেই ব্যাখ্যাযোগ্য।

আর আমাদের মতো দেশে প্রধান দ্বন্দ্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রেও তাঁদের অভিনব তত্ত্বগত ধারণাটি যে তাঁদের কি ধরনের গোলকধাঁধায়, কি ধরনের খামখেয়ালি ও কপটতার আবর্তে নিক্ষেপ করেছে এবার তা-ই অবলোকন করার জন্য আমরা পাঠককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

আমাদের মতো ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্তবাদবিরোধী কর্তব্যাবলী সর্বদাই "অন্তঃসম্পর্কিত" ও "ওতপ্রোতভাবে জড়িত"; কখনোই তাদের মধ্যে কোনো "অলজ্ঘনীয় সীমারেখা" থাকে না এবং সর্বদাই ঐ দুই সারি কর্তব্যাবলীকে "একত্রে যুগপৎ" চলতে হয়। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে এই বহুপুরাতন সত্যটাকে বিশেষভাবে মনে করিয়ে দিয়ে একটা নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেওয়ার দরকারটা কি ছিল? এ ব্যাপারে ভারতের অসাধারণ বৈশিষ্ট্যটা কি? এর কোনো স্পষ্ট জবাব নেই। তাঁরা কেবল অস্পষ্ট-ভাবে বলছেন যে এই প্রবণতাটা নাকি ভারতের বেলায় "চীনের চেয়েও আরো বেশী" জোরালো। সে কথা ঠিক না বেঠিক তার জবাব দেওয়ার জন্য আমাদের বিন্দুমাত্রও মাথাব্যথা নেই। আমরা কেবল বলতে চাই যে এই ধরনের "আরো বেশী" মার্কা কথা অনির্দিষ্ট, অন্তঃসারশূন্য, বৈজ্ঞানিক তাৎপর্যবিহীন ফাঁকাবুলি মাত্র। তবু যে তাঁরা এই রকম একটা কথা ব্যবহার করছেন তা একেবারে বিনা কারণে নয়। সেই কারণটা কি?

আসলে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কর্তব্যাবলী ও সামন্তবাদবিরোধী কর্তব্যাবলী যত "অন্তঃসম্পর্কিত" ও "ওতপ্রোতভাবে জড়িত" হোক, তাদের পার্থক্য যতই আপেক্ষিক হোক, যতই তাদের "একত্রে যুগপৎ" চলতে হোক — বিপ্লবের রণ-কৌশলগত সমস্যার সমাধান যে পরিমাণে প্রধান দ্বন্দ্ব নির্ধারণের উপর নির্ভরশীল ঠিক সেই পরিমাণে এদের পার্থক্যও **চূড়ান্ত** তীক্ষ্ণতা ও স্পষ্টতা সহকারে নির্ধারণের দাবী রাখে। এই দুই সারি কর্তব্যাবলীর মধ্যে একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে যেহেতু কেবল একটাই প্রাধান্যে থাকতে পারে তাই সেটা কোনটা এবং তা নিরূপণের পদ্ধতি কি তার জবাব আমাদের অবশ্যই যথাযথভাবে দিতে হবে। কোনো বোলচাল ঝেড়েই কমিউনিস্টরা এই বাধ্যবাধকতা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে না। অথচ ঠিক এই বাধ্যবাধকতাটাই আমাদের প্রতিপক্ষীয়দের কাছে অসহ্য বোধ হয়। কোনো একটা দেশে যে হয় সাম্রাজ্যবাদ আর নাহয় দেশীয় শাসকশ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকে, দেশটিকে যে তাই হয় উপনিবেশ নাহয় আধা-উপনিবেশ (নাহয় স্বাধীন) হতেই হয়, এই বাধ্যবাধকতাটা যেমন তাঁদের কাছে অসহ্য বোধ হয় এবং তা থেকে তাঁরা যেমন কাল্পনিক মুক্তি খোঁজেন 'নয়া-উপনিবেশ' নামক নতুন একটা শব্দের (নেহাতই একটা শব্দের)

মধ্যে, প্রধান দ্বন্দ্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রেও তাঁদের মনোভাবটা ঠিক তেমনি। আমাদের মতো দেশে একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে যে হয় বাহ্যিক নাহয় আভ্যন্তরীণ, হয় জাতীয় নাহয় সামন্ত দ্বন্দ্ব:কই প্রধান থাকতে হবে, এই বাধ্যবাধকতা থেকেও তাঁরা স্বভাবতই কাল্পনিক মুক্তি খোঁজেন প্রধান দ্বন্দ্বের অভিনব এক সূত্রায়ণের মধ্যে এবং এইভাবে তাঁরা বাহ্যিক বা আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের প্রাধান্য নিরূপণের জন্য যথাযথ ও সুনির্দিষ্ট কোনো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণের দায়িত্ব থেকেও অব্যাহতি পেতে চান। প্রমাণ চাই? চেয়ে দেখুন তাঁরা "প্রধান দ্বন্দ্ব" নির্ধারণ করছেন "দেশীয় শাসকশ্রেণীগুলির ফ্যাসীবাদী অংশ" ও রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদার সাম্রাজ্যবাদীদের জোটের সঙ্গে। কিন্তু এই প্রধান দ্বন্দ্বের চরিত্র বাহ্যিক না আভ্যন্তরীণ, এই প্রধান দ্বন্দ্বের বিষয়বস্তুটা "জাতীয়" না "সামন্ত", সে সম্বন্ধে তাঁরা অবিচলভাবে নীরব। আসলে প্রধান দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে এই বাধ্য-বাধকতাটারই তাঁরা আর পরোয়া করতে চান না। তাঁরা মনে করেন তাঁরা এমন এক দ্বন্দ্ব খুঁজে বের করেছেন যা একই সঙ্গে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দুটোই, যার মধ্যে দুটো দিকেরই "সমন্বয়" ঘটেছে। তাই স্বভাবতই তাঁরা এমন এক "গৃহযুদ্ধ" উদ্ভাবন ক'রে ফেলেছেন যা আবার একই সঙ্গে "জাতীয় যুদ্ধ"ও বটে: "গৃহযুদ্ধের কাঠামোর মধ্যেই এমন একটা পর্যায় দেখা দিতে পারে যখন 'লাঙল যার জমি তার'এর চেয়ে 'সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খল ঝেড়ে ফেল' বেশী গুরুত্ব-পূর্ণ হয়ে উঠবে[৬]।" অতএব কি দরকার আর 'উপনিবেশ' ও 'আধা-উপনিবেশ'-

৬ আমাদের প্রতিপক্ষীয়রা বলতে পারেন: 'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মতে সব পার্থক্যই তো অস্থায়ী ও আপেক্ষিক। সুতরাং এমন গৃহযুদ্ধ কি একেবারেই অসম্ভব যা আবার একই সঙ্গে জাতীয় যুদ্ধও বটে?' আমাদের জবাব: না তা অসম্ভব নয়। কিন্তু দুটি পৃথক ও বিপরীত বর্গকে বাস্তব জীবন ঠিক কখন ও কোন অবস্থায় পরস্পরের সঙ্গে একাকার ক'রে দেয় তা মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন ও কড়াকড়িভাবে নির্ধারণ না ক'রে নিজেদের কল্পনা ও চিন্তায় তাদের মর্জিমাফিক গুলিয়ে ফেলাটা মোটেই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ নয়, বরং চরম অবৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরিচয়। বাস্তব জীবনের এমন একটি উদাহরণ কিন্তু আমাদের হাতের কাছেই রয়েছে। তা হল ১৯৭১ সালে পাক বাহিনীর গণহত্যার বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার মানুষের আত্মরক্ষার সংগ্রাম (যে সংগ্রাম থেকে বহু "বিশুদ্ধ" কমিউ-নিস্ট শতহস্ত দূরে স'রে ছিলেন এবং যার ফায়দা অবাধে লুটে নিয়ে গিয়েছিল দেশীবিদেশী চক্রান্ত-কারীরা)। সে সংগ্রাম ছিল একই রাষ্ট্রকাঠামো অর্থাৎ পাকিস্তানী রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ. তাই তা ছিল 'গৃহযুদ্ধ'। কিন্তু সেটা ছিল এই সংগ্রামের নিছক বাহ্য ও আনুষ্ঠানিক দিকমাত্র। এই সংগ্রামের অন্তর্বস্তু ছিল জাতিসত্তার ভিত্তিতে সেই রাষ্ট্রকাঠামোকে ভাঙার প্রয়াস, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে পৃথক রাষ্ট্রসত্তার মধ্যে রূপদানের প্রয়াস। তাই এটাকে আমরা 'জাতীয় যুদ্ধ' ব'লেই অভিহিত করেছি।

['দ্বান্দ্বিক যুক্তিপদ্ধতির মতে দুটি বর্গের মধ্যে কোনো অলঙ্ঘনীয় চীনা প্রাচীর নেই', 'তাদের পার্থক্য নিরঙ্কুশ (absolute) নয় বরং আপেক্ষিক (relative)', এসব কথার অর্থ হল: তাদের পার্থক্য কেবল নির্দিষ্ট প্রসঙ্গে ও শর্তাধীনেই সত্য থাকে এবং তার বাইরে গেলেই অবলুপ্ত

এর মধ্যেকার কড়াকড়ি পার্থক্যে? কি দরকার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের পার্থক্য ও আপেক্ষিক প্রাধান্য নিরূপণের মাও-প্রণীত নিয়মাবলীর কঠোরতায়? ওসবই আজ বড় বেশী সেকেলে ও অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে!

তবু আমাদের মতো দেশে সামন্ত দ্বন্দ্ব এবং জাতীয় দ্বন্দ্বের পার্থক্য, এবং একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে তাদের যে কোনো একটির প্রাধান্য, এমন এক তুর্নিবার সত্য যে শত ইচ্ছা সত্ত্বেও তা তাঁরা পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারেননি এবং তারই দরুণ এক অমীমাংসেয় স্ববিরোধে তাঁদের জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। একদিকে তাঁরা তাঁদের খুশীমতো একটিমাত্র দ্বন্দ্বকে স্থায়ীভাবে প্রধান ব'লে বেঁধে দিয়েছেন (কখনও এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কখনও ঐ সাম্রাজ্যবাদী সেই দ্বন্দ্বের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, কিন্তু দ্বন্দ্বের মৌলিক চরিত্রটা অপরিবর্তিতই থেকে যায়)। অন্যদিকে তাঁরা তুটি মূল রণকৌশলগত স্লোগানকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, যাদের একটা সামন্তবাদবিরোধী ও অন্যটা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, এবং একটি বিশেষ সময়ে যাদের একটাই প্রাধান্যে থাকে ও অন্যটা তুলনায় গৌণ হয়ে যায়। কিন্তু প্রথম খণ্ডে যেহেতু আমরা দেখিয়েছি যে আমাদের মতো দেশে প্রধান দ্বন্দ্ব নির্ধারণ একটা রণকৌশলগত সমস্যা, সুতরাং এটা মানতেই হবে যে একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে সামন্তবাদবিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী রণকৌশলগত স্লোগান-তুটির মধ্যে যে কোনো একটা প্রাধান্যে আসার অর্থ হল সামন্ত দ্বন্দ্ব ও জাতীয় দ্বন্দ্বের মধ্যে যে কোনো একটা সেই পর্যায়ের জন্য প্রধান হওয়া। কিন্তু এটা সামন্ত দ্বন্দ্ব ও জাতীয় দ্বন্দ্বের পার্থক্যের ঊর্ধ্বে অবস্থিত তৃতীয় কোনো দ্বন্দ্ব স্থায়ীভাবে প্রধান থাকার তত্ত্বের বিরোধী। তাছাড়া তাঁরা সামন্তবাদবিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী রণকৌশলগত শ্লোগানতুটির প্রাধান্যের পরিবর্তন স্বীকার করেছেন কিন্তু কখন কোনটা প্রাধান্যে আসছে সেটা নির্ণয় করার জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট, বৈজ্ঞানিক ও অবজেকটিভ নিরিখ আমাদের দিতে পেরেছেন কি?

হয়ে যায়, কিন্তু ঠিক সে কারণেই সামগ্রিক অর্থে সে পার্থক্য অস্থায়ী ও আপেক্ষিক হলেও নির্দিষ্ট প্রসঙ্গে ও শর্তাধীনে তা নিরঙ্কুশভাবেই সত্য এবং চূড়ান্ত যাথার্থ্য সহকারে নির্ধারণের দাবীদার। এ উপমহাদেশের অধিকাংশ "দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী" ঠিক এ বিষয়টাই ভুলে যান, কষ্টসাধ্য বৈজ্ঞানিক যাথার্থ্যের যে কোনো দাবীকেই (যেমন যথাযথ সংজ্ঞানির্ধারণ, চুলচেরা পার্থক্যনিরূপণ, নিখুঁত পরিমাপন, সতর্ক যাচাইকরণ, ইত্যাদিকে) "অধিবিদ্যক" ব'লে উড়িয়ে দেন এবং সব পার্থক্য ও বিশিষ্টতা গুলিয়ে দেওয়াকেই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের পরাকাষ্ঠা ব'লে মনে করেন। পার্থক্য ও অভিন্নতার (identityর) মধ্যে যেখানে একটার দরকার সেখানে অন্যটার উপর জোর দেওয়ার ফলে তাঁদের গবেষণা পর্যবসিত হয় নিছক স্বমতসমর্থনে, তাত্ত্বিক বিতর্ক অধঃপতিত হয় কুতার্কিকের ভেলকিতে এবং নিছক তাত্ত্বিক আলোচনা ও বৈজ্ঞানিক যুক্তির জোরে তুটি কমরেডের মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয় কদাচিৎ। এঁরা ভুলে যান যে আধুনিক দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গী আদিম দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর চেয়ে বহুদূর অগ্রসর—মধ্যবর্তী একটা দীর্ঘ সময় জুড়ে গ'ড়ে-ওঠা ফর্মাল লজিক, অধিবিদ্যা, যান্ত্রিক বস্তুবাদ ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সমস্ত ইতিবাচক উপাদান আত্মস্থ ক'রেই তা আবির্ভূত হয়েছে।]

উদাহরণস্বরূপ, তাঁরা বলছেন বর্তমান ভারতে সামন্তবাদবিরোধী স্লোগানের প্রয়োজন প্রাধান্যে রয়েছে। কিন্তু কোন যুক্তিতে? কেউ যদি দাবী করে যে না, বর্তমান ভারতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্লোগানের প্রয়োজনই প্রাধান্যে রয়েছে তাহলে তাঁরা কোনো যুক্তিতেই তার দাবী খণ্ডন করতে পারবেন না (এবং সম্ভবত আরো আনন্দের সঙ্গেই 'অগত্যা' তার সঙ্গে একমত হয়ে যাবেন!)। অতএব দেখা যাচ্ছে যে উপনিবেশ, আধা-উপনিবেশ ও স্বাধীন দেশকে আলাদা করার মতো কোনো নিরিখ যেমন তাঁদের তত্ত্বে নেই, ঠিক তেমনি নেই প্রধান দ্বন্দ্বের পরিবর্তন ধরতে পারার মতোও কোনো নিরিখ। তাঁদের চিন্তার জগতে সবকিছুই চলে নিজের নিজের মর্জিমাফিক কিংবা আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে তাঁদের পূর্বকল্পিত একটা সিদ্ধান্তকে যেন তেন প্রকারেণ "প্রমাণ" করার অন্ধ তাগিদে। এটাকে বিজ্ঞানচর্চা বলা যায় কি, পাঠক?

কিন্তু এই যে তাঁরা উপনিবেশ আর আধা-উপনিবেশের পার্থক্য এবং জাতীয় দ্বন্দ্ব ও সামন্ত দ্বন্দ্বের পার্থক্য গুলিয়ে দিচ্ছেন, মুছে দিচ্ছেন প্রধান দ্বন্দ্ব ও তার পরিবর্তন নির্ধারণের সব নিরিখ, এইটুকুতেই কি তাঁদের কীর্তি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে? না। ভাববাদ ও বস্তুবাদের কড়াকড়ি পার্থক্য থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টাটা যেমন একটা ধূম্রজাল মাত্র, যার আড়ালে একদল দার্শনিক সর্বদা ভাববাদকেই চোরাচালান করার চেষ্টা করেন [দৃষ্টান্তস্বরূপ লেনিনের 'মেটিরিয়ালিজম অ্যাণ্ড এম্পিরিও-ক্রিটিসিজম' দ্রষ্টব্য], ঠিক তেমনি উপরোল্লিখিত পার্থক্যগুলি উত্তীর্ণ হওয়ার গালভরা বুলির আড়ালে আমাদের প্রতিপক্ষীয়রাও সর্বদাই আসলে সন্তর্পণে চোরাচালান করার চেষ্টা করেন উপনিবেশ ও জাতীয় দ্বন্দ্বের স্থায়ী প্রাধান্যের ধারণা। সরাসরি ও প্রকাশ্যে নিজেদের বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা করার সাহস তাঁদের নেই ব'লেই তাঁরা এহেন সম্মানজনক পথের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। জাতীয় দ্বন্দ্বের সুপণ্ডিত প্রবক্তাদের ব্যাপক অনুসারীরাই বিচার করুন, এর পরেও আপনাদের নেতাদের তত্ত্বগত অসততার দায়ে অভিযুক্ত করাটা আমাদের পক্ষে অন্যায় কিনা।

কিন্তু প্রমাণ কই, উপরের অভিযোগের প্রমাণ? আমাদের দেশগুলির বিপ্লবকে তাঁরা 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব'এর পরিবর্তে 'জাতীয় জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব' নামে অভিহিত করেছেন। আমাদের মতো দেশগুলির বিপ্লবকে 'জাতীয়-গণতান্ত্রিক বিপ্লব', 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব' বা 'নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব' যে কোনো নামেই অভিহিত করা হোক না কেন মার্কসবাদী মাত্রই জানেন যে এ বিপ্লবে জাতীয় ও গণতান্ত্রিক কর্তব্যাবলী সর্বদাই "ওতপ্রোতভাবে জড়িত" থাকে। এ অবস্থায় জাতীয় দিকটার উপর হঠাৎ বেশী জোর দিয়ে এ বিপ্লবের নাম 'জাতীয় জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব' রাখার প্রস্তাবের তাৎপর্য কি? 'জাতীয় জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব' নামক একটি নতুন বর্গের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমাদের মতামত যা-ই

হোক, এটুকু আমরা আমাদের পাঠককে জানাতে চাই যে এই পরিভাষাটি প্রথম ব্যবহৃত হয় ১৯৫১ সালে ভিয়েতনাম ওয়ার্কার্স পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে ত্রুয়োঙ্ চিন-এর 'ভিয়েতনামী বিপ্লব সম্বন্ধে রিপোর্ট'এ—যখন ভিয়েতনামের অধিকাংশ ভূখণ্ড ছিল ফরাসী উপনিবেশ, কিছু অংশ ছিল মুক্ত এলাকা এবং বাকীটা ছিল ভিয়েতনামী কমিউনিস্টদের মতে আধা-ঔপনিবেশিক (অর্থাৎ অবস্থাটা অনেকটা ১৯৩৭-৪৫এর চীনের মতো, যেখানে জাতীয় দ্বন্দ্ব ছিল প্রধান)। "এই প্রথমবারের মতো আমাদের পার্টি সিদ্ধান্ত করে যে **আমাদের মতো** একটি দেশে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব হচ্ছে একটা জাতীয় জন-গণতান্ত্রিক বিপ্লব" ('ভিয়েতনাম ওয়ার্কার্স পার্টির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস', বড় হরফ আমার)। এবং তখন ভিয়েতনামী সমাজের প্রধান দ্বন্দ্ব কি ছিল? —"আক্রমণাত্মক সাম্রাজ্যবাদই ভিয়েতনামী সমাজের প্রগতির পথে বাধাস্বরূপ প্রধান প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি।...অপ্রধান গুরুত্বের অপর শত্রু হচ্ছে সামন্তবাদীরা, যারা এই পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়াশীল সামন্তবাদী।...প্রধান এবং আশু কাজটি হচ্ছে জাতীয় মুক্তি সম্পূর্ণ করা" (ভিয়েতনাম ওয়ার্কার্স পার্টির ২য় কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক কর্মসূচী, ঐ)। এসবে কি এটাই প্রমাণিত হয় না যে আমাদের প্রতিপক্ষীয়দের যত বাগাড়ম্বরের আসল উদ্দেশ্য হল তার আড়ালে আমাদের সমাজ ও তার প্রধান দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে আমাদের তত্ত্বগত ধারণাকে গোপনে, চোরাপথে ও ফাঁকি দিয়ে উপনিবেশ ও জাতীয় দ্বন্দ্বের স্থায়ী প্রাধান্যের স্বীকৃতির যথাসম্ভব কাছাকাছি নিয়ে ফেলা? জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রবক্তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই নয় যে তাঁদের তত্ত্বটা ভ্রান্ত, বরং তাঁদের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁদের তাত্ত্বিক কাজকর্মে ন্যূনতম বৈজ্ঞানিক সততাটুকুও অনুপস্থিত[৭]।

৭ [সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও আমলা-মুৎসুদ্দি পুঁজিবাদের "জোট"এর সঙ্গে জনগণের দ্বন্দ্বই প্রধান দ্বন্দ্ব—ভারতে আমাদের প্রতিপক্ষীয়দের এই তত্ত্ব প্রথম উপস্থাপিত হয় আজ থেকে তিন বৎসর আগে। ঠিক তার পরেই সি পি আই (এম-এল)এর ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি কর্তৃক আমার বর্তমান প্রবন্ধটি প্রচারিত হয় (বেআইনীভাবে ও গোপনে)। ইতিমধ্যে তাঁদের তত্ত্বটির কিছুটা চেহারাবদল ঘটেছে। তাতে আমার এই তুচ্ছ প্রবন্ধটি কোনো ভূমিকা পালন করেছে কিনা জানি না তবে তার ফলে আমাদের প্রতিপক্ষীয়দের অভিপ্রায় সিদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে ঠিক উল্টোটাই ঘটেছে—অর্থাৎ তাঁদের সুবিধাবাদী চরিত্রবৈশিষ্ট্য এবং জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষক হিসাবে তাঁদের প্রকৃত স্বরূপ ফাঁস হয়ে গেছে আরো নগ্নভাবে। প্রথমত আগে তাঁরা বলতেন যে উপরোক্ত "জোট"টি আধা-উপনিবেশে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন, সুতরাং সেই জোটের সঙ্গে জনগণের দ্বন্দ্ব প্রধান; আজ সেই জোটের রাষ্ট্রক্ষমতা-সংক্রান্ত তাঁদের আদিপ্রতিজ্ঞাটি নীরবে পরিত্যাগ করাই তাঁরা সুবিধাজনক মনে করছেন, কিন্তু তবু নির্লজ্জের মতো আঁকড়ে রয়েছেন সেই জোটের সঙ্গে জনগণের দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-সংক্রান্ত তাঁদের সিদ্ধান্তটিকে। অর্থাৎ নিজেদের যুক্তিতেও সুবিধাবাদীরা সঙ্গতিনিষ্ঠ থাকে না, মাল গছানোর জন্য আশ্রয় নেয় যে কোনো গোঁজামিল ও ভেজালের। দ্বিতীয়ত আজ আর তাঁরা উপরোক্ত জোটের সঙ্গে জনগণের দ্বন্দ্বকে খোলাখুলি স্থায়ীভাবে প্রধান

পক্ষান্তরে আধা-উপনিবেশ সম্বন্ধে আমাদের (এবং মাওয়ের) যে তাত্ত্বিক ধারণা (যে এখানে দেশীয় শাসকশ্রেণীগুলির হাতেই রাষ্ট্রক্ষমতা রয়েছে এবং সাম্রাজ্যবাদ তাদের সঙ্গে আঁতাতবদ্ধ হলেও রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদার নয়) তাতে উপরে বর্ণিত এইসব অসুবিধা ও স্ববিরোধের উদ্ভব ঘটে না। কারণ সেই ধারণা অনুযায়ী রাষ্ট্রক্ষমতা সাম্রাজ্যবাদের হাতে, নাকি আত্মসমর্পণকারী দেশীয় শাসকশ্রেণীর হাতে, এটাই উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশের গুণগত পার্থক্যের ভিত্তি। একই সঙ্গে সামন্ত দ্বন্দ্ব প্রধান না জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান এ প্রশ্ন মীমাংসা করারও [ন্যূনতম ও আবশ্যিক] নিরিখ হল: রাষ্ট্রক্ষমতা দেশীয় শাসকশ্রেণীগুলির হাতেই রয়েছে, নাকি সেই রাষ্ট্রক্ষমতাকে প্রত্যক্ষভাবে নিজের দখলে নিয়ে আসার জন্য সাম্রাজ্যবাদ আগ্রাসন শুরু করেছে। সবই এখানে তীক্ষ্ণ, স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। কোথাও ভুল বোঝাবুঝির এতটুকু অবকাশ নেই।

আমাদের সামনে বিচার্য বিষয় ছিল আধা-উপনিবেশের রাষ্ট্রক্ষমতা সম্বন্ধে দুটি তাত্ত্বিক ধারণা। নানা দিক থেকে আমরা বিস্তারিত বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখালাম যে আমাদের প্রতিপক্ষীয়দের প্রস্তাবিত ধারণাটিকে প্রথম দৃষ্টিতে খুবই নির্দোষ ও স্বাভাবিক ব'লে মনে হলেও আসলে বিভিন্ন বাস্তব ঘটনার ব্যাখ্যাদানে তা নিতান্তই অকেজো এবং বিভিন্ন বাস্তব সমস্যার সমাধানে একেবারেই অপারগ। সুতরাং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে যদি অবিচল থাকতে হয় তাহলে তা আমাদের প্রত্যাখ্যান করতেই হবে।

ব'লে বেঁধে দিচ্ছেন না। তাঁরা বলেছেন যে এক পর্যায়ে জোটটির সঙ্গে দ্বন্দ্ব প্রধান থাকে, আরেক পর্যায়ে প্রধান হয় কোনো একটি বিশেষ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে দ্বন্দ্ব। কিন্তু তারপরেই তাঁরা যোগ ক'রে দিচ্ছেন যে যে-পর্যায়ে জোটটির সঙ্গে দ্বন্দ্ব প্রধান থাকে সে পর্যায়েও সাম্রাজ্যবাদই জোটটির প্রধান দিক, উপরন্তু একটি বিশেষ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিই হয় আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যস্থল। তাহলে আর জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান হতে বাকী রইল কি? এই পর্যায়েও জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান, ঐ পর্যায়েও জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান। তাছাড়া জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্যের যে "স্বতন্ত্র" একটি পর্যায় সূত্রায়ণ করার ভান তাঁরা করেছেন তা পূর্ববর্তী পর্যায় থেকে ভিন্নই বা কোন অর্থে? জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্যের পর্যায়ে উত্তরণ ঘটেছে কিনা তা নির্ধারণ করার নিরিখ কি? নিরিখ বলতে তাঁরা যা দিয়েছেন তা হল: বিপ্লবের বিকাশের কোনো এক পর্যায়ে, বিশেষত যখন বিপ্লবী আন্দোলন এক উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয়, ইত্যাদি। প্রধান দ্বন্দ্বের সমস্যা সমাধানে তাঁরা মাওয়ের অনুসারী ব'লে দাবী করলেও তাঁদের এসব "নিরিখ" যে শুধু মাওয়ের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা তা-ই নয়, এগুলো আসলে কোনো নিরিখই নয়, ফাঁকা কথামাত্র। এর পরেও কি কারো কোনো সন্দেহ থাকতে পারে যে আমাদের মতো দেশগুলিতে তাঁরা আসলে জাতীয় দ্বন্দ্বের স্থায়ী প্রাধান্যেই বিশ্বাসী এবং এ প্রসঙ্গে মাওয়ের তত্ত্বকে তাঁরা খারিজ করতে চান? কি চমৎকার বীরত্বপূর্ণ পদ্ধতিই না তাঁরা গ্রহণ করেছেন নিজেদের বিশ্বাস প্রচার করার জন্য!]

অপরপক্ষে আজ থেকে কয়েক যুগ আগে মাও এ সম্বন্ধে যে ধারণা উপস্থিত করেছিলেন এবং আমরা যাকে স্বাধীনভাবে পরীক্ষা ও বিচার ক'রেই গ্রহণ করেছি, আজও পর্যন্ত তারই উপযোগিতা সবদিক থেকে সম্পূর্ণ অটুট রয়েছে এবং তাকে পরিত্যাগ বা সংশোধন করার কোনো প্রয়োজন দেখা দেয়নি।

আমাদের সঙ্গে জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকদের লড়াইটা আসলে মাওয়ের সঙ্গেই তাঁদের ছদ্মবেশী লড়াই এবং সে লড়াইয়ে দুর্ভাগ্যক্রমে আবার মাওই জিতলেন।

৭.

সম্পাদকের আরো তিনটি প্রশ্নের জবাব দিয়ে এ প্রবন্ধের ইতি টানব।

প্রথম প্রশ্ন ॥ "আচ্ছা, 'সামন্তবাদের সঙ্গে ব্যাপক জনগণের দ্বন্দ্ব' সূত্রায়ণ-টির দ্বারা আমরা আসলে কি বোঝাই? মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ার সঙ্গে জনগণের দ্বন্দ্বও কি তার অন্তর্ভুক্ত? যদি অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে কেবল সামন্তবাদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব বলছি কেন, তার পরিবর্তে সাধারণভাবে 'আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব' কথাটা ব্যবহার করাই কি সঠিক হত না? আর যদি অন্তর্ভুক্ত না হয় তাহলে তো 'সামন্ত-বাদের সঙ্গে ব্যাপক জনগণের দ্বন্দ্ব' প্রকৃতপক্ষে পর্যবসিত হয় 'জমিদারশ্রেণীর সঙ্গে কৃষকদের দ্বন্দ্ব'তে, অর্থাৎ চারু মজুমদারের সূত্রায়ণটিই সঠিক হয়ে দাঁড়ায়। আপনার লেখায় আপনার যে চিন্তার পরিচয় মেলে তা হল: সামন্তবাদের সঙ্গে ব্যাপক জনগণের দ্বন্দ্ব = আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব = সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় শাসকশ্রেণীর জোটের সঙ্গে ব্যাপক জনগণের দ্বন্দ্ব, যার অর্থ মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ার সঙ্গে জনগণের দ্বন্দ্বও এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু যেহেতু 'সামন্ত দ্বন্দ্ব' বা 'সামন্তবাদের সঙ্গে ব্যাপক জনগণের দ্বন্দ্ব' সূত্রায়ণটি আপনি ব্যবহার করেছেন, এবং আভাস দিয়েছেন যে এ দ্বন্দ্বটা হল 'সামন্ত অবশেষ'এর সঙ্গে জনগণের, তাই সেদিক থেকে আবার মনে হয় যে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ার সঙ্গে জনগণের দ্বন্দ্বটাকে আপনি এর অন্তর্ভুক্ত করছেন না। আপনার চিন্তাটা ঠিক কি?"

জবাব ॥ ইতিপূর্বে উদ্ধৃত বক্তব্যে আমাদের প্রতিপক্ষীয়রা তাঁদের উদ্ভাবিত যে "দ্বন্দ্ব"টিকে প্রধান দ্বন্দ্ব ব'লে পেশ করেছেন, এবং যেভাবে সেটা পেশ করেছেন, তা আলোচনা করলেই এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়ে যাবে।

চীনে ১৯২৪-২৭ এবং ১৯২৭-৩৭ এই দুটো পর্যায়েই প্রধান দ্বন্দ্ব ছিল সামন্ত-বাদের সঙ্গে ব্যাপক জনগণের। কিন্তু ১৯২৪-২৭এ এই দ্বন্দ্বের এক মেরু গঠিত হয়েছিল সমগ্র বুর্জোয়াশ্রেণীসহ জনগণের দ্বারা (বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে একটা মুৎসুদ্দি অংশের জন্ম তখন হয়ে গেলেও তারা তখনও খোলাখুলি দলত্যাগ করেনি এবং রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হয়নি) ও অপর মেরু গঠিত হয়েছিল সাম্রাজ্য-

বাদ ও সামন্তশ্রেণীর জোটের দ্বারা (অর্থাৎ কেবল জমিদারশ্রেণী ও কৃষকদের দ্বারা মেরুদুটি গঠিত হয়নি।) আর ১৯২৭-৩৭এ এই একই দ্বন্দ্বের এক মেরু গঠিত হয়েছিল বুর্জোয়াশ্রেণীর কেবল জাতীয় অংশটুকুসহ জনগণের দ্বারা (বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে লুকিয়ে-থাকা প্রতিক্রিয়াশীল মুৎসুদ্দিরা ততদিনে খোলাখুলি দলত্যাগ ক'রে অপর মেরুতে যোগ দিয়ে ফেলেছে) ও অপর মেরু গঠিত হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদ, মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও সামন্তবাদের জোটের দ্বারা (অর্থাৎ কেবল জমিদারশ্রেণী ও কৃষকদের দ্বারা মেরুদুটি গঠিত হয়নি।) ১৯২৪-২৭ ও ১৯২৭-৩৭ এই দুটি পর্যায়ের মধ্যে প্রধান দ্বন্দ্বের দিক থেকে কোনো তফাৎ ছিল না, তফাৎ ছিল কেবল সেই একই প্রধান দ্বন্দ্বের মেরুবিন্যাসে। তা থেকে এটাই বেরিয়ে আসে যে 'প্রধান দ্বন্দ্ব কি?' আর 'সেই প্রধান দ্বন্দ্বের দুটি মেরু বিভিন্ন সময়ে কোন কোন শ্রেণীর দ্বারা গঠিত হচ্ছে?' এ দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রশ্ন এবং তাদের জবাবও সম্পূর্ণ আলাদা। বিপ্লবের একটা নির্দিষ্ট স্তরে যেসব মৌলিক কর্তব্য থাকে সেগুলোর মধ্যে আপাতত যেটার সম্পাদনে সমাজের ব্যাপকতম অংশ (বিশেষত বুনিয়াদী জনতা) সবচেয়ে জরুরী ভিত্তিতে আগ্রহী সেটাই 'প্রধান দ্বন্দ্ব কি?' প্রশ্নটির জবাব দেয়। আর আপাতত যেসব শ্রেণী সেই কর্তব্য সম্পাদনে বিভিন্ন মাত্রায় আগ্রহী ও সচেষ্ট তারা সকলে তখনকার মতো প্রধান দ্বন্দ্বের এক মেরু গঠন করে এবং যেসব শ্রেণীর মৌলিক স্বার্থগত অবস্থান তাদেরকে প্রথমোক্ত শ্রেণীগুলির প্রয়াস প্রতিরোধ ও দমন করতে প্রবৃত্ত করে তারা সকলে তখনকার মতো প্রধান দ্বন্দ্বের অন্য মেরু গঠন করে।

আমাদের প্রতিপক্ষীয়রা কিন্তু প্রধান দ্বন্দ্বের মেরুদুটির শ্রেণীগঠন বর্ণনা ক'রেই মনে করলেন যে 'প্রধান দ্বন্দ্ব কি?' প্রশ্নেরও জবাব দেওয়া হয়ে গেছে। এই প্রধান দ্বন্দ্বের সামাজিক অন্তর্বস্তু কি সামন্তবাদবিরোধিতা না সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা (না আর কিছু), এই প্রধান দ্বন্দ্বের চরিত্র কি বাহ্যিক না আভ্যন্তরীণ, এইসব প্রশ্নের সুস্পষ্ট জবাব দেওয়ার প্রয়োজনটাই তাঁরা অগ্রাহ্য করলেন কিন্তু এই অস্পষ্টতার আড়ালে লুকিয়ে আসলে হাজির করলেন জাতীয় দ্বন্দ্বকেই প্রাধান্য দেওয়ার দাবী।

অথচ তাঁরা তাঁদের প্রধান দ্বন্দ্বের মেরুদুটিকে যেভাবে গঠন করেছেন তাতে মাওয়ের তত্ত্ব অনুযায়ী কিন্তু সামন্ত দ্বন্দ্ব তথা আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বেরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কেননা জাতীয় দ্বন্দ্ব যখন প্রাধান্যে থাকে তখন দ্বন্দ্বের প্রতিক্রিয়াশীল মেরুতে থাকে কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় কিছু বিশ্বাসঘাতক (কিন্তু দেশীয় কোনো শ্রেণী নয়)। আর দ্বন্দ্বের প্রতিক্রিয়াশীল মেরুতে যখন থাকে সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় শাসকশ্রেণীগুলির জোট, তখন সেই প্রধান দ্বন্দ্বের চরিত্র সর্বদাই হয় আভ্যন্তরীণ (চীনে কি ১৯২৪-২৭এ, কি ১৯২৭-৩৭এ, কি

১৯৪৫-৪৯এ সর্বদাই তা-ই হয়েছে)। এবং আমাদের মতো দেশে—আধা-সামন্তবাদী শোষণে জর্জরিত কৃষকপ্রধান দেশে—বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের মধ্যে সামন্ত দ্বন্দ্ব ছাড়া আর কি প্রধান হতে পারে, সামন্তবাদবিরোধিতা ছাড়া আর কি হতে পারে সেই প্রধান দ্বন্দ্বের সামাজিক অন্তর্বস্তু ?

আমার মনে হয় এ সম্বন্ধে মাওয়ের বক্তব্য এবং এই বইয়ের প্রথম খণ্ডে তার যে ব্যাখ্যা আমি দিয়েছি সেটা যথেষ্ট মনোযোগের সঙ্গে বিবেচনা না করার ফলেই এই প্রশ্নে নানা বিভ্রান্তি দেখা দিচ্ছে। 'দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে' প্রবন্ধের চতুর্থ অংশের পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম অনুচ্ছেদে মাও আধা-ঔপনিবেশিক চীনে "প্রধান দ্বন্দ্ব ও অপ্রধান দ্বন্দ্বসমূহের সম্পর্কে"র "জটিল চিত্র"টাকে ব্যাখ্যা করেছেন। পঞ্চম অনুচ্ছেদে তিনি সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্যের পরিস্থিতি বিচার ক'রে দেখাচ্ছেন : (১) জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রতিক্রিয়াশীল মেরুতে থাকে সাম্রাজ্যবাদ ও "কিছু বিশ্বাসঘাতক" এবং (২) জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রাধান্যে আসার আগে সামন্ত দ্বন্দ্বটাই প্রাধান্যে থাকে, আর ১৯৩৭-৪৫এ যেহেতু জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রাধান্যে ছিল অতএব তার আগে অর্থাৎ ১৯২৪-২৭ ও ১৯২৭-৩৭এ সামন্ত দ্বন্দ্বই নিশ্চয় প্রাধান্যে ছিল। ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে তিনি সাম্রাজ্যবাদের "মৃদুতর" ও অসামরিক নিপীড়ন এবং "আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে"র প্রাধান্যের একটি পরিস্থিতি বিচার ক'রে দেখাচ্ছেন : (১) আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের এক মেরুতে রয়েছে "সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তশ্রেণীগুলির মৈত্রী" যার বিরুদ্ধে জনগণ গৃহযুদ্ধ চালাচ্ছে (সুতরাং কেবল জমিদারশ্রেণী ও কৃষকদের দ্বারা মেরুদুটি গঠিত নয়) এবং (২) ১৯২৬-২৭ ও ১৯২৭-৩৭এ আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বই প্রাধান্যে ছিল (কিন্তু উপরের বক্তব্য থেকেই এটা পরিষ্কার যে এই আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সামন্ত দ্বন্দ্বই, "জোট" মার্কা অন্য কোনো দ্বন্দ্ব নয়।) সপ্তম অনুচ্ছেদে তিনি গৃহযুদ্ধের এক উন্নত পর্যায়ে সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক ভিতর থেকে বিপ্লবী ফ্রণ্ট ভাঙা কিংবা দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের সাহায্য করার জন্য সামরিক হস্তক্ষেপ (আগ্রাসন নয়) ও তজ্জনিত পরিস্থিতি বিচার ক'রে বলছেন : "এইরকম সময়ে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় প্রতিক্রিয়া বেশ খোলাখুলি এক মেরুতে দাঁড়ায় আর জনসাধারণ দাঁড়ায় অন্য মেরুতে, এইভাবে তারা গ'ড়ে তোলে প্রধান দ্বন্দ্বটিকে…।" মাও এখানে মেরুদ্বয়ের গঠন বিশ্লেষণ করেছেন, তার চরিত্র ও বিষয়বস্তু সরাসরি উল্লেখ করেননি। তাই আমাদের উপমহাদেশের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মহলে নানা বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে [আর সে বিভ্রান্তিকে আরো বিভ্রান্তিকরভাবে পরিষ্কার ক'রে দিয়েছেন মার্কিনমুলুকের ডিক ওয়েনস্কট]। আমাদের প্রতিপক্ষীয়রা এই সুযোগে এমন একটা ধারণা ছড়ানোর চেষ্টা করছেন যেন মাও নিজেও এখানে তাঁদের মতোই সব কড়াকড়ি পার্থক্যের "যান্ত্রিকতা" থেকে মুক্ত হতে চেয়েছেন এবং না-আভ্যন্তরীণ-না বাহ্যিক তথা না-জাতীয়-না-

সামন্ত গোছের এক তৃতীয় ধরনের প্রধান দ্বন্দ্বের ইঙ্গিত দিয়েছেন। কিন্তু ন্যূনতম সতর্কতাসম্পন্ন পাঠকের পক্ষে এই ভ্রান্তির স্বরূপ উন্মোচন আদৌ কঠিন হওয়ার কথা নয়। কেননা মাও তারপরেই তাঁর বক্তব্যের যে দুটি দৃষ্টান্ত হাজির করেছেন সে দুটোই গৃহযুদ্ধের দৃষ্টান্ত: বিপ্লবোত্তর রাশিয়া ও ১৯২৭-৩৭এর চীন; উপরন্তু আমরা তো একটু আগেই দেখলাম যে ১৯২৭-৩৭এর চীনে সামন্ত দ্বন্দ্বই প্রধান ছিল। সুতরাং দুটো সিদ্ধান্ত: (১) সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের জোটের সঙ্গে ব্যাপক জনগণের সংগ্রামের চরিত্র সর্বদাই আভ্যন্তরীণ এবং (২) আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্তবাদী দেশে প্রধান স্থানাধিকারী "আভ্যন্তরীণ" দ্বন্দ্বটি সর্বদাই সামন্ত দ্বন্দ্ব অর্থাৎ তার সামাজিক অন্তর্বস্তু সামন্তবাদবিরোধিতা।

বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যেকার প্রতিক্রিয়াশীল বৃহৎ, মুৎসুদ্দি অংশটা চীনে দলত্যাগ করে ১৯২৭ সালে আর এই উপমহাদেশে এই প্রক্রিয়া চূড়ান্তভাবে নিষ্পন্ন হয় ১৯৪৭ সালে। তারপর থেকে এখানেও প্রধান দ্বন্দ্বের এক মেরুতে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদ (পরে তার সঙ্গে সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ), সামন্তশ্রেণী ও আমলা-মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণীর জোট এবং অপর মেরুতে রয়েছে জনগণ। কিন্তু ঠিক সেই কারণেই তো এখানে বর্তমানে প্রধান দ্বন্দ্বের চরিত্র আভ্যন্তরীণ এবং তাই তার সামাজিক অন্তর্বস্তু সামন্তবাদবিরোধিতা।

উপরের আলোচনার আলোকে এবার সম্পাদকের প্রশ্নটির জবাব দেওয়া সহজ হয়ে গেছে। ভারতীয় সমাজে অনেকগুলি আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব রয়েছে কিন্তু সেগুলোর মধ্য থেকে প্রাধান্যে আসতে পারে কেবল সামন্ত দ্বন্দ্বই। "মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ার সঙ্গে জনগণের দ্বন্দ্ব" অবশ্যই এই প্রধান দ্বন্দ্বের সামাজিক অন্তর্বস্তুর অন্তর্ভুক্ত নয়, অর্থাৎ সামন্ত দ্বন্দ্বের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু এই প্রধান দ্বন্দ্বের মেরুদ্বয় অবশ্যই গঠিত হবে একদিকে সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ, আমলা-মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও সামন্তশ্রেণীর জোট ও অন্যদিকে ব্যাপক জনগণের দ্বারা। পক্ষান্তরে চারু মজুমদারের সূত্রায়ণ (=জমিদারশ্রেণীর সঙ্গে কৃষকদের দ্বন্দ্ব) গ্রহণ করার অর্থ হবে প্রধান দ্বন্দ্বের সামাজিক অন্তর্বস্তুর সঙ্গে তার মেরু-দ্বয়ের গঠন-উপাদানকে গুলিয়ে ফেলা। সামাজিক অন্তর্বস্তু নিঃসন্দেহে সামন্তবাদ-বিরোধিতা কিন্তু তা মোটেও জমিদার-কৃষকের সংগ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সুতরাং চারু মজুমদারের সূত্রায়ণ গ্রহণ করার পরিণাম হবে প্রধান দ্বন্দ্ব ও তার ভিত্তিতে গ'ড়ে তোলা সংগ্রামের শত্রুমিত্রের পরিধিকে সঙ্কুচিত ক'রে ফেলা এবং সঙ্কীর্ণতাবাদ দ্বারা বিপ্লবের মারাত্মক ক্ষতিসাধন করা। বাস্তবেও চারু মজুমদারের নেতৃত্বে আমরা এই বিচ্যুতির কবলিত হয়েছিলাম।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ॥ "আপনি নিজেই মাওয়ের যে উক্তি উদ্ধৃত করেছেন তাতে দেখা যায় যে একটা জিনিসের গুণ **প্রধানত** তার প্রধান দিকটা দিয়ে নির্ধারিত

হয়। কিন্তু আপনি [প্রথম খণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে] আপনার সম্পূর্ণ যুক্তিকাঠামোটা দাঁড় করিয়েছেন এই ধারণার ভিত্তিতে যে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের পদ্ধতি অনুযায়ী গুণ **কেবলমাত্র** তার প্রধান দিকটা দিয়ে নির্ধারিত হয় এবং অপ্রধান দিকটা গুণনির্ধারণে কোনো অংশই নেয় না। কিন্তু মাওয়ের 'প্রধানত' কথাটিতে কি এটাই বোঝায় না যে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের প্রচলিত পদ্ধতিতেও অপ্রধান দিকটা গুণনির্ধারণে একটা অংশ নেয়?"

জবাব ॥ মাও এ সম্বন্ধে ঠিক কি বলেছেন? তিনি "প্রকৃতি" ও "গুণ" এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য করেছেন: "একটা জিনিসের **প্রকৃতি** নির্ধারিত হয় **প্রধানত** দ্বন্দ্বের প্রধান দিকের দ্বারা, যে দিকটি প্রাধান্যের অবস্থান অর্জন করেছে তার দ্বারা।…কিন্তু এই পরিস্থিতিটা স্থাণু নয়; দ্বন্দ্বের প্রধান ও অপ্রধান দিকগুলি পরস্পর পরস্পরে রূপান্তরিত হয় এবং তদনুযায়ী জিনিসটার প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়ে যায়। এবং যে **মুহূর্তে** নতুন দিকটা পুরোনো দিকের উপর প্রাধান্য অর্জন করে **সেই মুহূর্তেই** পুরোনো জিনিসটা **গুণগতভাবে** নতুন জিনিসে পরিবর্তিত হয়ে যায়" ('দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে', বড় হরফ আমার)। অর্থাৎ মাওয়ের মতে একটা জিনিসের "প্রকৃতি" নির্ধারিত হয় "প্রধানত" দ্বন্দ্বের প্রধান দিকের দ্বারা, কিন্তু **গুণগত পরিবর্তন** নির্ধারিত হয় **কেবলমাত্র** দ্বন্দ্বের প্রধান দিকটির দ্বারা ("যে মুহূর্তে…সেই মুহূর্তেই" কথাগুলি স্মরণীয়) এবং অপ্রধান দিকটি এই ব্যাপারে কোনো অংশই নেয় না।

বিষয়টার আরেকটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। প্রতিটি জিনিসই অগণিত দ্বন্দ্বের সমাহার, যাদের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট সময়ে ও একটা নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে একটা দ্বন্দ্বই প্রধান ও অন্যগুলো অপ্রধান। অন্যভাবে বললে, প্রতিটি জিনিস—অর্থাৎ তার সমগ্র "প্রকৃতি"—অগণিত গুণের সমষ্টি, যাদের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে ও নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে একটি গুণই প্রধান, অন্যগুলো অপ্রধান। প্রত্যেকটি গুণ এক-একটা দ্বন্দ্বের সঙ্গে যুক্ত, প্রধান গুণটি যুক্ত প্রধান দ্বন্দ্বের সঙ্গে। প্রতিটি গুণ তার সহগামী দ্বন্দ্বটির **কেবলমাত্র** প্রধান দিকের দ্বারাই নির্ধারিত হয় এবং অপ্রধান দিকটি এ ব্যাপারে কোনো অংশই নেয় না। কিন্তু জিনিসটির সমগ্র "প্রকৃতি" তার প্রধান-অপ্রধান সবগুলি গুণ তথা দ্বন্দ্ব দ্বারা গঠিত, তাই অপ্রধান গুণ তথা দ্বন্দ্বগুলি, সবগুলি দ্বন্দ্বের অপ্রধান দিকগুলির বিলোপের বিভিন্ন মাত্রা এবং প্রধান দিকগুলির বিকাশের মাত্রার বিভিন্নতা তার প্রকৃতিতে নানা বৈশিষ্ট্য (যদিও অপ্রধান বৈশিষ্ট্য) সংযোজন করে; উপরন্তু তার প্রকৃতি সবগুলি গুণ তথা দ্বন্দ্বের এবং দ্বন্দ্বগুলির প্রধান-অপ্রধান দিকসমূহের **পারস্পরিক সম্পর্ক** দ্বারাও প্রভাবিত হয়। এইসব কারণেই একটা জিনিসের গুণ দ্বন্দ্বের **কেবলমাত্র** প্রধান দিকটির দ্বারা নির্ধারিত হলেও তার "প্রকৃতি" নির্ধারিত হয় **প্রধানত** (কেবলমাত্র নয়) দ্বন্দ্বসমূহের প্রধান

দিকগুলির দ্বারা এবং বিশেষত প্রধান দ্বন্দ্বের প্রধান দিকটির দ্বারা।

কতগুলি সমাজ নেওয়া যাক। এগুলো গুণগতভাবে পুঁজিবাদী হয়েছে কিনা তা কিসের দ্বারা নির্ধারিত হওয়ার কথা? বুর্জোয়াশ্রেণী (তথা বুর্জোয়া উৎপাদনসম্পর্ক) ও সামন্তশ্রেণীর (তথা সামন্তবাদী উৎপাদনসম্পর্কের উপাদানের) দ্বন্দ্বে বুর্জোয়া দিকটি প্রাধান্যে এসেছে কিনা [সে প্রাধান্য কিভাবে নিরূপণ করছি তা ভিন্ন কথা] তা-ই দিয়ে। এ সমাজগুলো 'পুঁজিবাদী' এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সমগ্র "প্রকৃতি" সম্বন্ধে **প্রধান** কথাটা বলা হয়ে গেল বটে কিন্তু সব কথা বলা হল কি? না! সমাজগুলোর প্রধান গুণটা কেবলমাত্র বুর্জোয়া দিকটার প্রাধান্য দ্বারাই নির্ধারিত হলেও তাদের সমগ্র "প্রকৃতি" কিন্তু কেবলমাত্র তার দ্বারা নির্ধারিত হয় না। কেননা সবগুলি সমাজ গুণগতভাবে পুঁজিবাদী হয়ে যাওয়ার পরেও তাদের প্রকৃতিতে পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের হাজারো রকম তফাৎ থেকে যেতে পারে এবং থাকবেই। এমন কি একই ব্র্যাণ্ডের দুটো সিগ্রেটের মধ্যেও অসীম সংখ্যক ছোটোবড় পার্থক্য থাকতে বাধ্য।

এই বইয়ে আমার বিচার্য বিষয় ছিল **গুণ**নির্ধারণ। বিশেষত এক গুণ থেকে আরেক গুণে উত্তরণের প্রক্রিয়াকে কে নিয়ন্ত্রণ করে এটাই ছিল আমার জিজ্ঞাস্য। স্পষ্টতই মাওয়ের মতে তা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় কেবলমাত্র দ্বন্দ্বের প্রধান দিকটির দ্বারা এবং এই দৃষ্টিভঙ্গীকে মাওয়ের উপর আরোপ ক'রে আমি কোনো ভুল করিনি।

তৃতীয় প্রশ্ন[৮] ॥ "একদিকে আপনি সঠিকভাবেই বলেছেন যে 'আধা-সামন্তবাদ' বর্গটির যৌক্তিক ভিত্তি এবং এই চরিত্রায়ণের জন্য ব্যবহৃত উপাত্তগুলির চরিত্র উভয়েই দাবী করে যে পরস্পরবিপরীত দিকদ্বয়-সংক্রান্ত পরিমাণগত তুলনাকে **অগ্রাহ্য** করতে হবে—তা সরাসরিভাবে 'দিক'দুটিরই হোক বা তাদের 'কার্যকরী শক্তি'রই হোক। অথচ আপনিই আবার 'এক অর্থে' সামন্তবাদের 'কার্যকরী শক্তি'র প্রাধান্য মেনে নিয়েছেন (পৃঃ ১০৬)। এই অসঙ্গতি কি আপনার পুরো বিশ্লেষণটাকেই ধ্বসিয়ে দেয় না? আপনার প্রশ্নই তো আপনাকে ফিরিয়ে দেওয়া যায়: এক্ষেত্রে সমাজটাকে 'সামন্তবাদী' না ব'লে 'আধা-সামন্তবাদী' বলব কেন? আধা-উপনিবেশে পরাধীনতা বা স্বাধীনতার দিকের প্রাধান্য, মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ার আত্মসমর্পণের দিকের প্রাধান্য, ইত্যাদি সম্বন্ধেও একই ধরনের প্রশ্ন তোলা যায়।"

জবাব ॥ প্রথম খণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ের ৬নং উপ-পরিচ্ছেদে আমার প্রাসঙ্গিক

৮ [এই প্রশ্নটা আসলে সম্পাদকের চিঠিতে ছিল না। বর্তমান সংস্করণটি প্রস্তুত করার সময় আমিই এটা নিজে তৈরী ক'রে এখানে বসিয়ে দিলাম।]

বক্তব্যটি যথেষ্ট বিশদ নয় ব'লে এ প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক। এর জবাব আসলে লুকিয়ে আছে আমার "এক অর্থে" কথাগুলির মধ্যেই। আধা-সামন্তবাদী সমাজে আমি কেবল "এক অর্থে"ই সামন্তবাদের প্রাধান্যের কথা বলেছি এবং অন্য কোনো অর্থে পুঁজিবাদেরও প্রাধান্যের সম্ভাবনা, প্রচ্ছন্নভাবে হলেও, স্বীকার করেছি। বস্তুত, আধা-সামন্তবাদের নিরিখটি একই সঙ্গে যে দুটো শর্ত পূরণ করে তাদের মধ্যে কেবল **২নং শর্তের অর্থেই** (=পুঁজিবাদের দ্বারা সামন্ত-বাদের পূর্ণ অপসারণের অসম্ভবতার অর্থেই) সামন্তবাদের প্রাধান্য সত্য; পক্ষান্তরে **১নং শর্তের অর্থে**—যেহেতু সামন্তবাদ পরিমাণগতভাবে অপ্রধান হয়ে যাওয়াটা যুক্তিগতভাবে আবশ্যিক তাই **এইদিক থেকে**—আবার পুঁজি-বাদের শক্তির প্রাধান্যও সমান সত্য। আধা-সামন্তবাদী সমাজের বৈশিষ্ট্যই হল এই যে একদিক থেকে দেখলে তাতে সামন্তবাদ প্রধান আর অন্যদিক থেকে দেখলে পুঁজিবাদ প্রধান (যদিও কোনো 'প্রাধান্য'ই সরাসরি পরিমাণগত তুলনার অর্থে নয়), আর ঠিক এই কারণেই তো এক্ষেত্রে এমন একটি বর্গ ব্যবহার করতে হচ্ছে যাতে **দুটি দিকই** গুণনির্ধারণে অংশ নিচ্ছে। পক্ষান্তরে সামন্তবাদী সমাজে পুঁজিবাদ কোনো অর্থেই (এমন কি ১নং শর্তের অর্থেও) প্রধান নয়, আর পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজিবাদ সবদিক থেকেই (১নং ও ২নং উভয় শর্তের অর্থেই) প্রধান।

'আধা-উপনিবেশ' বা 'মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া' বর্গের ক্ষেত্রেও দুটি দিকের প্রাধান্যের বিষয়টা আমাদের একই ভাবে বিবেচনা করতে হবে।

চতুর্থ প্রশ্ন ॥ "আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্তবাদী চরিত্রায়ণটিকে চারু মজুমদার 'পূর্ণ সচেতনতার সঙ্গে, তার **সমস্ত** বাস্তব তাৎপর্যসহ' গ্রহণ করেছিলেন একথা আপনি বলছেন কেন? এইসব প্রশ্নে আপনারই আলোচিত বিচ্যুতিগুলির বীজ অন্তত আংশিকভাবে কি তাঁর মধ্যেই নিহিত ছিল না?"

জবাব ॥ আমার উদ্ধৃত কথাগুলির মধ্যে 'পূর্ণ', 'সমস্ত' এই কথাগুলিকে কালাতীত ও অনপেক্ষ অর্থে নিলে ভুল হবে। কথাগুলি আমি ঐতিহাসিক-আপেক্ষিক অর্থে বলেছি এবং আপেক্ষিক সত্য-সংক্রান্ত মার্কসীয় তত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত কারো কাছে কথাগুলি অগ্রহণীয় মনে হওয়ার কোনো কারণ নেই। আজকের ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে যেটুকু জ্ঞান সম্ভবপর ও যথেষ্ট সেটুকু জ্ঞানই **সেই ঐতিহাসিক পর্যায়ের জন্য** "পূর্ণ"। আজকের মাপকাঠিতে যা পূর্ণ কালকেই তা অযথেষ্ট, সুতরাং অপূর্ণ ও ত্রুটিময় হয়ে দাঁড়ায়।

ভারতীয় বিপ্লব ও ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ১৯৪৭-উত্তর ঐতিহাসিক বিকাশপ্রক্রিয়ার যে নির্দিষ্ট পর্যায় ও সংকটক্ষণটিতে চারু মজুমদার ও তাঁর তত্ত্বের আবির্ভাব সেই নির্দিষ্ট পর্যায়ের দাবী তিনি পূর্ণভাবেই মিটিয়েছিলেন। এই পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য ছিল বিপ্লবী লাইনের সপক্ষে

কর্মীসাধারণের ক্লান্তিহীন সংগ্রাম, ক্রমান্বয়ে 'আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্তবাদী' চরিত্রায়ণটিরই দিকে তাঁদের অবজেকটিভ অগ্রগতি এবং তাঁদের এই বিরামহীন প্রয়াসের বিরুদ্ধে অধঃপতিত নেতৃত্বের পৌনঃপুনিক দক্ষিণ ও বাম সুবিধাবাদ। ভারতীয় বিপ্লবের জীবনমরণ প্রশ্ন কেন্দ্রীভূত হয়েছিল নেতৃত্বের এই বিচুতিগুলিকে পরাজিত করতে পারা-না-পারার উপর। আর এই বিচ্যুতি-গুলির পাল্টা হিসাবে যেসব মৌলিক পথনির্দেশ প্রতিষ্ঠা করা সবচেয়ে জরুরী হয়ে উঠেছিল সেই সবগুলিকেই সুসংগত আকারে পাওয়া সম্ভব ছিল একমাত্র **'আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্তবাদী' চরিত্রায়ণেরই যৌক্তিক তাৎপর্যরূপে।**

'আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্তবাদী' চরিত্রারণের সেই অতি গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্যগুলি কি কি?

প্রথমত বিপ্লবের স্তর বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক এবং এই নির্দিষ্ট যুগে ও নির্দিষ্ট সমাজ-ব্যবস্থায় তা 'নয়া-গণতান্ত্রিক'। রাষ্ট্রক্ষমতায় রয়েছে বৃহৎ আমলা-মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও জমিদারশ্রেণী। বিপ্লবের লক্ষ্যবস্তু হল সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ, আমলা-মুৎসুদ্দি পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদের জোট এবং বিপ্লবের চালিকাশক্তি হল শ্রমিক, কৃষক, শহুরে পেটি বুর্জোয়া ও জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী।

দ্বিতীয়ত প্রধান দ্বন্দ্ব নির্ধারণের সমস্যা মাও-নির্দেশিত পথেই সমাধান করতে হবে।

তৃতীয়ত সংগ্রামের ধরনটা 'রুশ পথ'এর পরিবর্তে 'চীনা পথ'কে অনুসরণ করবে।

চারু মজুমদার যে মুহূর্তটিতে এই উপমহাদেশের ইতিহাসে আবির্ভূত হন তখনকার সবচেয়ে আশু দাবী ছিল আলোচ্য চরিত্রায়ণের এই তাৎপর্য তিনটিকেই অবিলম্বে প্রতিষ্ঠা করা। তিনি ইতিহাসের এই দাবী সম্বন্ধে পুরোমাত্রায় সজাগ ছিলেন এবং সিংহবিক্রমে এই দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এটাকেই বলি তাঁর "পূর্ণ সচেতনতা" এটাই "সমস্ত" বাস্তব তাৎপর্যের স্বীকৃতি। একথা ঠিক যে এই তিনটি তাৎপর্যের উপলব্ধির ব্যাপারে তাঁর বহু ত্রুটি ও ঘাটতি পরবর্তী পর্যায়ে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে [এবং নির্মমভাবেই সেগুলি উদ্‌ঘাটন ক'রে যাওয়া দরকার], কিন্তু তখন পর্যন্ত বাস্তবেই তা ছিল অনুদ্‌ঘাটিত। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই যে হিসাব নিলে আপনারা দেখতে পাবেন, উক্ত ঐতিহাসিক পর্যায়টিতে চারু মজুমদারের যে অসংখ্য সমালোচনা সম্ভবপর হয়েছিল, কি ভারতে কি বাংলাদেশে সর্বত্রই তা ছিল ব্যতিক্রমহীনভাবে **সুবিধাবাদী** দৃষ্টিকোণ থেকে করা। বিপ্লবী অবস্থান থেকে তাঁর ও তাঁর তত্ত্বের সমালোচনা সেই সময় সত্যকার অর্থে সম্ভবই হয়নি (এমন কি চীন থেকেও

না), তা সম্ভব হয় সেই পর্যায় পেরিয়ে যাওয়ার পরে। এই উপমহাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন ও সেই আন্দোলনের মধ্যেকার মতাদর্শগত সংগ্রামের বিকাশের সেই ক্রান্তিক্ষণটির দাবী চারু মজুমদার পুরোপুরিই মিটিয়েছিলেন। আজ যারা রাতারাতি তাঁকে "প্রতিবিপ্লবী" ও "বিশ্বাসঘাতক" ব'লে চিত্রিত ক'রে এই উপমহাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক মহত্তম অগ্রগতির পর্যায়কেই নাকচ করতে চাইছে এবং কর্মীসাধারণকে ফিরিয়ে নিতে চাইছে সংশোধনবাদী শাসনের সেই অন্ধকার দিনগুলিতে সেই প্রবীণ নেতাদের বিরুদ্ধে (বলা ভালো, সেই জিন্দা লাশদের বিরুদ্ধে) সংগ্রামে আমাদের এই কথাটি মনে রাখা অবশ্যপ্রয়োজন।

৪

বাংলাদেশ সীমান্তের ঘটনা[১] ও বাংলাদেশের প্রধান দ্বন্দ্ব

একটি আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্তবাদী দেশে কোন কোন শর্তে জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান হতে পারে তা আমরা ইতিপূর্বে মোটামুটি বিশদভাবে আলোচনা করেছি। কিন্তু সে আলোচনায় একটা গুরুতর অসম্পূর্ণতা থেকে গেছে এই কারণে যে জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান হওয়ার **সবগুলি** শর্ত তাতে যথোপযুক্ত তীক্ষ্ণতা ও স্পষ্টতার সঙ্গে সামনে আসেনি। এই ত্রুটি অবিলম্বে দূর করা প্রয়োজন। ভারতীয় কমরেডদের কাছে হয়তো এর গুরুত্ব এখন পর্যন্ত নিছকই তত্ত্বগত, কিন্তু বাংলাদেশের কমরেডদের কাছে এটা একটা আশু ব্যবহারিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই বাংলাদেশের পরিস্থিতি সামনে রেখেই আমরা বিষয়টার আলোচনা করব।

১.

আমাদের মতে বাংলাদেশে বিপ্লবের বর্তমান অবস্থায় কিছুতেই জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান হতে পারে না। এ বক্তব্যের মূল তাত্ত্বিক ভিত্তিটা এতদিন এই ছিল যে বৈদেশিক আগ্রাসন ব্যতীত আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্তবাদী বাংলাদেশে জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান হওয়া অসম্ভব। এই নিরিখ ভুল নয়। তবে জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান হওয়ার জন্য বৈদেশিক আগ্রাসন যে আবশ্যিক শর্ত (= যা পূরণ না হলে জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান হতে পারে না) কিন্তু যথেষ্ট শর্ত (= যা পূরণ হলে জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান হবেই)[২] নয় এ বিষয়টা যথেষ্ট পরিষ্কার ছিল না।

১ [১৫ আগস্ট ১৯৭৫-এর কু দে'তায় মুজিব সরকার উৎখাত হওয়ার পর মুজিববাদী দস্যু, গুণ্ডা ও হাইজ্যাকাররা এবং প্রচুর বিভ্রান্ত যুবক কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে প্রতিবেশী ভারতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের ছত্রছায়ায় থেকে এরা ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় সীমান্তের ওপার থেকে বিক্ষিপ্ত হামলা ও অন্তর্ঘাত চালিয়ে যেতে থাকে। এদের ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল নিহত "বঙ্গবন্ধু"র আদর্শে একটি মুজিববাদী সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। বর্তমানে এদের অনেকেই হাল ছেড়ে দেশে ফিরে গেছে।]

২ ['আবশ্যিক শর্ত' ও 'যথেষ্ট শর্ত' তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পক্ষে সাধারণভাবেই অতি প্রয়োজনীয় দুটি ধারণা। নানাভাবে এদের কাজে লাগানো যায়। যেমন ধরুন, ১৩৮ ও ১৬৭ পৃষ্ঠায় আমরা

জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকরা তাই প্রশ্ন তুলতে পারছেন : "বাংলাদেশ সীমান্তে আজ যা ঘটছে তা কি বৈদেশিক আগ্রাসন নয়? আপনাদের নিরিখ অনুযায়ীই তো এখানে এখন জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান হওয়ার কথা।"

আসলে অবশ্য বাংলাদেশ সীমান্তে যা ঘটছে তা এখনও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের সর্বাত্মক আগ্রাসন নয়। বাংলাদেশের শাসকশ্রেণীদুটিকে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ ক'রে নিজে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হওয়ার জন্য ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ এখনও তার সর্বাত্মক সামরিক অভিযান শুরু করেনি, বরং এইসব হয়রানিমূলক হামলার দ্বারা হুমকি ও চাপ প্রয়োগ ক'রে সে বাংলাদেশের শাসকশ্রেণীদুটিকে আরো নতিস্বীকার করাতে চাইছে [এবং তার নিজের প্রতি বশংবদ একটি সরকার গঠনে বাধ্য করাতে চাইছে]। এর ফলে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্ব তীব্রতর হয়েছে বটে কিন্তু বাংলাদেশের শাসকশ্রেণীদুটি এখনও তাদের রাষ্ট্রক্ষমতাকে চূড়ান্তভাবে বিপন্ন মনে করছে না, এখনও নানা আপোষরফা ও আন্তর্জাতিক দলাদলির মাধ্যমে তারা এই দ্বন্দ্বকে মোলায়েম ক'রে আনার আশা পোষণ করছে। তাই এমন কি নিছক জাতীয় স্বাধীনতার প্রশ্নেও ব্যাপক জনগণকে জমায়েত করার ন্যূনতম গণতান্ত্রিক শর্তাবলী পূরণে আজও তাদের বাধ্য করা যায়নি। [আজও তারা রাজনৈতিক সমাবেশ ও অন্যান্য কাজকর্মের উপর থেকে কু-পরবর্তী নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেনি,] আজও তারা একদিকে বিপুল জনশক্তির জাগরণকে নানা কালাকানুন দ্বারা শৃঙ্খলিত ক'রে রেখেছে, অন্যদিকে ন্যক্কারজনক দরকষাকষির

বলেছি যে মৌলিক দ্বন্দ্বদুটির মধ্য থেকেই কোনো একটি দ্বন্দ্বকে প্রধান হতে হবে এবং তাদের অতিরিক্ত অন্য কোনো দ্বন্দ্ব কিছুতেই কখনও প্রধান হতে পারে না। বইটা এ পর্যন্ত ছাপা হয়ে যাওয়ার পর বিদেশ থেকে এক কমরেড (র মি) এই বক্তব্যটির একটি সুন্দর, সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ প্রমাণ পাঠিয়েছেন : মাও চিন্তা অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া (ধরুন 'ক') আগাগোড়াই তার বিশিষ্ট মৌলিক দ্বন্দ্বগুলির দ্বারা নির্ধারিত (১৩৬ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি দ্রঃ) ; অর্থাৎ ঐ মৌলিক দ্বন্দ্বগুলি 'ক' প্রক্রিয়ার গোটাটার জন্যই আবশ্যিক শর্ত—যা পূরণ না হলে প্রক্রিয়াটি আর 'ক' থাকতেই পারে না, অন্য কোনো প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়ে যায় ; সুতরাং কোনো এক পরিস্থিতি একদিকে 'ক' প্রক্রিয়ারই অন্তর্ভুক্ত একটি পর্যায় হবে আর অন্যদিকে তা প্রধানত নির্ধারিত হবে 'ক' প্রক্রিয়ার আবশ্যিক শর্তাবলীর (= মৌলিক দ্বন্দ্বগুলির) বহির্ভূত কোনোকিছুর দ্বারা—এটা যুক্তিগতভাবেই স্ববিরোধী ; অতএব আমাদের দেশে নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কোনো পর্যায়েই মৌলিক দ্বন্দ্বদুটির বাইরের কোনো দ্বন্দ্ব প্রধান হওয়া সম্ভব নয়। কিছুদিন আগে এই যুক্তিটা পেলে আমি অবশ্যই তা ১ম খণ্ডের ৫ম অধ্যায়ের ৩য় অংশে ঢুকিয়ে দিতাম, কারণ ওয়েনস্কট প্রমুখদের তত্ত্বকে এক ধাক্কায় নিঃশেষে ধ্বসিয়ে দেওয়ার জন্য এটাই আবশ্যিক ও যথেষ্ট শর্ত! ওয়েনস্কটরা যদি এ বিপদ থেকে এই ব'লে পার পেতে চান যে তারা মৌলিক দ্বন্দ্বদুটির বাইরের কোনো দ্বন্দ্বকে প্রধান করেছেন না, বরং দুটি মৌলিক দ্বন্দ্বকেই একত্রে প্রধান করছেন, তাহলে তা আবার হয়ে দাঁড়াবে একই সঙ্গে একাধিক প্রধান দ্বন্দ্ব স্বীকার করার ভিয়েতনামী-আলবেনীয় দার্শনিক সংশোধনবাদ।]

পথে তারা বর্তমান সঙ্কট পার হওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। তাই আমাদের ন্যূনতম আবশ্যিক নিরিখটির বিচারেই এ কথা স্বচ্ছন্দে বলা যায় যে সশস্ত্র বৈদেশিক হস্তক্ষেপ ও হয়রানিমূলক হামলার এই পরিস্থিতিতে—অর্থাৎ যতক্ষণ সর্বাত্মক আগ্রাসন শুরু না হচ্ছে এবং দেশীয় শাসকশ্রেণীদুটি যতক্ষণ তাদের রাষ্ট্রক্ষমতাকে চূড়ান্তভাবে আক্রান্ত মনে না করছে ততক্ষণ—বাংলাদেশে কোনোমতেই জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান হতে পারে না। অবশ্য এ কথা অনস্বীকার্য যে একটি সম্প্রসারণবাদী শক্তির এই ধরনের অশুভ তৎপরতার মধ্যে সর্বাত্মক আগ্রাসনের সম্ভাবনা সবদাই নিহিত থাকে। এই যুক্তিতে কেউ যদি এই ঘটনাগুলিকে নিশ্চিত আগ্রাসনেরই পাঁয়তারা ব'লে অভিহিত করেন তবু কিন্তু বাংলাদেশে বর্তমানে জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্যে তিনি বিশ্বাস করতে পারেন না, কেননা 'আগ্রাসনের পাঁয়তারা'ও 'আগ্রাসন' থেকে ভিন্ন। আজকের ঘটনাগুলো সর্বাত্মক আগ্রাসনের রূপ নেবে কিনা, নিলেও তা কবে, এসব এখনই নির্ধারণ করা সম্ভব নয় কারণ তা আরো নানা বাস্তব শর্ত পরিপূরণের উপর নির্ভরশীল।

কিন্তু আসল কথা হল, আলোচ্য ঘটনাগুলি সশস্ত্র হস্তক্ষেপ না হয়রানিমূলক হামলা নাকি আগ্রাসনের পাঁয়তারা—এই বিতর্কটাকে পুরোপুরি বাদ দিয়েই আমাদের বর্তমান আলোচনা চলতে পারে। কেননা তর্কের খাতিরে **যদি এগুলোকে এমন কি আগ্রাসনেরই দৃষ্টান্ত ব'লে মেনেও নিই তবু তাতে জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য প্রতিপন্ন হয়ে যায় না।** আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্তবাদী দেশে জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্যের অবস্থা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মাও বলেছেন: "সাম্রাজ্যবাদ যখন এমন একটি দেশের বিরুদ্ধে আগ্রাসী যুদ্ধ চালায় তখন কিছু বিশ্বাসঘাতক ব্যতীত তার সবগুলি বিভিন্ন শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একটি জাতীয় যুদ্ধে সাময়িকভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে" ('দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে')। এর অর্থ: জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান হওয়ার জন্য কেবল বৈদেশিক আগ্রাসনই যথেষ্ট নয়, সে আগ্রাসনকে এমন ব্যাপক ও সর্বাত্মক রূপ নিতে হবে যাতে আপোষরফার মাধ্যমে দেশীয় শাসকশ্রেণীদুটির রাষ্ট্রক্ষমতা রক্ষার সকল সম্ভাবনা বিলুপ্ত হয় এবং দেশীয় শাসকশ্রেণীদুটিসহ দেশের সবগুলি শ্রেণী একটি জাতীয় যুদ্ধে **ইতিমধ্যেই** ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়[৩]।

বাংলাদেশে জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকদের মধ্যে দুটো ধারা বেরিয়ে এসেছে। এক ধারার প্রতিনিধিরা দেশীয় শাসকশ্রেণী ও তাদের বর্তমান

৩ [যাঁদের সন্দেহ হচ্ছে যে মাওয়ের একটা উদ্ধৃতি থেকে এখানে আমি আমার মতের সপক্ষে বড় বেশী "অর্থ" আদায় ক'রে নেওয়ার চেষ্টা করছি, তারা এই প্রবন্ধের ৩নং অংশ পর্যন্ত ধৈর্য ধরুন।]

সরকারের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেছেন এবং সেই ঐক্যের কাঠামোর মধ্যেই কিছু গৎবাঁধা দাবী তুলছেন। অপর ধারার প্রতিনিধিরা এই কাজকে "নির্লজ্জ লেজুড়বৃত্তি" ব'লে গালাগালি দিচ্ছেন এবং নিরলস সংগ্রামের পথেই বিভিন্ন আশু জরুরী দাবী আদায়ের ঘোষণা রাখছেন। শেষোক্তদের বিপ্লবী আন্তরিকতা ও সদিচ্ছার প্রতি সহানুভূতি দেখানো যেতে পারে কিন্তু তাঁদের যুক্তিসঙ্গতির আদৌ প্রশংসা করা চলে না। কারণ জাতীয় দ্বন্দ্ব যদি সত্যই প্রধান হয়ে গিয়ে থাকে এবং জাতীয় যুদ্ধই যদি এই মুহূর্তের কাজ হয়ে থাকে তবে অবশ্যই "কিছু বিশ্বাসঘাতক"কে বাদ দিয়ে দেশীয় শাসকশ্রেণীগুলির সঙ্গে জনগণ ও কমিউনিস্টদের ঐক্যফ্রন্ট **ইতিমধ্যেই** বিদ্যমান থাকতে হবে এবং দেশীয় শাসকশ্রেণীগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে হবে সেই ঐক্যফ্রন্টের কাঠামোর মধ্যেই। আর মজার ব্যাপার এই যে উভয়পক্ষই অন্তত মুখে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন যে দেশীয় শাসকশ্রেণীদ্বয় ও তাদের সরকার এখনও জনগণের ন্যূনতম জাতীয়-গণতান্ত্রিক দাবীগুলো মেটায়নি, এমন কি নিছক জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্যও ব্যাপক জনগণকে সমাবেশ ও সংগঠিত করার সামান্যতম শর্তাবলীও পূরণ করেনি এবং রুশ ভারত জোটের সঙ্গে সম্পাদিত গোপন ও অসম চুক্তিসমূহ প্রকাশ ও নাকচ করেনি। কিন্তু তা-ই যদি হয়ে থাকে তাহলে কি নিছক জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষার স্বার্থেও এইসব দাবী ও শর্ত পূরণের জন্য দেশীয় শাসকশ্রেণীদ্বয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাটাই কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে জনগণের আশু প্রধান রণকৌশলগত কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় না? আর তার মানে তো দেশে এখনও আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বই প্রধান হয়ে রয়েছে!

২.

ঠিক এই কথাটাই আমরা বলতে চাই।

বাংলাদেশের সীমান্তে আজ যেসব ঘটনা ঘটছে সেগুলোর সম্ভাব্য তাৎপর্যের প্রতি আমরা উদাসীন নই, উদাসীন থাকতেও পারি না। জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি এগুলো যে মারাত্মক হুমকি বহন করে তা নিশ্চয়ই জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে, তাঁদের দেশপ্রেম জাগিয়ে তুলতে হবে, প্রতিরোধের জন্য তাঁদের প্রস্তুত ও সংগঠিত করতে হবে এবং এই কাজ করার পথে সরকার যেসব প্রতিবন্ধ কায়েম ক'রে রেখেছে সেগুলোর বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রামে তাঁদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এমন কি জাতীয় প্রতিরোধযুদ্ধের জন্য ঐক্যফ্রন্টে সমবেত হওয়ার ডাক বা দাবীও এখন থেকেই তোলা যেতে পারে। জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকদের সঙ্গে মৌলিক মতপার্থক্য সত্ত্বেও এসব কাজে

আমরা যে কেবল নির্দ্বিধায় তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করব তা-ই নয়, এসব দায়িত্বপালনে আমরাই থাকব সকলের সামনে। এ বিষয়ে যদি আমাদের মধ্যে কারও ভুল ধারণা থেকে থাকে তবে এখনই তার সংশোধন হওয়া দরকার। আমাদের মতো দেশগুলিতে সর্বদাই জাতীয় ও গণতান্ত্রিক কর্তব্যাবলী ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে, কাজেই আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব প্রধান হওয়ার অজুহাতে আমরা যতই জাতীয় দিকটিকে অবহেলা করব ততই তা জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্যের ভ্রান্ত তত্ত্বটিকে টি'কে থাকার অবলম্বন জুগিয়ে যাবে। কিন্তু পাশাপাশি জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকদের বিরুদ্ধে যে বিষয়টি তত্ত্বগতভাবে এবং আমাদের ব্যবহারিক কাজকর্মের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত জোরের সঙ্গে তুলে ধরা দরকার তা হল: সীমান্তের ঘটনাবলীকে যদি এমন কি আগ্রাসনের দৃষ্টান্ত ব'লেও মেনে নেওয়া যায় তবু তাতে জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য প্রমাণিত হয় না, বরং মাও সেতুঙ চিন্তাধারা অনুযায়ী তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থায় প্রধান থাকে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বই।

কিন্তু এই আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের সামাজিক অন্তর্বস্তু কি? একে কেন্দ্র ক'রে দেশের বিভিন্ন শ্রেণী কিভাবে মেরুবিন্যস্ত হয়ে আছে?

আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্তবাদী বাংলাদেশে আভ্যন্তরীণ শ্রেণী-সংগ্রামের প্রধান অন্তর্বস্তু সামন্তবাদবিরোধিতা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে নানা ধরনের বিচ্যুতি প্রচলিত। বেশীর ভাগই নিজেদের দেশের সামন্ত অংশেষের বাস্তব মাত্রা ও চরিত্র বিচারের দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়ে প্রাক-বিপ্লব চীনের সেই জমিদারকেন্দ্রিক সামন্ত-ব্যবস্থাটাকেই কল্পনায় হুবহু নিজেদের সমাজের উপর চাপিয়ে দেন এবং ইতিমধ্যে সামন্ত অবশেষের যে বিরাট ক্ষয় ও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে ও বণিক-মহাজনী পুঁজির যে বিপুল আধিপত্য কায়েম হয়েছে তাকে মোটে হিসাবের মধ্যেই আনতে চান না। অন্যেরা আবার দেশের অর্থনীতিতে বণিক-মহাজনী পুঁজির বিপুল আধিপত্যবিস্তারের বাস্তবতাকে স্বীকার করেন কিন্তু তা করতে গিয়ে ভুলে যান যে এই বণিক-মহাজনী পুঁজির শোষণের চরিত্রও মূলত আধা-সামন্তবাদী। তাঁরা ভুলে যান যে বণিক পুঁজিকে হয় পুঁজিবাদী সম্পর্কের সঙ্গে জড়িত থাকতে হবে এবং সেক্ষেত্রে তার শোষণের চরিত্র হবে পুঁজিবাদী, আর নাহলে তাকে আধা-সামন্তবাদী সম্পর্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকতে হবে এবং সেক্ষেত্রে তার শোষণের চরিত্র হবে আধা-সামন্তবাদী। পুঁজিবাদীও নয়, আধা-সামন্তবাদীও নয় — এমন তৃতীয় কোনো স্বাধীন ধরনের 'বণিক পুঁজির শোষণে'র অস্তিত্ব অসম্ভব। অথচ এঁরা ঠিক এই অবাস্তব কল্পনাটিই করেন এবং তারপর এই বণিক পুঁজির সঙ্গে ব্যাপক জনগণের দ্বন্দ্বকে 'প্রধান দ্বন্দ্ব'রূপে নির্দেশ ক'রে মনে করেন তাঁরা এমন এক প্রধান দ্বন্দ্ব বের করেছেন যা জাতীয়

দ্বন্দ্বও নয়, সামন্ত দ্বন্দ্বও নয়[৪]! এঁরা বুঝতে পারেন না যে **আমাদের মতো দেশে বণিক পুঁজির সঙ্গে ব্যাপক জনগণের দ্বন্দ্বটি আসলে প্রধানত সামন্ত অবশেষের সঙ্গে ব্যাপক জনগণের দ্বন্দ্বটিরই অন্তর্ভুক্ত**। উপরে উল্লেখিত এই উভয়প্রকারের ভ্রান্তিকে আমরা ইতিপূর্বেই অন্যত্র খণ্ডন করেছি। একদিকে আমরা যেমন আমাদের অর্থনীতিতে বণিক-মহাজনী পুঁজির আধিপত্যবিস্তারের গুরুত্বকে তুলে ধরেছি (সি পি আই (এম-এল)এর ত্রিপুরা প্রাদেশিক কমিটি কর্তৃক প্রচারিত 'ভারতে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন টিঁকে থাকতে পারে?—৪', তরুণ নন্দী, আগস্ট ১৯৭৪ দ্রষ্টব্য), অন্যদিকে তেমনি দৃঢ়ভাবে ব্যাখ্যা করেছি যে এই বণিক-মহাজনী পুঁজির শোষণও আধা-সামন্তবাদী গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ (তরুণ নন্দীর উক্ত প্রবন্ধ এবং এই বইয়ের 'একটি আগ্রহজনক বিতর্ক' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। তাই এ বিষয়ে বিশদ আলোচনায় আমরা এখানে প্রবেশ করব না, কেবল এইটুকুই আবার উল্লেখ করব যে আমাদের মতো দেশে জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রাধান্যে না থাকলে সামন্ত দ্বন্দ্ব ছাড়া আর কোনো দ্বন্দ্ব কোনোমতেই প্রধান হতে পারে না।

তবে সামন্ত দ্বন্দ্বের মেরুদুটির শ্রেণীসমাবেশ বিভিন্ন রকমের হতে পারে : তার প্রতিক্রিয়াশীল মেরুটি গঠিত হতে পারে হয় কেবল সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের জোটের দ্বারা (যেমন ১৯২৭ পর্যন্ত চীনে) কিংবা সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও আমলা-মুৎসুদ্দি পুঁজিবাদের জোটের দ্বারা যেমন ১৯২৭-৩৭ ও ১৯৪৫-৪৯এর চীনে এবং ১৯৪৭এর পর থেকে এই উপমহাদেশের দেশগুলিতে)। আজকের বাংলাদেশে বিদেশী নিপীড়করা ও দেশীয় শাসকশ্রেণীদ্বয় প্রধান দ্বন্দ্বের (সামন্ত দ্বন্দ্বের) একই মেরুতে অবস্থিত কিন্তু তার দ্বারা নিশ্চয়ই বিদেশী শোষক নিপীড়কদের সকলের সঙ্গে বাংলাদেশের শাসকশ্রেণীদুটির একই পরিমাণ দ্বন্দ্ব ও ঐক্যকে বোঝানো হয় না। বাংলাদেশের শাসকশ্রেণীদ্বয়ের আজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সম্পর্ক অপেক্ষাকৃত নিবিড়; রুশ-ভারত জোটের সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্ব বেশ তীব্র ও প্রকট কিন্তু তা এখনও এত তীব্র নয় যাতে এ কথা বলা যায় যে রুশ-ভারত জোটের সঙ্গে বাংলাদেশের শাসকশ্রেণীদ্বয়ের ইতিমধ্যেই পরিপূর্ণ বিচ্ছেদ ঘ'টে গেছে এবং তারা **দুই বিপরীত মেরুতে** বিন্যস্ত হয়েছে। সে কথা বলা যাবে একমাত্র তখনই যখন রুশ-ভারত জোট বাংলাদেশের উপর সর্বাত্মক আগ্রাসন শুরু করবে এবং বাংলাদেশের শাসকশ্রেণীদুটি তার ফলে বাধ্য হবে রুশ-ভারত জোটের সঙ্গে সর্বপ্রকার অসম ও গোপন চুক্তি

৪ বাংলাদেশে প্রকাশিত অক্টোবর ১৯৭৫ তারিখের 'কমিউনিস্ট আন্দোলন ও কমিউনিস্ট ঐক্য' পত্রিকায় সইফ্-উদ্-দাহার তাঁর 'কমিউনিস্টদের ঐক্য প্রসঙ্গে' প্রবন্ধে "ভারতীয় চোরাচালানী পুঁজি ও তাদের বাংলাদেশীয় সহযোগী বণিক পুঁজির সঙ্গে বাংলাদেশের সর্বশ্রেণীর জনগণের দ্বন্দ্বটি"কে বাংলাদেশে বর্তমান পর্যায়ের প্রধান দ্বন্দ্ব ব'লে দাবী করেছেন।

প্রকাশ্যে বাতিল করতে, গণ-প্রতিরোধের ন্যূনতম শর্তাবলী পূরণ করতে ও জনগণের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জাতীয় যুদ্ধ শুরু করতে। তার আগে নয়।

৩.

এতক্ষণ আমরা যে বক্তব্য উপস্থিত করলাম তার বিরুদ্ধে জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকরা এবার নিশ্চয়ই তাঁদের সবচেয়ে মোক্ষম আপত্তিটি হাজির করবেন :

"জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট বাস্তবায়িত হওয়ার পরে জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান হয়, নাকি জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান হওয়ার পরে, এবং তা ইতিমধ্যে প্রধান হয়ে গেছে ব'লেই, জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট বাস্তবায়নের সংগ্রাম শুরু হতে পারে এবং অবশেষে তা বাস্তবায়িত হতে পারে? অর্থাৎ জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান হওয়ার পূর্বশর্ত, নাকি জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্যই জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের পূবশত? সবাই জানে যে জনতার একরোখা সংগ্রামের চাপে না পড়লে আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্তবাদী দেশের শাসকশ্রেণীদুটি কখনোই জনগণের সঙ্গে জাতীয় ঐক্য-ফ্রন্টে সামিল হয় না এবং ঐক্যফ্রন্টের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণ করে না। আপনাদের বক্তব্যের অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান হওয়ার আগেই—অর্থাৎ **আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব প্রধান থাকার অবস্থাতেই**—কমিউনিস্টদের তুলতে হবে জাতীয় প্রতিরোধযুদ্ধ ও জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের দাবী। আপনাদের এই বক্তব্য যুক্তিগতভাবে স্ববিরোধী এবং চীন বিপ্লবের ইতিহাস দ্বারা খণ্ডিত।"

তাঁদের এই বক্তব্য প্রথম দৃষ্টিতে নিতান্ত স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধপ্রায় ব'লেই মনে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এটা গ্রহণ করতে গেলে তার আগে বেশ কিছুটা পরিশ্রম স্বীকার করতে হয় : যুক্তি-পদ্ধতির ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বতত্ত্বের জায়গায় স্থাপন করতে হয় অধিবিদ্যাকে এবং সেইসঙ্গে চীন বিপ্লবের ইতিহাসটাও সংশোধন ক'রে নিতে হয় এই আপত্তিরই প্রয়োজন অনুযায়ী।

প্রথমে যুক্তিপদ্ধতির দিকটাই ধরা যাক। আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব প্রধান থাকার অবস্থায় জাতীয় প্রতিরোধযুদ্ধের আওয়াজ তোলা এবং জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট বাস্তবায়নের সংগ্রাম শুরু করাটা **যুক্তিগতভাবেই** কেন স্ববিরোধী লাগছে তাঁদের কাছে? আসলে আমাদের মতো সমাজে জাতীয় ও গণতান্ত্রিক কর্তব্যাবলী যে সর্বদাই ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং কখনোই যে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন নয় এ কথা মুখে যতই স্বীকার করা হোক না কেন অধিবিদ্যামূলক যুক্তিপদ্ধতি কিছুতেই তা প্রকৃতপক্ষে আত্মস্থ করতে পারে না এবং সবসময়েই ওদুটিকে আকাশপাতাল তফাৎ ক'রে রাখে। এই যুক্তিপদ্ধতির অনুসারীদের মাথায়

তাই কিছুতেই ঢুকতে চায় না যে জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্যের অবস্থায় 'কৃষকের হাতে জমি' দেওয়ার দাবী (যে দাবী ১৯৫৩তেই ভিয়েতনামে বাস্তবায়িত হয়েছিল) যদি যুক্তিগতভাবে স্ববিরোধী না হয়ে থাকে তবে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব প্রধান থাকার অবস্থাতে জাতীয় প্রতিরোধযুদ্ধ ও জাতীয় ঐক্যফ্রণ্টের দাবীও স্ববিরোধী হওয়ার কোনো আবশ্যিক কারণ নেই।

তারপর নেওয়া যাক চীন বিপ্লবের ঐতিহাসিক তথ্যাবলী। ১৯২৭-৩৭ পর্যায়কালে চীনে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বই প্রধান ছিল অথচ এই সময়টা জুড়ে চীনে বারেবারেই জাপানী হামলা ও আগ্রাসন ঘটেছে: ১৯২৮ সালে জাপান চিনান দখল করে, ১৯৩১এ ঘটে '১৮ সেপ্টেম্বরের ঘটনা,' তারপরেই জাপান লিয়াওনিঙ, কিরিন ও হেইলিঙকুয়ান নামক তিনটি প্রদেশ দখল ক'রে নেয়. ১৯৩৩এ দখল করে জেহোল প্রদেশ, আর ১৯৩৫এর পর থেকে জাপ সাম্রাজ্যবাদ আরো জোরদার ও ব্যাপক ক'রে তোলে তার আগ্রাসনকে। এইসব হামলা ও আগ্রাসন সত্ত্বেও তখনই আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব অপ্রধান হয়ে জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রাধান্যে আসেনি। কিন্তু কেন? বৈদেশিক আগ্রাসন ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই না জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান হয়ে যায়? বৈদেশিক আগ্রাসন সত্ত্বেও চীনে তখন জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান না হওয়ার একমাত্র কারণ ছিল এই যে চীনের শাসকশ্রেণীদুটিকে তখনও ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধযুদ্ধে রাজী করানো যায়নি, তারা তখনও জনগণ ও কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে তাদের দমন-অভিযান ও গৃহযুদ্ধ বন্ধ করেনি। ১৯৩৬এর ডিসেম্বরে সিয়ান ঘটনার মধ্য দিয়ে সেটা যখন অবশেষে সম্ভব হল সেই ১৯৩৭এই কেবল গৃহযুদ্ধ বন্ধ হল, আভ্যন্তরীণ তথা সামন্ত দ্বন্দ্ব অপ্রধান হল, প্রাধান্যে আসতে পারল জাতীয় দ্বন্দ্ব। উপরন্তু ১৯৩৭এ জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান হওয়ার পরেই কেবল চীনের কমিউনিস্টরা প্রথম জাতীয় প্রতিরোধযুদ্ধ ও জাতীয় ঐক্যফ্রণ্টের দাবী তোলেন একথাও ঠিক নয়। তাঁরা এ আওয়াজ প্রথম তোলেন সেই সুদূর ১৯৩১ সালের '১৮ সেপ্টেম্বরের ঘটনা'র পর (মাওয়ের 'জাতীয় যুদ্ধে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা' দ্রষ্টব্য)—যদিও তখন এবং তার পরের পাঁচ বৎসরাধিক কাল জুড়ে আভ্যন্তরীণ তথা সামন্ত দ্বন্দ্বই ছিল প্রধান। অতএব কেবলমাত্র জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্যের অবস্থাতেই জাতীয় প্রতিরোধযুদ্ধ ও জাতীয় ঐক্যফ্রণ্টের দাবী তোলা যায়, আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের প্রাধান্যের অবস্থায় তা তোলা যায় না, কিংবা বৈদেশিক আগ্রাসন হলেই ও উপরোক্ত দাবী তোলার প্রয়োজন দেখা দিলেই তার অর্থ জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান হয়ে গেছে—এ সব চিন্তাই ভুল। বৈদেশিক আগ্রাসন ঘটলেই জাতীয় দ্বন্দ্ব তীব্রতর হতে থাকে এবং জাতীয় প্রতিরোধযুদ্ধ ও জাতীয় ঐক্যফ্রণ্টের দাবী তোলার প্রয়োজন দেখা দেয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান হয়ে যায় না; জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান হয় কেবলমাত্র জাতীয় ঐক্যফ্রণ্টের দাবী বাস্তবায়িত হওয়ার পরেই।

৪.

ইতিপূর্বের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এবার আমরা দুটি আগ্রহজনক বিষয়ের উল্লেখ করতে চাই। একটা হল ৮ অক্টোবর ১৯৭৫ তারিখের 'পিপ্‌লস ডেইলি' (পিকিং) পত্রিকার একটি সম্পাদকীয় মন্তব্য। অপরটি হল 'গণ-যুদ্ধের বিজয় দীর্ঘজীবী হোক' পুস্তকে লিন পিয়াওয়ের একটি প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণ।

'পিপ্‌লস ডেইলি' লিখেছিল যে বাংলাদেশের জনগণ "রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষায় এবং আগ্রাসন প্রতিরোধে এক পরিশ্রমসাধ্য সংগ্রাম চালিয়েছেন" (ঢাকার 'বাংলাদেশ টাইমস'এ উদ্ধৃত)। আমাদের প্রতিপক্ষীয়রা ব'লে বেড়াচ্ছেন, এই মন্তব্য নাকি জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্যের তত্ত্বের প্রতিই এক প্রশ্নাতীত সমর্থন। তাঁরা বুঝতে পারেন না যে (১) আগ্রাসন ঘটলেই তাতে জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য প্রমাণিত হয় না এবং (২) পঞ্চশীল নীতির ভিত্তিতে চীন বাংলাদেশের জনগণের জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামের প্রতিই কেবল সমর্থন জানাতে পারে, তার আভ্যন্তরীণ শ্রেণীসংগ্রামের বিষয়ে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোনো মন্তব্য করতে পারে না। সুতরাং চীনের এই মন্তব্যে বাংলাদেশে জাতীয় দ্বন্দ্ব বা সামন্ত দ্বন্দ্ব কোনোটার প্রাধান্যের প্রতিই সমর্থন বোঝায় না।

ঢাকা থেকে অনূদিত ও প্রকাশিত লিন পিয়াওয়ের 'গণযুদ্ধের বিজয় দীর্ঘজীবী হোক' পুস্তকের এক জায়গায় আছে: "প্রতিরোধসংগ্রাম শুরু হওয়ার কিছুকাল পূর্ব অবধি চীনা কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে ওয়াঙ মিঙের প্রতিনিধিত্বে যে 'বামপন্থী' সুবিধাবাদী উপদলটির অস্তিত্ব ছিল তাহারা ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে জাপানী আক্রমণের ফলে চীন-জাপান জাতীয় বিরোধিতা যেভাবে উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল এবং জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-সংগ্রামের জন্য সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের যে দাবী উত্থিত হইয়াছিল তাহাকে আমল দিতে চায় নাই।... তিনি (মাও) দেখাইয়া দেন যে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ চীনকে একটি জাপানী উপনিবেশে পরিণত করিতে সচেষ্ট হওয়ার ফলে চীন ও জাপানের মধ্যেকার বিরুদ্ধতা চরমে পৌছাইয়াছে। ইহার ফলে এই বিরুদ্ধতা প্রধানতম বিরুদ্ধতায় পরিণত হইয়াছে এবং চীনদেশের অভ্যন্তরস্থ শ্রেণীবিরোধ যথা জনগণ ও সামন্তবাদের মধ্যে বিরোধ, কৃষক ও ভূস্বামীশ্রেণীর মধ্যে বিরোধ...তখনও সমাজে বিদ্যমান থাকিলেও জাপানী আক্রমণাত্মক অভিযানের ফলে সেইসব আপাতত দ্বিতীয় পর্যায়ে, কিংবা বলা যায় গৌণ পর্যায়ে, নামিয়া গিয়াছে। তিনি দেখাইয়া দেন যে শ্রেণী ও সামাজিক স্তর নির্বিশেষে চীনদেশের সকল মানুষের সাধারণ দাবী হইল জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করা। এই

ব্যাপারে ব্যতিক্রম হইল বৃহৎ ভূস্বামী ও বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর গুটিকতক জাপানী-সমর্থক বিশ্বাসঘাতক।" এই বিশ্লেষণ যে কোনো পাঠকের মনে অনিবার্যভাবে এই ধারণার জন্ম দেবে যে ১৯৩১ সালেই—অর্থাৎ জাপানী আগ্রাসন ঘটার সঙ্গে সঙ্গে এবং জাতীয় প্রতিরোধযুদ্ধ তথা জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের দাবী ওঠার ও বাস্তবায়িত হওয়ার আগেই চীনে জাতীয় দ্বন্দ্ব প্রধান হয়ে গিয়েছিল। বলা বাহুল্য এই বিশ্লেষণ ভুল এবং দক্ষিণপন্থী জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতিতে আক্রান্ত—আমাদের মতো দেশে যে বিচ্যুতির অবশ্যম্ভাবী পরিণতি কিন্তু আবার জাতীয়তাবাদও নয় বরং বৃহৎ বুর্জোয়া ও বৃহৎ জমিদারশ্রেণীর লেজুড়বৃত্তি। আজকে যাঁরা বাংলাদেশে বৈদেশিক আগ্রাসনের অজুহাতে জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য প্রচার করছেন তাঁরা আসলে লিন পিয়াওয়ের এই গুরুতর বিচ্যুতিরই উত্তরাধিকারী।

৫.

আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্তবাদী দেশে, অর্থাৎ যেখানেই আত্মসমর্পণ-বাদী আমলা-মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও জমিদারশ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতায় রয়েছে এমন প্রত্যেকটি দেশে, কমিউনিস্টরা যেমন দেশীয় শাসকশ্রেণীদ্বয়ের বিরুদ্ধে লাগাতার শ্রেণীসংগ্রাম পরিচালনা করবে তেমনি তার পাশাপাশি তারাই হবে জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের সজাগতম প্রহরী। এই শেষোক্ত প্রশ্নে তারা দেশীয় শাসকশ্রেণীগুলির ধিক্কারজনক আত্মসমর্পণ ও আপোষরফাগুলিকেও প্রতিনিয়ত জনতার সামনে ফাঁস ক'রে দেবে এবং এইভাবে দেশীয় শাসকশ্রেণীদুটির বিরুদ্ধে জনতার ঘৃণা ও দেশপ্রেমকে তীব্রতর ক'রে তুলে তাকেও ব্যবহার করবে শ্রেণীসংগ্রামেরই স্বার্থে। বৈদেশিক আগ্রাসন ঘটলে তারা আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে জাতীয় প্রতিরোধ ও জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের দাবী এবং তার জন্য অনুকূল শর্তাবলী সৃষ্টির দাবীও তুলবে, জনতার সক্রিয় সংগ্রামের অঙ্গীভূত ক'রে নেবে সে দাবীকে। তথাপি শাসকশ্রেণীদুটিকে ঐক্যফ্রন্টের জন্য চাপ দেওয়ার সংগ্রামটা, অর্থাৎ যত শীঘ্র সম্ভব জাতীয় যুদ্ধ শুরু ক'রে দেওয়ার জন্য অধীর প্রচেষ্টাটা, কখনোই কমিউনিস্টদের সমগ্র কর্মকাণ্ডের প্রধান দিক হতে পারে না; অথচ এই ভ্রান্ত মানসিকতাটাই জাতীয় দ্বন্দ্বের প্রাধান্য-ঘোষকদের ভ্রান্ত তত্ত্ব ও যুক্তিজালের তলে তলে কাজ ক'রে চলেছে। সর্ব অবস্থায় ও সর্বকালে কমিউনিস্টদের স্থায়ী দায়িত্ব হল বুনিয়াদী জনগণের শ্রেণীসংগ্রামের বিকাশ ও প্রসারের জন্য অনুকূল থেকে অনুকূলতর ক্ষেত্র শ্রেণীশত্রুর কাছ থেকে জয় ক'রে নেওয়া, যতক্ষণ না শ্রেণীশত্রুর শাসনকে চূড়ান্তভাবে উৎখাত করার পরিস্থিতি পরিপক্ক হয়। অবশ্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি দেখা দিলে তারা নিশ্চয়ই

শাসকশ্রেণীদুটিকে ঐক্যফ্রণ্টে রাজী করানোর এবং তার ন্যূনতম শর্তাবলী পূরণে বাধ্য করার প্রচেষ্টাকেও তাদের সংগ্রামের অংশ হিসাবেই গণ্য করবে; কিন্তু শাসকশ্রেণীদুটি যতক্ষণ এই দাবীগুলিকে বাস্তবে পূরণ না করছে ততক্ষণ তারা কোনোমতেই বলবে না যে শাসকশ্রেণীদুটির বিরুদ্ধে ব্যাপক জনগণের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব অপ্রধান হয়ে গেছে।

ঐক্যফ্রণ্টের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম শর্তাবলী পরিস্থিতিভেদে ভিন্ন ভিন্ন হতে বাধ্য। সাধারণভাবে এটুকু বলা যায় যে সংগঠন, সমাবেশ ও প্রচারের গণতান্ত্রিক অধিকারকে সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত হতেই হবে। এদিক থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মোক্ষম দাবীটি হচ্ছে বৈদেশিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জনগণের অস্ত্রসজ্জিত হওয়ার অধিকার। এই দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত কোনো কমিউনিস্ট পার্টিই শাসকশ্রেণীগুলির সঙ্গে জাতীয় যুদ্ধের ঐক্যফ্রণ্টে রাজী হতে পারে না এবং তীব্রতম-সম্ভব শ্রেণীসংগ্রাম পরিচালনার দায়িত্বে পারে না ঢিলে দিতে। কেননা শাসকশ্রেণীগুলির কাছ থেকে যে কোনো দাবী আদায়ের একমাত্র নির্ভরযোগ্য পথ শ্রেণীসংগ্রাম—তীব্র ও নির্মম, কিন্তু মাপা ও বিচক্ষণ, শ্রেণীসংগ্রাম। অবশ্য শাসকশ্রেণীগুলির বিরুদ্ধে তীব্র শ্রেণীসংগ্রামের অর্থ এই নয় যে পরিস্থিতির বিচারবিবেচনা না ক'রে এখনই গৃহযুদ্ধ শুরু ক'রে দিতে হবে কিংবা বলপূর্বক সরকার উচ্ছেদের দাবীকে রাখতে হবে এই মুহূর্তের একটা তাৎক্ষণিক স্লোগান হিসাবে। সেটা হবে বামপন্থী হঠকারিতা। চিয়াঙ সরকার ঐক্যফ্রণ্টের দাবী ও তার ন্যূনতম শর্তাবলী পূরণের আগে পর্যন্ত চীনে বিদ্যমান শ্রেণীসংগ্রামটাই ছিল সশস্ত্র গৃহযুদ্ধের স্তরে, তাই চিয়াঙ সরকার জাতীয় প্রতিরোধের দাবী পূরণ না করা পর্যন্ত চীনের কমিউনিস্টদের অব্যাহত রাখতে হয়েছিল গৃহযুদ্ধ ও বলপূর্বক সরকার উচ্ছেদের সংগ্রাম। বাংলাদেশে স্পষ্টতই শ্রেণীসংগ্রাম বর্তমানে সেই স্তরে নেই, তাই প্রতিটি পদক্ষেপে বিদ্যমান শ্রেণীসংগ্রামের অবজেকটিভ মাত্রা ও সম্ভাবনার উপর ভিত্তি ক'রেই এখানে অত্যন্ত সতর্কতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে আমাদের সচেতন প্রয়াসের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে।

তবে মূল কথা হচ্ছে এই যে জাতীয় প্রতিরোধের দাবী ও তার আনুষঙ্গিক অপরিহার্য শর্তাবলী শাসকশ্রেণীগুলি পূরণ করার আগেই তাদের বিরুদ্ধে শ্রেণীসংগ্রামের গুরুত্ব অপ্রধান ক'রে ফেলার অর্থ হচ্ছে তাদেরই দেওয়া শর্তে তাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। সোজা কথায় তাদের পায়ে আগে আত্মসমর্পণ ক'রে তারপর বিভিন্ন দাবী-দাওয়া নিয়ে তাদের কাছে কাকুতিমিনতি করা।

আজকের বাংলাদেশে এই শিক্ষাগুলিই অত্যন্ত জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে।

৫

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের সিকিমগ্রাস

একমাত্র যে প্রাসঙ্গিক সমস্যাটি আমাদের বাকী আছে তা হল সিকিমের বিষয়ে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া—বিশেষত সিকিমী কমিউনিস্টদের দৃষ্টিকোণ থেকে। কোন দ্বন্দ্বটিকে তাঁদের প্রধান ধরা উচিত? সিকিমের বর্তমান ঘটনাবলী সম্বন্ধে কোনো তথ্যই আমার জানা নেই। তবু আমি ঝুঁকি নিয়েই একটা মতামত প্রকাশ করছি।

সিকিম ভারতের উপনিবেশ নয়, তার একটা অংশ, একটা প্রদেশ। কারণ: (১) সিকিমের শাসকশ্রেণীগুলি ভারতের সহায়তায় নিজেরাই তাদের চোগিয়ালকে ঝেড়ে ফেলেছে এবং স্বেচ্ছায় ভারতের শাসকশ্রেণীগুলির নিকট আত্মসমর্পণ ক'রে তাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, (২) ভারতীয় জাতি ও সিকিমী জাতিসত্তার জন্য একই সংবিধান, সাংবিধানিক অধিকার ইত্যাদিসহ সিকিম ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থার অঙ্গীভূত হয়ে গেছে।

অবশ্য সিকিম উপনিবেশ নয়—এর অর্থ নিশ্চয় এটা নয় যে এখানে ভারতের সঙ্গে জাতীয় দ্বন্দ্বের গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টরটি সক্রিয় নেই। তা আছে। কিন্তু তাহলে সিকিমের উপনিবেশ হওয়া-না-হওয়াটা কি নিছক একটা টেকনিক্যাল বিষয় হয়ে দাঁড়ায় না? তা দাঁড়ায় না কারণ কমিউনিস্ট কৌশলের ক্ষেত্রে তা বিরাট পার্থক্যের তাৎপর্যবাহী। উপনিবেশে কমিউনিস্টদের প্রথম থেকেই জাতীয় দ্বন্দ্বকে প্রধান হিসাবে নিতে হয়। কিন্তু সিকিম যেহেতু উপনিবেশ নয় তাই আদৌ কোনোদিন সিকিমী কমিউনিস্টদের জাতীয় দ্বন্দ্বকে প্রধান হিসাবে নিতে হবে কিনা তা একটা খোলা প্রশ্নই রয়ে গেল। সিকিমী জনগণের মুক্তির আগে ভারত ও সিকিমের রাজনৈতিক বিচ্ছেদ ঘটবে, নাকি সিকিমসহ সমগ্র ভারতের বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সিকিমের জাতিগত সমস্যারও সমাধান হবে (দৃষ্টান্তস্বরূপ রাশিয়াতে যেমন হয়েছিল), তা কেউ আগে থেকে ব'লে দিতে পারে না। তাই **বর্তমান** পর্যায়ের বিচারে আমার মনে হয় যে সিকিমী কমিউনিস্টদের উচিত সিকিমসহ সারা ভারতের শাসকশ্রেণীদুটির বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের সঙ্গে **সমবেত** শ্রেণীসংগ্রাম যোগদান করা এবং **ঐক্যবদ্ধ** বিপ্লবের সুবিধাবলী প্রচার করা। অর্থাৎ সিকিমসহ সমগ্র ভারতে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের প্রাধান্যের উপরেই তাঁদের ভিত্তি করা উচিত। একই সঙ্গে তাঁরা অবশ্যই সিকিমী জাতি-

সত্তার বিচ্ছিন্ন হওয়ার **অধিকার**সহ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে **স্বীকার** ও সমর্থন করবেন, কিন্তু বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য **ওকালতি** করবেন না। এর গতি-পথে যদি কখনও ভারতের শাসকশ্রেণীদ্বয় ও সিকিমের ভূতপূর্ব শাসকশ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব যথেষ্ট তীক্ষ্ণ হয়ে উঠে ব্যাপক সিকিমী **জনগণকে** আলোড়িত করে, এবং সিকিমকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য একটা **গণচরিত্রের** জাতীয় আন্দোলন যদি বাস্তব ঘটনা হয়ে ওঠে, তাহলে সিকিমী কমিউনিস্টদের যে তা শুধু সমর্থন করা উচিত তা-ই নয় বরং সাধারণত তার নেতৃত্ব ছিনিয়ে নিতেও এগিয়ে আসা উচিত। ভারতীয় কমিউনিস্টদের উচিত দৃঢ়ভাবে ও দ্ব্যর্থহীনভাবে সিকিমী জাতিসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণ ও বিচ্ছিন্নভবনের **অধিকারকে** ঊর্ধ্বে তুলে ধরা, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের সিকিমগ্রাসকে নিন্দা করা এবং একই সঙ্গে অত্যন্ত নিঃস্বার্থভাবে ও হৃদ্যতাসহকারে সিকিমী জনগণকে সিকিমসহ সারা ভারতের সবপ্রধান শোষকশ্রেণীগুলির বিরুদ্ধে যুক্ত সংগ্রামে আমন্ত্রণ জানানো।